শিবাজীর স্বপ্ন

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

[redacted]

প্রথম প্রকাশ
রথযাত্রা, ১৩৬৬

প্রকাশক
নির্মলকুমার সাহা
সাহিত্যম্
১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর
অজিত কুমার সামই
ঘাটাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১/১এ, গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ-শিল্পী
গণেশ বসু

ব্লক ও প্রচ্ছদ মুদ্রণ
জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত
ন্যাশনাল হাফটোন কোম্পানী
কলিকাতা-৯

শিবাজীর স্বপ্ন

কথা ছিল সনৎদা এই বইয়ের একটি ভূমিকা লিখে দেবেন, কিন্তু তা আর আমাদেব বরাতে হ'লো না। কপি দেবাব দিন তাঁর স্বভাবসুলভ মিষ্টি হাসি-মুখে বলেছিলেন, শিবাজীর এই গল্পটা বাবা একটি মাসিক পত্রিকায় লিখছিলেন, কিন্তু শেষ করতে পারেননি। অনেক খেটে এটি শেষ করেছি ভাই, এই নাও। বলে, কপিটা একবাব কপালে ঠেকিয়ে টেবিলের ওপর বাখলেন। হাতে লেখা পুরো পাণ্ডুলিপি। ঠিক তারাশঙ্করের মতনই হাতের লেখা ছিল সনৎদার। পাতা ওলটাতে ওলটাতে বললাম, আপনি কোথা থেকে শুরু করেছেন দাদা? অবাক হবার ভঙ্গী করে উনি বললেন, ওমা, তা বলবো কেন? তোমরা ধরে নাও। আমরা পারিনি। এখন এ বই যাঁরা পড়বেন তাঁরা যদি পারেন—এটা বড় কথা নয়, অসমাপ্ত এই বই যিনি অনেক পরিশ্রম করে শেষ করে গিয়েছেন, তিনি আর আমাদের মধ্যে নেই। আমাব প্রকাশনা জীবনে এটি একটি অত্যন্ত মর্মান্তিক ঘটনা।

—প্রকাশক

উৎসর্গ

রাঢ় দেশের জন-মানুষের উদ্দেশে

এক

—"চলা যাও; অভি চলা যাও, ভাগো-ভাগো। নেহি মাংতা হ্যায়। কুছ পরোয়া নেহি।"

কণ্ঠস্বরের উচ্চতা ও তীক্ষ্ণতা এবং তার মধ্যে উত্তাপহীন বাঁকা ব্যঙ্গের স্বর আমাকে চমকে দিলে। মনে হ'ল চেনা। অত্যন্ত জানা। অথচ স্মরণ করতে পারছি না। থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম।

স্বাধীনতার পর দেশে রাস্তাঘাটগুলো একে একে ফাইভ ইয়ার প্ল্যানিংয়ের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে, এবং মেরামত নয়, একেবারে নতুন করে গড়া হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত পিচ ঢালাই করে রাজপথেই পরিণত হচ্ছে। বড় বড় পথ, ন্যাশনাল হাইওয়েই নয়—গ্রামের রাস্তাতেও পিচ পড়ছে। বর্ধমান মুর্শিদাবাদের ভিতর দিয়ে একটা অনেক পুরনো সড়ক আছে—নাম বাদশাহী সড়ক। এই সড়কে কাজ হচ্ছিল। আমি ছিলাম একখানা জীপে; যাচ্ছিলাম ওই রাস্তা ধরে আখড়াইয়ের দীঘি দেখতে এবং দেখাতে। অনেক দিন আগে 'আখড়াইয়ের দীঘি' নামে একটি গল্প লিখেছিলাম। একটা অতি নিষ্ঠুর গল্প। এক ঠ্যাঙাড়ে অর্থাৎ যারা আগের কালে রাস্তার পাশে লুকিয়ে থেকে পথে নরহত্যা করত তাদেরই একজনকে নিয়ে গল্প। শেষ পর্যন্ত হতভাগ্য লোকটা নিজের ছেলেকেই একদিন হত্যা করেছিল। পরবর্তীকালে ও থেকে একটা নাটকও হয়েছিল। সে নাটক অভিনয়ের সময় আমার অনুশোচনার আর শেষ ছিল না। ওই পুত্র-হত্যার দৃশ্যটা নিজে কোনোদিন দেখতে পারিনি। নাটকটা চলেওনি। লোকে এই নিষ্ঠুর মানসিক আঘাত গ্রহণ করবে কেন? নাটকটার সংস্করণ শেষ হলে বইখানা আর দ্বিতীয়বার প্রকাশ করতেও দিইনি। সেই গল্প নিয়ে ছবি হবে। তবে পরিবর্তিত আকারে।

যাঁরা ছবি করবেন তাঁরাই বলেছেন যে, ওই যেখানে বাপ ছেলেকে হত্যা করছে সেখানে ওই ঠ্যাঙাড়ে লাঠিয়ালের ছেলে আক্রান্ত হয়ে প্রথমে বলবে, বাবা—আমি, আমি তারাচরণ। কিন্তু উন্মত্ত ঠ্যাঙাড়ের তখন দিগ্বিদিক জ্ঞান নেই, সে হিংস্র বাঘ যেমন শিকারের উপর লাফিয়ে পড়ে তেমনভাবেই হিংস্র আক্রমণে ছেলের উপর লাফ দিল। তখন ছেলে, সেও লাঠিয়াল, সেও দাঁড়াল ঘুরে এবং বাপের আক্রমণ রোধ করলে। ছেলের হাতে বাপের হ'ল পরাজয়।

আমার রাজী হওয়ার কথা নয়। উচিতও নয়। তবু রাজী হয়েছি। আমার অপবাদ আছে—অর্থের জন্য এমন পরিবর্তনে আমি রাজী হই। সে অবশ্যই আমাকে শিরোধার্য করতে হয়েছে। অর্থ যখন নিয়েছি বা পেয়েছি তখন তার প্রতিবাদ করার অধিকার আমার গেছে, কিন্তু তার মধ্যে যেসব কথা আছে সেসবের মূল্য অনেক। সেসব যুক্তি-কথা থাক, এখানে অবান্তর। এখানে যে কথাটা আছে সেইটেই বলি। আজ ওই গল্পটার জন্য একটা মানসিক অপরাধ আমি বোধ করে থাকি। একবার একটি পাবলিক লাইব্রেরির একখানা বই—আমারই বই—যে বইয়ে ওই 'আখড়াইয়ের দীঘি' গল্পটি আছে—সেই বই দেখেছিলাম। তার পাতা উল্টে দেখতে দেখতে কৌতুক অনুভব করেছিলাম প্রচুর। গল্পের পাশে, শেষে নানা মন্তব্য করেছে পাঠক-পাঠিকারা। আখড়াইয়ের দীঘির শেষে লাল পেন্সিলে মোটা হরফে একজন লিখেছিলেন—লেখক রাক্ষস। ছেলের রক্ত খেতে পারে। তাতেও তার তৃপ্তি হয়নি, তারপরও তিনবার লিখেছিল রাক্ষস রাক্ষস রাক্ষস! আর একটা গল্প 'অগ্রদানী'। তার নিচেও এমনি সব মন্তব্য দেখেছি। এই নিয়ে মনে একটা প্রচ্ছন্ন আক্ষেপ বা অনুশোচনা যাই হোক, বেদনা হয়ে জমে আছে। তাই এ প্রস্তাব যখন তাঁবা করলেন তখন রাজী আমি হলাম। ডিরেক্টার প্রডিউসার প্রত্যাশা করেন যে, যখন ছেলের হাতে বাপের পরাজয় ঘটবে তখন দর্শকেরা আনন্দে করতালি দিয়ে উঠবে এবং মন যা চায় তাই পেযে তারা পরিপূর্ণ অন্তর নিয়ে ফিরে যাবে। ফিরে গিয়ে আবারও আসবে দেখতে। আমি নিজেও কল্পনায় খুশী হয়েছি। ভারী ভালো লেগেছে। তাই রাজীও হয়েছি সানন্দে।

এই এঁরাই আমাকে বলেছিলেন যদি লোকেশনের মধ্যে বাস্তবতা থাকে তবে সেই লোকেশনেই তাঁরা ছবি তুলবেন।

ডিরেক্টার হেসে বলেছিলেন, আপনাব গল্পের পটভূমি তো শুনেছি সবই রিয়াল। একটু যদি দেখিয়ে দেন জায়গাটা। মানে, স্টুডিয়োতে ওই মাঠ আর কি বলে ওই বিরাট দীঘি ঠিক তো আসবে না।

বলেছিলাম, আখড়াইয়ের দীঘি সত্যিই আছে। চলুন না। এই তো বছর কয়েক আগেও কাঁদী গিয়ে দেখে এসেছি। তবে রাস্তা দুর্গম।

—জীপের কাছে দুর্গম কিছু নেই। দু'খানা জীপ নিয়ে যাব।

সেই নিয়ে ওই পথে বেরিয়েছিলাম। কলকাতা থেকে ডিরেক্টার ফটোগ্রাফার অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রভৃতি নিয়ে জন সাতেক, তাছাড়া দু'জন ড্রাইভার। কলকাতা থেকে আমার গ্রাম পর্যন্ত পথ পিচ দেওয়া রাজপথ হয়ে গেছে। দেড়শো মাইল

রাস্তা ঘণ্টা আষ্টেক লেগেছিল। গ্রামে রাত্রিটা বিশ্রাম করে পরের দিন ভোরবেলাতেই বেরিয়েছিলাম। আমার বাড়ি থেকে আখড়াইয়ের দীঘি নিকটতম পথে কুড়ি মাইল। এ কুড়ি মাইলের পনরো মাইল সুগম তো নয়ই তবে জীপের পক্ষে দুর্গম নয়। বাকী পাঁচ মাইল দুর্গম, জীপকেও চলতে হচ্ছিল খোঁড়াতে খোঁড়াতে।

পথে মাটি ফেলা হচ্ছে। মাঠ থেকে মাটি—বড় বড় মাটির চাঁই ফেলে বিছিয়ে দিয়েছে। গাড়িকে মাঠে নেমে মাঠ ভেঙে যেতে হচ্ছে। কয়েকবারই গাড়ি কাত্ হয়ে উল্টে যেতে যেতে রয়ে গেল। কিন্তু তাতে কষ্ট হলেও গায়ে লাগছিল না। নব যুবকেরা হৈ হৈ করে উল্লাসে কষ্টকে উপেক্ষা দিয়ে ঢেকে চলেছিল। পিছনের জীপে ফটোগ্রাফার ছিল নেতা। তার নেতৃত্বে গান ধরেছিল ওরা—"দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে।" মধ্যে মধ্যে গর্তে গাড়ি পড়লে চীৎকার করে উঠছে—"কাণ্ডারী হুঁসিয়ার! যাত্রীরা হুঁসিয়ার!" তাদের নিরুদ্বিগ্ন উল্লাস কৌতুকের স্পর্শ আমার প্রৌঢ় মনকেও অভিভূত করে তুলছিল। আমার সঙ্গে গাড়িতে যারা ছিল তারা প্রৌঢ় নয়, তারা জোয়ান, তারা আমার জন্যই চুপ করে থাকলেও হাস্য-কৌতুকের অন্ত ছিল না।

ডিরেক্টার বললেন, হ্যাঁ, রাত্রির অন্ধকারে এসব জায়গায় মানুষ মারবার জায়গা বটে।

রাস্তাটা মাঠের উপর দিয়ে চলে গেছে দক্ষিণ থেকে উত্তর মুখে। পূর্বে পশ্চিমে দু'দিকেই বিস্তীর্ণ দিগন্ত জোড়া শস্যক্ষেত্র। মধ্যে মধ্যে বট অশথের গাছ ওই মাঠের মধ্যে চাষীদের আশ্রয়স্থলের মতো দাঁড়িয়ে আছে। আর দু'চারটে মাঠের পুকুরের পাড় উঁচু হয়ে রয়েছে, তার উপর পাঁচটা-দশটা তালগাছ।

সময়টা ফাল্গুনের শেষ। শস্যক্ষেত্র প্রায় রিক্ত। এখানকার মাটি একটু কালচে। মধ্যে মধ্যে বাতাসে মাঠের ধুলো উড়ছে। দূরে—অনেক দূরে যেখানে গ্রামের বন কালো আভাসে আকাশের গায়ে জেগে রয়েছে তার কোলে কিছু উজ্জ্বল বর্ণের রেখাছটার মতো মনে হচ্ছে। রবিফসলের কোনো ফসলে ফুল দেখা দিয়েছে। আখের ক্ষেতগুলিতে আখ কাটা হচ্ছে। তাও অনেক দূরে। কাছে-পিঠে লোক নেই। নির্জন মাঠ। যেন খাঁ-খাঁ করছে। এখানে এখনও মানুষ মারলে কে তাকে রক্ষা করবে? আততায়ী থাকে বাঘের মত ওৎ পেতে। পথিক রাত্রে যখন পথ চলে তখন ভয় তাকে দুর্বল করে রাখে, সে-সময় আক্রমণ হলেই তার অর্ধেক মৃত্যু হয়ে যায়।

ডিরেক্টার বললে—এখানে দিনের দু'চারটে শট আর রাত্রের কয়েকটা হলেই অদ্ভুত হবে। অসাধাবণ ব্যাপার হবে একটা।

সামনেই আখড়াইয়ের দীঘির উঁচু পাড়। পাড়টা বেড় দিয়ে রাস্তাটা একটা মোড় ফিরেছে। মোড়টা ফিরেই গাড়িটা একটা ঝাঁকি খেয়ে দাঁড়িয়ে থেমে গেল। একটা জায়গায় ময়দার মতো ধুলোর মধ্যে গাড়ির সামনের চাকা দুটো যেন একটা গর্তের ভিতর পড়ে গেল।

সম্মুখেই প্রায় দু'তিনশো গজ দূরে অনেক লোক। সবাই কুলী। রাস্তায় কাজ হচ্ছে। আরও খানিকটা দূরে সামনেব মাঠে তালপাতার ছাউনি পঞ্চাশ-ষাটটা কুঁড়ে দেখা যাচ্ছিল। কাজ করছিল যারা তারা সংখ্যায় শ'খানেক তো বটেই, তার বেশিও হতে পাবে। কাজ ঠিক হচ্ছিল না তখন, পথের পাশেই একটা গাছতলায় তারা জটলা কবে জমে দাঁড়িয়েছিল ; কোনো একটা বিতর্ক বা টাকা-পয়সার লেনদেন গোছের কিছু হচ্ছিল। সম্ভবতঃ সপ্তাহের পেমেণ্ট। কুঁড়ে বেঁধে যেখানে কুলী থাকে সেখানে মজুরেরা প্রায়ই সব বিদেশী মজুর হয়। তারা পেমেণ্ট নিয়ে থাকে সপ্তাহে সপ্তাহে। স্থানীয় মজুব হলে পেমেণ্ট দৈনিক।

বন্ধ হয়ে যাওয়া গাড়িটা স্টার্ট দিয়ে ড্রাইভার সশব্দে গীয়ার দিয়ে ওই গর্তটা থেকে তুলতে চেষ্টা করলে। কিন্তু ধুলোর মধ্যে চাকা দুটো বন বন করে পাক খেয়ে খানিকটা ধুলো উড়িয়ে আবার বন্ধ হয়ে গেল।

আবার স্টার্ট দিলে। গাড়িটা কোঁ কোঁ শব্দ করে স্টার্ট নিয়ে আবার ধুলো উড়িয়ে বন্ধ হ'ল। এবাব ড্রাইভার পাশে ঝুঁকে দেখে বললে—এ যে একটা নালা!

নালাই বটে। চাষের প্রয়োজনে সেচের জল নিয়ে যাবার জন্য একটা নালা কাটা হয়েছিল, সেটাকে রাস্তা মেরামতের সময় মাটি ফেলে বন্ধ করেছে। গরুর গাড়ির চাকার লোহার হালের চাপে ঘর্ষণে দুটি চাকা চলার যে দুটি জায়গা—গ্রামের লোকেবা যাকে গাড়ির গোল বলে—সেই গোল দুটির মাটি গুঁড়িয়ে ময়দার মতো ধুলো হয়ে উঠেছে। উপর থেকে নিরীহ নিশ্চিন্ত দুটি সমতল মসৃণ পথ, কিন্তু ভিতরে চোরাবালির গর্তের মতো গর্ত। সেই গর্তের মধ্যে জীপের সামনের চাকা দুটি যত ঘুরছে ততই মহাগর্তে নিপতিত হচ্ছে।

আমি বললাম—নাম সকলে। হাল্কা হোক গাড়িটা। নামল সকলে। আবার গাড়ি স্টার্ট নিল, আবার চাকা ঘুরল, এবং এবার আরও খানিকটা বসে সামনের অ্যাক্সেল মাটিতে ঠেকে গেল।

ডিরেক্টার বললে—এই মরেছে। অ্যাক্সেল মাটিতে থুবড়ে পড়ল যে।

ড্রাইভার ঝুঁকে দেখে বললে—তাইতো।

অর্থাৎ এখন নিচে বাঁশ দিয়ে ঠেলে তুলে পিছন থেকে ঠেলা মেরে গাড়ি পার করতে হবে।

সকলে মাটির উপর উবু হয়ে বসে ঘাড় হেঁট করে নিরীক্ষণ করতে বসে গেল।

তারপর আস্তিন গোটালে।

শুধু হাত আর গায়ের জোরে এবং সে জোর ও হাত ভদ্র সন্তানদের, তাতে মেদিনী কবলিত কর্ণের রথচক্রের মতো গাড়িটিকে এতটুকু নড়াতে পারলে না।

চেষ্টা চলল কিছুক্ষণ। অতঃপর সকলেই ক্লান্ত হয়ে রাস্তার পাশে বসে সিগারেট ধরালে; আমাকে খাতির করে একটু দূরে গিয়ে অবশ্য। প্রযোজক আমাকে সিগারেট দিয়ে নিজে ধরালে। তারপর ধোঁয়া ছেড়ে বললে—লোক চাই. আর নিচে থেকে ঠেলা দিয়ে তুলতে বাঁশ চাই।

আমি বললাম—চলুন ওইখানে গিয়ে দেখি। ওদের ওখানে সব পাওয়া যাবে।

* * *

চিন্তা খুব ছিল না। সামনে অনেক লোক। আমরা তিনজন হাঁটছিলাম। আমি, প্রডিউসার আর ডিরেক্টার। হাল্কা নিশ্চিন্ত মনেই যেতে যেতে কথা বলছিলাম। ডিরেক্টারটি বলেছিল—আপনি কেন যাবেন? আমরা যাচ্ছি, টাকা দিয়ে কাজ করিয়ে নেব, কি কাজ আপনার হেঁটে?

আমি তবুও গিয়েছিলাম। সম্ভবতঃ নিজের প্রতিষ্ঠায় মানুষ নিজেকে অলঙ্ঘ্য মনে করে এবং সব কিছুর এমন কি টাকার মূল্যের চেয়েও নিজের অনুরোধ বা আদেশকে মূল্যবান মনে করে। তার সঙ্গে বয়সের অর্থাৎ প্রবীণতারও এই দোষটা আছে। বলেছিলাম—না না, চল, আমিও যাই।

কৌতুক করতে করতেই চললাম।—এমন একটা ব্যাপার না হ'লে ট'লে আর হ'ল কি? সেই 'বিপিনে' ছবিটার সময়—মিস্টার দত্ত, মনে পড়ছে?

হেসে উঠল মিস্টার দত্ত। কিন্তু সে হাসি আরম্ভ হতে-না-হতেই স্তব্ধ হয়ে গেল। সামনে পঞ্চাশ গজ দূরে তখন ওই জটলাটা। জটলাটায় অকস্মাৎ কোলাহলটা কলহের মতো প্রবল এবং উচ্চ হয়ে উঠল। কলহের কোলাহলের সে ঐকতান এমনই জটিল এবং দুরূহ যে তার এক বর্ণ বোধগম্য হয় না। শুধু উত্তপ্ত উচ্চ শব্দ এসে অনেক ঢাকের বেতালা বাজনার মতো কানে এসে ঢোকে।

—কি হ'ল?

লোকগুলি সব সরে যাচ্ছে চীৎকার করতে করতে। চলে যাচ্ছে মাঠের মধ্যে কুঁড়ের দিকে। যেতে যেতে উত্তপ্ত আলোচনা করছে। মধ্যে মধ্যে থমকে দাঁড়াচ্ছে।

পাতলা জনতার মধ্যখানে এতক্ষণে দেখা গেল একটি মূর্তি। বিশেষ করে দেখা গেল বা নজরে পড়ল এতগুলো মানুষের মধ্যে একটি মানুষ। তার কারণ তার পোশাক। প্রথমেই চোখে পড়ে তার মাথার টুপি। একটা শোলা হ্যাট। মাথায় শোলা হ্যাট, খালি গা, কোমর থেকে একটা হাফপ্যাণ্ট, হাতে একটা লাঠি—না, লাঠি না, একটা বন্দুক।

চীৎকার করছে লোকটা—চলা যাও। আভি চলা যাও। নেহি মাংতা হ্যায়। কুছ পরোয়া নেহি।

চীৎকারের কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ উচ্চ কিন্তু তাতে উত্তাপ নেই, ক্রোধ নেই, বাঁকা ব্যঙ্গের উপেক্ষা আছে।

আমি চমকে উঠলাম। এই কণ্ঠস্বর—এই ভঙ্গিতে কথা বলা—এ যেন আমার খুব পরিচিত। খুব চেনা। অথচ কিছুতেই মনে করতে পারছি না।

একবার থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম।

প্রযোজক বললে—দাঁড়ালেন যে? পায়ে লাগল নাকি?

—না। চলুন।

গতি দ্রুত করেই এবার পঞ্চাশ গজ এগিয়ে গেলাম।

একটি মানুষ—কুৎসিত দেখতে। যত কুৎসিত সে জন্মগতভাবে না হোক তত কুৎসিত হয়ে উঠেছে বসন্তের দাগে। দীর্ঘদিন আমাজা একটা কালচে তামার পাত্রের মতো হয়ে উঠেছে মুখটা। বসন্তের দাগগুলো হাতুড়ির পেটাইয়ের দাগের মতো দেখাচ্ছে। কিন্তু দেহখানা বটে! পেশী-সবল লম্বা মানুষ, চোখ দুটো খয়রা রঙের এবং তাতে বিচিত্র দৃষ্টি।

চিনতে পারলাম না। না, এ মানুষ তো আমি কখনও দেখিনি!

ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন।—কি স্যার, নালায় গাড়ি পড়েছে তো! উঠছে না? বলে হি-হি ক'রে হেসে উঠল।

প্রডিউসার বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ। রাস্তা এমন করে রেখেছেন, গাড়ি ভেঙে যায়নি এই ভাগ্য। মেরামত করছেন—কি রকম মেরামত করছেন আপনি?

হেসে সে বললে—যা কণ্ট্রাক্ট তাই করেছি। আর্থওয়ার্কের কাজ আর্থওয়ার্ক করে যাচ্ছি। মাটি ফেলছি। মাটি ধুলো হলে হোয়াট ক্যান আই ডু? ওতে স্যার, আমার কোনো রেসপন্সিবিলিটি পাবেন না। কিন্তু ঘাবড়াবেন না। চলুন, তুলে দিচ্ছি। শিব্বা সরকার থাকতে কুছ পরোয়া নেহি হ্যায়। এ রামধনিয়া, চামারিয়া, এ—। আরে ইধর আও, শুনো। এই—

আবার আমি চমকে উঠলাম।

শিব্বা সরকার? শিব্বা সরকার? বলে উঠলাম—শিব্বা সরকার? শিবাজী সরকার? আপনি গয়ার শিবাজী সরকার?

সে আমার মুখের দিকে তাকালে সবিস্ময়ে।

ডিরেক্টার বললে—ওঁর নাম চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়—লেখক।

—চন্দ্রশেখর!

তার খয়রা রঙের চোখ দুটো নেচে উঠল।

—আরে—আরে—আরে। মাই ডিয়াব রে। মেবে পিয়ারকে ভাই রে! দাদা রে! দোস্ত বে!

বলে হা হা শব্দে হেসে যেন মাতাল হয়ে গেল।

শিব্বা সরকার খানিকটা হেসে নিয়ে আমার দুই বাহুতে ধবে আমাকে প্রায় বাচ্চা ছেলেব মতো সামনে ধবে দেখতে লাগল আর ঘাড় নাডতে লাগল।

বললাম—কি দেখছ?

—দেখতা হ্যায় ভাইয়া—বহুৎ কুছ দেখতা হ্যায়।

আমাব সঙ্গের লোকেরা যে বেশ খানিকটা অবাক হয়ে গেলেন সে বলাই বাহুল্য। কিন্তু শিব্বা সরকারের সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করার কথা নয়, করলেও না। বলতে লাগল—দেখতা হ্যায় তুম হামাবা ওহি মামুজী হ্যায় না জাল কোই হ্যায়। ওহি ছোটাসে লড়কা—

তারপর বাংলায় শুরু করলে—ফুটবলের মাঠে ছোট রোগা ছেলে, পাঁই পাঁই দৌড়োয়খুনি। আরে বাপরে বাপরে—আঁ!

তারপর আর এক দফা হাসি।

আমি এবার অবকাশ পেয়ে বললাম—কিন্তু তুমি এখানে কোথায় মামাসাহেব? মহারাজ শিব্বা—

হাসিটা তার বেড়ে গেল। হা-হা-হা-হা।

দুপুরের রোদ যেন কাঁপছিল তার হাসিতে।

—মহারাজ শিব্বা! ভোলনি তাহলেখুনি?

বাংলা বলতে গেলেই শিবাজী মধ্যে মধ্যে 'খুনি' নামক একটি শব্দ যত্র তত্র লাগিয়ে দেয়। ওটা কলকাতার হবেখন, বলবখনের 'খন' শব্দ 'খুনি' হয়ে গেছে শিব্বার জিহ্বায়।

সংসারে এক একটা লোক আছে যারা সবাই যে বৃহৎ এবং মহৎ তা হয়তো নয়, কিন্তু তারা অবিস্মরণীয়। ভোলা তাদের যায় না। আমি তাই বললাম—তুমি কি ভুলবার মতো লোক মামা?

তাতেও তার হাসি।—নই, না? আমাকে ভোলা যায় না?

—তার পরিচয় তো পেলে—আমি দেখবামাত্র চিনেছি। তুমি আমাকে চেননি। হা-হা করে হাসি তার চলেইছিল। বললে—That's true, তা সত্যি। না, আমি চিনিনি। একদম চিনিনি। এঁরা নাম না বললে ভাবতাম কালো রোগা লোকটা সম্ভবতঃ এঁদের চাকর।

বলেই বিকট অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল শিব্বা সরকার। সে হাসি আর প্রায় থামে না।

ওদিকে রোদ্দুর তখন প্রখর হয়ে উঠেছে, মাঝে মাঝে উতলা বাতাসের ঝটকা উঠছে, ধুলো উড়ছে। একটু ছায়ার প্রয়োজন অনুভব সকলেই করছেন বলে মনে হ'ল। আমি তার হাসির মাঝখানেই বললাম—চাকর মনে করেছিলে—তা কব। কিন্তু একটু ছায়ায় চল। একটা গাছতলায়। আর গাড়িখানা একটু ঠেলেঠুলে পার করে দাও।

শিব্বা বললে—আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা।

ইতিমধ্যে কুলীদের জনকতক কোট প্যাণ্ট হ্যাট মাথায় সিনেমা কর্মীদের দেখে সাহেব-সুবো বা সম্ভ্রান্ত লোক ভেবে এগিয়ে এসে একটু দূরে দাঁড়িয়ে শিব্বার কথাবার্তা শুনছিল।

শিব্বা আমার হাত দুটো ছেড়ে দিয়ে বললে—চামারিয়া, আও। গাড়ি উঠাও—আও। বলে সে নিজেই এগিয়ে গেল গাড়িটার পিছনে। এবং দু'হাত লাগিয়ে মা দুর্গার অসুরের মতো টান হয়ে ঠেলতে লাগল।

ড্রাইভার উঠে স্টার্ট দিলে। দশ-বারো জনের ঠেলাতেও মেদিনীগ্রাসিত কর্ণের রথচক্রের মতো চাকাটা একটুও নড়ল না। সামনে সোজা একটা খাঁজে গাড়িটা আটকে গেছে। টেনে আলগোছে তুলে পার না করলে পার হবে না।

শিব্বা এদিক ওদিক ভালো করে দেখে বললে—লে আও ব্যাম্বু। বাঁশ লে আও। পাঁচ সাত ব্যাম্বু।

এর পর দেরি হ'ল না। ব্যাম্বু অর্থাৎ জীপের তলায় বাঁশের ঠেলা লাগিয়ে কাঁধে চাপিয়ে ঠেলে তুলে দিলে।

তারপর কাঁধটা ঝেড়ে নিয়ে বললে—ব্যাস, আব মজেমে চলেগা।

আমি বললাম—কিন্তু তুমি এখানে কোথা?

হা-হা শব্দে হেসে উঠল শিব্বা। বললে—কেন, কুলী খাটাচ্ছি। বাদশাহী কাচ্চা সড়ক ভেঙে পাক্কা ডেমোক্র্যাটিক রোড বনেগা—ওহি বানাচ্ছি। কিন্তু তুমি কোথায়?

—আমি? আমার যে বাড়ি দেশ এই অঞ্চলেই। এটা মুর্শিদাবাদ—পাশেই বীরভূমে আমার বাড়ি।

—আচ্ছা! হাঁ-হাঁ-হাঁ। তোমার দেশ তো তাই বটেখুনি। লাভপুর-বীরভূম।

—হ্যাঁ। এখান থেকে তিরিশ মাইল, তাও সড়ক ধরে। মাঠের সোজা রাস্তায় অর্ধেক হয়ে যাবে। পনরো থেকে আঠারো মাইল। তুমি তো একবার এসেছ।

—এসেছিখুনি? না! ঠিক মনে পড়ে না। না না, মনে পড়ছেখুনি, মস্ত বড় একটা পুকুরপাড়ের উপর অনেক তালগাছ। আর রাঙামাটির ফ্যালো ল্যাণ্ড। না?

—হ্যাঁ।

—আমি তোমাকে বলেছিলাম তালগাছ থেকে গুড় মিছরি করতে। না-খুনি?

হাসলাম। বললাম—হ্যাঁ। কিন্তু এইবার তো ছাড়তে হয়।

—ছাড়তে হয়! কেন?

—দেখছ তো পথে বেরিয়েছি। এঁরা সঙ্গে রয়েছেন।

—ইয়েস, ইয়েস, তাইতো-খুনি, আমি তো একটা আস্ত ইডিয়ট। জিজ্ঞাসাই করিনি—এঁরা কারা? তা ওটা আমি বটেই—মানে ইডিয়ট। ইডিয়ট আমি চিরকালখুনি। বলেই সে অট্টহাস্যে আবার ফেটে পড়ল।

হাসিটা একটু কমলে বললাম—সিনেমা দেখ?

—সিনেমা? ফিলিম? হাণ্টারওয়ালী? আঃ, বহুৎ মজাদার। ঘোড়েকো পর সোওয়ারি হোকে টগবগ টগবগ চলতি হ্যায় হাণ্টারওয়ালী। মুখে মুখোস, কোমরবন্দে পিস্তৌল, হাতমে হাণ্টার। বদমাশ ডাকু চোট্টা দাগাবাজ লোগোঁকো পর সপাসপ সপাসপ হাণ্টার চালাতি হ্যায়। পুলুশকে সাথ পিস্তৌল লেকে লড়তি হ্যায়।—আঃ হা-হা। ওহি একঠো দেখা বহুৎ রোজ হো গয়া। বাস্, উসকে বাদ নেহি দেখা।

আমি বললাম—এঁরা সিনেমার সেই সব ছবি তোলেন, মানে তৈরি করেন।

বাঁ হাতখানা কাত্ভাবে কানের পাশে উঁচু দিকে তুলে শিব্বা বললে—আরে-বাপরে বাপরে বাপ! তাজ্জব বনানেয়ালে মস্তুর খেলাকে খেলোয়াড়, আমীর আদমী। বাহবা—বাহবা রে! নমস্তে নমস্তে নমস্তে।

তারপরই—তব তো—, বলেই চামারিয়াকে বললে—আরে কেয়া দেখতা হ্যায়

তু—যা যা, জলদি তুরন্ত দরি বিছাও, চারপাই লাও। লাগাও হুঁয়া। আভি তিন মিনটকে অন্দর; তিন মিনট।

তারপর সে বললে—এসখুনি মামাবাহাদুর। আসুন আসুন স্যার। এসেছেন যখন তখন চা তো একটু খেতেই হবে। আসুন।

বলেই সে একটু দূরের বড় বটগাছটার তলার দিকে ছুটল।

প্রডিউসার বললেন—কে মশায়?

ডিরেক্টার একটু হেসে কপালে আঙুলের টোকা দিয়ে বললে—একটু গোলমাল আছে, না দাদা?

বললাম—তা হয়তো আছে। এ সব কথা বলার পর অস্বীকার করি কি করে!

—আপনার মামা? না, আপনি ওর মামা?

—মামার বাড়ির সম্পর্কে ও-ই আমাব মামা।

—খুব হিন্দী বলেন তো! এই সব হিন্দুস্থানী লেবারদের সঙ্গে থেকে ওটা হয়ে গেছে বোধ হয়।

—সেটা তো পরে হয়েছে। ওর দেশ হ'ল গয়া। মানে ওদের পূর্বপুরুষ অন্ততঃ একশো বছর বেহারের বাসিন্দা।

বলতে বলতেই আমরা গাছতলায় এসে গেলাম। দেখলাম একখানা 'দবি' অর্থাৎ সতরঞ্চি পাতা রয়েছে। কয়েকটা দড়ি দিয়ে বোনা বসবার মতো ছোট ছোট চৌকি পাশে পাশে রেখেছে। দুটো অদ্ভুতদর্শন চেয়ার রয়েছে। অদ্ভুত-দর্শন বলছি দেখতে অদ্ভুত লাগে বলেই, আক্ষরিক অর্থে, গড়ন এবং গড়াটাই নতুন ধরনের। বটের বাঁকাচোরা 'দ' অক্ষরের মতো ডাল কেটে তার উপর বটের ডাল পেরেক মেরে এঁটে তৈরি করেছে। অবশ্য শান্তিনিকেতনে আগের কালে এ ধরনের আসবাব তৈরির রেওয়াজ দেখেছিলাম। নিজেও আমি বট-অশথের যে সব গাছ তাল কিংবা খেজুর গাছের গায়ে শিকড় জড়িয়ে ওঠে তাদের শিকড় কেটে নানান রকম মূর্তি চেঁছে-ছুলে কেটে তৈরি করি। কিন্তু শিব্বার চেয়ার অদ্ভুত ধরনের। যত উঁচু তত বে-আরামদায়ক।

শিব্বা বললে—বস। বসুন স্যার—

চেয়ার খাটিয়ায় কেউ বসল না, সকলেই শতরঞ্চিটার উপর বসেই সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়ল।

বটগাছটার তলাতেই ওদিকে ইট, বাঁশ, ডাল, তেরপল দিয়ে তৈরি একখানা ঘর বা তাঁবু—যা বলা যায় তাই। কোনোটাই বেখাপ হবে না।

তবে মাথার ছাউনিটা টিন। পাশেই একটা চালা। সেটার মাথাও টিনে ছাওয়া।

শিব্বা বললে—ওহি মেরা দৌলতখানা।

বলে খানিকটা হা-হা করে হাসতে চেষ্টা করলে—কিন্তু হাসিটা এবার জমল না। হঠাৎ থেমে গেল। বললে—চা চড়িয়ে দিয়েছি।

আবার হঠাৎ বললে—হাঁ। এক বাত তো পুছনা হ্যায় ভাই!

—চিনি নেই? গুড়? বললেন, প্রডিউসার।

—না না না। ওসবের অভাব নেই। কিন্তু আপনারা সব জাত-টাত মানেন নাকি?

—জাত? না না না। তবে—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না হলে মন খুঁত খুঁত করে।

শিব্বা ডাকলে—অনসূইয়া!

—চা বানাচ্ছে হমি।

—শুনো শুনো, ইধর আও তো একবার।

—হাঁ।

বলে এসে দাঁড়াল একটি সুন্দরী এবং অতি পরিচ্ছন্ন মেয়ে। রঙ বোধহয় এককালে কাঁচা সোনার মতোই ছিল। কিন্তু রৌদ্রদগ্ধ হয়ে তা বিবর্ণ হয়েছে। কিন্তু তাতে তার রূপেব খুব বেশি হানি ঘটেনি। চোখ ডাগর, কপালের জোড়ে একটি খাঁজ আছে এবং কানের প্রান্তটি একটু স্থূল। তাতে তার সৌন্দর্য বেড়েছে। বয়স তিবিশ হবে। দেখে আমার মনে হ'ল একে যেন কোথায় কখন দেখেছি। কিন্তু কথাটা একবার সবে এসেই আবার হারিয়ে গেল।

শিব্বা বললে—এই হামাবা অনসূইয়া! খুব্ ভাল চা করেখুনি। শুধু চা কেন, নানান রকম খাবারও তৈবি করতে পারে। হরেক চিজ। সবসে বঢ়িয়াঁ বানাতি হ্যায় কাবাব। দেখুনখুনি—অপরিচ্ছন্ন নয় তো? তবে ও জাতে ভুস্যাদিন। আপত্তি হবে না তো?

—না না। ঠিক আছে।

—আচ্ছা যো। বানায়ো চা। আচ্ছা, ব-হু-ত আচ্ছা চা বানানা হ্যায়! আঁ? সমঝ গ্যয়ি?

অনসূইয়া একটু হেসে বললে—হাঁ।

সে চলে গেল।

মেয়েটির এমন একটি রূপ ছিল—যার মধ্যে কোমল এবং কঠোরের অপরূপ নির্বিরোধ সমাবেশ যে, তার দিক থেকে চোখ ফেরানো সহজ নয়। তার উপর

তার সর্বাঙ্গে সত্যই একটি পরিচ্ছন্নতার এবং রুচির মনোরম পরিচয় ছিল যাতে তার আকর্ষণ বেড়েছিল আরও অনেক গুণে। তার পরনে ছিল কচি কলাপাতা রঙে রঙানো হিন্দুস্থানী ঢঙে কুঁচিয়ে পরা শাড়ি, আর উর্ধ্বাঙ্গে পরা ছিল খুব আঁটো এবং খাটো হিন্দুস্থানী কাঁচুলী। তার রঙটা কড়া লাল। বোধ করি লাল টুন থেকে তৈরি। হাতে ছিল একহাত করে সবুজ কাঁচকড়ার চুড়ি। গলায় হাঁসুলি। নাকে টক্‌টকে লাল কাচের নাকচাবি। মাথায় রুক্ষ একটু লালচে একরাশি চুলে মস্ত একটা খোঁপা—যেটা মাথার ঘোমটাকে বার বার স্থানচ্যুত করছিল।

আমরা সকলেই স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। শিব্বার কিন্তু এদিকে লক্ষ্য ছিল না। সে অতিথি সংকারের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল।

সে ছোট ছোট কয়েকটা ওই ডালে তৈরি টুল বা টিপয় এনে সামনে রাখলে, তারপর বের করে আনলে চায়েব বাসন। বাসনগুলি কিন্তু ভাল। চীনেমাটির নয়—চুনার-টুনাবের তৈরি পাইপ ক্লের তৈরি মেহগনি রঙের কাপ ডিস।

ইতিমধ্যে ওদিক থেকে ঘিয়েব গন্ধ পাওয়া গেল। উনোনে ঘি চড়ানো হয়েছে। কয়েক মিনিট পরই শব্দ উঠল—কিছু যেন ভাজা হচ্ছে—তার। বলতে দ্বিধা নেই—সে গন্ধে এবং শব্দে সকলেবই রসনা সজল হয়ে উঠল। তবুও প্রডিউসার বললেন—ওসব আবার কি হচ্ছে?

—ওমলেট হচ্ছেখুনি। আপলোক আমীব হ্যায়, মস্তুব হ্যায়, মেহমান হ্যায়; অন্‌সূইয়া বোলিন—অমলেট বানা দুঁ? স্রিফ চায় ক্যায়সে দুঁ? হাঁ, ঠিক বাত বোলিন। তো বোলা—বানাও।

—কিন্তু আমরা খেয়েছি এই কিছুক্ষণ আগে। তাছাড়া খাবার আমাদের সঙ্গে রয়েছে। অনেক খাবার।

—নেহি সাব! উ কি কোবে হোবে? আপনালোগের সাথে তো খানাপিনাকে সব কুছু জরুর পাশমে হোবে। কলকাত্তার মিঠাই, রোটী, আণ্ডা সব কুছ। লেকেন হমি লোক স্রিফ চা ক্যায়সে দুঁ।

এসে দাঁড়াল অন্‌সূয়া। মুখে তার একমুখ হাসি।—সে হোবে না। কুছুতে হোবে না।

—আমাদের দেরি হয়ে যাবে। এগারোটা বাজে। রোদ্দুর চড়ে যাচ্ছে।

—বেশতো-খুনি। এ বেলা এখানে ঠহর যাইয়ে। এইসা পোখরা ঠাণ্ডা পানি। নেহা লিজিয়ে; হম খাস্‌সি মার দে—অন্‌সূইয়া বহুত আচ্ছা কালিয়া কোর্মা কোপ্তাসে আপলোঁগোকা ফরমায়েস বানায়েগি। মুর্গী খাইয়েগা তো চারঠো

মুর্গী মার দে। খানাপিনা কি লিজিয়ে, দু পহর কো নিদ যাইয়ে। চার পাঁচ বাজে চা পি কর মজেমে চলা যাইয়েগা জীপ পর সওয়ারি হোকে। ভর-ভর-ভর-ভর—

হেসে ফেললেন প্রডিউসার, ডিরেক্টার এবং আমিও।

শিব্বা বললে—বাস বাস। আমীর লোক রাজী হো গ্যয়ে হেঁ! মিঠি মিঠি হস রহেঁ হেঁ। বাস্ হো গ্যয়া। লাগাও। এ চামারিয়া—এ—

চামারিয়ারা তখন চলে গেছে আপন আপন ঝোপড়ায়। শুধু ছেলের পাল—উলঙ্গ, অর্ধ উলঙ্গ—তারা ভিড় করে সামনে, কিছু দাঁড়িয়ে আছে। ফটোগ্রাফার এবং একজন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট তাদের অজ্ঞাতসারে তাদের স্ন্যাপ নিয়ে চলেছে।

আমি চমকে উঠে বললাম—উহু। না না। সে হবে না মামা সাহেব। সে হয় না।

শিব্বা বললে—হয় না ?

—না। তুমি বুঝছ না—আমাদের অনেক কাজ আছে।

—ও: তুমি বুঝি ভুলে গেছখুনি—প্রথম আলাপের দিনের কথা ? বলে হা-হা-হা করে হেসে উঠল।

আমার মনে পড়ল বইকি।

শিব্বা হাসি থামিয়ে বললে—মাথার পিছন দিকে সে কাটা দাগটা আছে তো ? জানেন স্যার, প্রথম দিন—ওর সঙ্গে আমার আলাপ। গয়া এসেছে ও মামার বাড়ি। বয়স ওর তখন বারো, আমার তখন চোদ্দো-পনরো। ও থার্ড ক্লাসে পড়ে। আমিখুনি দু'বছর ফেল করে থার্ড ক্লাসে বসে আছি। আমাদের বাড়িতে এল ওর মামার সঙ্গে। তিনি নিয়ে এসেছেন বেড়াতে। রবিবার দিন। আমার বাবা ছিলেনখুনি উকীল। মস্ত উকীল। আমি আদরের ছোট ছেলে। ডাংপিটে করে তুলেছেন—হয়ে উঠেছি। একটা ছেলে এসে ঝরঝর করে পদ্য মুখস্ত বলতে লাগলখুনি। সুন্দর বলতে লাগল। বাবা খুব মুগ্ধ হয়ে গেলেন। বললেন—কবিতা তো বলতে পার ; খেলাধুলো করতে পার ? বললে—ফুটবল পারি। বললেন—শিব্বার সঙ্গে খেল—দেখি। শিব্বা, bring your football। তখন বলে খেলব না। আমি ওকে হাত ধরে টেনে নামিয়েছিলাম, বলেছিলাম—you are a coward! তখন নেমে এল। খেললে—দু'জনে ফুটবল খেলা। আমি ব্যাকে খেলি, ও খেলে ফরওয়ার্ডে। আর দৌড়ুতে পারত পাঁই পাঁই করে। ও: আমাকে নাজেহাল করে দিয়েছিল। শেষে আমি রেগে এইস্যা ধাক্কা মানে পুশ দিলামখুনি যে, একেবারে চিৎপাত। অ্যাণ্ড—

মাথার পিছনটা একটা খোলায় কেটে গিয়ে ঝরঝর করে রক্ত পড়তে লাগল। নানান রকম করে তো রক্ত বন্ধ করা হ'ল। তখন আমি বললাম—ও আজ যেতে পাবে না, এইখানে থাকবে। ও থাকবে না—আমিও ছাড়বো না। শেষে আমি একটা ছুরি দিয়ে নিজের বাঁ হাতের arm—মানে বাঁ-আর্ম দিয়ে পুশ দিয়েছিলাম কিনা—, তাই হাতটা চিরে রক্ত বের করে দিলাম। ওর মাথায় যত রক্ত পড়েছিল—তার থেকে বেশি পড়ল। আমি বললাম, হ'ল তো—শোধবোধ। এবার যদি যাব বলবে—তবে খুন হয়ে যাবে। এ শিব্বা—সেই শিব্বা। বদল্ কুছ নেহি হুয়া। বলে হেসে উঠল।

কথাগুলো সবই সত্য। আমার মনের মধ্যে গোড়া থেকেই নতুন করে জেগে উঠে ঘুরছে। কিন্তু কি বিপদ! এই দুপুরে এই তেপান্তরের মাঠে কলকাতার এই ফিল্ম কর্মীরা তো খুব স্বস্তি বোধ করবে।

বললেও একজন সে কথা।—এ যে বিপদ বাধালেন দাদা!

আমি বললাম—আচ্ছা আমি বুঝিয়ে বলছি।

তার আগেই অন্সূইয়া ট্রের ওপরে ওমলেটের প্লেট এবং টিপটে চা ভিজিয়ে দুধ চিনির পাত্র সমেত এনে নামিয়ে দিলে।

অন্সূইয়াও অদ্ভুত। কোনো সংকোচ নেই. অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ। হেসে বললে—ওমলেট খাইয়ে। হাম চা বানাই।

বললাম—হ্যাঁ। নিশ্চয়।

—হম বহুত মিঠা চা বানাই বাবু। চিনি জাস্তি হমি দিই না—তবভি বহত মিঠা হোতা। হমর হাঁত মিঠা আছে। ওমলেট খান—দেখেন—খুব ভাল লাগবে। বলে সে প্লেটগুলি এগিয়ে দিল। ওমলেটের সঙ্গে দুটি করে শক্ত বাখারীর ছুঁচলো কাঠি দেওয়া ছিল। বুঝতে পারিনি উদ্দেশ্য। বললাম—এগুলো কি?

—ছুরি কাঁটা। হেসে উঠল অন্সূইয়া।

—ছুরি কাঁটা?

—ইয়ে! ইয়ে দেখিয়ে সাব।—শিব্বা তার প্লেটটা তুলে নিয়ে একটা কাঠি দিয়ে ওমলেট বিঁধে অন্যটা দিয়ে এক টুকরো কেটে নিয়ে দিব্যি খেতে লাগল।

একটি সহযাত্রী বলল—ওয়াণ্ডারফুল।

প্রডিউসার বললেন—ড্রাইভারকে ডাক। ওখানে গাড়ি নিয়ে বসে রইল কেন? এই—এই যতীন!

যতীন ড্রাইভারকে দেখা যাচ্ছিল না। গাড়িটার চারিদিকে বাচ্চা ছেলেগুলো ভিড় করে যেন একটি বেড়ার আড়াল করে রেখেছে।

—য-তী-ন। অ—য-তী-ন।

ডিরেক্টারের অ্যাসিস্টাণ্ট এবার উঠে দাঁড়াল—য-তী-ন। তারপরই বললে

—ও সব্বনাশ।

—কি ?

—যতীন যে গাড়ির তলায় ঢুকেছে।

তাব অর্থ—গাড়িতে গোলমাল হয়েছে কিছু।

—দেখ দেখ! না—আমিই দেখি। বলে প্রডিউসার এগিয়ে গেলেন।

ডিরেক্টার বললে—মাই গড। গেছি তাহলে।

দুই

গেছি তাহলে নয়। কয়েক মিনিট পরেই প্রডিউসার শুকনো মুখে ফিরে এলেন। বললেন—গিয়েছে। গাড়ি গিয়েছে।

—কি হ'ল ?

—ওই গচকায় পড়ে গিয়েছে। কি গিয়েছে তার হদিস পাচ্ছে না।

শিব্বা সরকার হা-হা করে হাসতে লাগল। মহা আনন্দ হয়েছে তার। সকলেই বিরক্ত হ'ল এতে। কিন্তু উপায় আর কিছু ছিল না।

শিব্বা বললে—ঘাবড়াইয়ে মৎ সাহেব, বিলকুল ঠিক হো যায়গা। এহি তো পাঁচ মিল হ্যায় কান্দী—হুঁয়াসে মেকানিক বোলা করকে লে আউঙ্গা। অব ঠারিয়ে —আরাম লিজিয়ে। চা পি লিজিয়ে।

বলেই সে উঠে চলে গেল।

আমরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। সকলেরই দৃষ্টিতে এক প্রশ্ন—তাহলে ?

আমি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলাম। প্রশ্নের কোনো সমাধান নেই। আমি ভাবছিলাম শিব্বার কথা। ওই প্রথম দিনের কথাই। আমাকে আটকে রেখেছিল সেদিন সারাদিন। বাবার বন্দুক নিয়ে সে শিকার করেছিল কয়েকটা পাখি। মাংস খাইয়েছিল।

শিব্বা সরকারের বাবা ছিলেন ত্রৈলোক্যনাথ সরকার। নামকরা উকীল ওখানকার। একটু বিচিত্র মানুষ। লোকে তাঁর মাথাও খারাপ ছিল বলত।

চার ছেলের নামেই তার পরিচয় আছে। বড় ছেলের নাম ছিল—বিক্রমাদিত্য, মেজর নাম ছিল—প্রতাপসিংহ, সেজ—বাপ্পারাও সরকার আর ছোটর নাম শিবাজী। ডাকত শিব্বা বলে। প্রত্যেক ছেলেই বিখ্যাত ব্যক্তি হবে—এইটে শুধু কামনাই ছিল না—দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তাঁর।

হঠাৎ মুর্গীর আর্তনাদে চমকে উঠলাম। সকলেই ফিরে তাকাল। চকিত হয়ে ফিরে তাকাল। আমার বুঝতে বাকী ছিল না—শিবাজী আমাদের জন্য মুর্গী বধ করছে।

অনসূইয়া চা দিচ্ছিল—সে শেষ কাপটা আমার সামনে এগিয়ে দিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠে গেল।—আয় বাপরে বাপ, তুমি হামাকে আস্তে দাও! বড় মুরগা মৎ মারো। আরে—

শিবাজী সেদিন মহাসমাদরে অতিথিদের আপ্যায়ন করেছিল। রান্না করেছিল অনসূইয়া। সে রান্না সত্যি সত্যিই অপূর্ব। খেয়েদেয়ে একটু বিশ্রাম করে ফিরতি মুখে ঘুরতে আমাদের পাঁচটা বেজে গেল। ফিল্ম কোম্পানীর ভদ্রলোকেরা আমাকে ডেকে বললেন—উনি তো এত খাতিরযত্ন করলেন, এমন করে খাওয়ালেন! কিন্তু ওঁর অবস্থা দেখে তো—। মানে উনি নিজে ঠিকেদার বলে তো মনে হচ্ছে না। সম্ভবতঃ কর্মচারী-টর্মচারী। ওঁকে কি ভাবে—

কথাটা আমারও মনে হয়েছিল। কোনো সিদ্ধান্তে আমিই পৌঁছুতে পারিনি। শিবাজীর যে পরিচয় আমি জানি, চোখে যা দেখে এসেছি, সে আমার চোখের সামনে ভাসছে।

প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ি, বিস্তীর্ণ হাতা, সুন্দর ফলের বাগান। বাড়িতে আসবাবপত্র অনেক এবং সেগুলি মহার্ঘ। দামী জিনিসপত্র। শিবাজীর বাবা ত্রৈলোক্যনাথ ওখানকার খুব বড় উকীল। শহরে বাড়ি—সেও বড় বাড়ি—কিন্তু শহর থেকে মাইল পনরো দূরে গ্রামের মধ্যে তিনি প্রায় অধিপতি ছিলেন। শহরে কম্পাসগাড়ি ছিল, ঘোড়া ছিল বড় বড় দুটো। একটা গাড়ির এবং একটা শুধু চড়বার জন্য। বাড়িতে বন্দুক দেখেছি—র‍্যাকে সারি সারি চারটে সাজানো থাকত। গ্রামের বাড়িতে বড় বড় বয়েল এবং পাঞ্জাবী গাইয়ে গোয়াল ভর্তি ছিল। তাদের খাবার জায়গাগুলি বাঁধানো এবং যেখানে তারা দাঁড়িয়ে থাকত—তাও বাঁধানো জায়গা। গোয়ালঘরগুলি খাপরার হলেও ও দেশের দেহাতী মানুষের ঘর-দোর থেকে ভাল ছিল। মামাদের কাছে শুনতাম—টাকা তাঁর প্রচুর এবং ক্ষেত-খামারও ছিল বিস্তীর্ণ। উকীল হিসেবেই বড় ছিলেন তা নয়—মানুষ হিসেবেও বড় ছিলেন। পণ্ডিত মানুষ। দর্শনে গভীর

অনুরাগ এবং সে-চর্চাও রাখতেন। সব থেকে গভীর ছিল তাঁর স্বদেশপ্রেম। সে আমলে তাঁত বসিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কোনো দলের লোক ছিলেন না। যত খাতির ছিল দেশপ্রেমিক মহলে—সরকারপ্রেমিক এবং সরকারী মহলে তার থেকে কম খাতির ছিল না। দু' পক্ষকেই তিনি সমান খাতির করতেন এবং দু' পক্ষের খাতাতেই তাঁর নাম প্রথম দিকেই প্রীতিভাজন হিসেবে লেখা ছিল। সংসারে কিছু কিছু বিশ্বনিন্দক লোক আছে—যারা বলত উনি গাছেরও খান তলারও কুড়ান। রামও ভজেন রহিমকেও পোজেন—অর্থাৎ পূজা করেন।
তাঁর বই লেখারও বাতিক ছিল। দর্শনশাস্ত্র নিয়ে বিরাট কয়েকখানা খাতা লিখেছিলেন, যা সাধারণ লোকের বুঝতে পারার কথা থাক—বড় বড় বিশেষজ্ঞরা দেখে বলেছিলেন—ব্যাপারটা করেছেন হিমালয়ের তুল্য লম্বা-চওড়া, এ পরিভ্রমণ তো কয়েক ঘণ্টার বা কয়েক দিনের কাজ নয়। এতে তো সবই আছে। এপাশে ভারতবর্ষ ওপাশে চীন মঙ্গোলিয়া। ব্যাপার বিরাট।
কথাগুলো সঠিক এই না হলেও এই ধরনের। ত্রৈলোক্যনাথবাবু—মানে শিবাজীর বাবা এতেই খুশী থাকতেন বা থেকেছিলেন, কিন্তু কখনও এ ছাপিয়ে বের করবার কথা কল্পনাও করেননি।
ছেলেদের নামকরণের মধ্যে তাঁর মনের একটা আভাস পাওয়া যায়। বিক্রমাদিত্য প্রতাপসিংহ বাপ্পারাও শিবাজী অর্থাৎ তারা ভবিষ্যতে বিরাট হবে, ইতিহাসে তাদের নাম থাকবে—তাদের পিতা হিসেবে তিনি অমর হবেন; তবে তিনি কপট বা কুটিল ব্যক্তি ছিলেন না—এটা ঠিক। তিনি যখন মারা যান তখন তাঁর বয়স খুব বেশি হয়নি; ষাটের কোঠা ছুঁয়েছেন মাত্র। মনটা তাঁর তখন ভেঙেছে। কারণ, বড় ছেলে বিক্রমাদিত্য উকীল হয়ে বসেই থাকেন বাপের জুনিয়র হিসেবে—উপার্জন সীমাবদ্ধ। বলতে গেলে, বাপের উকীলী যোগ্যতা বাদে বাকীটুকু অনুকরণ করে আয়ত্ত করেছেন। তবে তারই মধ্যে গরমিল কিছু আছে—সেটা হ'ল হিসেবী বুদ্ধির পারঙ্গমতা। সুদী কারবার করেন, মধ্যে মধ্যে মক্কেলের টাকার হিসেব মেলে না, এবং দেহাতের ক্ষেত-খামারে যেখানে যান—সেখানে ক্ষেতী 'কামিনদের অত্যধিক দয়ামায়া করেন। তার জের টানার দায় মধ্যে মধ্যে ত্রৈলোক্যনাথবাবুর ঘাড়ে এসে পড়ে। টাকা দিতে হয়।
দ্বিতীয় ছেলে প্রতাপসিংহ সরকার তাঁর নাম থেকে সিংহ বাদ দিয়েছেন। তিনি খুব সাহেবঘেঁষা লোক, ছেলেবেলা থেকে দুর্ধর্ষ লোক—সে হিসেবে সিংহটা তাঁর রাখা উচিৎ ছিল। বন্দুক নিয়ে শিকার করেন। ছেলেবেলা

থেকেই সে-অভ্যাস করেছিলেন। ছেলেবেলা পাখি, চোদ্দো-পনরো বছর থেকে গাঁয়ের পারিয়া কুত্তা; তারপর রাত্রে শিয়াল হুড়ার—এসব মেরেছেন। আঠারো বছর বয়সে বিলেত পালিয়েছিলেন। সেখানে বেশ কয়েক বছর থেকে ব্যারিস্টারি ফেল করে ফিরে এসেছিলেন। চাকরি একটা যোগাড় করে নিয়েছিলেন মধ্যপ্রদেশে এক আদিবাসী নেটিভ স্টেটে।—অ্যাসিস্ট্যাণ্ট দেওয়ান ছিলেন। বিয়ে করেছিলেন এক পাঞ্জাবী মেয়েকে—আর্যসমাজী মতে। টাকাতে কুলোতো না, দেনা করতেন—বাপ শোধ দিতেন।

বাপ্পারাও—সে হয়েছিল নিতান্তই কেরানী। নিতান্ত গৃহস্থ মানুষ। চাকরি নেবার সময় এফিডেবিট করে নামটা পাল্টে হরিচরণ সরকার করে নিয়েছিল। বাপ দুঃখিত হয়েছিলেন—বলেছিলেন, পাল্টাবেই যদি তবে হরিচরণ কেন? ওটা না।

ছেলে নতমুখে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। বাপ বলেছিলেন—ওটাকে বরং ব্যোপদেব কর। বুঝলে—

ছেলে বোঝেনি।

বাপ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিলেন—তবে থাক।

শিবাজী তখন খোলোতে পা দিচ্ছে। পড়াশুনায় ইতিহাসের শিবাজী থেকে অবশ্যই কিছু ভাল, কিন্তু তখনও পর্যন্ত ইস্কুলে ন' বছর পড়েও সাতটি ক্লাশ উত্তীর্ণ হতে পারেনি। তবে প্রচুর জীবনীশক্তি। এবং কল্পনাও তার নামটির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিচিত্রপথগামী।

সে মধ্যে মধ্যে একটা শক্ত লাঠি এবং একটা ভোজালি নিয়ে পথভ্রমণে বের হ'ত। কাঁধে সামান্য একটা বোঁচকা। চলে যেত গয়া থেকে পাটনা। আবার পাটনা থেকে গয়া। কখনও যেত সাসারাম। কখনও কিউল। পথ ছিল তার রেললাইনের পাশে পাশে। আর একটা অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল—সেটা হ'ল তার ওদেশের সাধারণ দেহাতী মানুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবার ক্ষমতা। তাদের দেহাতী ভাষাতে তার পারঙ্গমতা ছিল অদ্ভুত। উচ্চারণ, স্বর, টান অবিকল তাদের মতো। তাদের যে-সব বিচিত্র গ্রাম্য শব্দগুলি লিখিত ভাষায় এবং ভদ্র সমাজে বর্জিত—তা ছিল তার জিহ্বাগ্রে। তার উপর মার দিতে পারত, মার খেতে পারত। যে-গ্রামে তার বাপের ক্ষেত-খামার ছিল, গ্রামের বাড়ি ছিল—সেখানে একরকম এই সমাজের সে ছিল অত্যন্ত মান্যের ব্যক্তি। তাদের বিবাদ হলে তারা তাকে ডাকত। সে একটা চৌপায়ায় চেপে বসে বিচার করত। সে জমিন থেকে জাত নিয়ে কলহের বিচার; আবার কোনো মেয়ে শ্বশুরবাড়ি

যেতে চাচ্ছে না তা থেকে কোনো লৌণ্ডা কার বেটীকে কি বহুকে কি বলেছে— বা ছোট্ট একটি ঢেলা মেরেছে তার বিচার পর্যন্ত। হাতে একটা কঞ্চি থাকত। সেই কঞ্চি নিয়ে সপাং সপাং শব্দে বাতাসে আওয়াজ তুলে মেয়েটাকে সামনে বসিয়ে বলত—শ্বশুরবাড়ি যাবি? না, যাবি না? এঁ্যা! না যাবি তো, শুন্— পহেলে তো আমি এই ছড়ি পিঠে ভাঙব। তব ভি না যাবি তো পিরেতশিলার ইলাকা থেকে পিরেত বুলাব। হ্যাঁ। তোর চুলের মুঠি এমনি করে ধরে— বলে খপ করে চুলের মুঠি ধরে উপর দিকে টানত।

চীৎকার করত মেয়েটা।

তখন আরম্ভ করত শিবাজী—শ্বশুরবাড়ি না গেলে এই পাপ হয়। এই পাপের এই সাজা কি তোকে পিরেতে ধরবে। তোর এই নওজোয়ানী সে চিবিয়ে চিবিয়ে খাবে। তারপর তুই মরবি। মরে তুইও পিরেত হবি। তখন দশ-দশটা যমরাজার পিয়াদা তোকে ডাণ্ডা দিয়ে পিটবে। আর তুই চিল্লাবি।— খোনা সরু আওয়াজ করে সে বলত—মৎ মারো,—দয়া করো। মর যাইব— হম মর যাইব। আয় বাপ! আয় মা! জান বাঁচায়ো! আরে বাপ!

এমন সজীব এবং সত্য করে তুলত সে, যে, ভয়ে মেয়েটা কেঁদে উঠত।

ও তখন জিজ্ঞাসা করত—কেয়া? আব্ যাওগী?

সে বলত—হাঁ যায়ব। হম যায়ব বাবুজী—হম জরুর যায়ব।

ছোঁড়াদের কিন্তু এ সব বলত না। ওদের পিঠে এবং পাছায় ছড়ি লাগাত।— এক দো তিন—বলো হারামী, আওর করোগে ফিন্? চার পাঁচ ছ—কহুরে লুচ্চা কঃ। সাত আঠ নও—জয় ডাণ্ডে কি জয়। বলো হারামী লুচ্চা—বলো পুকারো!—নেহি তো ইয়ে দশ ইগারা বারা—

কেউ কেউ পনরো ষোলো পর্যন্ত উঠত। নইলে সচরাচর ওই নয় পর্যন্ত গিয়েই দণ্ডিত লৌণ্ডা, তার পা দুটো চেপে ধরে বলত—গোড় লাগি, তেরা গোড় লাগি মায় বাপ! কভি না—কভি না। আর কভি না করব এইসন কাম!

—আ-চ্ছা—। বলে ছেড়ে দিয়ে বলত—আব্ বোল হারামী, ছোকরীকো বোল—তু হামারা মায় ছে! বোল!

তারপর বলত—লে কান পাকড় আপনা।

এরপর সে রেহাই পেত। বিচার শেষ করে বলত—আরে পরধানজী, তামকুল ভরকে ছিলম তো বুলানা।

হুঁকো ওর ঝোলাতেই থাকত। হুঁকো ছাড়া সে কখনও বের হ'ত না। তামাক সেজে ছিলম এলে সে বলত বাত্তী লে আনা। বাত্তী না হলে কি করে চলবে?

তামাক খাবে—ধোঁয়াটা তো দেখতে পাওয়া চাই। তামাক খাওয়ার মজা কি শুধু ধোঁয়া গলায় লাগিয়ে? আরে রামজী কহো! চোখের সামনে ধোঁয়া যদি কুণ্ডলী পাকিয়ে না দেখা গেল তবে তো তিনকে এক বরবাদ। তামাক খাবে, গলায় লাগবে, বুকে লাগবে, মৌজের সে হ'ল নম্বর এক। তারপর চোখে দেখবে কেমন সাদা ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুরছে, উড়ছে—সে হ'ল নম্বর দো। আর নম্বর তিন হ'ল ওর গন্ধ—বয়। নাকে লাগবে। তব তো মৌজ পুরা। ওর এক বাদ গেলেই বিলকুল বরবাদ—সব বুরা হয়ে গেল। বাত্তী লে আও।

এসব আমার স্বচক্ষে দেখা এবং স্বকর্ণে শোনা। ১৯১৫ সালে আমি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে যখন মামার বাড়ি যাই তখন শিবাজীর সঙ্গে সেই বাল্যের আলাপ ঝালিয়ে উঠে জমাট বেঁধেছিল। শিবাজী বয়সে আমার থেকে বড় কিন্তু ফেল করে তখন থার্ড ক্লাসে রয়েছে। স্কুলের খাতায় নামই আছে—কয়েক মিনিটের জন্য যায় তারপর চলে আসে। এবং গোটা শহর চক্কর দিয়ে বেড়ায় এক সাইকেলে। তখন তার সাইকেল হয়েছে। সাইকেলের নাম ছিল একটা। বলত—ইয়ে হামারা তরঙ্গী। আর বাবার ঘোড়াটাকে বলত—তীর। সেটাতেও মধ্যে মধ্যে চড়ে বের হ'ত। কিন্তু শহরে সাইকেল। তীর আউর তরঙ্গী। দোনো পর সওয়ার শিব্বা জঙ্গী। এ সব ছড়াটড়া সে নিজেই বানাতো।

আমাকে দেখে খুশীর আর সীমা ছিল না। আমি এসেছি খবর পেয়েই সে তরঙ্গীর উপর চড়ে চলে এসেছিল আমার মামার বাড়ি এবং বাইরে থেকেই হাঁকতে হাঁকতে এসেছিল—আহো—আহো রাম দাদা—, দাদোজী—

আমার মামা খুব ভালবাসতেন শিবাজীকে। শিবাজী তাঁকে বলত দাদোজী, উনি ডাকতেন শিব্বা। কারণ শিব্বা ছিল তাঁর গুণমুগ্ধ ভক্ত। আমার মামা রামপ্রসাদ ও-অঞ্চলের বাঙালীদের সমাজের প্রাণ ছিলেন। বিদ্যায় বুদ্ধিতে সাহসে ঈশ্বরভক্তিতে একজন অসাধারণ মানুষ। সরল সত্যবাদী। শুধু দোষই হোক আর অসহনীয় গুণই হোক যেটা ছিল—সেটা অন্যায় এবং অসত্যের প্রতি অসহিষ্ণুতা—না, ঠিক বলা হ'ল না—অসহিষ্ণুতার চেয়ে অনেক বেশী—ক্রোধ। এবং সে ক্রোধের সম্বরণ ছিল দুঃসাধ্য। সে ক্রোধে তাঁর নিজের অনিষ্টই করতেন বেশি। হয় সারাটা দিন খেতেন না, নয় নিজের কপালে করাঘাত করতেন। অথবা নিজের কোনো জিনিসটা থাকলে সেটাকে দুমড়ে মুচড়ে শেষ করে দিতেন। তবে কঠিন সত্য বাক্য থেকে অন্যায়কারীর রেহাই ছিল না। এই মামার প্রিয়পাত্র হয়েছিল সে—১৯১৫।১৬ সালের প্লেগের সময়। তখন

শিবাজী ষোলো বছরে পদার্পণ করেছে কি করবে। কয়েকটি বাঙালী বাড়িতে প্লেগ ঢুকেছিল। শহরের বাসিন্দারা প্রাণের দায়ে পালিয়েছিল—যার যেখানে যেখানে আশ্রয়স্থান ছিল সেখানে। আমার মামার বাড়িরই—আমার এক মা-মরা মাসতুতো ভাই আমাদের গ্রামে এসেছিল। সে বয়সে আমার থেকেও ছোট। সেও পরে মারা যায়। কিন্তু আমার বড় মামা পালাননি। শিবাজীদের বাড়ির সকলেই পালিয়েছিল। পালাননি ত্রৈলোক্যনাথ, আর পালায়নি শিবাজী। এই প্লেগের মৃতদেহ সৎকারের জন্য শহরে লোক ছিল আগের অর্থাৎ আমার বড় মামার আমলের চার-পাঁচজন—আর তাব সঙ্গে যোগ দিয়েছিল শিবাজী। বড় মামা শিবাজীর বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কাকা, শিবাজী আমাদের সঙ্গে যেতে চাচ্ছে। ওকে নিয়ে যাব?—ওকে বারণ করুন বলবার লোক আমার মামা ছিলেন না।

ত্রৈলোক্যনাথবাবু বলেছিলেন—সে চাচ্ছে যেতে নিশ্চয় যাবে। আমার আশীর্বাদ নিয়ে যেতে বলো।

কি আশীর্বাদ তাকে তিনি করেছিলেন সে শিবাজী জানে আর তিনি জানতেন, কিন্তু আমার বড় মামার অতি প্রিয়পাত্র হয়েছিল সেদিন থেকে। বড় মামা তাকে ডাকতেন—শিব্বা। শিবাজী সাড়া দিত, হো দাদোজী! মুঝে বুলা কাঁহে হেঁ আপ।

আবার শিব্বা বাড়ির দোর থেকে ডাকত—আহো দাদোজী! দাদোজী হো!

মামা সহাস্য মুখে উত্তর দিতেন—ক্যা হো শিব্বা, আ যাও ভাইয়া। আ যাও!

—মেজাজ শরীফ? হেসে বাড়িতে ঢুকত শিব্বা।

বড় মামা বলতেন—বহত খুব। একদম তর হো গেয়া। তুম আয়া!

সেদিনও শিবাজী বড় মামাকে আহো দাদোজী বলে ডাকতেই মামা উত্তর দিয়েছিলেন—আ যাও শিব্বা। হামারা ভাগ্না আয়া হ্যায় বাঙ্গাল্ সে।

—হাঁ হাঁ! ওহি শুনকর হম তরঙ্গী পর সওয়ার হোকে বন্ বন্ বন্ পাঁচ মিনটকে অন্দর চলা আয়া! কাঁহা হ্যায় উ—বাঙ্গালী বাবুয়া? আঁ? ইয়ে? আচ্ছা! ক্যা ভাগ্না—মুঝে পহছানতে হো? পসর গেয়া?

আমি অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম তার দিকে। সত্যি বলতে কি, চিনতে পারিনি। কারণ—যে কিশোরটি আমার এমন কঠিন বড় মামার সঙ্গে এমন হৃদ্যতা এবং অন্তরঙ্গতার সঙ্গে কথা বলতে পারে—তাকে আগে কখনও দেখেছি বা শুনেছি বলে তো মনে পড়ে না। মামার বাড়ি আসা আমার কম। এসেছিলাম সেই যেবার ওই শিবাজীদের বাড়িতেই মাথা কেটেছিলাম। সে প্রায়

তিন বছর কেন, প্রায় চার বছর আগে। সেই শিবাজীতে এবং এই শিবাজীতে কোনোক্রমেই এক করে মেলাতে পারিনি।

বড় মামা বলেছিলেন—গতবার এসেছিলি—ওদের বাড়ি সেই দেহাত নিয়ে গিয়েছিলাম—

বড় মামাকে থামিয়ে দিয়ে শিবাজী বলেছিল—ওহে ছোকরা, মাথাতে সেই কাটা দাগটা আছেখুনি? সেই ফেলে দিয়েছিলামখুনি?

আর না মনে পড়ে? মাথা কাটার স্মৃতি এবং তার সঙ্গে কথায় কথায় খুনি। মনে পড়েছিল, বলেছিলাম—শিবাজী? কত বড় হয়ে গেছ তুমি?

—হাঁ হাঁ! হমি কি বাংগালীয়া—পেট মে পিলিয়া ডিগডিগিয়া! ভাত আওর মচ্ছি খানেওলা! ডাল খাতা রোটী খাতা—ডন দেতা—বৈঠক দেতা—পচ্ছিমকে পানি পিতা। এঁও বন গিয়া।

তারপর ধপ করে বসে পড়েছিল—চেয়ারটা ছেঁড়া ডেক চেয়ার, লক্ষ্য না করেই বসে পড়েছিল—মামা তাকে বারণ করতেও অবকাশ পাননি, শিবাজী বসবার সঙ্গে সঙ্গে ছেঁড়া ক্যানভাসটা ছিঁড়ে ভিতরে বসে গিয়েছিল এবং আঘাত পেয়েছিল বেশ। কিন্তু আঘাতবোধের চেয়ে বিচিত্র কৌতুকবোধ তার বেশি। সে এমন হাসতে লেগেছিল যে, সে আর ওঠেইনি সেই গর্ত থেকে বা ভুলেই গিয়েছিল উঠতে। টেনে তুলেছিলেন আমার বড় মামা।—আরে লাগিয়েছিস তো? ওঠ ওঠ!

—আরে, ঠাওরো জী, মুঝে জেরা হসনে দো! ক্যা বুড়বক গিদ্ধড় হাম—হে-হে-হে-হে-হে-হে! সে আর থামে না—চোখে জল এসে গিয়েছিল।

উঠিয়ে মামা পিছনটা দেখে বলেছিলেন—হ্যাঁ, কেটে গেছে। লম্বা হয়ে চিরে গেছে। রক্ত পড়ছে।

—পড়ছে বুঝিখুনি?

—বুঝতে পারছিসনে? গণ্ডার নাকি তুই?

—গণ্ডার?—আবার একদফা হাসি। তারপর মামাকে প্রণাম করে বলেছিল—বহুৎ ঠিক বোলা, বহুৎ ঠিক। হ্যাঁ—গণ্ডার হ্যায় হম।

—ব'স, এই তক্তাপোষে ব'স। একটু টিঞ্চার আইডিন লাগিয়ে দি।

—দো।

মামা টিঞ্চার আইডিন এনে লাগিয়ে দিয়েছিলেন, শিবাজী একটু মুখ বিকৃত করেনি। আমার সঙ্গেই কথা বসে গিয়েছিল অম্লান মুখে।—আরে তুমিখুনি

এবার ম্যাট্রিক দিলে নাকি ? এইটুকু বাচ্চাখুনি ? না দাড়িখুনি, না গোঁফখুনি ? তার ওপর দাদোজী বলে—তুমি নাকি পত্ত লেখখুনি ? গজল না—বয়েৎ না—পাখিসব করে রবখুনি ?—বলে আবার হাসতে লাগল।

হঠাৎ বাইরে কোন ছেলে শিবাজীর সাইকেলের ঘণ্টাটা বাজিয়ে দিয়েছিল। টপ করে উঠে ছুটে গিয়েছিল—কৌন হ্যায় রে ? হামারা তরঙ্গী কি ঘণ্টা বাজাকে খেল লাগায়া ? কৌন রে ?

ফিরে এসেছিল আস্তে আস্তে এবং বলেছিল—গণ্ডার ঠিক নই রামদা। বুঝতে পারিনি লেগেছে।—কিন্তু যাবার সময় সাইকেলে উঠেই চলে গিয়েছিল, এবং বলে গিয়েছিল, দাদোজী, ভাগ্নাকে লেকে হম ইধর ওধর সব ঘুমেঙ্গে। বিলকুল দেখ্‌লা দেঙ্গে।—আঁ ?

সে-বার আমাকে সে চরকির মত ঘুরিয়েছিল। কোনো জায়গা দেখাতে আর বাকী রাখেনি। সে গয়ার মন্দির থেকে বোধগয়া পর্যন্ত, সরযূ, প্রেতশিলা পর্যন্ত। এবং তার বাইরে—ওর রাজ্য ওই দেহাতের মজলিশ পর্যন্ত। সাইকেলে ঘোড়ায় পদব্রজে তার ক্লান্তি ছিল না। আশ্চর্যও হয়েছিলাম—ওই দেহাতে ওর ওই দেহাতীদের সঙ্গে ঠিক তাদের মতো কথা কওয়া দেখে আবার গয়ার মন্দির থেকে প্রেতশিলা থেকে বোধগয়ার মন্দির পর্যন্ত পুরাণ লোককথা—ইতিহাসের গল্পগুলি মুখস্ত দেখে।

এরই মধ্যে দু' একদিন হঠাৎ এক-একবার গম্ভীর হয়ে চিন্তা করে কথা বলতে শুনেছি। একদিন অমনি বেড়াতে গিয়ে কথায় কথায় শিবাজীই বলেছিল—পরীক্ষায় পাস তো হবেইখনি—তা চলে এস না এখানেখুনি—মানে পাটনায়খুনি। খুব ভাল হবেখুনি।

—কি ভাল হবে ?

—আরে মুলকাত উলকাত হোগা।

—তুমি তো থাকবে গয়ায়। সে তুমিসুদ্ধ পাটনায় পড়লে হ'ত।

—আরে আমি চলে যাবখুনি পাটনা।

—বাইসিক্লে না ঘোড়ায় ?

—ট্রেনেখুনি। পোঁ—ভস-ভস-ভস-ভস। বাস, ক' ঘণ্টাখুনি। তবেখুনি সাইকেলে যেতে পারিখুনি, গিয়েছিখুনি। ঘোড়াটা বুড্ডা হো গেয়া—

—কিন্তু তুমি এমন করে পড়াশোনা না-করে ঘোর কেন ? পড়লেই পার !

—মগজে কিছু নেইখুনি।

—ধুর ! পড় না আর মগজের দোষ দাও।

একটু চুপ করে থেকে বলেছিল—ভাগ্না, তোমাকে ভালবাসি কেন জানখুনি ?'

—কেন ?

—দেখ, দুনিয়াসুদ্ধ তামাম আদমী এই কথাই বলে—আর ঘেন্না করে। সব থেকে বেশি করে আমার দাদারা। বড়দা উকীল, মেজদা তো থাকেই না—সে আবার বিলায়েত সে লৌটকে আয়ে হেঁ। সাব লোক। যদিও ফেল করে এসেছেখুনি। তারা তো তারা—সেজদাওখুনি, যে কেরানীখুনি, সেও ঘেন্না করে হে। সেইখুনি ছেলেবেলা থেকে পড়াতে আমার কেন মন লাগেনাখুনি তা আমি কি করে বলব ? এক ঘেন্না করে না বাপুজী আর দাদোজী—তুহার মামা—আর তুমি। তুমি এসব কথা ব'লোনাখুনি। এই পড়ার কথা বললেখুনি আমার মাথায় খুন চড়ে যায়।

আমি খুন চড়াতে চাইনি তার মাথায়—চুপ করেছিলাম। সে একটু চুপ করে থেকে বলেছিল—দেখ ভাগ্না, শিবাজী মহারাজ লেখাপড়া জানতেন না কিন্তু তিনি কি বোকা ছিলেন ? আকব্বরশাহ বাদশাহ (আকবরকে শিবাজী আকব্বর বলত) লেখাপড়া জানতেন না—তাতেই বা তাঁর কি ক্ষতি হয়েছিল ? আমি তো তবু থোড়াথুড়ি কিছু জানি। আরে ওতেই ফতে কর দুঙ্গা। দেখো তুমি !

জিজ্ঞাসা করেছিলাম—কি করবে তুমি ?

—ঠিক করিনি কিছুখুনি। দেখ কিছুটা বোকা আমি হচ্ছিখুনি। ছেলেবেলা থেকে বাপুজী শিবাজী মহারাজার গল্প মাসে কতবার যে বলেছেন তার হিসেব নেই। তখন থেকে মনে করে আসতামখুনি শিবাজী মহারাজ যেমন জবরদস্ত আলমগীর বাদশাকে ঘায়েল করে বাদশাহীকে ফাটিয়ে দিয়েছিল—তেমনিভাবে আমিও করব একটা দল। শিবাজী মহারাজের মাউলী সিপাহী ছিল—আমি এইসব দেহাতীদের মধ্যে থেকে চুনে চুনে আদমী নেব—কাহার, কুর্মী, দুসাদ—এই সব জাত। বুঝেছ ? এখানকার বাঙন, ছত্রী, গোয়ালা—এরা খুব জবরদস্ত বটে কিন্তু এসব উঁচু জাত নেব না। কিঁউ কি—এ লোক সব তকরার করে, মগজ নিয়ে খেল খেলে। আর ওরা তা নয়। যা বলব তাই শুনবে। ওদের নিয়ে এই জঙ্গলে আস্তানা গাড়ব। গড় বানাব। জঙ্গলে বাঘ আছে ভালুক আছে জানবর আছে, সহজে এর মধ্যে পাত্তা করতে পারবে না। সমঝালে না ? এক জঙ্গল সে নয়া জঙ্গল—হুঁয়াসে ফিন নয়া জঙ্গল। ঘুরব আর লুঠব—থানা-কাছাইরী। বম্ব ভি বানায়েঙ্গে। ক্ষুদিরাম, বারীন ঘোষকে মাফিক আদমীদের আনব, তারা ফিকির বাত্লাবে। বুঝেছ না ? রামদাদার উপর লোভ আছে আমার। উনি আমার দাদোজী। ওঁকে নিয়ে যাব। হাঁ। ওই যে সব

দো চারঠো বম্ব আওর ছুটো পিস্তৌল লেকে ই সব ফুট ফাট কর রহে হেঁ—ইসমে কুছ নেহি হোগা। ইয়ে দেখো—ইলোক কেত্না ইন্তজাম কিয়া থা।—জার্মনী সে হাতিয়ার লেকে জাহাজ লায়া। কেয়া হুয়া? বিলকুল বরবাদ হো গেয়া। লেকিন—। চুপ করে গিয়েছিল শিবাজী।

আমিও চুপ করে ছিলাম। অবাক হয়ে শুনেই গিয়েছিলাম। কি বলব খুঁজে পাইনি। আমারও এ সবের একটু ছোঁয়াচ ছিল কিন্তু তার কথা বলার বিপদ জানতাম। বলিনি।

কিছুক্ষণ পর শিবাজী বলেছিল—এখন বড় হয়ে বুঝতে পারছি—ও হবে না।

আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিলাম।

পরীক্ষার খবর বের হলে আমি যেদিন চলে এসেছিলাম, সেদিন শিবাজী আমাকে ট্রেনে তুলে দিতে এসেছিল। এসেছিল গয়া থেকে কিউল পর্যন্ত। কিউল থেকে আমার লুপ লাইনের ট্রেন ধরার কথা। সারা রাস্তাটা প্রায় চুপচাপ করেই এসেছিল। তার মন খুব খারাপ। আমার মতো শান্ত নিরীহ একটি গুণমুগ্ধ ভক্তকে হারিয়ে তার মন ভাল ছিল না। বলেওছিল কথাটা—দেখ ভাগ্না, বড়ি দুখ লাগতা হ্যায় ভাই। বহত দুখ্। কলিজা হামারা ফাঁক হো গয়া! তুমিইতোখুনি আমাকে ভালবাসখুনি। দোস্ত—ইয়ার যাকে বলে। বামদাদা—দাদোজী আছে—কিন্তু ও কত বড়। হয় না। হাম জুটি না হলেখুনি হয় না। তা তুমি চলে যাচ্ছ!—

কিউলে ট্রেনে চড়িয়ে দিয়ে বলেছিল—দেখ, এখনও আমি মতলব পুরা ছাড়িনি।

মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলাম।

সে বলেছিল—শিবাজী মহারাজ আর মাউলী পল্টন। হাঁ।

আমি হেসেছিলাম।

সে বলেছিল—হসো মৎ। তামাশাকে বাত নেহি হ্যায়! হাঁ। যাও, আর তুম আচ্ছাসে লিখাপড়ি করো। হাঁ! হম জরুর তুমকো বোলায়েঙ্গে। হাঁ!

তিন

এর কিছুদিন—বোধহয় বৎসরখানেকের মধ্যেই মামার চিঠিতে শিবাজী সম্পর্কে দুটো খবর পেয়েছিলাম।

প্রথম, শিবাজীর বাবা মারা গেছেন। একখানা শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণপত্রও পেয়েছিলাম।

মামা তাঁর পত্রে লিখেছিলেন—শিবাজী খুব কাতর হয়ে পড়েছে। মা নেই। বাপই ছিলেন মা বাপ। ভাইরা সব ভিন্ন হয়ে যাবে। ওর বাবাই উইল করে সব পৃথক পৃথক করে দিয়ে গেছেন। সেদিক দিয়ে বুঝে চলতে পারলে শিবাজীর ভাবনার কারণ নেই। প্রত্যেক ছেলেকে পঁচিশ হাজার টাকা করে নগদ, তাছাড়া বাড়ি এবং সব থেকে ভাল জিনিস মস্ত ক্ষেতি ছিল তাঁর—এক-একজনে পঞ্চাশ বিঘে জমি পাবে। তাছাড়া তার বাবা একটা বড় জঙ্গল একেবারে আলাদা করে শিব্বাকে দিয়েছেন।—কিন্তু তা নিয়ে শিবাজীর আনন্দ নেই। সরল সোজা মানুষ। বড্ড কাঁদছে। বাপঅন্ত প্রাণ ছিল। ইত্যাদি ইত্যাদি। শিবাজীকে আমি একটা চিঠি লিখেছিলাম। চিঠির উত্তর দিয়েছিল। হাতের লেখা খারাপ। লিখেছিল—ভাগ্না, তুমি যেসব কথা লিখেছ সেসব খুব ভাল, খুব মিষ্টি কিন্তু আমি এখন গীতা পড়ছি। মনকে বাঁধছি। ভয় কি! ভগবান আছেন। বলছি তাঁকে—তুমি বাপ হও, পথ দেখাও!

তার মাস কয়েক পর মামার পত্র পেয়ে বিস্ময়ের সীমা রইল না। ভগবান তাকে শেষটায় এই পথ দেখালেন? কোথায় মহারাজ শিবাজীর পথানুসরণ করে গয়া হাজারিবাগের পার্বত্য অরণ্য অঞ্চলে মাউলী সৈন্যের মতো কাহার কুর্মী দুসাদ পল্টন তৈরি করে স্বাধীন রাজত্ব স্থাপন করা—আর কোথায় ইংরেজ রাজত্ব রক্ষা করতে বাঙালী পল্টনে যোগ দিয়ে বসরার অভিমুখে জাহাজে চড়ে God save the king গাইতে গাইতে লড়াই করতে যাওয়া।

শিবাজী বাঙালী পল্টনে যোগ দিয়ে মিডল ইস্টে চলে গেছে।

*   *   *

মধ্যে একবার গিয়েছিলাম গয়া।

মামার কাছে শিবাজীর নতুন সংবাদ পেয়েছিলাম। তখন বেনারস কন্‌স্পিরাসি কেস চলছে কাশীতে—বেনারস জেলের মধ্যে—পুলিশ বাহিনীর প্রহরার মধ্যে। মামা বললেন—এখন পুলিশ শিবাজীর খোঁজ করছে।

—কেন?

মামা বলেছিলেন—ও ওদের দলের কথা জানত। ওদের দলে যোগ দেবার জন্যে খুব তোষামোদ করেছিল। এখানকার বঙ্কিম তো একজন আসামী। তার কাছে যেত। কিন্তু ওরা ওকে নেয়নি। বড়লোকের ছেলে—তার উপর ওই রকম বাউণ্ডুলে—দোসাদ-টোসাদদের সঙ্গে ঘোরে। তখন লোকে বলত দোসাদদের সঙ্গে মদও খায়। এইজন্যে নেয়নি। পুলিশের ভাল হ'ত ওর সাক্ষী পেলে।

—ও মদ খেতো ?

—আমি বিশ্বাস করি না। তবে হ্যাঁ—তামাক তো খেতোই, ভাঙও খেতে শুরু করেছিল। ও যে ঝট্ করে পল্টনে যোগ দিয়ে চলে গেল—তার কারণ হ'ল বঙ্কিম ধরা পড়ল। বঙ্কিম শেষকালটায় ধরা পড়বার আগে কি কি যেন ওর কাছে গিয়ে রেখে এসেছিল। বোধহয় তার মধ্যে একটা পিস্তল কি রিভলভার ছিল। বঙ্কিম যেদিন ধরা পড়ল ঠিক তার তিনদিনের মধ্যেই ও কলকাতা গিয়ে পল্টনে নাম লেখাল।

—খবর-টবর দেয় না ?

—শেষ চিঠি একটা আমাকে দিয়েছিল কুতল্ আমারা থেকে। কিন্তু তারপর 'কুতল্ আমারা'র ব্রিটিশ ফৌজকে তো সারেণ্ডার করতে হয়েছে। বেঁচে থাকলে বন্দী হয়ে আছে—না হলে—

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিলেন বড় মামা। সঙ্গে সঙ্গে আমিও।

১৯১৮ সালে আর্মিস্টিস-এর পর যুদ্ধ থামল। সন্ধি হ'ল। জিতল মিত্রপক্ষ। ইংরেজরা তাব মুখপাত্র—প্রধান। কুতল্ আমারায় যারা বন্দী হয়েছিল তুর্কীদের হাতে তারা মুক্ত হ'ল। এর মধ্যে আমার জীবনে ঘটনা কম ঘটেনি। কলকাতায় কলেজে পড়তে এসে ১৯১৬ সালের শেষ দিকে আমাকে পুলিশ ধরেছিল সশস্ত্র বিপ্লবীদের সঙ্গে সংস্পর্শের সন্দেহে। ইণ্টার্নমেণ্টে গোটা সতেরো সাল এবং আঠারো সালের নভেম্বর পর্যন্ত কাটিয়ে আমিও মুক্তিলাভ করেছি। আমার বিয়েও হয়ে গেছে। এর মধ্যে আমি ভুলে গিয়েছিলাম শিবাজীর কথা। কখনও হয়তো মনে হয়েছে কোনো অলস অবসরে, কিন্তু সে ওই সামান্যক্ষণের জন্য। তার থেকে বেশি স্থান তো তার ছিল না আমার জীবনে। তাছাড়া আমার জীবনে তখন এসেছে কিশোরী বধূ। তার কল্যাণে আমার ইণ্টার্নমেণ্টটা হয়েছিল স্বগ্রামে স্বগৃহে। অবশ্য একজন প্রভাবশালী পুলিশ অফিসারেরও স্নেহ ছিল তার সঙ্গে। তিনি ছিলেন আমার পিতৃবন্ধু। যাই হোক, আমার ইণ্টার্নমেণ্ট খুব বেশি পীড়াদায়ক হয়নি। বরং কলেজ-ইস্কুলের বাধ্যবাধকতার তিক্ততাহীন ইচ্ছামতো পড়াশুনো এবং এই কিশোরী বধূর সাহচর্যের মধ্যে জীবনটা বলতে গেলে অন্তরীণতার গণ্ডীবন্ধন সত্ত্বেও সুস্বপ্নমধুরই হয়ে উঠেছিল। সুতরাং এর মধ্যে শিবাজীর কথা মনে পড়বার কথা নয়, মনেও পড়েনি। তবে যে নিয়মে অকস্মাৎ জীবনে পথে একবার দেখা একটা মানুষের মুখ—যে মুখটা কোনো একটা কারণে হয়তো ভাল লেগেছিল, সেই মুখটা অকস্মাৎ অকারণে ভেসে ওঠে এবং কয়েকটা মুহূর্ত লোকটি কে এই প্রশ্নে মনকে একটু চিন্তিত করে আবার মিলিয়ে যায়—তেমনি-

ভাবে শিবাজীকেও মনে পড়ে থাকবে। তবে তাকে চিনতে প্রশ্ন জাগেনি বলে আবার তৎক্ষণাৎ মিলিয়ে গিয়ে থাকবে। যাক সেকথা। সে মনে পড়া মনে পড়াই নয়।

১৯১৮ সালে আর্মিস্টিসের পর আমার উপর সব বাধা-নিষেধ উঠে গেল। আমার শ্বশুরেরা বললেন—এইবার ব্যবসা-বাণিজ্যে লেগে যাও। পড়াশুনা করে কি হবে?

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী।

তাই লেগে গেলাম।

শ্বশুরেরাই তাঁদের বৃহৎ ব্যবসায়ে একটা বিভাগে শিক্ষানবীশ হিসেবে ঢুকিয়ে নিলেন। একটা ডিপার্টমেণ্টে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর সহকর্মী করে দিলেন। টাইসমেত স্যুট পরে একখানা সেক্রেটাবিয়েট টেবিলের সামনে চেয়ার নিয়ে বসে গেলাম। ভারতবর্ষেব স্বাধীনতা—জীবনের বৃহৎ স্বপ্ন—সবই গ্যাসপোরা বেলুনের মতো স্থতো কেটে উড়তে উড়তে আকাশপথে অদৃশ্য হয়ে গেল। সেটা অবশ্য সাময়িক; কারণ ও জীবনে টিকে থাকতে পারিনি আমি, তার প্রমাণ আমার জীবন। ব্যবসায়ে মন বসলে লাভ লোকসান দুটোর বোঝা দু'দিকে চাপিয়ে বাঁক-বওয়া মজুরের মতোই আজও দুলে দুলে বয়ে চলতাম। সাহিত্যিক হতাম না। ওখানে টিকেছিলাম মাত্র বছর দুয়েক। এরই শেষের দিকে হঠাৎ আমার বড় মামা লিখলেন—কলকাতায় যাচ্ছি। তোর সঙ্গেই দরকার।

খুশী হলাম। অনেকদিন মামাদের ওখানে যাইনি। দেখাশুনোও হয়নি। এবং পত্রালাপ, তাও কমে গিয়েছিল। ইণ্টার্নমেণ্টের সময় পত্র আমি লিখতাম না, মা লিখতেন এবং মামারাও পত্র দিতেন মাকে। ওরই মধ্যে চলত কুশলবার্তা বিনিময়। তারপর ইণ্টার্নমেণ্ট ঘুচল। ব্যবসায়ে শিক্ষানবীশ হিসেবে ঢুকলাম। তখন আর অভ্যেসটা ফিরল না। চিঠি লেখা অভ্যেসটাই বলতে গেলে ঘুচে গিছল। অজুহাত ভাল মিলেছিল—কাজের ভিড়ে সময় পাইনে। কিন্তু কাজ বেশি ছিল না, কিছু কিছু ব্যবসায় সংক্রান্ত চিঠি লেখা, দুটো চারটে ফার্মে যাওয়া আসা, আর সিগারেট টানতে টানতে গল্প করা। ব্যবসায়ের চিঠির বাঁধা-ধরা গৎ—উইথ রেফারেন্স টু ইওর লেটার, অথবা উই বেগ টু অ্যাকনলেজ উইথ থ্যাঙ্কস দি রিসিট, বা উই বেগ টু রিগ্রেট—ইত্যাদি ইত্যাদি। বাকী সাধারণ জীবনের পত্র লেখার কর্মগুলোর মধ্যে প্রিয়তমাসু বলে তরুণী পত্নীকে পত্র লেখার কর্ম ছাড়া সব কর্ম এবং সব লোকজনকে ভুলেই গিয়েছিলাম।

ব্যবসায়টা ছিল বা শ্বশুরদের ব্যবসায়ের এ বিভাগটা ছিল একটা এঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ। কলকাতার এক মিত্তির বাড়ির অ্যাডভেঞ্চারার তরুণ ম্যাট্রিক ফেল করে বাড়ির সিন্দুক বাক্স থেকে টাকা সংগ্রহ করে পালিয়েছিল বিলেত। সেখানে বেশ বছর কয়েক থেকে কি একটা এঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা আর কি সব নাট-বল্টুর সোল এজেন্সী আর এক বেলজিয়ান তরুণী বধূ নিয়ে দেশে এসে ফিনান্সিয়ার খুঁজতে খুঁজতে পাকড়েছিলেন এই শ্বশুর মশায়দের কর্তাকে। শ্বশুরদের আমার অচলা অগাধ ভক্তি এবং বিশ্বাস ছিল সাদা চামড়ার ওপর। কর্তাব্যক্তিটি সাগ্রহে এদের নিয়ে এক ব্যবসা ফেঁদে বসলেন। কাজ এই নাট-বল্টু বাজারে চালানো এবং ক্রেতার সঙ্গে কণ্ট্রাক্টারী। বাড়ি ঘর তৈরি নয়, বোট লঞ্চ বিল্ডিং।

মস্ত বড় একখানা ঘর, বোধ হয় পঞ্চাশ ফিট বাই তিরিশ ফিট হল, সেই হলটাকে কাঠের পার্টিশন দিয়ে ঘিরে ঘিরে সুদৃশ্য পায়রার খুপরির মতো ছোট ছোট ঘরে নানান ডিপার্টমেণ্ট। তারই একখানা দশ ফিট বাই দশ ফিট খুপরির মধ্যে আমরা তিনজন প্রাণী। ওই মিত্তির সাহেব, তার মেম এবং আমি। মেম সাহেব আমার বয়সী কি কিছু বড়; দীর্ঘাঙ্গী স্বর্ণকেশী বিড়ালাক্ষি এবং হাস্যমুখী প্রগল্ভা। মধ্যে মধ্যে মিত্তির সাহেব চলে যায় আজ এখান কাল ওখান—কণ্ট্রাকট সংগ্রহের কাজে। আমরা দু'জনে ওই ঘরে বসে দিনমান কাটাই। মেম সাহেবের নিপুণ হাতে টাইপরাইটার চলে খট খট খট শব্দে। আমি কলম পিষি, আর মেম সাহেবকে দেখি। শনিবার খেলা দেখতে যাই। কোনো-কোনোদিন সিনেমায় যাই। অবশ্য মেম সাহেবের সঙ্গে নয়। তাকে সঙ্গে নেবার জন্যে উচ্চতর এবং যোগ্যতর পদের লোক আছে। আমার পক্ষে ওই সঙ্গটুকুই যথেষ্ট। এরই মধ্যে মিত্তির সাহেবের এক টেলিগ্রাম এল গোয়ালিয়র থেকে। মেম সাহেবকে অবিলম্বে যাবার জন্যে টেলিগ্রাম করেছেন। মেম সাহেব চলে গেলেন। কিছুদিন পর মেম সাহেব হাসিমুখে ফিরে এলেন। গোয়ালিয়রের মহারাজার একখানা প্রমোদতরণী—হাউসবোট বিল্ডিং কণ্ট্রাক্ট পেয়েছেন; সে আমলে বারো হাজার টাকার কণ্ট্রাক্ট।

আপিসটা জমে উঠল।

মেম সাহেব ও মিত্তির সাহেব চলে গেলেন গোয়ালিয়র। এখানে মিত্তির সাহেবের এক দাদা এলেন। বড়া মিত্তির। এক ফিরিঙ্গী মেম টাইপিস্ট, একজন সরকার। সে এখানে মাল কিনবে, গোয়ালিয়র পাঠাবে।

জিনিসপত্র অনেক চাই। কাঠ তার মধ্যে বেশি। সি-পির জঙ্গলে কাঠ প্রচুর

কিন্তু সে কাঠ চলবে না। এখান থেকে উৎকৃষ্ট সিজন কাঠ দেখেশুনে পাঠাতে হবে। বড়া মিত্তির মাইডিয়ার লোক, খাঁটি কলকাতার ছেলে, শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তের দর্জিপাড়ার দাদার থেকে উন্নত সংস্করণ।

শরৎচন্দ্রের দর্জিপাড়াব দাদা শুধু থিে টারে হাবমোনিয়ম বাঁশী বাজান আর বড়া মিত্তির নাটক লেখে; অভিনয় করে, স্যুট পরে। সিগারেটের ধোঁয়ায় রিঙ বানায়। ফিরিঙ্গী মেম টাইপিস্টেব সঙ্গে নিদারুণ জমিয়ে তোলে কয়েক দিনের মধ্যে। এরই মধ্যে এল ওই চিঠি। বড় মামা আসবেন—উঠবেন কোথায় তা না লিখলেও অনুমান কবতে পাবি। কলকাতায় আমার এক সম্পর্কিতা মাসীর বাড়ি আছে—সেখানেই উঠবেন। কিন্তু কবে আসবেন লেখেননি।

সেদিন শনিবার, মাঠে খেলা আছে, দুর্দান্ত খেলা। মোহনবাগান ভার্সাস ডি সি এল আই।

মিত্তির বললে—বাঁড়ুজ্জে, ফিনিস এভবিথিং উইদিন ওয়ান। বুঝলে?—আমরা অফ হব দেড়টায়। ছুটো। মাঠে পৌঁছুতেই হবে। লরা—ইউ মাস্ট কাম টুডে। ইউ মাস্ট। না হলে জমবে না।

লরা প্রথমে আমার দিকে তাকাল, তাব পব মিত্তিবেব দিকে তাকিয়ে বললে—আমাব অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়ে আছে ব্যানার্জীব সঙ্গে।

—রাবিশ। সে হতেই পারে না।

ঠিক এই সময়ে বেয়ারা এনে একখানা স্লিপ দিলে।

আমার স্লিপ। স্লিপে বড় মামার নাম লেখা। ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে গেলাম। দেখলাম ভিজিটারস ওয়েটিং রুমে বসে আছেন বড় মামা, এবং তাঁব পাশে গৌরবর্ণ টকটকে রঙ দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ চেহাবা, পরনে খাকী হাপ প্যান্ট খাকী শার্ট একটি অল্পবয়সী তরুণ।

অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম তার দিকে।

চিনেও যেন চিনতে পারছিলাম না। শিবাজী! এমন সুন্দর হয়েছে শিবাজী? শুধু সুন্দরই নয়—তার চেয়ে বেশি কিছু। পৌরুষ এবং রূপের এমন সমন্বয় সচরাচর দেখা যায় না।

আমার সবিস্ময় দৃষ্টি দেখে শিবাজী অট্টহাস্যে যেন ফেটে পড়ল—হা হা হা হা। হা হা হা। হা হা হা।

ঘরের ছাদটাও যেন কাঁপছিল। আপিসটার দেওয়ালে দেওয়ালে সে অট্টহাসি প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরছিল। আপিসের কর্মচারীরাও চমকে উঠেছিল এ হাসিতে।

কোনো আপিসের ভিতরে লেনদেন কাজকর্মের মধ্যে এমন অট্টহাস্য হেসে কেউ যে সব কিছু বিপর্যস্ত করে দিতে পারে এ কেউ ভাবতেই পারে না। সুইংডোর-গুলো ঠেলে মুখ বেরিয়ে আসতে শুরু করল।

মামা বললেন—শিবা, তুই থাম। এমন করে হাসে না আপিসের মধ্যে।

শিবাজী তার দিকে তাকিয়ে থামাল তার হাসি। কারণ মামার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠেছিল। হাসি থামিয়ে সে উঠে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললে—হ্যালো হ্যালো ভাগ্নে—অবাক হয়ে গেলেখুনি বাবা? বাট্—কি দেখছখুনি বল তো?

—তোমাকে দেখছি। এত সুন্দর হয়েছো হে তুমি!

একটা ফার্সী বয়েৎ বলে উঠল সে, তার কিছুই মনে নেই শুধু মনে আছে—বিদেশী ভাষাটি দুর্বোধ্য হলেও ধ্বনিঝঙ্কার তার মাধুর্যে ভবা ছিল। এবং কয়েক-বারই ছিল তার মধ্যে গুল আব গুলাব শব্দ।

বয়েৎটা শেষ করে সে নিজেই তার অর্থ বলে দিয়েছিল—রাত্রে শুয়েছিলাম পথের ধারে একটা গুলবাগিচার পাশে। আকাশে ছিল চাঁদ। গুলাব পাখা মেলে উড়ে যেতে চাইল চাঁদের দিকে, আর চাঁদ নেমে আসতে চাইল গুলাবের কাছে। গুলাব ঝরে পড়ল আমার বুকে, চাঁদ গ'লে ঝরে পড়ল সেও আমার বুকে। দুই বিরহীর বিরহ বুকে করে আমি হয়ে গেলাম দিওয়ানা। বুঝলেনাখুনি ভাগ্নে, গালে যে গুলাবি আভা দেখছ এ হ'ল বসরাই! আর রঙে চেহারায় যে জলুষ দেখছ সে হ'ল আরবের আকাশের চাঁদের আলোর ছটা! লেকেন—হাম তো হ্যা দিওয়ানা।

আমি অবাক হয়ে গেলাম শিবাজীর কথা শুনে।

এ কি সেই শিবাজী? যে সাইকেলে পয়দলে কখনও ঘোড়ায় গয়ার চারিপাশের দেহাতে ঘুরে বেড়াত, বোকার মতো কথা বলত—দেহাতী লোকদের সঙ্গে বেমালুম মিশে যেত, তাদের সঙ্গে তামকুল খেত, তাদের বিচার করত—সেই?

বড়মামা বললেন—ওসব কথা এখানে নয় শিউজী ভাইয়া, এসব কথা মৌজ করে আপন এলাকায় দু-চারজনে বসে বলতে হয়। এ তোমার পল্টনের ক্যাম্প ফায়ার নয়, জাহাজের ডেক নয়, এটা আপিস। এখানে যা করতে এসেছ তাই কর।

শিবাজী সঙ্গে সঙ্গে মেনে নিয়ে বললে—দাদোজী আমার ঠিক হ্যায়। সেইখুনি ভাল কথা। এখানটা বিজিনেসের আসর—এখানে বিজিনেস। ভাগ্না, তুমি করিয়ে দাও বিজিনেস একটা। দাদোজী বলেখুনি বাণিজ্য। তা করে দাও-বাণিজ্য। বাণিজ্য ছাড়া লক্ষ্মী হয় না। লক্ষ্মী ছাড়াখুনি তামাম দুনিয়া কালী যাতি হ্যায়!

আমি হেসে বললাম—কি বিজিনেস ? তুমি বিজিনেস করছ নাকি ?

বড়মামা বললেন—শিব্বা আর সে শিব্বা নেই ; ও ওর চেহারার মতো পাল্টে গেছে। ওয়ারে গিয়ে নানান আইডিয়া নিয়ে ফিরেছে। এখন ও টিম্বার মারচেণ্ট হয়েছে। গয়াতে জঙ্গল তো ওর ছিলই। সি-পিতেও জঙ্গল নিয়েছে। কাঠ সাপ্লাই দিচ্ছে। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল এস মিটার অ্যাণ্ড কোম্পানী—তাদের ফার্স্ট ক্লাস টীক চাই—পাক্কা শাল চাই। ও তাই দেখে চিঠি লিখেছিল ; চিঠির উত্তর গেলে ও সেটা যখন আমাকে দেখালে—তখন দেখলাম তোর শ্বশুরদের কোম্পানী। তাই ওকে বলতেই ও আমাকে বললে—আপনি চলুন দাদা। ভাগ্নেকে একটা সাবপ্রাইজ দিয়ে আসি। আর বিজিনেস করে আসি। আমি তোকে লিখলাম যাচ্ছি—কিন্তু এর কথা আর লিখলাম না।

লরা এসে দাঁড়াল—ব্যানার্জী !

—কি ?

মিস্টার মিটার ব্যস্ত হয়ে উঠেছে—চলে যাবে। তোমাকে ডাকছে।

আমি মামাকে এবং শিবাজীকে বললাম—বসুন, আমি আসছি। মিটারকে গিয়ে বললাম—পার্টি এসেছে—কাঠ সাপ্লাই দিতে চায়।

মিটার বললে—হ্যাং ইওর পার্টি—সময় বহিয়া যায় নদীর স্রোতের প্রায়, ওয়ান টোয়েণ্টিফাইভ হয়ে গেছে—নট এ সিংগল মিনিট টু লুজ। কাম অন লরা।

লরা বললে—ব্যানার্জী ! কাতরভাবে সে চাইল আমার দিকে।

আমি বললাম—তোমার সঙ্গে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট বাতিল করে দিচ্ছি লরা। তুমি মিটারের সঙ্গে যাও। খেলার পর ও-ই বরং তোমাকে সিনেমা দেখাবে। যে পার্টি এসেছে—ওরা আমার আত্মীয়ও বটে। আমি ওদের সঙ্গে যাব।

—হোয়াট হ্যাণ্ডসাম ব্রাইট ইয়ংম্যান তোমার আত্মীয় ?

—হ্যাঁ, আমার আত্মীয়।

লরার চোখে তৃষ্ণা দেখেছিলাম যেন। কিন্তু আর অগ্রসর হতে পারেনি—মিটার তাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। আমি দুঃখিত হইনি। কারণ শিবাজীর আকর্ষণ আমার কাছে অধিকতর প্রবল মনে হয়েছিল। তবে দুঃখিত হয়েছিলাম লরার জন্য, কারণ লরা মিটারকে পছন্দ করত না মোটেই। মিটার অত্যন্ত কৃপণ। শুধু তাই নয়—অতি ঘরন্তী যেমন ঘর পায় না, অতি সুন্দরী যেমন বর পায় না—তেমনি অতি মুখফোড় ফক্কর মিটার—ভক্ত বা মুগ্ধ কাউকে পেত না। সকলেই ওকে ভয় করত।

ওরা চলে গেলে আমিও বেরিয়ে এসে মামা এবং শিবাজীর কাছে ফিরে এসে বলেছিলাম—সোমবার আসুন তাহ'লে। এখন চলুন—একসঙ্গেই যাই।

—কেন? সোমবার কেন?

—মিটার তো চলে গেল—খেলা আছে।

বড়মামা বললেন—মিটার কেন, তোমার শ্বশুররাই তো আসল মালিক—

—তা বটে, কিন্তু ডিপার্টমেণ্টাল হেড।—

—আরে ভাগ্গা—শিরকা কিস্মত তো তাজমে। গর্দান যাতা হ্যায়, শির মিট্টিপর লুটা যাতা—লেকেন তাজ তো মসনদ পর রহ যাতা হ্যায়। চলো—

বলেই সে উঠে পড়ল।

বিস্ময়ের কথা, বড়মামাকে নিয়ে সে একরকম ঠেলেই ঢুকে পড়ল ম্যানেজিং ডিরেক্টারের ঘরে।—মে আই কাম ইন স্যার?

শিবাজী ঘরের মধ্যে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে ডাকলেন আমার মামা-শ্বশুর। গিয়ে দেখলাম এই অল্পক্ষণের মধ্যেই শিবাজী তাঁকে প্রায় মুগ্ধ করে ফেলেছে। জমিয়ে গল্প জুড়ে দিয়েছে। এর মধ্যেই মেসোপাটমিয়ায় নিয়ে গিয়ে ফেলেছে ঝানু ব্যবসায়ীটিকে এবং তাকে প্রায় রূপকথা শোনা ছেলে মানুষের মত মুগ্ধ করে ফেলেছে।

শিবাজী বলছিল—বেটা তুর্কী স্পাইটা জাতে ছিল আরব। ধরে আমি নিয়ে এলাম কর্নেল সাহেবের তাঁবুতে।

শিবাজী চট ক'রে চেয়ার ছেড়ে উঠে খট্ করে পায়ে পায়ে ঠুকে নিখুঁত মিলিটারী স্যালুট করে দাঁড়াল। তারপর বললে—সেলাম করে দাঁড়ালাম।

"বেটা খোনা খোনা আওয়াজে,—বুঝলেন না,—মিলিটারী সাহেবগুলো সব বেটার নাকি সুরে কথা। দেখবেন আপনি। মানে খাঁটী ইংরেজ আর জাঁদরেল ইংরেজগুলো খোনা হয়। শও মে তো আশীঠো জরুর!—বলে হাসলে। তারপর চেয়ারে বসে বললে—বেটা মদ খাচ্ছিল, বললে—ইয়েস, হোয়াটস আঁপেন্ড্? হুঁ ইজ দিঁস—বাঁগার?

—এ স্পাই স্যার!

—স্পাঁই?

—ইয়েস সার। হি ওয়াজ সিগন্যালিং।

—সিঁগন্যালিং?

—ইয়েস স্যার—বাই মীনস অব বার্নিং ম্যাচষ্টিক্‌স।—

—হাঁ! বাঁট—হাঁউ হিঁ এণ্টারড্।

—কান্ট টেল স্যার। হি সেজ দ্যাট হি ওয়ান অব দি স্যাপারস এ্যাণ্ড মাইনারস। তারপর বুঝলেন না—আচমকা কিক্, সেই এ্যামুনিশন বুট সমেত কিক্। ব্যাটাতো কোঁক করে পেটে হাত দিয়ে বসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গেই আর এক কিক্ পিঠে। তারপর এলোপাথাড়ি। শেষে হল কি জানেন—মার ধর—টর্চার বেটা আবব একটি কথা কবলালে না! তখন—মানে পরের দিন সকাল বেলা বেটার কোর্টমার্শাল হয়ে গেল। কোর্ট না ছাই—কর্নেল বেটা হুকুম দিলে—বাঁধো বেটার হাতে আর পায়ে। বাঁধা হল। তারপর রেললাইনের উপর বেটাকে শুইয়ে দেওয়া হল। ওদিক থেকে ইঞ্জিন ড্রাইভারকে বললে—চালাও ইঞ্জিন। ইঞ্জিনটা এগিয়ে আসতে লাগল। লোকটা ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইল। ইঞ্জিনটা এসে একেবারে সামনেই একবার থেমে গেল খ্যাঁচ করে। লোকটা চমকে একটা আর্তনাদ করে উঠল। তখন আবাব জিজ্ঞাসা করলে—বল সত্যকথা। বল। কিন্তু লোকটা ওই একবার চমকে একবার চীৎকার করে আবার যে চুপ করলে সে মুখ আর খুললে না।

আমার শ্বশুর রুদ্ধশ্বাসে শুনছিলেন বললেন—তারপর?

খুব সহজ ভাবে হেসে শিবাজী বললে—তারপর আবার কি? দিলে ইঞ্জিন চালিয়ে।

—মরে গেল?

হেসে শিবাজী বললে—আউব ক্যা হো সক্তা বাতাইয়ে? মরে গেল লোকটা বালি খুঁড়ে পুঁতে দেওয়া হল। ওখানে তো একরকম সবই বালি। মরুভূমি তো। কিন্তু এই হল যুদ্ধ ওয়ার। ওয়ার ইজনো—তামাসা। তারপর ট্রেঞ্চে যখন মেশিনগান চলে না? কট্ কট্ কট্ কট্ কট্ কট্—তখন তো—আদমী মরে পট্ পট্ পট্ পট্! কাঠের ব্যবসায়ীর কাঠ সাপ্লাইয়ের কথাবার্ত্তার ভিতর এই গল্পটি যে কিভাবে এল তা আমার বোধগম্য হল না। সেটা বোধগম্য করে দিলে এবার শিবাজী নিজেই। সে বললে—আমার বিজিনেস ঠিক এই রকম ডিসিপ্লিন স্যাব। ওটা আমি ষ্ট্রিক্টলি অবজার্ভ করি। যারা সব আমার কুলী কামিন আছে তাদের ওই ডিসিপ্লিন মেনে চলতে হয়। একটু এতটুকু এদিক ওদিক হলে আমি শাস্তি দিয়ে থাকি। সো দ্যাট—আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন কাঠ যদি আমাব কাছে নেন তবে ঠিক কাঠ—ঠিক সময়ে আপনি নিশ্চয় পাবেন। আমি বনেব মধ্যেই থাকি। কুলীরা থাকে কুঁড়ে বেঁধে। আমার বিজিনেস চেয়ার টেবিলে বসে বিজলি কি পাখার হাওয়া খেয়ে নয়—এ্যাণ্ড আই এ্যাম এ ম্যান অব মাই ওয়ার্ড। বাত দিয়া তো জাত দিয়া—হাঁ!

শ্বশুর বললেন—কতটা বন আপনার আছে ?
—অনেক স্যার অনেক। গয়ার জঙ্গল—আসুন না নিজে এসে দেখে যান। শিকারের শখ যদি থাকে হরেক রকম চিতা গেমস মিলবে—বাঘ—ডোরা চিতা—শম্বর, ইভন কৃষ্ণসার। নীলগাই—তাও মিলবে। আসুন। ইউ আর ওয়েলকাম !
—বেশ, কিছু অর্ডার আপনাকে দিলাম। সেটা তো গয়া থেকে দিলে হবে না ! আপনার তো সি পি-তে জঙ্গল নেওয়া আছে বলছেন—সেখান থেকে দিতে হবে। টীক চাই। একটু ভাল জিনিস দিতে হবে—যাতে বর্মাটীকের সঙ্গে বেমালুম চালিয়ে দিতে পারি।
—ও কে স্যার—তাই হবে। তবে আই ক্যান গিভ ইউ ভেরী ভেরী গুড টীক ফ্রম মাই ওন গার্ডেন। গয়াতে বাবা যখন জঙ্গল কেনেন তখনই এই গাছগুলোর বয়স ছিল সাম টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ারস। এখন বয়স হবে মোর দ্যান সিক্সটি। আগের যিনি জঙ্গলের মালিক ছিলেন তিনি মহারাজা টিকারীর বাড়ির স্বজাতি। রইস আদমী ছিলেন—শখ করে চাষ করেছিলেন টীকের। মোর দ্যান ফাইভ হাণ্ড্রেড পুতেছিলেন। হাণ্ড্রেড তো আঁতুড়েই গেছে। তারপর হাণ্ড্রেড আর শো গেছে শৈশবে। তারপর হাণ্ড্রেড গেছে যৌবনে। টু হাণ্ড্রেড ছিল—বাবা পেয়েছিলেন। আমাদের আমলে গেছে সিক্সটি ফাইভ—এখনও ওয়ান হাণ্ড্রেড থার্টিফাইভ যাকে বলে—অস্তি ভাগিরথী তীরে বিশাল শাল্মলী তরু। বনস্পতি—যাকে বলে। খুব ভাল টীক। আমার ওটা দিতে সুবিধে কারণ এখন কাজ হচ্ছে গয়ার জঙ্গলে—এখন সি পি-তে সব গুছিয়ে গাছিয়ে বসে কাঠ দিতে আপনাকে দেরি হবে। আই শ্যাল গিভ ইউ ভেরী চীপ।
—অনেক ভাড়া পড়ে যাবে। গোয়ালিয়র তো।
—দাম পুষিয়ে দেব।
বড়মামা আমার এতক্ষণে কথা বললেন। বললেন—দেখুন আত্মীয় আমি, কুটুম্ব। এ ক্ষেত্রে লেন দেন কারবারের মধ্যে থাকাটা ঠিক নয় বলে কথা বলি নি। তবে বলি—আপনারা এসে ওর গাছ, কাঠের কোয়ালিটি ওর ক্যাপাসিটি এসব দেখুন। আমাদের মনে হয় পছন্দ হবে। মানে ওই গাছগুলো থেকে ওর ক্যাপিট্যাল এসে যাবে। এবং ভাল কাঠ দিয়ে বাজারে একটা নামও হয়ে যাবে।
একটু ভেবে শ্বশুর মশাই বললেন—তাই হবে।

শিবাজী বলেছিল—দেন আই গেট ইওর কণ্ট্রাক্ট স্যার ?

—ইয়েস। অবশ্য এখন একটা সামান্য অর্ডার দিচ্ছি। গোটা অর্ডার আফ্‌টার ইনস্‌পেকশন দেব।

—ভেরী গুড! তা হলে কবে আসছেন বলুন!

—সেটা সোমবার দিন জানাব।

—তাতে তো আমি সময় পেয়ে যাচ্ছি—চলুন, আগেই চলুন। ওই তো আপনাব দেওয়ালে লেখা রয়েছে—টাইম ইজ মানি।

শ্বশুর মশাই বলেছিলেন—টাকা অনেক আসে যায়। টাইম শুধু টাকা আনেই না টাকা বের করেও দিয়ে যায়। দিন দেখে যেতে হবে।

ভদ্রলোক রসিকতার ধার বিশেষ ধারতেন না কোনদিনই। সেদিন কি রকম করে যে রসিকতা করে ফেললেন তা বুঝলাম না।

শিবাজী উঠে দাঁড়িয়ে খট্ ক'রে পায়ে পায়ে ঠেকিয়ে মিলিটারী স্যালুট করে বললে—তাহলে চলি স্যার।

হেসে ফেললেন শ্বশুর।

শিবাজীর সঙ্গেই বেরিয়ে যাচ্ছিলাম। শ্বশুর মশাই বললেন—শোন।

—থাকতে হল আমাকে।

শ্বশুর বললেন—এ ছোকরাকে তো জান বলছ। তোমার মামাও এসেছিলেন। ছোকরা পাগলা একটু, নয় ?

—একটু একসিন্ট্রিক।

—একটু নয় বেশ। লেখা পড়া কতদূর করেছে ?

—ম্যাট্রিকও দেয় নি। ওয়ারে চলে গিয়েছিল।

—সে তো শুনলাম। বাপের অবস্থা সত্যই ভাল ছিল ?

—বেশ ভাল অবস্থায়। আমি ওদের সব দেখে এসেছি।

—জঙ্গল আছে বলছে—দেখেছ ?

—দেখি নি। তবে মামাদের ওখানে শুনেছি—সম্পত্তি-জমি জঙ্গল এসব বেশ দামী সম্পত্তি।

—হুঁ। একটু চুপ করে থেকে বললেন—ওর সঙ্গে ব্যবসাতে ঢুকে যাও না!

—ওর সঙ্গে ?

—হ্যাঁ। ও কিছু রাখতে পারবে না। সব যাবে ওর। তোমাকে কিছু টাকা দিচ্ছি, ওর সঙ্গে আলাপ আছে, তোমার টাকা ওর জঙ্গল—ব্যবসায় নেমে পড়। দু বছরের মধ্যে দেখবে—সব তোমার হাতে চলে আসবে।

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম পিতৃতুল্য শ্বশুরদেবের মুখের দিকে!

—কি?

আস্তে ঘাড় নেড়ে বললাম—না তা' পারব না।

—তোমার কিছু হবে না!

আমি চলে আসছিলাম তিনি ডেকে বললেন—শোন।

আবার ফিরে গিয়ে দাঁড়ালাম সামনে।

তিনি বললেন—তুমি না কর ব্যবসা ওর সঙ্গে, ভাল কথা। করবে না সেটা আমারই বোঝা উচিত ছিল। দেশের জন্যে যারা পাগলামি করে জেল খেটে—বা—ফাঁসী কাঠে ঝোলে—তাদের বুদ্ধি আলাদা। তারা মরে গিয়ে দেশ যদি স্বাধীনই হয় তবে তাতে তাদের কি ফয়দা সে তারাই জানে। সে কথা আমি বুঝি না। কিন্তু শুনতে ভাল। শহীদ। তেমনি শুনতে ভাল—খুব অনেষ্ট ম্যান। তোমার অনেষ্টির জন্যে অনেকের প্রশংসা পাও তুমি। আমিও তোমার প্রশংসা করছি! কিন্তু আশা করি আমার সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতা করবে না। এ সব কথা ওই ছোকরাকে কি তোমার মামাকে বলবে না!

চুপ করে রইলাম!

ভুরু কুঞ্চিত করে তিনি বললেন—কি?

—কিন্তু আমি মাঝখানে রয়েছি।

—তুমি মাঝখানে? কি করে? হিসেব করে বল?

—আমার কাছেই এসেছিল।

—না। এসেছিল ফার্মের কাছে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে। এ্যাক্সি-ডেণ্টালি বল আর যাই বল তুমি ফার্মে আছ পরিচিত লোক তোমার সঙ্গেই এসে দেখা প্রথমে। নয়? ভেবে বল।

ব্যবসাদারটির বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ এবং অতি বক্র। এ বিষয়ে বাজারে তাঁর প্রকাণ্ড নাম আছে। সে নিয়ে তিনি গৌরব বোধ করে থাকেন। তার যুক্তি অকাট্য। মনে মনে অনেক চেষ্টা করেও এ যুক্তির বেড়াজাল থেকে বের হবার কোন ফাঁকই পেলাম না আমি। আমাকে স্বীকার করতে হল তাঁর যুক্তি! চুপ করে থেকেই স্বীকার করলাম—উত্তর আমার নেই।

তিনি বললেন—বাজারে আমার দুর্নাম আছে প্যাঁচালো লোক বলে। সে কথা তুমি ওকে বলতে পার। কিন্তু যে কথাটা এক্ষুনি তোমাকে বললাম—সেটা

তুমি নিশ্চয় বলতে পার না। তুমি জামাই না-হলে এ প্রস্তাব আমি কখনই করতাম না। যাও।

মাথা হেঁট করেই বেরিয়ে এলাম।

পরের দিন রবিবার। সেদিন শিবাজীর সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু আমি থাকতে পারিনি; মামার সঙ্গে দেখা করে এসেছিলাম মেসোমশায়ের বাসায়। শিবাজী ছিল না। মামাকেও আমি শ্বশুরের সব কথা বলিনি। তবে বলেছিলাম—আপনি তো জানেন মামা, ব্যবসার ক্ষেত্রে আমার শ্বশুর খুব জটিল লোক। বড় বড় মাড়োয়ারীরা ওর বুদ্ধিকে ভয় খায়। শিবাজী ওঁর সঙ্গে ব্যবসা করতে কেন যাচ্ছে? আমার শ্বশুর বলে যদি মনে করে আমার দ্বারা কোন উপকার হবে কি সুবিধা হবে—তা হলে সেটার চেয়ে বড় ভুল ধারণা আর হয় না। ওকে বারণ করবেন।

বলেও শেষে জুড়ে দিলাম—ওকে বারণ করবেন তা হলে।

বড় মামাও আমার সরল প্রকৃতির লোক। যত সরল তত ক্রোধী। তিনি বললেন—না না। তোমার সঙ্গে এতে কি আছে? কিচ্ছু না। আর নিজেকে তোমার এতখানি ইম্পর্টেণ্ট ভাববার কোন কারণ নেই। তুমি এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না।

কথার মধ্যেই শিবাজী এসে পড়েছিল। বড়মামা তাকে কথাটা বলেছিলেন শিব্বা—চাঁদু কি বলছে শোন।

মধ্যে মধ্যে বড় মামা গভীর স্নেহে বা তীব্র ব্যঙ্গে—চন্দ্রশেখর থেকে চাঁদু বলে সম্বোধন করতেন আমাকে।

শিব্বা বলেছিল—কি?

বড় মামা সব বলতেই—সে হা হা ক'রে হেসে উঠেছিল তার স্বভাবানুযায়ী।

মনে মনে করুণা অনুভব করেছিলাম হতভাগ্য মূর্খ শিবাজীর জন্য কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দায়মুক্ত হয়ে ফিরে এসেছিলাম।

পরের দিন সোমবার শিবাজী আপিসে এল—কাঁটায় কাঁটায় সময় রেখে। ঠিক সাড়ে এগারটার সময়। আমি আমার ঘরেই ছিলাম, অর্থাৎ মিটার এ্যাণ্ড রয় কোম্পানীর ঘরে। বড় মিত্তির এসে অবধি—ডি সি এল আই ভারসাস মোহনবাগানের খেলার কথায় পঞ্চমুখ। লরা বসে টাইপ করছিল এবং হাসছিল! মিত্তিরের সঙ্গে লরার ঝগড়া হয়ে গেছে খেলার মাঠে, সে কথা লরা

বলেছে আপিসে এসেই। বিশদ কিছু শুনিনি কারণ তখনই মিত্তির এসে গিয়েছিল। এবং দিনটা আরম্ভ করেছিল গম্ভীরভাবে। বলেছিল—ব্যানার্জী প্লিজ ডু ইয়োর ওন ওয়ার্ক। নো টক প্লিজ। তারপর ঝুঁকে পড়েছিল এটা ওটা সেটার উপর।

এটা ওটা সেটা বলছি এই কারণে যে কাজ তো কিছু ছিল না। বোল্ট, নাট তখন প্রায় বস্তাবন্দী হয়ে গুদোমে পড়ে আছে, মরচে ধরছে। তবে অভিযোগ উঠেছে জায়গা আগ্‌লে রয়েছে। ওগুলো নিয়ে ঘোরাঘুরি করে আমার ক্লান্তি হবারই কথা, এখানে যাও ওখানে যাও বলে বলেই শ্বশুর ক্লান্ত হয়েছেন। এখন কাজের মধ্যে গোয়ালিয়রের হাউসবোট। তার মাল কিনে পাঠানো। চিঠি-পত্র অল্প দু'চারখানা আসে, তারই বেশী। একটা চিঠির খসড়া করা আছে, লরা তাই কতকগুলো দিনে টাইপ করে, মিত্তির ঠিকানা দেখে বলে দেয়। আমি লিখি। বেয়ারা সেগুলো ডেসপ্যাচে দিয়ে আসে! বুক পোষ্টে চলে যায়।

সেই কাজই চলছিল। হঠাৎ মিত্তির আরম্ভ করলে—পরশু যে খেলাটা মিস করলে ব্যানার্জী—সে একটা আপশোষের মিস্। এ খেলা কালে কস্মিনে হয়।

আমি ঠিকানা লিখে চলছিলাম। বললাম—কাগজে পড়েছি।

—রাবিশ। কাগজে পড়া আর চোখে দেখা? একটু চুপ করে থেকে বললে—তুমি বাওয়া লেখ। পুরনো আমলের দুটো লাইন আছে হয়তো বলবে—ভালগার। তা হোক—ওয়াণ্ডারফুল টু লাইনস, কাপলেট। "লতাতে কি ফোটে ফুল বিনা বরিষণে, চিঠিতে কি ভোলে মন বিনা দরশনে।" আস্ক লরা। উৎসাহ ভরে হাততালি দিতে গিয়ে লরার গায়ে আমার কনুই ঠেকেছিল—সী ওয়াজ ফিউরিয়াস। কারণটা হ'ল—ইংরেজরা তো ও সইয়ের বউয়ের বকুল ফুলের বোনপো বউ—তারা হারছে আমার ব্রাদারদের কাছে।

লরা বললে—ইয়োর মাসতুতো ভাই। নট ইয়োর ওন ব্রাদার।

মিত্তির বললে—এই রস জ্ঞানের জন্যেই আই এ্যাডোর ইউ সো মাচ্—লরা।

লরা কি বলতে যাচ্ছিল এমন সময় বেয়ারা এসে লরাকে বললে—

—কর্তা সাবনে আপকে বোলায়া।

কর্তাসাব হলেন বস্—আমার শ্বশুর।

চমকে উঠল লরা! কর্তা সাবের ডাক শুনে সকলেই চমকায়। কারণ ধমকানোর কাজটাই উনি করে থাকেন।

মিত্তির পর্যন্ত দমে গেল। বললে—কি হ'ল?

লরা চলে গেল।

মিত্তির বললে—জান ব্যানার্জী, সেদিন লরা ফায়ার। অবিশ্যি আমার কন্থুই বেশ উচ্চ স্থানে ওকে খোঁচা মেরেছিল। বলে খি-খি ক'রে হাসতে লাগল।

বেয়ারা আবার ফিরে এসে ডাকলে মিত্তিরকে। মিত্তিরের মুখ শুকিয়ে গেল। বললে—ছুঁড়িটা বসের কাছে লাগিয়েছে টাগিয়েছে নাকি ?—ব্যানার্জী ?

বললাম—তা তো জানি না মিঃ মিত্তির।

আমি বসে সিগারেট ধরিয়ে টানতে টানতে ভাবছিলাম ব্যাপারটা কি ? প্রথমে লরা—তারপর মিত্তির !

সিগারেটটার শেষ টান দিয়ে ফেলে দিচ্ছি এমন সময় মিত্তির ফিরে এল থমথমে মুখ নিয়ে। চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসতে বললে—আই টোল্ড মাই ব্রাদার, বারবার বলেছিলাম এসব দেশীলোকের সঙ্গে পার্টনারশিপে যেয়ো না।

আমি চুপ করেই রইলাম। মিত্তির বললে—দে আর রাঘব বোয়ালের শার্কস ! তোর এমন মেমসাহেব বউ রয়েছে একটা ইয়োরোপীয়ান ফার্মের সঙ্গে পার্টনাশিপ করলেই পারতিস ! তা না—। হুঁঃ—

তারপর বললে—ব্যানার্জী !

—এঁ্যা ?

—তুমি সেদিন সেই ছোকরাকে তোমার শ্বশুরের কাছে নিয়ে গিয়েছিলে ?

—কোন ? ও ইউ মীন শিবাজীকে।

—আই ডোণ্ট নো হোয়েদার হি ইজ শিবাজী অর রাণাপ্রতাপ অর ঔরংজীব অর রবার্ট ব্রুস। যে ছোকরা কাঠ সাপ্লাই দেবে বলে এসেছিল ?

—হ্যাঁ তার নামই শিবাজী।

—আমি তোমাকে বললাম সোমবার আমার সঙ্গে দেখা করার কথা আর তুমি তাকে স্ট্রেট নিয়ে গেলে রয়ের কাছে ? হতে পারেন তিনি তোমার শ্বশুর কিন্তু বিজিনেসে নো বডি ইজ নোবডিজ শ্বশুর !

আমার রাগ হয়ে গেল ! বললাম—তা হলে নোবডি ইজ নোবডিজ ব্রাদার মিঃ মিটার—।

থমকে গেল মিত্তির। বললে—এক্সকিউজ মিঃ ব্যানার্জী। কথাটা ঠিক ভাবে পুট করতে পারিনি হয়তো। কিন্তু সব কাজেরই একটা নিয়ম আছে। খানিকটা রাইট আছে। এখানে টার্মস্ রেট আমি সেটেল্ করতাম। হয়তো সাম কমিশন আদায় করতাম। তা আমি নিশ্চয় একলা খেতাম না। তোমার শ্বশুর তোমাকে জামাই বলে মাইনের বেশী কিছু দেয় না। আমার ভাইও দেয় না। এটা সব জায়গায় সকলে পায়। সেটাই মারা গেল।

বললাম—কিন্তু আমি তাকে রয়ের কাছে নিয়ে যাই নি। সে নিজেই ঠেলে চলে গেল ঘরের মধ্যে এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে রয়কে চার্মড্ করে দিলে। কথাবার্তা পাকা ক'রে নিলে।

—লোকটা এসেছে। লরাকে রয় ডিক্টেট করেছে অর্ডারের চিঠি।

—শিবাজী এসেছে?

—এসেছে। শিবাজী না ফিবাজী গড নোজ বাট হি ইজ এ ডেভিল। ডেয়ার ডেভিল যাকে বলে। তোমার শ্বশুর যে শ্বশুর—যার বাওয়া গোমড়া মুখে নো বডি এমন কি লরাও কোন দিন এক কণা হাস্যরেখা দেখে নি—যাকে দেখে আমার মুখ অবধি গোমড়া হয় তার ঘরে—ডেভিল হা-হা-হা করে হাসছে!

লরা ফিরে এল শর্টহ্যাণ্ড নোট নিয়ে এবং চেয়ার টেনে তৎক্ষণাৎ টাইপ করতে বসে গেল। খট্ খট্ শব্দে ঘরটা ভরে উঠল।

মিত্তির বললে—রাবিশ্। দেখবে আমি বলছি—এ কাঠ আমার ব্রাদার রিজেক্ট করে দেবে। বার্মাটিক দেবার কথা—তার জায়গায় জোচ্চুরি দেখতো!

লরা বললে—বস্ নিজে যাচ্ছেন কাঠ দেখতে। কাঠ দেখে পছন্দ হলে তবে কণ্ট্রাক্ট ভ্যালিড হবে।

সুইং ডোরটার ওপাশে জুতোর শব্দ উঠল সঙ্গে সঙ্গে শিবাজীর উচ্চ দরাজ কণ্ঠ।—ওয়াণ্ডারফুল আপিস আপনার! ওঃ কত ডিপার্টমেণ্ট।

মিত্তির বললে—ভেরি ক্লেভার চ্যাপ!

রয় এবং শিবাজী ঘরে ঢুকল। রয় বললেন—এই হ'ল মিত্তির রয় এ্যাণ্ড কম্প্যানী এখন অবশ্য ছোট অফিস। এই সবে আরম্ভ। তবে খুব বড় কম্প্যানী করবার ইচ্ছে আছে আমার। ইঞ্জিনীয়ারিং হার্ডওয়্যার—টিম্বার ঐ সব নিয়ে খুব বড় কারবার করব আমি।

শিবাজীর মন ঘুরে গিয়েছিল আমাকে দেখে। আমার হাত ধরে বললে—ভাগ্না! ইউ মাষ্ট কাম! ও কিন্তু যাবে মিষ্টার রয়।

—ও যাবে?

—নিশ্চয়। মাষ্ট! তা না হলে হবে না।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—কোথায়?

হা-হা শব্দে হেসে উঠল শিবাজী। সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা রামের কে? বেয়াই মশাই—ভাগ্না আমার লেখা-টেখাতেই ভাল—স্বদেশী-টদেশীতেই বুদ্ধি। দেখুন তো জিজ্ঞাসা করে কোথায়? ফরেষ্টে। আমার ওখানে! মিষ্টার রয়

আসছেন—নিজে দেখবেন ফরেষ্ট। হ্যাঁ তোমার সঙ্গে এনগেজমেণ্ট আজ সন্ধের ক্যানসেলড। আমি চলে যাচ্ছি সন্ধেতে। চলনা তুমিও চল না আমার সঙ্গে এ্যাডভান্স পার্টি হয়ে।

শ্বশুর বললেন—নাঃ। কাল আমার সঙ্গেই যাবে। কাল সন্ধেতে যাচ্ছি।

লরা—ইউ আর কামিং উইথ আস।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—তুমিও যাবে।

মিটারের দিকে তাকিয়ে বললেন—হরেন টাইপিষ্টকে বলে দিচ্ছি যে কদিন লরা চন্দ্রশেখর না ফিরছে সে ক'দিন সে এখানে বসবে। আপনি থাকলেন। লরা, তুমি ক্যাশ থেকে পঞ্চাশটা টাকা নিয়ো। আমি বলে দিচ্ছি। তোমার নিজের খরচের জন্যে। আসুন।

শিবাজীকে নিয়ে তিনি চলে গেলেন।

বেয়ারা আবার এল একখানা স্লিপ নিয়ে। লরাকে স্লিপ দিয়েছেন রয়। স্লিপটা পড়ে লরা ছিঁড়ে ফেলে দিলে।

সন্ধেবেলা বাসায় বসে আছি একখানা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। নামল—লরা। আমাকে দেখে হেসে বললে—বসের সঙ্গে দেখা করব।

জিজ্ঞাসা করলাম—কি ব্যাপার? যেতে পারবে না? মিটার রাগ করছে?

লরা হেসে বললে—খুব পেকে গেছ দেখছি! তোমার মিটার এবার আমার কাছে গালে চড় খাবে।

—তবে কেন যাবে না?

—কে বললে যাব না। যাব। বস স্লিপে দিয়েছিলেন তখন সন্ধেতে এখানে আসতে ইনষ্ট্রাকশনের জন্যে।

—ইনষ্ট্রাকশন?

—হ্যাঁ। ওখানে যাচ্ছি সেখানের জন্যে ইনষ্ট্রাকশন। আমি জানি না ঠিক। তবে—এটা ষ্ট্রিকটলি প্রাইভেট। তোমাকে বললাম। তুমি যেন শ্বশুরকে বলো না আমি বলেছি।

বিস্ময় বোধ করলাম বইকি।

লরা বেরিয়ে এল প্রায় এক ঘণ্টা পর। একটু মুচকে হেসে সে খট খট করে যেন তরঙ্গ তুলে চলে গেল। কিছু প্রশ্ন করবার অবকাশ পেলাম না। পিছনে রয় বেরিয়ে এসেছেন। চাকরকে বললেন—যা ট্রাম রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আয়। শ্বশুর আমাকে বললেন—যাচ্ছ তুমি কিন্তু আশা করি তুমি যে কথা আমাকে দিয়েছ তা নিশ্চয় রাখবে!

আমি তাকালাম তাঁর দিকে। তারপর বললাম—আমি যাব না।

—না। সে ছোকরা বারবার বলে গেছে আমাকে।

—বলবেন কাজে আটক পড়েছি কি শরীর ভাল নেই।

—না। যাবে। যাবে—দেখবে—ঘুরবে, হাসবে; কোন কথায় থেকে দরকার কি তোমার? যাবে তুমি।

একটু চুপ করে থেকে বললেন—আমি বরং তোমার মামাকে নিয়ে ঘুরব, জঙ্গলটা দেখব। তুমি লবাকে সঙ্গে নিয়ে ছোকরার সঙ্গে শিকার-টিকার করবে বোধগয়া যাবে। বুঝেছ?

বললাম—বুঝেছি। কিন্তু বুঝতে ঠিক পারলাম না। মনটা যেন সন্দেহের দোলায় দুলছিল।

সরকার চট্টরাজ এসে তিনখানা টিকিট দিলে। বার্থ রিজার্ভেশন হয়ে গেছে।

চার

শিবাজীর আস্তানায় উঠে সত্যই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন সকলে।

গয়া থেকে প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ মাইল পথ। একেবারে জঙ্গলের মাঝখানে শিবাজীর আস্তানা। এখানেই শিবাজীর বাবার কেনা সেগুনের জঙ্গল। অবশ্য তৈরী করা জঙ্গল। যেমন করে আজকালকার দিনে জঙ্গলের আবাদ হয় অনেকটা সেই রকম। চারিপাশে শালবন তার মাঝখানে বিস্তীর্ণ একটা জায়গা পরিষ্কার করে সেগুনের চারা এনে পুঁতেছিলেন শৌখীন ভূমিহার জমিদারটি। পাঁচশো গাছের মধ্যে এখন আছে দেড়শো কি একশো ষাটটি গাছ। কাজেই মধ্যে মধ্যে বেশ ফাঁকা রয়েছে। অবশ্য উপরটাই ফাঁকা। নিচের জমি সেগুনের চারা গাছে ভর্তি। কিন্তু সে সব বেশ মোটাও নয় উচ্চতাতেও বেশ বড় নয়। তাও খুব বেশী নয়। তেমন গাছ যা উঁচুতে বারো থেকে বিশ ফুট মোটায় পরিধিতে এক ফুট দেড় ফুট এমন গাছ শত খানেক। বাকী গাছগুলো সাত ফুট আট ফুট, পরিধিতে ছয় ইঞ্চি আট ইঞ্চি এমনি। ঘন হয়ে জমাট বেঁধে রয়েছে। এরই মাঝখানে পাথরের তৈরী একটা বাংলো। দেখতে ভারি রোমান্টিক। মনে হয় যেন মধ্যযুগের সীমান্ত রক্ষার একটা ঘাঁটি।

এই ঘরটাতে শিবাজী আমাদের জায়গা করে রেখেছিল। ঘর বেশী নয় তিন খানা দুপাশে বারান্দা, তার সঙ্গে সাহেবী কেতায় ১৯২০।২২ সালের বাথরুম

দুপাশে দুটো। কমোড—বাথটব ইত্যাদি। অবশ্য সবই খুব পুরনো। অর্থাৎ যিনি করেছিলেন তিনি যা কিনেছিলেন তাই আছে। ঘরে বেশ ভালো নেয়ারের খাট—টেবিল ইত্যাদি। তবে গড়ন টড়ন ভালো নয়। এগুলো নতুন। সম্ভবতঃ শিবাজীবাহাদুর এই ব্যবসায়ে নেমে এগুলো করিয়েছেন। কাঠ এবং পালিশ ঝক্ ঝক্ করছে। শিবাজী প্রথমেই বললে—স্যার—ইয়েঃ—ইয়েঃ তো হামারা কাঠকে নমুনা হ্যায়। একটা সেগুন কেটে তার থেকে তৈরী এগুলো।

কাঠ—কাঠের আঁশ—দাগ এগুলি সত্যই চমৎকার। সি পি টিক তো দূরের কথা—বার্মা টিকের সঙ্গেও পাল্লা দিতে পারে।

ব্যবসার মালিক মিষ্টার রায়—আমার শ্বশুরমশায় তাকিয়েছিলেন অন্য দিকে। ঘরের জানালা দিয়ে তিনি তাকিয়ে ছিলেন বন বিস্তারের দিকে। মধ্যে মধ্যে ফাঁকা সেগুন বনটার ওপার পর্যন্ত দৃষ্টি গিয়ে ঘনবদ্ধ নিবিড় শাল জঙ্গলে আবদ্ধ হয়েছিল।

তিনি বললেন—কতদূর চলে গেছে এই বনটা ?

আমার বড় মামা হেসে বললেন—বনটা ? সে চলে গেছে মাইলের পর মাইল। মধ্যে মধ্যে ফাঁকা কিছু কিছু আছে গাঁও আছে কিন্তু চলে গেছে বলতে গেলে গয়া জেলা হয়ে গিরিডি হাজারিবাগ—সেখানে থেকে রাঁচি ওদিকে সি-পি।

হেসে রয় বললেন—নাঃ সে আমি জিজ্ঞাসা করছি না। জিজ্ঞাসা করছি—এই এক নাগাড়ে কতটা গেছে আর শিবাজীবাবুরই বা এলাকা কত দূর ?

শিবাজী চায়ের জন্য ব্যস্ত হয়েছিল, টেবিলের উপর সাজানো ছিল কাপ ডিসগুলো। সে বললে—সে খুনি মাইল মাপাতো নেই স্যার তবে দলিলমে লিখ্যা হুয়া হ্যায় কি পাঁনশো বিঘা। উসকে সীমানা বরাবর পত্থল গাড়া হুয়া হ্যায়।

বড় মামা বললেন—আপনাদের দেশের বিঘা নয়। এ দেশের বিঘা বাংলা দেশের বিঘা থেকে অনেক বড়।

—হ্যাঁ। সে আমি জানি। আচ্ছা শিবাজীবাবু—এক বিঘাতে কতগুলো করে গাছ থাকে ?

—অনেক-অনেক !

একটু চুপ করে রইলেন রায়। তারপর বললেন—আচ্ছা জঙ্গলটা দেখা যায় না ঘুরে।

—হাঁ। হাতি হ্যায়। জমিদার লোকের হাতি আছে—আমরা ভাড়া নিয়ে

কাঠ তোলাই, বয়ে আনাই। হাতি মওজুদ! সওয়ার হো যাইয়ে উসকা পর চলিয়ে দেখিয়ে। বন্দুক লে লিজিয়ে। শিকার ভি হো যায়েগা।

—হোয়াট ইজ ইট? লরা চমকে উঠে বললে—ভিয়ারস-বীয়ারস-বোরস হেয়ারস।

হেসে শিবাজী বললে—মেনি! মেনি! এ্যাণ্ড টাইগার-লেপার্ডস—

মাই গড্! বিস্ফারিত দৃষ্টিতে লরা তার দিকে তাকিয়ে রইল।

শিবাজী বললে—আমার কুলীরা বলছিল—দু'দিন আগে তারা বাঘের ডাক শুনেছিল! কিন্তু আমার কোন ভয় নেই। আমার বন্দুক আছে। এবং আমি বাঘ মেরেছি। তা ছাড়া জানতো আমি ওয়ার ফেরৎ। একজন হাবিলদার ছিলাম। বলে সে খট করে পায়ে না ঠেকিয়ে স্যালুট দিলে লরাকে।

সকলে হেসে ফেললে, লরাও না হেসে পারল না। হেসে সে বললে—তুমি বাঘ শিকার করেছ? সত্য কথা?

শিবাজী চলে গেল বসবার ঘরটায় এবং একটা মুণ্ড সমেত বাঘের চামড়া এনে মুখটা লরার সামনে ধরে বলল—এই দেখ!

লরা চীৎকার করে দেহটাকে কাত করে সরে এসে বলল—হাউ ডেঞ্জারাস ইউ আর, প্লিজ—প্লিজ—টেক্ ইট এ্যাওয়ে—প্লিজ—

হেসে শিবাজী বললে—জ্যান্ত নয় মরা!

লরা বললে—তা হোক। মনে হচ্ছে আমাকে খেয়ে ফেলবে! প্লিজ!

শিবাজী সরিয়ে নিয়ে সেটাকে ও ঘরে রেখে এল। তারপর বললে—সত্যিই বন দেখতে যাবেন নাকি খুনি?

রয় বললেন—যাব।

—রাত্রে না দিনে? মানে শিকার রাত্রে ভাল।

—শিকার করবার শখ নেই। আমি প্রায় ওল্ডম্যান। ওসব আপনি করুন, চন্দ্রশেখর চায়তো করুক। না কি বেয়াই মশাই?

কথাটা বললেন আমার বড় মামাকে।

বড়মামা হেসে বললেন—আমি কিন্তু শিকার দেখতে ভালবাসি।

রয় বললেন—আমার ভালবাসা ওতে নেই। আমি দিনেই দেখতে চাই বনটা। এবং সন্ধ্যাতে ফিরতেও হবে আমাকে। ভুলে এসেছি কাল মস্ত একটা কাজ আছে। অফিসের কাজ সব গুছিয়ে ভুলে গেলাম দেশের জমিদারীর কথা। মস্ত একটা নিলেম আছে আমাদের এজমালি সম্পত্তি নিয়ে নবাবী আমলের খান সাহেবদের সঙ্গে। এই নিয়ে তিনবার নিলেমের মুখে আমরা টাকা দিয়ে রক্ষা

করে এসেছি। এবার আর তা হতে দেব না। হোক নিলেম। আমি ডাকবার জন্য ডিটারমিনড। এসব ক্ষেত্রে নিজে না গেলে চলবে না। জমিদারী সেরেস্তার গমস্তা নায়েব, এদের অভ্যাস হল তহুরীর নামে দু পয়সা চার পয়সা ঘুষ খাওয়া। আমাদের আর এক শরিক আছেন তারা ধুরন্ধর মহাজন। তারা ঘুষ দিয়ে যদি ওদের মাঝখানে চুপ করিয়ে দিয়ে ডেকে নেয় তা হলে আপশোসের সীমা থাকবে না।

সন্ধ্যের মুখে বাংলোটার বারান্দায় বসে সিগারেট খাচ্ছিলাম আর ভাবছিলাম। বেলা নটার সময় হাতীর পিঠে বেরিয়ে জঙ্গলে অনেক ঘুরে ফিরে এসেছি প্রায় চারটের সময়। এসেই স্নান করে খেয়ে শ্বশুর রায় রওনা হয়ে গেছেন। গয়া গিয়ে ট্রেণ ধরে দেশের জেলার সদরে পেঁৗছুবেন কাল বেলা বারোটা নাগাদ। বড়মামা সঙ্গে গেলেন, তাকে ট্রেণে তুলে দেবেন। ষ্টেশন মাষ্টারকে বলে গয়া কোচে বার্থ রিজার্ভেশনের ব্যবস্থা করে দেবেন। রয় রেখে গেলেন আমাকে এবং নরাকে।

কাজ দিয়ে গেছেন। কাজ হল যে বড় সেগুন গাছগুলি আছে সেগুলি থেকে ভাল উৎকৃষ্টগুলিকে নাম্বারিং করতে হবে আলকাতরা দিয়ে এবং প্রত্যেক গাছের সব থেকে মোটা ডাল টুকরো কেটে নিয়ে তাতে সেই নাম্বার বসিয়ে দিতে হবে। তারপর সেই ডাল যাবে কলকাতায়; সেখানে গুণাগুণ বিচার হবে। এবং তা থেকেই অর্ডার দেওয়া হবে শিবাজীকে।

রায় মশায় বললেন—কিছু মনে করবেন না শিবাজীবাবু। আমি আটঘাট বেঁধে কাজ করতে চাই। বুঝলেন—মহারাজ ইঞ্জিনীয়ারদের দিয়ে কাঠের কোয়ালিটি এ্যাপ্রুভ করিয়ে নিতে চাই। বুঝেছেন?

—খুব গুড আইডিয়া খুনি—ভেরি গুড আইডিয়া।

—তাছাড়া যদি আপনার গাছের কোয়ালিটি ভাল হয় আমি ভাবছি সমস্ত গাছ কিনব। আপনাকে বলছিলাম পরশু, যে এই কোম্পানীটাকে খুব বড় ফার্ম করব আমি। হার্ডওয়্যার টিম্বার বিজনেস সব মিলিয়ে ফার্ম করব। বড় বড় বিল্ডিং ব্রিজ কণ্ট্রাক্ট নেব। বুঝলেন না? যদি পার্টনার হয়ে কাজ করেন—তাতেও রাজী আছি। মস্ত ক্যাপিট্যাল আপনার। আপনি এখানকার ইনচার্জ হয়ে থাকবেন। দরকার হয় ডায়নেমো বসিয়ে সয়িং মেশিন বসাব। লরী কিনব। চালান যাবে কাঠ!

—ওয়াণ্ডারফুল আইডিয়া—ওয়াণ্ডারফুল। শিবাজী লাফিয়ে উঠেছিল।

লরা বলেছিল—আমি এখানে থাকতে পারব না। আমি যাব।

রয় সাহেব চটে তার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন একেবারে খাস বাংলায়—খুকিপনা করো না লরা। খুকিপনা আমার ভাল লাগে না। এ করলে তোমাকে চাকরী ছাড়তে হবে, বুঝেছ!

লরা ম্লান হয়ে গিয়েছিল।

রয় তাকে এবার মিষ্ট কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন—ভয় কি তোমার? শিবাজীবাবু রইলেন, চন্দ্রশেখর রইল—এখানে একশো সওয়াশো ঘর কুলীরা রয়েছে—তাদের অনেকে কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে রয়েছে। তা ছাড়া তুমি তো বীরের জাত। ব্রিটিশ ব্লাড রয়েছে তোমার মধ্যে। তুমি ভয় পেলে চলবে কেন? কি ব্রেভ! দিন দুই থাকলেই কাজ হয়ে যাবে।

তারপর শিবাজীর দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—দেখবেন শিবাজীবাবু, দুদিনের মধ্যে কাজ যেন শেষ হয়ে যায়। কাল সকাল থেকেই লোক লাগাবেন। নাম্বারিং করবে একজন, একজন মিস্ত্রীকে দেবেন সে ভাল করাতে কেটে দেবে। ব্যাস সঙ্গে সঙ্গে তার নাম্বারিং করে নেবেন। হ্যাঁ, যা ডাল কাটা হচ্ছে এর একটা দাম আপনি পাবেন। আপনার ন্যায্য পাওনা। তার একটা বিলও করে দেবেন, কেমন?

—থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। মেনি-মেনি থ্যাঙ্কস, থাউস্যাণ্ডস থ্যাঙ্কস টু য়ু স্যার। ইউ আর এ ওয়াণ্ডারফুল বিজিনেস ম্যান স্যার। আমি তো আমার জীবনে দেখি নি খুনি।

ওঁরা চলে গেলে বারান্দায় বসে সিগারেট ধরিয়ে ভাবছিলাম—শিবাজীকে বলি—ইউ আর এ ওয়াণ্ডারফুল ইডিয়ট শিবাজী। আমি তো আমার জীবনে তোমার মত সরল বোকা ইডিয়ট দেখি নি!

লরা চুপ করে বসেছিল। সেও সিগারেট টানছিল। মধ্যে মধ্যে আমার দিকে তাকিয়ে অতিসূক্ষ্ম হাসি তার ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠছিল। ওই সূক্ষ্ম হাস্যরেখাই আমার মনের ঝাপসা দিগন্তে একটি আলোক রেখা পাত করে সেখানকার রহস্যের আভাস দিচ্ছিল।

তাতেই ওই কথা মনে হল আমার।

শিবাজী আমার বড় মামাকে এবং রায়কে এগিয়ে দিতে গিয়েছিল। খুব ভাল বয়েলগাড়ী—তার সঙ্গে কয়েকজন লোক সঙ্গে দিয়েছে সে। বেলা এখনও ঘণ্টা দেড়েক আছে এর মধ্যেই তারা বনের এলাকা পার হয়ে যাবেন।

লরা বললে—ইয়োর শিবাজীবাবু ইজ এ ডীয়ার। ইজন্ট ইট?—

বললাম—হ্যাঁ। বাট্—

আমি থেমে গেলাম। লরা বললে—কি ?

বললাম—একটু বেশি সরল ?

হেসে উঠল লরা।

একটা কোন জানোয়ারের বিকট উচ্চ শব্দে চমকে উঠলাম।

লরা হেসে বললে—ভয় করো না—বার্কিং ডীয়ার শাম্বার! সন্ধ্যেবেলা বেরুবার মুখে বাঘের গন্ধ পেয়েছে ডেকে সাবধান করছে অন্যদের। বস। বলে সে ঘরের মধ্যে গেল এবং কয়েক মুহূর্ত পরেই—একটা হুইস্কির বোতল এবং গ্লাস সোডা নিয়ে ফিরে এল।

লরা খায় আমি জানি। ডি-এনের কাছে শুনেছি। লরাও আমাকে বলেছে। কিন্তু এখানেও সে তার সঙ্গে এনেছে তা জানতাম না।

লরা গ্লাসে হুইস্কী ঢালতে ঢালতে বললে—তুমি খাও না। কিন্তু তোমার বন্ধু ?—

বললাম—জানি না। তবে—

আমার কথায় বাধা দিয়ে শিবাজীর উচ্চ কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

—ভাগনা! বাইরে থাকতো ঘরের মধ্যে যাও।

এই সময় বনের ওপাশে কুলী বস্তীতে ক্যানেস্তারা বাজতে লাগল।

লরা উঠে দাঁড়িয়ে বললে—মাই গড!

আমিও চমকে উঠে বললাম—কি ?

—টাইগার। নিশ্চয় বাঘ বেরিয়েছে।

—বাঘ ?

—শুনছনা ক্যানেস্তারা বাজাচ্ছে কুলীরা ? তার আগে বার্কিং ডীয়ার ডেকেছে। শিবাজীবাবু হেঁকেছে ঘরের ভিতর যাও—

শিবাজী এসে হাজির হল সেই মুহূর্তে এবং ঘরের মধ্যে গিয়ে তার বন্দুকটা এনে টোটা পুরে নলটা উপরের দিকে তুলে—পরপর কটা ফায়ার করল। বললে—তোমরা খুনি না থাকলে ভাগনা আজ বাঘটার পিছু নিতাম খুনি। বাঘ বেরিয়েছে।

লরা বললে—চল না। আমি সঙ্গে যাব।

—তুমি ?

—ই-য়ে-স। আমার বাবা চা বাগানে কাজ করতেন। ছেলেবেলা বাগানে বাঘ ঢোকা দেখেছি। আমি ভয় করি না, চল। নাও টেক এ গ্লাস।

হুইস্কি ঢেলে—সে গ্লাসটা তুলে ধরলে লরা।

পাঁচ

গ্লাসটা শেষ করে লরা বললে—তুমি খাবে না ?

শিব্বা হাসল একটু। হেসে বললে—এ ক'দিনে কি তুমি আমাকে খেতে দেখেছ ?

লরা হাতের খালি গ্লাসটা রাখতে রাখতে বললে—তা দেখিনি। তবে যদি খেতে—দেখতে কত ভাল লাগছে !

শিব্বা এবার জোরে হেসে উঠল। ঝড়ো বাতাসের মত হা হা হাসি থামিয়ে বললে—না খেয়ে এমনিতেই আমার এমনিই খুব ভাল লাগে। আমার বেশী ভাল লাগার জন্যে খুনি ও সব দরকার হয় না।

তারপর প্রসঙ্গ বদলে বললে—তা যাবে নাকি বাঘের পেছন পেছন ? ভাগনা, তুমি যাবে নাকি খুনি ?

আমি এতক্ষণ চুপ করেই বসেছিলাম। এবাব বললাম—মামা, তোমার মাথার গোলমাল হয়েছে !

—কেন ? কাহে এইসা বোলতা ভাগনা ?

—তা না হলে এই পড়তি বেলায় তুমি আমাকে আর লরাকে নিয়ে বাঘ শিকার করতে যাবার কথা বল !

—কেন ? বলব না কেন ? তুমি মর্দানা, জোয়ান বেটাছেলে, আর লরা তো বলছে ও ছেলেবেলায় চা বাগানে বাঘ ঢোকা দেখেছে ! ওর সাহস আছে !

আমি ও প্রসঙ্গে জল ঢেলে দিয়ে বললাম—আমি যত জোয়ান মর্দানাই হই আর লরার যত সাহসই থাক তোমাকে আর আমাদের নিয়ে এই পড়ন্ত বেলায় বাঘ শিকার করতে যেতে হবে না।

শিবাজী মেনে নিলে আমার কথা। বললে—বেশ, তোমার কথাই খুনি মেনে নিলাম ভাগনা ! কাল সকালেই যাব বাঘ শিকারে ! বুঝলে লরা, ছাট্স্ ফাইন্যাল !

লরার দেহের মধ্যে পানীয় তখন ক্রিয়া করছে। সে আদুরী মেয়ের মত বলে উঠল—দেন, ওন্ট্ ইউ গিভ মি ছাট ওয়াণ্ডারফুল অর্কিড !

আমি জানি না। তাই জিজ্ঞাসা করলাম—অর্কিড ? কোন্ ওয়াণ্ডারফুল অর্কিড ?

শিবাজী বললে—আমি একটা বেগুনে অর্কিডের কথা বলছিলাম লরাকে !

বললাম—অর্কিডও কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারবে!

এমন সময় আমাদের মনোযোগ অন্য দিকে আকৃষ্ট হতে বাধ্য হল। একজন মজুর এসে দাঁড়িয়েছে বারান্দার নীচে উঠোনে।

তাকে দেখে শিবাজী বললে—কিয়া রে চামারিয়া?

চামারিয়া কিন্তু-কিন্তু করে গভীর সংকোচের সঙ্গে বললে—হুজুর, বাচ্চি বহত বোতি হ্যায়!

শিবাজী মনে মনে বোধ হয় আমার কাছ থেকে বাধা পেয়ে চটে ছিল। সে হাতের বন্দুকটা লাঠির মত তুলে বললে—বাচ্চি রোতি হ্যায় তো হম কা করে? হম কিয়া ডক্টর হ্যায়?

চামারিয়া বললে—আপ এক দফে দেখতে তো আস্থা হোতা!

একটা খেলা হারিয়ে তার বদলে আর একটা খেলা পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে খুশী হয়ে উঠল শিবাজী। বললে—চল্, দেখি বাচ্চি কাহে রোতি হ্যায়।

তারপর বললে—দাঁড়া বন্দুকটা রেখে আসি!

ঘরের ভিতর বন্দুকটা যথাস্থানে রেখে বাইরে বেরিয়ে এসে সে বললে—সঙ্গে যাবে নাকি খুনি? ও ভাগনা?

লরাও উঠে দাঁড়াল। বললে—আই টু শ্যাল গো!

—কাম অন!

শিবাজী তখন নেমে পড়েছে উঠোনে বারান্দা থেকে।

চামারিয়া আগে আগে, তারপর শিবাজী, তারপর আমি, তারপর লরা।

খানিকটা যেতে যেতেই লরা আদুরে খুকীর মত হাত দিয়ে আমাকে ঠেলে আমার পিছন থেকে আগে এসে লাইনে ঢুকে গেল।

আগে যেতে যেতে শিবাজী পিছন ফিরে বললে—হোয়াট্‌স্ দ্যাট?

লরা হেসে বললে—একেবারে পেছনে আসতে ভয় লাগছিল, সেইজন্যে লাইনের ভেতরে ঢুকলাম!

শিবাজী হেসে বললে—এই সাহস নিয়ে তুমি বাঘ দেখতে যাবে বলছিলে? শেম্।

লরা তার কথা শুনে হাসতে লাগল। হাসতেই থাকল পানীয়ের প্রভাবে!

আমার বিরক্ত লাগছিল। এই অবস্থাতেই আমরা এসে পৌঁছুলাম চামারিয়ার বাড়ীতে!

চামারিয়ার বাড়ী!

বাড়ী আর কি! ভারতবর্ষের দীনতম মানুষ যেমনভাবে বাস করে সেই ধরনের

দীনতম আশ্রয়! জঙ্গলের ধারে ধারে এক নদী বয়ে গিয়েছে। তার ধারে ধারে বুনো উলুঘাসের অপর্যাপ্ত বাড়। সেই খড় ঘরের চালে; বনের ফালতু কাঠ আর লকড়ি দিয়ে তৈরী দরিদ্রের ঘর। ঘর নয়, ঝোপড়ি। সেই ঝোপড়ির সারি দুধারে। মাঝখানে সরু ধুলোভর্তি রাস্তা। সর্বক্ষণ ধুলো উড়ছে সেখানে। আমাদিকে নিয়ে সেই রাস্তায় চলতে চলতে শিবাজী অহঙ্কার করে বললে—দেখছ খুনি ভাগনা, কেইসা সহর বনায়া হাম্!

আমি হেসে বললাম—এই তোমার সহর? তা হলে তো খুবই বানিয়েছ দেখছি! শিবাজী সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সমর্থন করে বললে—এইসা কাহে বোলতা ভাগনা? শোনো তো, শিউজী মহারাজ ভি শহর বনায়া, ফোর্ট বনায়া। উ সব কি ইস্‌সে আচ্ছা থা? উ সব ভি তো ইসকে মাফিক গাঁও থা!

আমি বললাম—বেশ বাপু, তাই মেনে নিলাম। তা, তোমার এইসব কুলীরাই কি শিউজী মহারাজের মাওলা সৈন্য হবে না কি?

বিচিত্র মানুষ শিবাজী। সে অত্যন্ত গম্ভীরভাবে তার ডান হাতের তর্জনী তুলে নেড়ে নেড়ে বললে—ও কথাটি ব'লো না খুনি ভাগনা! এরাও আমার কাছে শিউজী মহারাজের মাওলাদের মত। এরা কারা জান? বেহারের সবচেয়ে জবরদস্ত আদমী এরা। এরা হল বেহারের দুসাদ, মুসহর আর কুর্মী! ওদের গায়ে যত জোর, মনে তত সাহস, আর মন তত ভাল!

হাঁটতে হাঁটতে এমন এক জায়গায় পৌঁচেছি যেখান থেকে একটা ঘরের ভিতর বাচ্চার কান্না শোনা যাচ্ছে। তার স্বরে ঝোপড়ির মধ্যে কাঁদছে একটি মেয়ে। শিবাজীর মনোযোগ আকৃষ্ট হল সে দিকে। সে চামারিয়াকে বললে—হম ঘরকে অন্দর না ঘুসব্। তুম্ তুমহারা জেনানাকি বুলাও।

চামারিয়া তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। কয়েক মুহূর্ত পরেই সে বেরিয়ে এল মেয়েকে কোলে নিয়ে। পিছন পিছন তাঁর স্ত্রী।

আমার বয়স তখন অল্প, বেশী নয়। তরুণ বয়েস আমার। তখনও চোখে নানান রঙের নেশা আছে। তখনও রূপ যদি শ্রী আর চারুতার পথ বেয়ে সামনে এসে না দাঁড়াত তো রূপকে চিনতে পারতাম না, পছন্দও হত না। রূপকে তার বাহ্যিক শ্রী ও চারুতা অতিক্রম করে নির্মুক্ত দৃষ্টি দিয়ে দেখার ক্ষমতা ছিল না। সব রূপকেই নিজের পছন্দসই চেনা রূপের মাপকাঠিতে মেপে, খতিয়ে দেখতে চাইতাম। কিন্তু চামারিয়ার দীন ঝোপড়ি থেকে যে দুজন বেরিয়ে এল, যাদের একজনের বয়েস পঁচিশ ত্রিশ, অন্যজনের চার পাঁচ কি ছয়, তাদের এখানে দেখবার প্রত্যাশা করিনি। আমার সেই কাঁচা বয়সের নেশা-ধরা চোখেও ধরা পড়ল দুজনেই

আশ্চর্য সুন্দরী। গয়া জেলার অজানা জঙ্গলের ধূলোর উপরে দুপাশে উলুখড়ে ছাওয়া দরিদ্র কুটীরের পটভূমিতে, মলিন পরিচ্ছদে ঢাকা মূর্তি দুটিকে দেখেও তাদের আশ্চর্য রূপকে চিনতে ভুল হল না। যেটা সবচেয়ে আমাকে অবাক করেছিল তা হল তাদের গায়ের রঙ। একেবারে যাকে 'অতসী পুষ্প বর্ণাভ্যাং' বলে তাই। অথবা দেহাতি উপমা দিলে বলতে হয় পাকা গেহুঁর মত। আর তেমনি কি চোখ মুখের বাহার! মনে হল জায়গাটা ওদের দুজনের আবির্ভাবে আলো হয়ে উঠল।

আর এ অভিজ্ঞতাটা শুধু যে একা আমারই নয়, আমাদের সকলের, সেটা লরার কথায় প্রকট হয়ে পড়ল। লরাই আমাকে বললে—ডু ইউ সি মিঃ ব্যানার্জী, হাউ হ্যাণ্ডসাম বোথ দি মাদার এণ্ড দি ডটার আর! মা-মেয়ে দুজনেই কি সুন্দর দেখেছ?

শিবাজীও বোধহয় এ খবরটা জানত। কিন্তু সে বিচিত্র মানুষ! তার সে সম্পর্কে যেন কোন মাথা-ব্যথাই নেই! সে স্বভাবমত হল্লা করে চেঁচিয়ে উঠল—আব তো বাতাও কিয়া হুয়া লড়কিকি।

কোলের পাঁচ ছ' বছরের মেয়েটার দিকে চেয়ে বললেও কথাটা সে বললে মেয়ের মাকে। মেয়ের মা বোধহয় শিবাজীকে ভাল করেই চেনে। শিবাজীর গাঁক-গাঁক করা প্রশ্নের উত্তরে সে একটু হেসে নিজের ময়লা ঘোমটাটি একটু বেশী করে মাথার উপর টেনে দিলে। তাতেও তার সুন্দর মুখখানি অনাবৃতই থাকল। বুঝলাম শিবাজীকে ওর লজ্জা নেই।

মেয়ে তখনও কোলে। শিবাজী হৈ হৈ করে বললে—কেয়া চামারিয়া, তুম তো বোলতা তুমহারা লেড়কি সুরসতিয়া বহত রোতি হ্যায়। কাঁহা, রোতি তো নেহি। তুম কাহে তুমহারা লড়কিকি নাম মে ঝুটমুট বোলা? বাতাও কাহে বোলা! নহি তো হম তুমকো মারকে জান নিকল লেঙ্গে!

চামারিয়া, চামারিয়ার স্ত্রী আর চামারিয়ার মেয়ে সবাই অল্প অল্প হাসতে লাগল তার কথা শুনে। চামারিয়া বললে—কিয়া, হম ঝুট বোলা আপকো? দেখিয়ে লেড়কিকি আঁখসে আঁসু নিকলা কেইসে!

চামারিয়ার কথা মিথ্যে নয়। কারণ দেখলাম মেয়েটির সুন্দর মুখে বড় বড় দুটি চোখের নীচে দুটি জলের ধারা তখনও জায়গায় জায়গায় চিক চিক করছে। শিবাজী কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি তার বাঁ হাত দিয়ে চোখের থেকে ঝরে-পড়া, গালের উপরের জল মুছতে লাগল। মুছে যেন প্রমাণ করবার চেষ্টা করলে সে কাঁদেনি।

মেয়ের মা মেয়ের কাণ্ড দেখে হাসতে লাগল। বললে—দেখিয়ে উসকি কাম দেখিয়ে! আভি তক তো বহত রোতা শোর মচা কর। আব আপ আঁতে হেঁ হি শুন কর তো রোনা একদম বন্ধ্ কর দিয়া। আভি দেখিয়ে কেইসা আঁম্ন সাফা করতি হ্যায়!

আমরা সবাই বাচ্চা মেয়েটার কাণ্ড দেখে কৌতুক বোধ করে হাসছিলাম। এমন কি লরা যে লরা, সেও হাসছিল। হাসছিল না কেবল ছোট্ট মেয়েটা। সে তার বাঁ হাত মুঠো করে মায়ের কোলে থেকেই মায়ের পিঠে একটা কিল বসিয়ে দিলে। তারপর তার বড় বড় নীলাভ চোখেব খয়েরী তাবায় রাগ ফুটিয়ে মায়ের দিকে চেয়ে রইল।

শিবাজী বললে—কই দেখি কি হয়েছে? আ যাও চামারিয়া, দেখলাও কিয়া হুয়া!

চামারিয়া শশব্যস্ত হয়ে মেয়ের কাছে সরে এসে তার ডান হাতখানি সযত্নে ধরে শিবাজীর সামনে রাখলে।

ডান হাতখানাব কব্জিটা ফুলে আছে। বেশ খানিকক্ষণ দেখলে শিবাজী। তারপর পাকা ডাক্তারের মত তার হাতের ফুলো জায়গাটায় নিজের দুটো শক্ত শক্ত মোটা আঙুলের টিপ দিলে। দেখলাম মেয়েটার মুখখানি যন্ত্রণায় সাদা হয়ে গেল। তবু সে সহ্য করতে লাগল মুখ টিপে। তার মুখের চেহারা দেখে বুঝলাম মেয়েটার যন্ত্রণার পরিমাণ। আমি শিবাজীকে বললাম—মামা সাহেব, অত জোরে টিপো না, দেখছ না ওর বড্ড লাগছে!

শিবাজী মহারাজ নির্বিকার। সে আরও জোরে জোবে ফুলো জায়গাটা টিপতে টিপতে বললে—আরে ভাগনা, সুরসুতিয়ার হিম্মত বহত। ও দুসাদিন! চামারিয়ার বেটি! ওর লাগলেও ও সহ্য করতে পারে!

তারপর সুরসুতিয়ার মুখের দিকে চেয়ে বললে—কি রে সুরসুতিয়া, লাগছে?

ঠোঁটে ঠোঁট টিপে সুরসুতিয়া সজোরে ঘাড় নেড়ে জানালে—না, তার লাগছে না। হাতে কব্জীর কাছে ফোলা জায়গাটায় টেপাটিপি করে যথেষ্ট পরিমাণ ডাক্তারী পরীক্ষা করে ঘাড় নেড়ে শিবাজী নিজের অকপট অন্তরের ভাবটি প্রকাশ করে বললে, আমাকেই আস্তে আস্তে বললে—বুঝলে ভাগনা, কিছু খুনি বুঝতে পারছি না!

আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম বুঝবার বিশেষ কিছু নেই। বাচ্চা মেয়ে, কোন ভাবে অসাবধানে ছুটোছুটি করতে গিয়ে খানিকটা চোট লেগে জায়গাটায় ব্যথা হয়েছে, ফুলেছে। শিবাজীর দারুণ গম্ভীর পরীক্ষা ও হতাশা দেখে আমার

হাসি আসছিল। শিবাজীবই মত। তার সমস্ত চলাফেরায় কেমন একটা অত্যন্ত 'হাই সিরীয়াস' ব্যাপার আছে, যা সামান্য বুদ্ধিওয়ালা লোকের মনেও হাসির আমেজ আনে, অথচ যে হাসি মুখে প্রকাশ করা যায় না তার সামনে। আমিও হাসি চেপে তাকে সহজভাবেই বললাম—বুঝলে মামা সাহেব, বাচ্চাটার হাতে কোথাও অজান্তে লেগে মচকেছে, ফুলেছে। ভয়ের কিছু নেই।

শুনেও শিবাজী হতাশভাবে ঘাড় নেড়ে জানালে—না। ব্যাপারটা বেশ সিরিয়াস, বুঝলে খুনি ভাগনা। তাবপব বাজা-বাদশাব মত পিছন ফিরে শিবাজী মহাবাজ হাঁকলেন—এ চামারিয়া!

চামারিয়া হাজির হাতের কাছেই। সে হাত জোড় করে সাড়া দিলে—হোজৌর!

সঙ্গে সঙ্গে একসঙ্গে বাদশাহী আর মিলিটারী হুকুম—চলা যাও বাংলোমে! নোকরকো পাশসে দাওয়াইকা বাক্সা আউর কিতাব আউব আইডিনকা বোতল লে কর চলা আও! সমঝা!

দৌড়ুল চামারিয়া।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবাব পিছন থেকে হায়দারী হাঁক—শুনো, এ চামারিয়া!

ফিরল চামারিয়া।

শিবাজী জিজ্ঞাসা কবলে—কিয়া কিয়া লাওগে?

—দাওয়াইকা বাক্সা আউব কিতাব আউর আইডিংকা বোতল!

শিবাজী খুশী। তার পিঠে চাপড় মেরে বললে—ব্যস, বহত খুব, দৌড়কে যাও। চামারিয়া ছুটে চলে গেল। সমস্ত ব্যাপারটা যতই হাস্যকর হোক সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে চামারিয়ার শিবাজীর প্রতি আন্তরিক আনুগত্যটিকে স্পষ্ট অনুভব করলাম।

আমরা সবাই চুপ কয়েক মুহূর্তের জন্য। এখন হাতে কাজও নেই, মনেও কোন কথা নেই। চোখ তুলে চাইলাম। ঝোপড়ির উপর দিয়ে দৃষ্টি চলে গেল বড় বড় গাছেব কাণ্ডের ফাঁকে ফাঁকে অরণ্যের মধ্যে। পড়ন্ত দিনের আলো টুকরো টুকরো সোনার গয়নার মত ছড়িয়ে আছে বনের ঘাসের উপর এখানে সেখানে। প্রায় কোন শব্দ নেই। তবু বসতির শেষ প্রান্তে বাঘের ভয়ে পেটানো ক্যানেস্তারা বাজনা শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। বসতির এখান ওখান থেকে মানুষের গলার সাড়া উঠছে মধ্যে মাঝে। তবু এইসব টুকরো টুকরো শব্দের আড়ালে রয়েছে অগাধ নৈঃশব্দের অনন্ত বিস্তার, যার প্রকাশ ছেদহীন এক ঝিল্লী-ঝঙ্কারের মধ্য দিয়ে। প্রাণ জগতের এইসব টুকরো টুকরো শব্দের অন্তরালে

এই ছেদহীন নৈঃশব্দকে অনুভব করতে করতে যেন একই সঙ্গে অনন্ত নৈঃশব্দ এবং অন্তহীন কালকে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করতে থাকলাম।

বেশ নিবিষ্ট হয়ে গিয়েছিলাম নিজের অনুভবে। হঠাৎ আমার বাহুতে একটা ইঙ্গিতময় স্পর্শ অনুভব করলাম। নিবিষ্টতা ভেঙে গেল। একটু বিরক্তও হলাম। চমকে চেয়ে দেখলাম লরা আমার কাছে সরে এসে সন্তর্পণে আমার হাতে টিপ দিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হাসছে। আমি একটু বিরক্তই হয়েছিলাম। জিজ্ঞাসা করলাম মৃদুস্বরে—হোয়াট? কি ব্যাপার?

আমার বিরক্তিকে বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য না করে সে আমার কানের কাছে ফিস্ ফিস্ করে বললে—জাষ্ট লুক এ্যাট হার!

হার? কে? এখানে তো দুজন 'হার' আছে। মা আর মেয়ে। লরা কার কথা বলছে? আমি স্বভাবতই যে মনোযোগ দেবার পাত্রী তার দিকেই তাকালাম। পরিপূর্ণযৌবনা সুন্দরী নারীটির দিকে। কিন্তু সেখানে দেখার মত কিছু তো পেলাম না। শুধু দেখলাম এই পড়ন্ত বেলায় দুজন পুরুষ ও একজন মেমসায়েবের সামনে বাক্যহীনভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে সে কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত ও অপ্রতিভ বোধ করছে। তা তো স্বাভাবিকই। কারণ এই তিনজনের মধ্যে দুজন তার অপরিচিত আর তৃতীয়জন তার মহামান্য মনিব।

আমার ভুলটা ধরতে পেরে লরা আবার হাতে টিপ দিলে, ফিস ফিস করে বললে—নো, নট দেয়ার। লুক এ্যাট দি ফেস অব দি ইয়াংগার ওয়ান। ওখানে নয়, বাচ্চাটার মুখের দিকে চেয়ে দেখ।

আরও বিরক্ত হলাম। যদি মানুষের মুখের দিকে চেয়ে দেখার কিছু থাকে সে তো থাকে সর্বাগ্রে সুন্দরী যুবতী নারীর মুখেই। পাঁচ, ছ' বছরের বাচ্চার মুখে সৌন্দর্য দেখতে পান দার্শনিকরা। তা আমি তো আর দার্শনিক নই। তবু লরার কথায় আমি সুরসুতিয়ার মুখের দিকে চাইলাম।

চেয়ে যা দেখলাম তাতে খানিকটা অবাক লাগল বই কি! দেখলাম বাচ্চা মেয়েটা তার মায়ের কোল থেকে তার বড় বড় নীলাভ চোখের দুটো খয়েরী তারায় যেন আগুন জেলে এক দৃষ্টিতে শিবাজী মামার মুখের দিকে চেয়ে আছে! অদ্ভুত! মেয়েটা কেন চেয়ে আছে অমনভাবে শিবাজীর মুখের দিকে? ওকি শিবাজীর ওর হাতের উপর সজোরে টিপে পরীক্ষা করার জন্য ব্যথা পেয়ে তারই যন্ত্রণায় ওর মুখের দিকে অমনভাবে চেয়ে আছে? কেন কে জানে?

কিন্তু যার দিকে চেয়ে আছে সে কিন্তু নির্বিকার। সে আমাদের দিকে পিছন ফিরে বাংলোর দিকে চেয়ে দেখছে চামারিয়া ফিরছে কিনা! আমরাও চাইলাম

রাস্তার দিকে শিবাজীর দৃষ্টি অনুসরণ করে। চামারিয়ার চিহ্ন নেই। শিবাজী বিড বিড় করে উঠল—বুদ্ধু কঁহাকা। যাঁহা যায়েগা কামমে হুঁয়োই দের করেগা!

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই দেখা গেল চামারিয়া আসছে দৌড়ুতে দৌড়ুতে। তখন নিশ্চিন্ত হয়ে শিবাজী স্বরস্বতিয়া আর তার মায়ের দিকে ফিরে চাইল। স্বরস্বতিয়াকে বললে—স্বরস্বতিয়া, দেখতা, তেরি বাপ আতা হ্যায়!

স্ববস্বতিয়া দেখলাম, তেমনিভাবেই ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল। শিবাজীর কথায় তার মুখের এক চুল এদিক ওদিক হল না, কিম্বা চোখের খয়েরী তারার দীপ্তি কিছুমাত্র কমল না। কি মনে হল শিবাজীর, সে হেসে বললে—কিয়া রে, কুছ বোলতি নহি কাহে? হাঁথ কি দর্দ বহত হ্যায় কিয়া?

মেয়েটা আবার সজোরে ঘাড় নাড়ল। যার অর্থ বেশী ব্যথা নেই।

শিবাজী হেসে তার মাথার রুখু চুলে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললে—তব দেখ লে হম কিতনে বড়া ডাক্‌দর হ্যায়!

তারপব খানিকটা আত্মগতভাবে আবার খানিকটা আমাকে যেন শুনিয়েই বললে—দাদোজী থাকলে খুনি, খুব ভাল হত খুনি ভাগনা! আমি কি আর জানি কিছু! আমাকে আবার বই দেখতে হবে!

তারপর আমার দিকে চেয়ে বললে—জানই তো পড়তে আমার কত তকলিফ হয়, কত কষ্ট হয়! আমার খুনি ওসব পোষায় না!

চামারিয়া এসে হাজির হল গন্ধমাদন নিয়ে। হোমিওপ্যাথি ওষুধের বাক্স, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার বই আর আইডিনের শিশি। দেখে শিবাজী বললে—বহত খুব। সব ঠিক ঠিক লায়া।

তারপর স্বরস্বতিয়াকে সে হঠাৎ বললে—নহিরে, তেরি বাপ, এহি চামারিয়া বুদ্ধু নহি হ্যায়।

এতক্ষণে হাসল মেয়েটা। হেসেই, হাসির লজ্জায় মায়ের পিঠে মুখ লুকোল।

তারপর সে এক কাণ্ড। স্বরস্বতিয়ার চিকিৎসা পর্ব আরম্ভ হল।

এ ঝোপড়ি ও ঝোপড়ি থেকে কয়েকটা ছোট ছোট চারপাই এল। আম্‌রা সব বসলাম তাতে। একটা চারপাই টেবিলের কাজ করলে। তার ওপর বই রেখে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন আরম্ভ হল শিবাজীর।

শিবাজী ব্যতিব্যস্ত হয়ে আমাকে বললে—তুমিও একটু খুনি হাত লাগাও তো ভাগনা। দেখতো কি দাওয়াই দেওয়া যায়।

অনেক গবেষণার পর ওষুধ আবিষ্কৃত হল। আর্নিকা থার্টি।

ওষুধটা শিবাজী চটপট বের করে ফেললে বাক্স থেকে। বুঝলাম শিবাজী এ সব ব্যাপারে খুব সিরিয়াস। শিবাজী ডাক্তার নয়, আসল ডাক্তার হলেন আমার মামা, শিবাজীর দাদোজী। কিন্তু শিবাজী পাকা কম্পাউণ্ডার।

কিন্তু ওষুধ দিতে গিয়ে আর এক বিপত্তি।

যে আর্নিকা থার্টির শিশিটি বের হল সেটির ওষুধ তরলাবস্থায় রয়েছে। গ্লোবিউল হলে চুকে যেত; চার পাঁচটা বড়ি মেয়েটার মুখে ফেলে দিলেই চুকে যেত। এবার জলের সঙ্গে এক ফোঁটা ওষুধ দিয়ে মেয়েটিকে খাওয়াতে হবে। শিবাজী সঙ্গে সঙ্গে হুকুম দিলে—বর্তন আউর পানি লাও!

সঙ্গে সঙ্গে ঝোপড়ির ভিতর থেকে চকচকে পিতলের লোটা-ভর্তি জল এসে হাজির। আনলে চামারিয়া।

দেখে চীৎকার করে উঠল শিবাজী—আরে, ইসমে কিয়া হোগা? ঐ বর্তন নহি চলেগা! আউর ই লড়কি কিয়া এক লোটা দাওয়াই পিয়েগী?

তাবপর আরও উচ্চকণ্ঠে চীৎকার—ফিন যাও বাংলোমে। চা পিনেকো এক কাপোয়া লে আও!

আবার দৌড়ুল চামারিয়া। আবাব কিছুক্ষণের বিরতি। আবার সেই নিঃশব্দতা, কালের ঝিল্লীঝংকৃত পদধ্বনি। তারই পৃষ্ঠপটে আমরা ক'টি মানুষ জীবনের নাট্যলীলার আসরে নেমেছি। আমি এখানে একটি পার্শ্বচরিত্র মাত্র। এই মুহূর্তে মূল নায়িকা ওই বাচ্চা মেয়েটি, যে মায়ের কোলে হাতের যন্ত্রণায় কাতর হয়েও সে যন্ত্রণা সহ্য করে শিবাজীর মুখের দিকে চেয়ে আছে। সেখানে কি নাটক অভিনীত হয়ে কোন্ রস উৎপন্ন হচ্ছে তা বুঝতে পারছি না।

সেই বিকেলের পড়ন্ত রোদ, সেই শান্ত স্তব্ধ অরণ্য, সেই রাশি রাশি ধুলো, এরই মধ্যে চামারিয়া আবার এসে হাজির হল এক কাঁচের কাপ হাতে। তাতে আধ কাপ 'পানি' ঢালা হল। তারপর বেশ অভ্যস্ত হাতে শিবাজী সেই কাপে দু ফোঁটা ওষুধ ঢেলে দিলে। তারপর কাপটার মাথায় হাত চাপা দিয়ে কাপটা চামারিয়ার হাতে দিয়ে বললে—এইসে পাকড়ো!

তাবপর দু' হাত বাড়িয়ে দিলে মেয়েটির দিকে। সস্নেহে বললে—আ যাও!

অবাক কাণ্ড! কি লজ্জা পাঁচ বছরের মেয়েটার! সে মায়ের কোলে মুখ লুকোল। কিন্তু শিবাজী আর কিছুতে না হোক, মুখের প্রতাপে সাক্ষাৎ শিবাজী মহারাজ! সে এক ধমক দিয়ে মেয়েটাকে তার মায়ের কোল থেকে কেড়ে নিজের কোলে টেনে নিলে। তারপর তাকে নিজের কোলে টেনে বসিয়ে বললে—আব দাওয়াই পি লে সুরসুতিয়া!

স্বরস্বতিয়া কিন্তু চামারিয়া নয়, চামারিয়ার স্ত্রীও নয়। সে সোজা মেয়ে নয়। সে শিবাজীর কোলে বসেছে বটে, কিন্তু মুখ নীচু করে মুখ লুকিয়ে আছে। কিছুতেই সে মুখ তুলবে না। শিবাজী দু' একটা ধমক দিয়ে শেষে অনুনয় বিনয় করতে লাগল।

আমার ভাল লাগছিল না।

ঠিক এই সময়েই শিবাজীর বাংলো থেকে নোকর এসে হাজির হল। আমরা আসবার আগে চায়ের কথা বলে এসেছিলাম। নোকর খবর নিয়ে এসেছে, চা তৈরী। শুনেই আমি বললাম—মামা, আমি বাংলোয় যাচ্ছি। চায়ের জন্যে মন কেমন করছে!

লরাকে বললাম—কি লরা, যাবে না কি? না, এখানেই থাকবে?

লরা বলল—না, চল, আমিও খুব 'থার্ষ্টি'। চায়ের তেষ্টা পেয়েছে।

শিবাজী বিব্রত হয়ে বললে—তোমরা চল খুনি, আমি যাচ্ছি। কিন্তু ভাগনা, তুমি দেখছ খুনি, মেয়েটা কি রকম জেদী! তোমরা চল, আমি ওকে ওষুধটা খাইয়ে খুনি, এখুনি যাচ্ছি!

আমরা চলে এলাম। চা তৈরী ছিল। গয়ার অরণ্যে মোষের জলহীন খাঁটি দুধে সিদ্ধ চা! সুপ্রচুর চিনি, আদা, লবঙ্গ সহযোগে তৈরী। একাধারে খাদ্য ও পানীয়! বাংলোর বারান্দায় বসে আরাম করে সেই চা উপভোগ করছিলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এল শিবাজী। আমার চোখে চোখ পড়তেই সে বললে মেয়েটাকে ওষুধ খাওয়াতে খুনি কি কষ্ট! শেষে একটা খুনি চাপড় মারলাম, তবে খেলে!

হঠাৎ লরা চায়ের কাপ হাতে লাফিয়ে উঠল—ওঃ, হাউ ফাইন! কি সুন্দর! কোথায় পেলে তুমি?

তাকিয়ে দেখলাম। শিবাজীর হাতে একটি অর্কিডের ফুল। একটা লম্বা ডাঁটিতে সারিবন্দী বেগনী ফুল! লরার ঔৎসুক্য ও উৎসাহই যেন অর্কিডের সম্পর্কে আমার চোখ খুলে দিলে। বিকেল বেলার ছায়া-ঢাকা, এই আঁধার-আঁধার, নির্জন বিষণ্ণতায় যেন এক নতুন সুরের ছোঁয়া লাগল। লরা শিবাজীর হাত থেকে ফুলটি প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে বাংলো থেকে ছুটে নেমে চলে গেল বাংলোর সামনে উঠোনে, যেখানে বড় বড় মুনি-ঋষিদের মত প্রাচীন শিরীষগাছ-গুলোর কালো কালো বিশাল বিস্তারের ফাঁক দিয়ে জায়গায় জায়গায় তখনও সোনার কুচির মত রোদের টুকরো এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে। উঠোনে

দাঁড়িয়ে লরা তার হাতের ফুলটি সেই সোনা-সোনা রোদের মধ্যে মেলে ধরলে। সঙ্গে সঙ্গে একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতা হল আমার। মনে হল সারা জায়গাটা যেন হেসে উঠল। আর সেই আলোয়-হাসা বেগনী ফুলটি যেন এই সমস্ত দৃশ্যপট, এখানকার মানুষজন সবাইকে ছাপিয়ে উঠে এই সমগ্র দৃশ্যপটের আনন্দময় কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়াল।

আমি ছুটে নেমে গিয়ে কিশোর বালকের মত উৎসাহিত হয়ে লরার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। বালকের মত আনন্দ প্রকাশ করে লরার কথারই পুনরুক্তি করলাম —সত্যি, কী সুন্দর!

তার আনা সামগ্রী আমাদের সমূহ আনন্দের উৎস হয়ে উঠেছে দেখে শিবাজীও প্রবল উৎসাহে উৎসাহিত হয়ে আমাদের কাছে এসে দাঁড়াল। তার মস্ত খসখসে মুখে এক মুখ হেসে সে বললে—কি ভাগনা, বল খুনি, কেমন জিনিষ এনেছি! বল আমার আচ্ছা টেষ্ট আছে কি না!

লরাকে বললে—দিস ইজ দি ভ্যারাইটি অব অর্কিড আই স্পোক টু ইউ! এই অর্কিডের কথাই বলেছিলাম তোমাকে।

তা স্বীকার করতেই হল! করলামও। কিন্তু এই অর্কিড তো আর সে সংগ্রহ করেনি। করেছে অন্য কেউ। এতে আমার এই পাতানো মাতুলের গৌরবটা কোথায় সে প্রশ্ন আর তুললাম না। শুধু জিজ্ঞাসা করলাম—মামাজী, এ অর্কিড তুমি কোথা থেকে পেলে?

মামাজী উৎসাহিত হয়ে বললে—আরে আমাদের ল্যাংড়া হরিয়া কোথা থেকে নিয়ে এসেছিল খুনি!

একটু থেমে শিবাজী বললে—আমাদের ল্যাংড়া হরিয়া বহত মজাদার আদমি। আমার এই জঙ্গলে কোথায় কোন্ গাছ আছে, কোন্ গাছে কোন্ ফুল আছে অর্কিড আছে, কোন্খানে কোন্ চিড়িয়া আছে, কোন্ জানোয়ার আছে কোন্খানে, এ সব খবর ও খুনি খুব ভাল করে রাখে। ও তো আদমিই নয়, ও এই জঙ্গলে থেকে থেকে ল্যাংড়া হরিয়াও জানোয়ার কি চিড়িয়া বনে গিয়েছে!

লরা আদুরীর মত বললে—নাউ, হোয়াট শ্যাল আই ডু উইথ দিস্ ওয়াণ্ডারফুল থিং?

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—কেন, কি আবার করবে? ঘরে কাঁচের গ্লাসে জলে ওর কাটা ডাঁটিটা ডুবিয়ে রেখে দেবে!

—বাট! লরা খেদে অস্থির হয়ে উঠল—বাট ইট উইল উইদার এ্যাওয়ে ইন দি মর্নিং! কাল সকালেই তো এটা শুকিয়ে যাবে!

এ আবার কি রকম কথা! কোন্ আজগুবী কথা! বললাম—ফুলের তো ওই মজা! আজকের ফুল কালকে শুকিয়ে যাবেই! এই নিয়ম!

তাতেও লরার খেদ!

শিবাজী স্বভাবেই 'শিভ্যাল্‌রাস' আদমি, তার 'শিভ্যাল্‌রী' জেগে উঠল। সে লরার হাত থেকে ফুলটি নিয়ে বললে—গিভ ইট টু মি খুনি! আমাকে দাও। এ্যাণ্ড খুনি ইউ উইল সি নেক্‌স্‌ট মর্নিং দ্যাট ইট্‌স্‌ জাষ্ট দি সেম! আমি এমন ব্যবস্থা করব যে দেখবে কাল সকালেও যেমনকার তেমনি থাকবে!

লরার খুকী-খুকী আবদারের অন্ত নেই। সে খুন খুন করে বললে—বাট, দি ডে আফ্‌টার টু-মরো? কাল না হয় থাকল, কিন্তু পরশু? পরশু তো শুকিয়ে যাবে? পচে যাবে?

—তা যাবে। শিবাজীর মত শিভ্যাল্‌রাস মানুষকেও স্বীকার করতে হল। তাকেও বলতে হল—ফুলকে চিরজীবী করার ক্ষমতা তার নেই।

সঙ্গে সঙ্গে নতুন প্রশ্ন—দেন? ক্যান ইউ নট গিভ মি নিউ ফ্লাওয়ারস্‌ লাইক দিস্‌? তুমি আমাকে এমনি নতুন ফুল এনে দিতে পারবে না?

শিবাজী বললে—লেট মি সি খুনি! দেখছি দাঁড়াও!

বলতে বলতে সে নোকরকে বললে—যাও তো বেটা, একদফে ল্যাংড়া হরিয়াকে বুলাকে লাও! জলদি যানা। সমঝা?

আমি শিবাজীর কথায় হাসলাম একটু। শিবাজীর সবই জলদি জলদি।

হঠাৎ আবার নতুন কথা মনে পড়ল শিবাজীর। সে তার চলমান সেবককে ফেরালে। বললে—বেটা, এক কাম ভুল গয়া! করকে যাও! এক সিসাকে গিলাস, থোড়া পানি আউর থোড়া নিমক দে যানা।

গিলাস, পানি আউর নিমক এল। নোকর চলে গেল ল্যাংড়া হরিয়াকে ডাকতে। শিবাজী পড়ল জলভর্তি গেলাস আর নুন নিয়ে। প্রথমেই জলের গেলাসটা সে অর্ধেক খালি করে দিলে, তারপর হাতের নুনটা জলে ফেলে দিলে। তারপর গেলাসটা রেখে দিলে লরার খাটের পাশে খবরের কাগজ-ঢাকা টেবিলটার উপর।

লরা জিজ্ঞাসা করলে—হোয়াট উড ইউ ডু? কি করবে গ্লাসটা নিয়ে?

শিবাজী গম্ভীরভাবে বললে—খুনি ইউ নো নাথিং! কিছুই জান না দেখছি!' আমি তোমার অর্কিডকে দীর্ঘতর জীবন দেবার ব্যবস্থা করছি।

লরা হাততালি দিয়ে বললে—ও, হাউ ফাইন!

শিবাজী লরার পাশে রাখা ফুলটি তুলে সেটিকে গ্লাসের জলে ডুবিয়ে দিলে! বললে—নাউ সি।

আমরা সবাই সেই পুষ্পশোভার দিকে চেয়ে রইলাম।

ছয়

বাইরে অন্ধকার নেমে আসছে। ঘরের ভিতর থেকে দেখতে পাচ্ছি বারান্দার নীচে উঠোনে যে রোদের সোনার টুকরোগুলো পড়েছিল সেগুলো কে যেন কুড়িয়ে নিয়ে একটা বিশ্বব্যাপী কালো ঝোলার মধ্যে লুকিয়ে ফেললে। তারপর সেই কালো ঝোলাটা টাঙিয়ে দিলে আমাদের চোখের সামনে। তারই মাঝখানে পায়েব শব্দ শুনলাম। পায়ের শব্দের সঙ্গে একটা ঠক ঠক লাঠির শব্দ।

শিবাজী বললে—আ যাও বেটা হরিয়া!

দরজার ওপাশ থেকে আধো অন্ধকারের মধ্যে ঠক ঠক করে লাঠির শব্দ হল। পরক্ষণেই ঘরের ভিতর ঢুকল ল্যাংড়া হরিয়া। ঠিক এই মুহূর্তেই চাকর ঘরের ভিতর বাতি দিয়ে গেল। কেরোসিন বাতির আলোয় দেখলাম একটি মাঝবয়সী, বেঁটেখাটো লোক, এক পায়ে কাঠের পা, বগলে ক্রাচ, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। দীনদরিদ্র মানুষ, মাথায় কাঁচাপাকা চুল, মুখে খোঁচা খোঁচা প্রায়-পাকা দাড়ি, বড় বড় লালচে ঘোলাটে চোখ, চোখে নির্বোধ বিনীত দৃষ্টি। পরণে হাঁটু পর্যন্ত ময়লা কাপড়, গায়ে বোধহয় একটা ফতুয়া-টতুয়া আছে। বোধহয় বললাম এইজন্যে যে একখানা ময়লা সুতী চাদরে তার বুক-পিঠ ঢাকা। সে ক্রাচে ভর দিয়ে দু' হাত জোড় করে প্রথমে শিবাজীকে, পরে আমাদের দুজনকে জনে জনে নমস্কার করলে। তারই সঙ্গে মুখে প্রতিবারই বললে—সেলাম হুজুর।

লোকটি শুধু নির্বোধ এবং বিনীতই নয়। অত্যন্ত ভীরুও। অন্তত আমার তাই মনে হল। মনে হল যেন যখন বাইবেলে 'when the meek shall inherit the earth' বলে প্রশ্ন করা হয়েছে তখন বোধ হয় meek বলতে এমনি সব মানুষদের কথাই বলা হয়েছিল।

শিবাজী বললে—কি করছিলি রে হরিয়া?

ক্রাচটা আস্তে আস্তে মেঝেতে শুইয়ে দিয়ে সে আস্তে আস্তে এক মুখ হেসে বললে—কুছ ন হুজুর! কিছু না হুজুর! সুরস্থতিয়া 'গপ্' শোনার জন্যে বায়না করছিল!

শিবাজী হেসে বললে—ও লেড়কি তো তোর সব 'গপ্ই' শুনেছে আমাদের মত। তা আজ আবার তোর কোন্ পুরনো 'কিসসা' শুনতে চাচ্ছিল?

ল্যাংড়া হরিয়া খুব বিনীতভাবে বললে—ওই আমার পা-টা গেল কি করে তাই আবার শুনতে চাচ্ছিল।

লরা বাংলা বলতে পারে না, কিন্তু বুঝতে পারে। সেও সানুকম্প দৃষ্টিতে চেয়েছিল হরিয়ার দিকে। সে বললে—ও, হি ইস সাচ এন আম্বল্ ম্যান! সো স্যুইট! কি বিনীত আর ঠাণ্ডা মানুষটা!

শিবাজী সোৎসাহে বললে—ও, তুমি তাই ভাবছ? ভাবছ ও একজন ঠাণ্ডা, ভীতু লোক?

—দেন? হোয়াট ডু ইউ মীন? কি বলছ তুমি?

—বলছি ও একজন দুর্দান্ত সাহসী লোক। গয়ার এই বনটাই হল ওর পৃথিবী। এইখানেই ওর জন্ম, এই বনই ওর ঘরবাড়ী! ওর পা-টা কি করে গিয়েছে জান? ওর যখন উনিশ-কুড়ি বছর বয়েস তখন একটা নেকড়ে বাঘের সঙ্গে লড়াই করে ওর পা-টা জখম হয়েছিল। হরিয়াও কিন্তু ছাড়েনি, সে নেকড়েটাকে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে মেরেছিল। তারপর জখমি পা নিয়ে ল্যাংড়াতে ল্যাংড়াতে মরা নেকড়েটা নিয়ে বাড়ী এসেছিল! ও কি সোজা লোক?

লরার মুখে সে কি বিস্ময়! সে গালে হাত দিয়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে তার সায়েবী বিস্ময় প্রকাশ করেছিল। তারপর বলেছিল—ও গড্, দেন?

—তারপর জখমি পা'টায় 'গ্যাংগ্রীণ' হল, পা পচে উঠতে গয়ার হাসপাতালে গিয়ে পা'টা হাঁটুর নীচে থেকে কাটিয়ে আসতে হল।

—ও কি করে? ওর চলে কিসে? হ্যাজ হি নো ওয়াইফ অর চিল্ড্রেন? ওর বৌ, ছেলেপুলে নেই?

শিবাজী সোৎসাহে ঘাড় নেড়ে বললে—নো! হি হ্যাজ নান একসেপ্ট দিস ফরেষ্ট। ওর কেউ নেই এই বন ছাড়া। এই বনই ওর স্ত্রী! একজন স্বামী তার স্ত্রীকে যেমন চেনে, ও ঠিক তেমনিভাবে চেনে এই বনটাকে। এই এত বড় বনের কোথায় কি আছে সব খুঁটিনাটি ও চেনে।

শিবাজী যেন একজন বিচিত্র বীরকে ওই ল্যাংড়া হরিয়ার মাঝবয়সী, মলিন, জখমী দেহের ভিতর থেকে বের করে এনে আমাদের, বিশেষ করে লরার সামনে

স্থাপন করে দিলে। শুনে লরা ভয়ে, বিস্ময়ে ও কৌতূহলে আবার গালে হাত দিয়ে বললে—ও, হাউ ষ্ট্রেঞ্জ! কি আশ্চর্য!

ল্যাংড়া হরিয়া আমাদের উৎসাহ ও বিস্ময় প্রকাশে বেশ বিব্রত বোধ করছিল। বুঝলাম এই সব উচ্ছ্বসিত প্রশংসাবাক্য শোনা, বিশেষ শিবাজীর শ্রেণীর ভদ্রলোকদের কাছ থেকে এ ধরনের কথা শুনবার তার অভ্যাস নেই! তাতে সে বেশ বিব্রত ও লজ্জিত হয়ে পড়েছে। সে এইবার হাত জোড় করে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলে—হমে কাহে বুলায়া হুজুর?

ল্যাংড়া হরিয়ার চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাকে ডাকার আসল উদ্দেশ্যটা যেন চাপা পড়ে হারিয়ে যাচ্ছিল। সেই প্রশ্নকেই আবার ঠেলে তুললে হরিয়া। শিবাজী বললে—তোকে ডেকেছি একটা কথা জিজ্ঞাসা করবার জন্যে!

—বাতাইয়ে হুজুর!

শিবাজী টেবিলের উপরের অর্কিডটা দেখিয়ে বললে—ওটা কোথা থেকে আনলি রে হরিয়া? কোথায় পেলি?

কাঁচা-পাকা ছোট ছোট চুল, খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়ি, রেখাকুঞ্চিত মুখের মাঝখানে ওর ঘোলাটে লালচে চোখের চেহারা পালটে গেল এক মুহূর্তে। চোখ দুটো প্রায় আলোর ছটালাগা দুটো ফিকে রঙের চুনীর মত কিম্বা দুটো হলদে পোকরাজের মত ঝক ঝক করে উঠল। সে মেঝের উপর দুই হাতের ভর দিয়ে একটু নড়ে-চড়ে বসল। তারপর অর্কিডের প্রাপ্তি-[illegible]টা বুঝাতে লাগল শিবাজীকে।

বিচিত্র সে কথাবার্তা। ঠেঁট হিন্দীতে কথাবার্তা হচ্ছে ওদের দুজনের। তবু যতটুকু বুঝতে পারলাম তাতে মনে হল আমরা যেমন ভিন্ন ভিন্ন মানুষকে তাদের ভিন্নতা দিয়ে স্পষ্ট পৃথক করে চিনি, হরিয়াও এই জঙ্গলের গাছপালাগুলোকে তাদের ভিন্নতায় ও পার্থক্যে তেমনি স্পষ্টভাবে চেনে। ও যা বললে তাতে দ্বিতীয় রাস্তা দিয়ে ঢুকে এক 'মিল' (মাইল) গিয়ে, 'মিল পোষ্টের' পর ঠিক পাঁচটা শাল গাছ পার হলেই ছ' নম্বর শালগাছের পিছনে একটা বুড়ো শিরীষ গাছ আছে। সেই শিরীষ গাছে ওঠা যায় না তার কাণ্ডটা এত মোটা। সেই গাছের সব চেয়ে নীচের ঠিক উপরের ডালে এই অর্কিড আছে। এখনও অনেক ফুল আছে তাতে। তবে পাড়তে হলে শিরীষগাছে না উঠে তার পাশের শাল গাছে উঠে ফুল পাড়তে হবে। তবে সে সব বুঝিয়ে শেষে সাবধান করে দিলে। বললে—শিরীষ গাছের যে ডালে ফুল আছে, তারই ঠিক উপরের ডালে, যেখানে ফুল ফুটে আছে ঠিক তারই উপরে মস্ত বড় মৌমাছির চাক

ঝুলে আছে। নীচের ডালে বেশী দোলা লাগলে মৌমাছিরা বিরক্ত হয়ে চটে যেতে পারে। কাজেই সাবধান!

শিবাজী হেসে বললে—তা তুই ফুল পাড়লি কি করে? তোর আবার ফুলের সখ হল কেন?

লজ্জিতভাবে হেসে হরিয়া বললে—ওহি লেড়কির জন্যে! ওহি খুবসুরতিয়াকি লিয়ে! উ হর রোজ হমকো দিক্ করতি হ্যায় ফুলকে লিয়ে! তো আজ গিয়া—

—গেলি তো ফুল পাড়লি কি করে?

ও যা বললে তা হল, ও পাশের শাল গাছে উঠে ওর ওই ক্রাচ দিয়ে ধাক্কায় ফুল পেড়েছে।

লরা আবার অবাক হয়ে গালে হাত দিলে—মাই গড্! কিন্তু ওই খোঁড়া পায়ে ও গাছে উঠতে পারে?

শিবাজী বললে—তা পারে। তবে তুমি নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবে না!

তারপর শিবাজী হরিয়াকে বললে—কি রে কাল সকালে যাবি নাকি আমার সঙ্গে?

কথা শুনে হরিয়া যেন লজ্জায় ও সংকোচে নুইয়ে নিজের মাথাটা প্রায় মেঝের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে চুপ করে রইল।

ব্যাপারটা বুঝে শিবাজী বললে—ও, কাল সকালে কাজ আছে বুঝি? কনট্রাক্টারের সঙ্গে জঙ্গলের মধ্যে যেতে হবে?

সে সভয়ে সংকুচিত মুখ তুলে, হাত জোড় করে বললে—জী হাঁ!

—ঠিক আছে। আমি তো তোর কাছে সব বুঝে নিয়েছি। আমি একাই মেমসাহেবকে নিয়ে যেতে পারব। তোকে অত কিন্তু-কিন্তু হতে হবে না। ঠিক আছে, ঘরে চলে যা, তোর ছুট্টি!

হাত তুলে নমস্কার করে ও ক্রাচটা টেনে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। এই সময় লরা ওর পকেট থেকে একটা আধুলি বের করে শিবাজীর হাতে দিয়ে নিম্নকণ্ঠে বললে—ওকে দাও!

শিবাজী আধুলিটা তার দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হেসে বললে—নে রে, মেমসাহেব তোকে দিলেন।

কৃতকৃতার্থের মত আধুলিটা তুলে নিয়ে আবার আমাদের জনে-জনে দু হাত জুড়ে নমস্কার করে ল্যাংড়া হরিয়া বেরিয়ে গেল।

সে বেরিয়ে যাবার পর শিবাজী বললে—ইট্স্ সেটেল্ড্, দেন! এই ঠিক রইল। আমরা কাল সকালে ব্রেক্ফাষ্ট করে অর্কিড আনতে যাব।

লরা বললে—দেন্ মিঃ সরকার, তুমি আমাকে শুধু ফুল নয়, ওই অর্কিডের একটা গাছই শেকড়শুদ্ধ তুলে দেবে। আমি কলকাতা নিয়ে যাব। নিয়ে গিয়ে আমার বাড়ীর বারান্দায় তারে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখব। সেদিকে নজর পড়লেই তোমাকে বার বার মনে পড়বে!

কথাটা ভাল লাগল শিবাজীরও। সে উৎসাহের সঙ্গে বললে—তাই হবে! ওটা আমার স্মৃতি হয়েই থাকবে তোমার কাছে! সে বেশ ভালই হবে!

তারপর আমার দিকে চেয়ে বললে—তুমিও তো খুনি যাবে ভাগনা?

আমি সোজা ঘাড় নেড়ে জবাব দিলাম—না! আমি বাংলোতেই থাকব। এ অরণ্যবাস আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে!

পরদিন সকালে ব্রেক্ফাষ্টের পর শিবাজী আর লরা বেরিয়ে গেল অর্কিডের সন্ধানে।

আমি ওদের ব্যাপারটা ঠিক বুঝছি না। শিবাজী অবশ্য সব সময়েই একটা বাষ্পীয় উৎসাহে ভাসে। ওটা তার স্বভাবেরই একটা ধাতুগত অংশ। তবে এখন দেখছি সে উৎসাহ প্রবলতর। তার উৎসাহের আধিক্য কেন সেইটাই আমি বুঝতে পারছি না। অন্যদিকে লরার এই আদুরী আদুরী ভাবটাও যেন আমার কাছে কেমন কেমন লাগছে। লরা অবশ্য প্রয়োজনমত এক নিমেষেই আদুরী করে তুলতে পারে নিজেকে। উৎসাহপ্রবণতা যদি শিবাজীর চরিত্রের ধাতুগত অংশ হয়, আদুরী আদুরী ভাব করা লরার দ্বিতীয় চরিত্র, যাকে অতি-অভ্যাসের অংগ বলা চলে। তার উপর আমি জানি, আমার পূজ্যপাদ শ্বশুর মহাশয় শিবাজীকে মুগ্ধ করবার জন্যই রেখে গিয়েছেন লরাকে। লরাকে দিয়ে শিবাজীকে শুধু মুগ্ধ নয়, বিমুগ্ধ করার বাস্তব প্রয়োজন আছে তাঁর। সবটা মিলে আমার কাছে কেমন একটা অশুচি লাগছে। কাজেই তার মধ্যে আমার গিয়ে কাজ কি? ওরা দুজনে যা হয় করুক। আর সে ক্ষেত্রে আমি গেলেও আমি তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে ওদের কাছে অতিরিক্ত এবং হয়তো অসহ্যও হতাম।

সুতরাং আমার ওদের সঙ্গে না যাওয়াই সব দিক দিয়ে ঠিক হয়েছে বলে মনে হল আমার। সুতরাং ওরা চলে যাবার পর আমি নিশ্চিন্ত মনে আর একবার চা খেলাম বেশ আরাম করে। সকালের সুন্দর রৌদ্রে চারিদিক ভাসছে।

ওরা চলে যাওয়ায় আমার একা একা বসে চা খেতে খেতে বেশ ছুটি ছুটি লাগতে লাগল। ওরা দুটি তরুণ-তরুণী, গভীর অরণ্যমধ্যে লোকচক্ষুর আড়ালে ফুল সংগ্রহের অছিলায় যা হয় করুক। তাতে আমার কি বাপু?

কিন্তু? একটা কথা আমার হঠাৎ মনে হল। কাল রাত্রিতে যখন জঙ্গলে যাবার কথা হচ্ছিল তখন তো শিবাজী ল্যাংড়া হরিয়াকে তার সঙ্গে যাবার জন্য অনুরোধ করছিল! তার মানে, ওর তো তৃতীয় ব্যক্তিতে আপত্তি ছিল না। এটা যদি ওর মনের কথা হয়, তা হলে যা নিয়ে আমি শিবাজীর সম্পর্কে এক নতুন ধারণা গড়ে তুলছি তা তো মিথ্যা! শুধু মিথ্যাই নয়, এতে ওর সম্পর্কে আমি অবিচারও করছি।

তবে ওটা তো লোক-দেখানো ব্যাপারও হতে পারে! মনে ওর যাই থাকুক, চক্ষুলজ্জার খাতিরে নিজের আসল মনোভাবটা চাপা দেবার জন্যেই হয়তো শিবাজী ল্যাংড়া হরিয়াকে তৃতীয় ব্যক্তি হয়ে তার সঙ্গে যাবার অনুরোধ জানিয়েছিল! এই বা অসম্ভব কি?

বাংলোর বারান্দায় বসে চা খেতে খেতে কেবল ওই কথাটাই আমার মনে ঘুরে বেড়াতে লাগল। সে এক কুম্ভীপাকের মত। চিন্তাটা অস্বস্তিকর, ভাল লাগছে না অথচ তাড়িয়েও দিতে পাবছি না মন থেকে। বারে বারেই ঘুরে-ফিরে আসছে মনের ভিতব।

তাই ওই চিন্তার হাত থেকে ছাড়ান পাবার জন্য উঠে দাঁড়ালাম। নেমে পড়লাম সামনের উঠোনে। তারপর এগুতে লাগলাম এক পা এক পা করে।

জায়গাটা আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। আমি কিছুই চিনি না এখানকার। প্রথম দিন এসে বনে বনে দিনের বেলা হাতীর পিঠে ঘুরেছি! তারপর গতকাল বিকেলে কেবল শিবাজী মহারাজের কুলিদের বস্তী পর্যন্ত গিয়েছি এবং সেইটুকুই চিনে এসেছি। আর মানুষজন চিনবার মধ্যে চিনেছি চামারিয়া আর ল্যাংড়া হরিয়াকে। আর দেখেছি সুরসুতিয়া আর তার মাকে। এখন এই সকালের দিকে বস্তী বোধহয় খালি; পুরুষরা সব জঙ্গলে কাজে গিয়েছে। থাকবার মধ্যে আছে মেয়েরা। ওদের সঙ্গে তো আর আলাপ চলবে না। ওরা আমাকে দেখবামাত্র লম্বা ঘোমটা টেনে আমার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াবে।

তবু সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতেই এগিয়ে চললাম। খানিকটা এগুতেই শব্দ এল কানে। নির্জন বনস্থলীতে এতটুকু শব্দ এত বড় হয়ে কানে বাজে। এ সেই ষষ্ঠীর ব্রতকথার মত। ডাল পড়লে ঢেঁকি হয়, পাতা পড়লে কুলো হয়, ছোট্ট এতটুকু শব্দ মনে হয় ঢাকের বাজনা।

কিন্তু কিসের শব্দ ও ?

কান পেতে শুনতেই বুঝলাম যে লরির রেসিংয়ের শব্দ !

তা হলে ?

তা হলে কি ল্যাংড়া হরিয়া এখনও আছে ওখানে ? আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে চললাম।

একটু এগিয়ে যেতেই গাছপালা কমে এল। অমনি দেখতে পেলাম লরিটাকে। লরিটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। কাছে নয়, পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। কারণ রেসিংয়ের ধাক্কায় পিছনে বেশ ধুলো উড়ছিল। পাশে দাঁড়াতেই দেখলাম ড্রাইভার আর দু'জন কুলি রয়েছে ট্রাকের ভিতর। কিন্তু ল্যাংড়া হরিয়া নেই সেখানে।

আমি আমার ভাঙা-ভাঙা হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করলাম—হরিয়া যাবে না আপনাদের সংগে ?

ড্রাইভার বললে—নিশ্চয়ই যাবে। তারই জন্যে তো অপেক্ষা করছি।

তারপর হেসে বললে—ওকে ছাড়া তো জঙ্গলে ঢোকাই যায় না। কোন্ গাছ, কোন্ ডাল কাটতে হবে সে হরিয়াই বলে দেবে। উ তো বাবু, আদমি নহি হ্যায়, উও তো জঙ্গলকে এক আজব চিড়িয়া !

ল্যাংড়া হরিয়া সম্পর্কে আমার কৌতূহল ছিলই। আমি হেসে জিজ্ঞাসা করলাম —কি রকম ?

ড্রাইভার হেসে বললে—ওইসাহি ! ওই রকমই। এ জঙ্গল তো হরিয়ার ঘরবাড়ী। একটু থেমে সে যেন আরও একটু ভেবে নিলে। তারপর বললে—ঘরবাড়ীর বেশী। এ জঙ্গল ওর মায়ের মত। ও সেই মায়ের কোলের বাচ্চা !

এই উপমা শুনে আগের রাত্রিতে শোনা শিবাজীর উপমাটার কথা মনে পড়ল। শিবাজী হরিয়ার সঙ্গে জঙ্গলের সম্পর্কের উপমা দিয়েছিল স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের উপমা দিয়ে। আর ড্রাইভারটি উপমা দিলে মা-ছেলের সম্পর্কের উপমা। এ থেকে দু'জনের মনোভাবের তফাৎটা যেন অস্পষ্টভাবে চিনতে পারলাম। একখানা বিলিতী ছবির কথা মনে পড়ল। দেখেছিলাম কিছুদিন আগে। যতদূর মনে পড়ে ছবিটির নাম 'হাডসন বে'। তাতে বিখ্যাত অভিনেতা পল মুনি আশ্চর্য অভিনয় করেছিলেন। এক জাহাজের মধ্যবয়সী ক্যাপটেন, তিনি নানান অছিলায় পৃথিবীর এক নির্জন, প্রায়-অপরিচিত স্থানে মাঝে মাঝে চলে আসতেন আপনার জাহাজ নিয়ে। তরুণ নাবিক কোন্ সমুদ্রপারের বন্দরে কোন রহস্যময়ী সুন্দরী নারীর প্রেম বলি প্রেম, কুহক বলি কুহক, তারই টানে

যেমন নিজের ঘর-সংসার, পরিচিত পরিবেশ সব ফেলে ছুটে যেতে যায়, কখনও কখনও ছুটে গিয়েও হাজির হয় সেই প্রেমময়ী কি মোহময়ীর কাছে, তেমনি সেই ক্যাপ্টেন ছুটে যেতেন হাডসন বে'তে তার আশ্চর্য সৌন্দর্যের আকর্ষণে। ল্যাংড়া হরিয়ার ব্যাপারটা হয়তো অনেকটা তেমনি। কিন্তু ট্রাক-ড্রাইভারের দেওয়া মায়ের উপমাটা আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলাম না। তাই আমি বললাম—জঙ্গলকে হরিয়ার মা না বলে জেনানা বল!

ড্রাইভারটি জিভ কেটে সজোরে ঘাড় নেড়ে বললে—নহি, নহি হুজুর! ওইসা মৎ বোলিয়ে! গুনাহ্ হো যায়গা! গলত্ ভি হোগা?

—কেন? পাপ হবে কেন? ভুল হবে কেন?

ড্রাইভার গম্ভীরভাবে বললে—আভি আপকো হম দেখলা দেগা! এখনি দেখাচ্ছি আপনাকে।

রৌদ্রের রঙ সাদা হয়েছে। বেলা হয়েছে খানিকটা।

ড্রাইভার জোরে জোরে হর্ন বাজাতে লাগল। সেই বিজাতীয় শব্দ নিঃশব্দ বনস্থলীতে একটি কুৎসিত ধ্বনিময়তা সৃষ্টি করলে। কিন্তু তাতেই ফল ফলল। দেখলাম একটি ঝোপড়ি থেকে হরিয়া ক্রাচে ভর দিয়ে বেশ তাড়াতাড়ি চলে আসছে।

দু এক মিনিটের মধ্যেই সে এসে পড়ল ট্রাকের কাছে। সে হাসিমুখে বোধহয় কিছু বলতে যাচ্ছিল ট্রাক-ড্রাইভারকে। কিন্তু আমাকে দেখে থমকে গেল। আমার মনে হল মাটি আর ঘাসের অতি নিশ্চিন্ত পরিবেশের মধ্যে যে শামুকটি আপনার খোলের মধ্যে থেকে নিজের কোমল দেহটি বের করে মন্থরভাবে চলার আয়োজন করছিল সে অকস্মাৎ কোন্ অনির্দেশ্য অবিশ্বাসে শঙ্কিত হয়ে মুখ গুটিয়ে আবার খোলের মধ্যে ঢুকে গেল। আমার চোখে চোখ পড়তেই সে ভীরু মুখে সভয় দৃষ্টিপাত করে, দু হাত জোড় করে আমাকে ভয়-ভয় গলায় বললে—সালাম হুজুর!

আমিও তার ভয় ভাঙাবার জন্য হেসে দু হাত জোড় করে তার নমস্কার ফেরত দিয়ে বললাম—সেলাম হরিয়া মহারাজ!

'হরিয়া মহারাজ!'

ট্রাক-ড্রাইভার হাসি-হাসি মুখে অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চাইল, কুলি দু'জনেরও তেমনি অবস্থা। কিন্তু হরিয়া মহারাজের মাথাটা নুইয়ে পড়ল, বোধহয় লজ্জায়। বুঝলাম, এ রকম নামে হরিয়াকে সম্মানিত করে কেউ কখনও ডাকে নি বোধহয়।

ট্রাক-ড্রাইভার আমার সমাদরকে তারিফ করে বললে—আপ সাচ বোলে হেঁ! হরিয়া তো মহারাজই হ্যায়! উ তো সাধু মহাত্মা, সচ আদমি!

কিন্তু দেখলাম হরিয়া তখনও গভীর লজ্জায় আরও বেশী করে মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে।

এ কি বিড়ম্বনা! যাকে আদর করলাম সে যদি আদর পেয়ে এমন হয়ে যায় তা হলে কি করি! কি করা যায় ঠিক করতে পারলাম না।

আমি হরিয়ার কাছে এগিয়ে গেলাম। বললাম—তোমার এত দেরী হল যে হরিয়া? গাড়ী তো দেখছি তোমার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছে!

হরিয়া একবার ভয়ে ভয়ে মুখ তুললে। উল্টো বিপত্তি হল দেখছি! তার ভাব দেখে মনে হল যেন আমি হরিয়াকে বেলা হওয়ার বিলম্বের জন্য কৈফিয়ৎ চাইছি!

ট্রাক-ড্রাইভারই কৈফিয়ৎ দিলে। বললে—হুজুর, হরিয়া মহারাজ তো সকাল বেলা আস্নান করে। তারপর থোড়া পূজাপাঠ করে। তাই একটু দেরী হয়। পূজাপাঠ না করে ও তো ওর ঝোপড়ি থেকে বের হয় না।

জিজ্ঞাসা করলাম—তোমরা পূজাপাঠ কর না?

—নহি হুজুর। ও সব করি না। হরিয়ার ব্যাপারই দুসরা। ও বলে, পূজো কবার সময় তো ও জঙ্গলেরও পূজো করে। শিউজী, কিষণজী এদের পূজো করতে গিয়ে কেবল যদি জঙ্গলের গাছপালা, ফুল-চিড়িয়া-জানোয়ারের চেহারা মনে পড়ে, তা হলে তাদের পূজো না করে উপায় কি? তার চেয়ে শিউজী, কিষণজীর সঙ্গে তাদের পূজো করাও ভাল!

আমি মনে মনে হাঁ করে গেলাম। আরে বাপ, এ তো একজন আজব লোক। এ তো দেখছি ওই পা-খোঁড়া, দীন-দরিদ্র, মাঝবয়সী অজানা লোকটির মধ্যে একজন তত্ত্বদর্শী পুরুষ রয়েছেন! সাবাস বাবা! মনে হল দেখি তো আরও একটু পরখ করে। জিজ্ঞাসা করলাম ট্রাক-ড্রাইভারকেই। হরিয়াকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে তো জবাব মিলবে না! তবু জিজ্ঞাসা করলাম—তা জঙ্গলকে তো পূজো করো হরিয়া মহারাজ। কিন্তু আবার সেই জঙ্গলে গিয়েই তো জঙ্গলের গাছপালাডাল, বড় বড় গাছ সব কাটো, গুলি করে জানোয়ার চিড়িয়া মারো! তাতে জঙ্গল গোস্সা করে না?

এবার জবাব দিলে হরিয়াই। আস্তে আস্তে কথা বলে অজ্ঞ, অনভিজ্ঞ লোককে মানুষ যেমন বুঝায়, তেমনিভাবে মুখ তুলে হাত নেড়ে হরিয়াই আমাকে আস্তে আস্তে বুঝাতে লাগল। বললে—নহি হুজুর! ওতে কোন পাপ হয় না। আর

সচ্ বলতে কি আমি সকালবেলায় তো সেই জন্যেই পূজো করি। লড়কা যেমন পেটের খিদে মেটাবার জন্যে মায়ের তৈরী করা ডাল, রোটি, ভাত, শাগ নিয়ে খায়, এও তেমনি আর কি! তাতে কি মা রাগ করে? বরং মা খুশী হয়। ভাবে বেটার জন্যে সব বানিয়ে রেখে দিয়েছিলাম, বেটা খেয়েছে! তেমনি সকাল বেলা পূজো করে মায়ের কাছে বলি, মা, আমার পেটের জন্যে তোমার ঘর থেকে কোই লকড়ি, পেঁড়, ফুল, ফল, চিড়িয়া, জানোয়ার নেব, তুমি মাফ ক'রো! মাফি মাংচি মা, তোমার কাছে!

সাবাস আদমি! আর এ তত্ত্ব বুঝে দরকার নেই আমার! আমি বললাম—তোমাদের দেরী হয়ে যাচ্ছে না তো?

হরিয়া হাসল। যার অর্থ দেরী হচ্ছে।

বুঝে বললাম—চলে যাও তাহ'লে!

হরিয়া ট্রাক-ড্রাইভারকে বললে—চলো ভাই! জানেকা বখ্‌ত্ দো নম্বর রাস্তা হোকে যানা।

দু নম্বর রাস্তায় যাবাব নির্দেশ! মনে পড়ে গেল গত রাত্রির কথা। হরিয়া শিবাজীকে দু নম্বর রাস্তা দিয়ে এক মাইল যেতে বলেছিল! তাই মনে পড়তেই জিজ্ঞাসা করলাম—শিবাজীর খোঁজ নিয়ে যাবে বুঝি?

আবার লজ্জাবতী লতার মত নুইয়ে পড়ল হরিয়া। লজ্জিতভাবে বলল—কাল সাহাব বলছিলেন যাবার কথা! তা সাহাব এত সকালে যাবেন জানলে তো আমিই যেতে পারতাম! তা এখন যখন যাচ্ছি তখন সাহাবকে একবার দেখেই যাই! ওই দিকেই তো যাব!

বলে কপালে হাত ঠেকিয়ে সে যুক্তকর নমস্কার করে বললে—সাহাব তো মায়-বাপ হুজুর!

এই সামান্য পরিচয়ে হরিয়া সম্পর্কে দুটো একটা ছোট ব্যাপার বুঝেছিলাম। বোধহয় পূজো-টুজো বেশী করার জন্য বার বার প্রণাম-নমস্কার করাটা তার খুব রপ্ত। আর একটা ব্যাপার হল, ল্যাংড়া হরিয়া আমাদের মত পরিষ্কার জামা-কাপড়-পরা, অপরিচিত ভদ্রজনদের কাছে লাজুক ও ভীতু হয়ে গুটিয়ে গেলেও ওর কোন আবেগের বিষয় আলোচনার মধ্যে এসে হাজির হলে ও অসঙ্কোচে মুখ খোলে। তখন ওর মনের ফুর্তি কথার মধ্যে বাঙ্ময় হয়ে ওঠে শিবাজীকে যুক্তকর নমস্কারের ভিতর দিয়ে ওর সেই চেহারাটাই আবার দেখতে পেলাম।

আমার কৌতুহল হল। একটু খোঁচা দিলাম্র তাকে। বললাম—এই তো

বললে জঙ্গল তোমার মা। আবার এই এখন বলছ শিবাজী তোমার মায়-বাপ! তোমার কত মা হে হরিয়া?

হরিয়া হাসল। হেসে দু'খানি হাত মেলে আমাকে উত্তর দিতে মুখ খুললে। বুঝলাম ও এবার কোন তত্ত্বকথা শোনাবে আমাকে। হরিয়া হাত মেলে আস্তে আস্তে বললে—উ দো তো দুসরি কিসিমকে বাত হুজুর। এক বাত তো 'পরমাত্‌মাকি', দুস্‌রা তো 'আত্‌মাকি'।

আমি ওর তত্ত্বকথা শুনে হাসব কি কাঁদব বুঝতে পারছিলাম না। তাই চুপ করে গেলাম। বুঝলাম 'পরমাত্মা' বলে ও বুঝাতে চাইলে অরণ্য-প্রকৃতিকে আর 'আত্মা' হলেন শিবাজী মহারাজ। কিন্তু ওর তত্ত্বকথা তখনও শেষ হয়নি। ও বললে—পরমাত্মাকে চোখে দেখা যায় না। তাঁর জন্যে 'ধেয়ান' লাগাতে হয়। তিনি মেহেরবাণী করলে ধেয়ানমে তাঁকে পাওয়া যায়। কিন্তু 'আত্মা' 'পরমাত্মার' অংশ, টুকরো। তবে টুকরো বলে তাঁব চেহারা আছে। তাই তাঁকে দেখা যায়।

আমি আবার ওর তত্ত্বকথার জালে জড়িয়ে গেলাম চুপ করে থেকেও মাত্র একটি প্রশ্ন করে। জিজ্ঞাসা করলাম—তাহলে তো হবিয়া মহারাজ, সব 'আত্মাই' সমান!

হরিয়া আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে জোরের সঙ্গে বললে—জরুর! সবারই 'অন্দরমে' তা পরমাত্মার অংশ হয়ে আত্মা রযেছেন। সেদিক দিয়ে সবাই সমান।

—সবাই সমান? বল কি? ওই কুকুরের বাচ্চাটা, ওই সুরসুতিয়া, তুমি আর তোমাদের শিবাজী মহারাজ সবাই সমান?

—জরুর। জোরের সঙ্গে সে বললে কথাটা।

তারপর নিজের ত্রুটি স্বীকার করলে। বিনীতভাবে বললে—কিন্তু আমরা তা মনে করতে পারি না! সে আমাদেরই কসুর হুজুর! আমরা ঠিক বুঝতে পারি না। বুঝতে পারি না বলেই সবাইকে সব আত্মাকে সমান বলে মনে করতে পারি না। ফারাক হয়ে যায়। কাউকে মা বলি, কাউকে বাপ বলি, কোই বেটা বেটি, কোই নোকর, কোই রাজা, কোই মিত্র, কোই দুষমন। বুঝার গলতিতে সব অলগ অলগ হয়ে যায়, ফারাক হয়ে যায়।

হেসে জিজ্ঞাসা করলাম—শিবাজী কি তোমার কাছে?

সঙ্গে সঙ্গে দু হাত এক হয়ে জুড়ে গেল কপালে। সে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে বললে—আরে বাপরে বাপ, উয়ো তো 'সাকসাৎ' শিউজী আমার কাছে!

—কি রকম ?

—হাঁ হুজুর, উ তো সাকসাৎ শিউজী ! উ তো হামারা মায়-বাপ, ভগবান ! উনকে আত্মা বহুত পবিত্র ! ওইসা আদমী আপ্ কভি নহি দেখিয়েগা হুজুর ! উনকে দিল তো ছোটে বাচ্চাকে মাফিক হ্যায় ! তামাম দুনিয়া তো উনকে পাশ এক খেলোওনা ! সারা সংসারটা ওঁর কাছে ছোট বাচ্চার খেলনার মত। সখ হলে এই কিছুক্ষণ খেললে, তারপর ফেলে দিলে। দুনিয়ায় কোন জিনিষে ওঁর টান নেই। সেই জন্যেই তো উনি এমন বাচ্চার মত হুল্লোড় করে বেড়ান !

হঠাৎ কোলের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের হর্ন বেজে উঠল। হর্ন বাজিয়ে ট্রাক-ডাইভার আমাদের দিকে চেয়ে হাসতে লাগল দাঁত বের করে। বুঝলাম তাগিদ দিচ্ছে হরিয়াকে। রসিকতা করেই অবশ্য।

হরিয়া একান্ত সচেতন হয়ে উঠল হর্নের শব্দে। সে হাত জোড় করে আবার বিনীত নমস্কার জানিয়ে বললে—আমি যাই হুজুর, কামে দেরী হয়ে যাবে।

আমি হয়তো শিবাজী সম্পর্কে আরও দু-এক কথা জিজ্ঞাসা করতাম, কিন্তু হরিয়া উঠে পড়ল গাড়ীতে, ড্রাইভারের পাশে। তার দেখাদেখি কুলিরা ট্রাকের পিছনে উঠে পড়ল হুড়মুড় করে। ট্রাক ছেড়ে দিলে। অনেক ধূলো উড়িয়ে ট্রাকটা চলে গেল।

সাত

আমি একা দাঁড়িয়ে রইলাম ধূলোভর্তি রাস্তার উপর। ভাবতে লাগলাম কি করব ! হরিয়াকে শিবাজী সম্পর্কে প্রশ্ন করার আড়ালে একটা কৌতুহল অবশ্যই ছিল। সে কৌতুহল শিবাজীর চরিত্র সম্পর্কে। চরিত্র বলতে আমাদের দেশে ও সমাজে যা সাধারণত বোঝায় সেই চরিত্রের কথাই বলছি। এর মধ্যে শিবাজী সত্যি কথা বলে কিনা, যা ভাবে তাই করে কিনা, অসঙ্গত উপায়ে অর্থোপার্জন করে কিনা—এসব সূক্ষ্ম প্রশ্ন আসে না। তার মধ্যে একটাই জিনিষ আসে। সেটা এই যে শিবাজী যদিও পরিপূর্ণ যুবক, যদিও কাল-চলিত সামাজিক নিয়মে তার বিয়ের বয়স হয়েছে অথচ এখনও বিয়ে করেনি, সেই শিবাজীর স্ত্রীলোক সম্পর্কে সাধারণত মনোভাব কি। সোজা কথায় বিবাহ না হওয়া সত্বেও অনাত্মীয় কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক আছে কিনা, অথবা থাকবার মত, রাখবার মত মন তার আছে কিনা

কিন্তু তার কোন উত্তর আভাসেও পেলাম না। বরং যা পেলাম হরিয়ার কথাবার্তা থেকে, তা অন্য রকম। শিবাজী এ দিক দিয়ে হয়তো এখনও কিশোর, অথবা বালকই রয়ে গিয়েছে। অথচ তাকে নারীসঙ্গ দিয়ে বশীভূত করবার জন্য এক পক্ষ এখানে লরাকে স্থাপন করে গিয়েছেন যুদ্ধের সময় মাটির ভিতর সংগোপনে পাতা মাইনের মত। বিস্ফোরণ হলেই হয়!

হরিয়ার কথায় যা আভাস পেলাম তাও আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করছিল না। স্বাভাবিক নয় বলেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করছিল না!

এদিক ওদিক চাইতে চাইতে দেখলাম খানিকটা দূরে ঘোমটা টেনে একটি সুন্দরী মেয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। তাকে দেখেই চিনতে পারলাম। আরও চিনতে পারলাম ওর পিছনের সুন্দরী বাচ্চা মেয়েটাকে দেখে। সুরসুতিয়া আর তার মা!

আমার মনের মধ্যে যে কৌতুহল তরল জলস্রোতের মত গড়িয়ে চলতে চলতে পথ খুঁজে না পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে কোন অন্ধকার গর্তে জমছিল সে যেন হঠাৎ কোন্ সুড়ঙ্গ-পথ পেয়ে গেল বেব হবার। ওই তো চামারিয়ার সুন্দরী স্ত্রী রয়েছে। ওদের সম্পর্কে শিবাজীর মনোযোগ তো দেখলাম অপরিসীম। ওই পাঁচ ছ' বছরের মেয়েটাও কাল সন্ধ্যে বেলায় মায়ের কোল থেকে কেমন বিচিত্র দৃষ্টিতে চেয়েছিল শিবাজীর দিকে। শিবাজীর গভীর ও সানুকম্প মনোযোগেও কিন্তু সে দৃষ্টির সামনে এতটুকু ইতরবিশেষ হয়নি।

কেন? মেয়েটার চোখের ওই স্থির চাউনীর মানে কি ছিল?

ওর মায়ের সম্পর্কে শিবাজীর কোন গোপন আকর্ষণ জনিত ঈর্ষা ও বিদ্বেষ? ঈর্ষা কথাটা ভুল বললাম। অতটুকু বাচ্চা মেয়ের আবার ঈর্ষা হতে যাবে কেন? তবে ওই রকম কোন সম্পর্ক থাকলে তার কন্যার চোখে বিদ্বেষ ফুটে বেরুবেই। ও দৃষ্টি কি সেই ধরনের কোন বিদ্বেষ স্পষ্ট ও উদ্ধত ভাবে বহন করছিল?

তা হলেও হতে পারে।

হাতে কাজ নেই, মনেও কোন স্পষ্ট ভাবনা নেই। তাই এগিয়ে গেলাম ওদের দিকে। দেখলাম সুরসুতিয়ার মা আমার দিকে একবার চেয়ে তার মাথার ঘোমটাটা আর একটু টেনে দিলে। কিন্তু সুরসুতিয়া আমার দিকে চেয়ে রইল খটখটে চোখে!

মেয়েটার চোখের চাউনীই বোধহয় অমনি শুকনো শুকনো। তা না হলে আমার দিকেই বা ও অমন করে চাইবে কেন? আমি অপরিচিত বলে?

পরিচয় করবার জন্যেই এগিয়ে গেলাম। নিজের যৎসামান্য হিন্দীজ্ঞানকে সম্বল করে ওর কাছে এগিয়ে গেলাম মুখে হাসি নিয়ে। বললাম—কি সুরসুতিয়া, তোমার হাত কেমন আছে?

সে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। যেন আন্দাজ করলে আমার মতলবটা কি! তারপব আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়ল, যার অর্থ তার হাত ভাল আছে।

আব কি জিজ্ঞাসা করি। আবার প্রশ্ন করলাম—দাওয়াই খেযেছ?

আবার তার ঘাড় নড়ল, যাব অর্থ সে দাওয়াই খেয়েছে!

আবার বললাম—তাহলে দাওয়াই খেয়েই কমেছে?

আবার ঘাড় নড়ল যার অর্থ হ্যাঁ!

এবার তার মুখ থেকে ঘাড় নড়ার সঙ্গে সঙ্গে কথা বেরিয়ে এল—একদম ঠিক হো গয়া!

আমি তার হাত ধরে হেসে বললাম—খুব ভাল! আমি ভেবেছিলাম তুমি কথা বলতে পার না! এই তো দেখছি তুমি খুব সুন্দর কথা বল।

ছোট শিশু কৌতুকে বিদ্যুৎ-চমকের মত যেমন হাসি হাসে তেমনি ফিক করে হাসল মেয়েটি। তার লাল টুকটুকে দুটি ঠোঁটের আড়াল থেকে সুন্দর, সাজানো, ধবধবে দাঁতের সারি বেরিয়ে তার কচি মুখখানিকে আরও সুন্দর করে তুললে। ভারী ভাল লাগল আমার!

আমি আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলাম। তার আগেই মেয়েটি কথা বললে—চৌপায়া আনব? আপনি বসবেন?

আমার হাতে অনন্ত অবসর। তাছাড়া ওদের সঙ্গে আলাপ করবারও আগ্রহ আমার মনে। তাই খুসী হয়ে বললাম—আন, বসি!

তারপবই মেয়েটির হাতের ব্যথাব কথা মনে হতেই বললাম—তোমার হাতে 'দর্দ' রয়েছে। তুমি যেন আনতে যেয়ো না।

সুরসুতিয়া ততক্ষণে ছুটে ঝোপড়ির মধ্যে চলে গিয়েছে। অল্পক্ষণ পরেই ওর মা মাথায় বেশ লম্বা ঘোমটা টেনে একটি চৌপায়া নামিয়ে দিলে। সুরসুতিয়া মায়ের পিছন পিছন ছুটে বেরিয়ে এসে বললে—এখানে নয়। ওই পিপুলতলার ছায়ায় পেতে দাও।

একটু দূরেই মস্ত বড় এক অশ্বত্থগাছ। সকালের রোদের ধাক্কায় তার নরম ছায়া পড়েছে লম্বা হয়ে। সুরসুতিয়ার মা চৌপায়াটি তুলে সেখানে পাতবার জন্যে হাত বাড়াল। আমি তার আগেই শশব্যস্ত হয়ে চৌপায়াটি তুলে নিয়ে

গিয়ে সেই ছায়ায় পাতলাম। তারপর বসলাম তার উপর। সুরসুতিয়া হাসিমুখে এসে দাঁড়াল আমার কাছে।

মনে মনে ভাবছিলাম এবার কি কথা বলি! সুরসুতিয়া বলে এই ছ' বছরের মেয়েটি, ওর আর আমার জীবনের অভিজ্ঞতার বৃত্ত সম্পূর্ণ আলাদা। একে অন্যকে কোথাও স্পর্শ করে না। আমার সেই বৃত্ত থেকে এ বৃত্তে কোন্ খবর পাঠাই?

তবু একটা সাধারণ কথাই জিজ্ঞাসা করলাম। একজন মোটামুটি শিক্ষিত মানুষ যা ভাবে, যা বলে সেই ধরণের কিছু। ও কি উত্তর দেবে জেনেও তাই জিজ্ঞাসা করলাম। বললাম—তুমি 'লিখাপড়া' করো?

এ সেই কবেকার কথা। তখনও দেশ স্বাধীন হওয়া দূরের কথা, দেশ যে কোনদিন স্বাধীন হতে পারে এ কল্পনাই তখন কারও মাথায় আসত না। সেই কালে, ইংরেজী শিক্ষার ছোট ছোট কেন্দ্র তখন মাত্র সহরগুলি। সেই সহর থেকে অনেক অনেক দূরে, অরণ্যের কোলে, দুসাদ, কুর্মীদের বস্তিতে যে তখনও লেখাপড়া ঢোকেনি সে তো জানা কথা। তাই সুরসুতিয়ার জবাবটা কি হবে আমি তো ভাল করেই জানতাম!

কিন্তু আমাকে সম্পূর্ণ বিস্মিত করে সুরসুতিয়া হেসে ঘাড় নেড়ে জবাব দিলে—হাঁ! হমি লিখাপড়া করি। আমার অনেক কিতাব আছে! হমি বংলা ভি জানে!

অবাক, অবাক কাণ্ড!

আমি অবাক হয়ে বললাম—তাই না কি?

আমার বিস্ময়ে গভীর উৎসাহ অনুভব করলে সুরসুতিয়া। আমার মুখের দিকে একটু চেয়ে থেকে সে হঠাৎ ছুটে চলে গেল নিজেদের ঘরের দিকে। আমিও কৌতূহল অনুভব করলাম।

একটু পরেই আবার সে ছুটতে ছুটতে ফিরে এল আমার কাছে। হাতে এক গোছা বই। সেই বইগুলো আমার কোলের উপর ফেলে দিয়ে সে হাসিমুখে বললে—হমি পড়ি ই সব কিতাব।

বইগুলোর অধিকাংশই বড় বড় আকারের উৎকৃষ্ট ছবির বই। ইংরেজী। ইংরেজী অক্ষরশিক্ষার ও তারপর শব্দশিক্ষার বই। তার সঙ্গে দু'খানা হিন্দী বই, বর্ণপরিচয়ের। সঙ্গে আবার বিদ্যাসাগর মশাইয়ের বাংলা প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগও রয়েছে দেখলাম। তার উপর হিন্দী অক্ষরে অঙ্কের বই। মানে হিন্দী ধারাপাত

সবচেয়ে নীচে ছিল হিন্দী ধারাপাতখানি। বইয়ের সাজানো থেকে কেন যেন আমার মনে হল, অঙ্কশাস্ত্র সম্পর্কে সুরসুতিয়ার বিশেষ প্রীতি নেই। হিন্দী ধারাপাতের নীচে আরও একখানা বই ছিল। যখন আমি হিন্দী ধারাপাতে হাত দিয়েছি তখনই সুরসুতিয়া আমাকে বিষম অবাক করে দিয়ে ধারাপাতের নীচের বইখানি ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে, আমার কাছ থেকে লুকোবার জন্যে নিজের পিছনে বইশুদ্ধ হাতখানি আড়াল করলে।

ওর সঙ্গে আমার বইয়ের খেলাটা হঠাৎ জমে উঠল। আমি খেলাকে আরও জমাবার জন্যে, ও আমার কাছ থেকে যে কৌতুহল চাইছিল সেই কৌতুহল দেখিয়ে বললাম—ওটা কোন্ কিতাব ?

ঘাড় নাড়ল সুরসুতিয়া হাসি হাসি মুখে। যার মানে ও আমাকে বলবে না। বইশুদ্ধ হাতখানা পিছনে দিয়ে ও হঠাৎ ছুটে চলে গেল পিপুল গাছটার পিছনে। সেখানে বইখানি রেখে আবার মুখ হাসিতে ভর্তি করে দাঁড়াল আমার সামনে। আমি ও নিয়ে আব কোন কথা বললাম না। কারণ ও খেলাটা ওই খেলবে শেষে আমার সঙ্গে।

আমি বইগুলো নেড়ে চেড়ে দেখছিলাম। এ তো অনেক বিদ্যাব আয়োজন দেখছি।

তার মানে সুরসুতিয়ার বিদ্যারম্ভ ভালই হয়েছে। সে হিন্দী, ইংরেজী এবং বাংলা সবই শিখছে।

জিজ্ঞাসা করলাম—কে পড়ায় তোমাকে ?

সুরসুতিয়া বললে—কেন ? বাবুজী সাহাব পড়ান।

বলতে গিয়ে দেখলাম সুরসুতিয়ার মুখখানি জ্বলে উঠল আবার যেন একটু লজ্জারও ছোঁয়া লাগল।

আমি একখানা ইংরেজী ছবির বই খুললাম। মোটা দামী কাগজে ছাপা। প্রথম পৃষ্ঠাতেই একটি রঙীন আপেলের গায়ে 'A' বসানো, পাশে লেখা Apple। তার নীচে একটা বড় 'B', পাশে একটি পাখামেলা মৌমাছি, Bee লেখা। পাতার উপরে গোটা গোটা অক্ষরে ইংরেজীতে লেখা—সরস্বতী। হাতেব অক্ষর ভাল নয়, কিন্তু যথাসাধ্য ভাল করার চেষ্টা হয়েছে।

তার নাম লেখা অক্ষরগুলির উপর আঙুল রেখে জিজ্ঞাসা করলাম—কে লিখেছ ? বলেই তার মুখের দিকে চাইলাম সস্নেহে।

আবার লজ্জার মধুর ছোপ-লাগা, উৎসাহ-জ্বলজ্বল মুখ। উত্তর এল— [illegible]জী সাহাব!

মানুষের অন্তরের অকপট প্রীতি ও শ্রদ্ধার অকুণ্ঠ প্রকাশ মানুষের মুখকে কত সুন্দর করে তা দেখলাম আবার চোখের সামনে। বললাম—বাবুজী সাহাবের হাতের লেখা তো ভারী সুন্দর।

অহঙ্কারে যেন ফুলে উঠল সুরস্থতিয়ার মনটি। সে অহঙ্কারে প্রায় ভেঙে পড়তে পড়তে বললে—বাবুজী সাহাব বহুত লিখিপঢ়ি আদমী হ্যায়!

আমার ইচ্ছা হল ওর বুদ্ধি একটুখানি পরীক্ষা করি। তার আগে বললাম—তোমার এমন সুন্দর নাম, সরস্বতী, তোমাকে সবাই সুরস্থতিয়া বলে ডাকে কেন?

বলার সঙ্গে সঙ্গে গভীর মনোবেদনা ফুটে উঠল তার মুখে। সে দুঃখিতভাবে বললে—দেখুন না, সবাই অমনি করে ডাকে আমাকে। এমন কি বাবুজী সাহাবও ডাকেন। আমার বহুত 'খারাব' লাগে। আমি বাবুজীকে বলেছি—আমার নামটা বদলে দাও! বাবুজী বলেছেন—তুই আর একটু বড় হ'। তোকে যখন গয়ায় মেয়েদের ইস্কুলে ভর্তি করে দেব তখন তোর নাম বদলে দেব!

জিজ্ঞাসা করলাম—কি নাম হবে তখন?

সুরস্থতিয়া হেসে বললে—বাবুজী সাহাব বলেছেন উনি নাম ঠিক করে দেবেন।

—কি নাম হবে তা বলেনি তোমাকে?

সুরস্থতিয়া গভীর রহস্যময়ভাবে বললে—বাবুজী সাহাব আমার নাম মনে মনে ঠিক করে রেখেছেন। আমাকে যখন ভর্তি করবেন তখন বলবেন সেটা!

বললাম—বেশ, বেশ, আজই বাবুজীকে আমি জিজ্ঞাসা করব কি নাম হবে তোমার সরস্বতীর বদলে। সরস্বতী নামও অবশ্য খুবই ভাল। সরস্বতী, জান নিশ্চয়ই, বিদ্যার দেবতা! তিনি সাদা ধবধবে, কুন্দ ফুলের মত রঙ, গায়ে সোনার নয়, সাদা মুক্তোর গয়না, পরণে সাদা সিল্কের সাড়ী! সব সাদা! তা তোমার কি রকম নাম চাই? কত সুন্দর সুন্দর নামই তো আছে! প্রিয়ংবদা, অনসূয়া, অরুন্ধতী!

সঙ্গে সঙ্গে গভীরভাবে বিব্রত হয়ে সে আমার মুখ চেপে ধরলে তার ছোট্ট নরম ডান হাতখানি দিয়ে। কচি হাতের ভিজে-ভিজে নরম স্পর্শের মধ্যে যেন দুধের গন্ধ পেলাম। হয় তো আমার সঙ্গে দেখা হবার আগেই সুরস্থতিয়া দুধ মাখিয়ে কিছু খেয়ে এসেছে। ভারী ভাল লাগল আমার। সুদূর, বিজন বনান্ত দেশের গন্ধ হয়ে সেটুকু বোধহয় আমার স্মৃতিতে গেঁথে গেল।

সুরস্থতিয়া ঘাড় নেড়ে বলতে লাগল—নহি, নহি, কভি নহি!

আমার মুখের উপর থেকে তার হাতখানি সরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—কি নহি ?

সে সজোরে ঘাড় নেড়ে বললে—বাবুজী সাহাবকো নহি বোলনা !

—কেন ? বললে কি হবে ?

—বাবুজী গোস্‌সা করবে আমার ওপর। আমার সঙ্গে কথা বলবে না।

সুতরাং সুরসুতিয়ার কথা মেনে নিতে হল আমাকে। বললাম—আচ্ছা বলব না।

তারপর বললাম—কই দেখি তুমি কেমন পড়ছ !

পরীক্ষা আরম্ভ হল সুরসুতিয়ার। দেখলাম ইংরেজী, হিন্দী ও বেশ শিখেছে ওর ছ'বছর বয়সের পক্ষে। সেই সঙ্গে বাংলাটাও কম শেখে নি। প্রথম ভাগের ছবিশুদ্ধ প্রথম অক্ষরগুলো নজরে পড়তেই একটা অক্ষরের উপর আঙল রেখে বললাম—এটা কি বল ?

সঙ্গে সঙ্গে বলে দিলে সুরসুতিয়া—দীর্ঘ ঈ।

ছবিটা দেখিয়ে বললাম—এটা কি ?

—ঈগল পাঁ-খী !

পাখিটা এমন করে উচ্চারণ করলে সুরসুতিয়া যে আমি হেসে ফেললাম। বললাম—পাঁখী কি ? পা-খী ?

তার বাংলা উচ্চারণ নিয়ে ওই ছোট্ট মেয়েটিকে অমন ধারার কৌতুক করা আমার অবশ্যই উচিত হয়নি, তবু সুরসুতিয়া আমাকে নিজে হাতে করে টেনে যেন ফেলে-আশা শৈশবের খেলায় নিয়ে এসেছে। সে খেলায় আমি তারই মত বেনিয়মের নিয়ম পালন করছি। আমার নিষ্ঠুর রসিকতায় সে চটে গেল। বললে—হাঁ, হাঁ, পাঁ-খী। পাঁ-খী ! চিড়িয়া ! বহুত বড়া চিড়িয়া !

বলেই সে ছুটে চলে গেল।

ভাবলাম আমার উপর রাগ করে চলে গেল না কি ? কিন্তু দেখলাম—না, যায়নি। পিপুল গাছের পিছন থেকে সেই লুকনো বইখানা এনে হাজির করলে। তারপর সজোরে ফেলে দিলে আমার কোলের উপর। সরোষে বললে—দেখিয়ে।

দেখলাম, দেখে অবাক হলাম। বইখানা হল সহজপাঠ। নন্দলালের ছবি-আঁকা, রবীন্দ্রনাথের সহজপাঠ। বাংলা দেশের বাইরে, অবাঙালী অঞ্চলে, গয়া জেলার কোন্ এক অরণ্যপ্রান্তে এক হিন্দী-বলা বালিকার হাতে সহজপাঠ দেখব প্রত্যাশা করিনি।

আমার বিস্ময় ও আনন্দ বহুগুণ বাড়িয়ে স্থুরস্থতিয়া তখন তর্‌তর্‌ করে আবৃত্তি আরম্ভ করেছে—

আমাদের ছোটো নদী
চলে আঁকে বাঁকে,
বৈশাখ মাসে তার
হাঁটুজল থাকে।

চলল আবৃত্তি।

আবৃত্তি চলল, আমি অবাক হয়ে শুনতে লাগলাম।

সে কি বিচিত্র আস্বাদ! বিহাবের হিন্দীভাষী একটি ছ'বছরের মেয়ের মুখে ববীন্দ্রনাথের ওই অপরূপ কবিতার হিন্দীর ছোঁয়াচ-লাগা উচ্চারণে আবৃত্তি এক আশ্চর্য ধ্বনিময় সৌন্দর্যে আমার দুই কান এবং মন পরিপূর্ণ করে দিলে। বুঝলাম মেয়েটি নিজের মাতৃভাষার সঙ্গে সমান প্রেমে বাংলাভাষা শিক্ষা কবেছে। তার মাথার রুখু চুলে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললাম—তোমাকে কে শেখালে এগুলো? তোমার বাবুজী সাহাব?

—জী! ই কিতাব হম পুবা শিখ লিয়া!

আমার মনে হল মেয়েটি সহজপাঠখানি যেভাবে আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিল তাতে ও এই বইখানির প্রেমে পড়েছে! তাই এতগুলো বইয়েব মধ্যে এই বইখানিকেই ও বিশেষ সম্পদের মত মনে করে।

স্থুরস্থতিয়া আমাকে বললে—বাবুজী সাহাব আমাকে বলেছেন, আমি একটু বড় হলে আমাকে গয়ার ইস্কুলে পড়তে দেবেন। তারপর সেখানে পড়া শেষ হলে আমাকে 'কলকাত্তার' কালেইজে পড়াবেন।

সেদিন সকালে বেড়াতে গিয়ে দৈবক্রমে আমি আবিষ্কার করে ফেললাম স্থুরস্থতিয়ার মনটিকে। আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতা থেকে অনেক দূরে এক অরণ্যপ্রান্তে বাস ক'রে যার মনে শুধু এই অরণ্যের ভাব আর ভাবনাই থাকবার কথা, সে সভ্যতার শ্রেষ্ঠতম শিক্ষালাভের স্বপ্ন দেখছে এটা তো সোজা কথা নয়! ওকে উৎসাহিত করে বললাম—সে তো খুব ভাল হবে। প্রথমে গয়ায়, তারপর কলকাতায় লেখাপড়া শিখবে, সহুরে মেয়েদের মত সাজপোষাক কববে। বি. এ., এম. এ. পাশ করে একটা খুব লেখাপড়া-জানা ছেলের সঙ্গে তোমার সাদী হবে।

সঙ্গে সঙ্গে ওদিক থেকে প্রতিবাদের ঝড় উঠল। ছ'বছরের স্থুরস্থতিয়ার মাথাটা প্রতিবাদে ঘন ঘন আন্দোলিত হতে লাগল। আমি তার

প্রতিবাদের প্রবলতা দেখে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—কি, তুমি সাদী করবে না ?

সঙ্গে সঙ্গে সাফ জবাব—নহি, নহি, হম সাদী ন করব্ !

—তব ?

—আমি লিখাপড়ি করে ফৌজে যাব ! সেখানে কামান-বন্দুক লিয়ে লড়াই করব।

আমি হাঁ হয়ে গেলাম। তবে ব্যাপারটা বুঝলাম সঙ্গে সঙ্গেই। ছ'বছরের সুরসুতিয়ার আদর্শ হলেন শিবাজী মহারাজ ! বীরবিক্রম শিবাজী মহারাজের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সে বীরনারী হতে চায় ! আমার আর তাতে আপত্তি কি ? ও বীরনারী যদি হতেই চায় তো তাই হোক ! তবে একটু কৌতুক করার লোভ সামলাতে পারলাম না। বললাম—উসকে বাদ ? লড়াইকে বাদ ? লড়াইয়ের পর কি করবে ? সাদী করবে না !

আবার সেই ঘাড় নাড়া—নহি ! কভি নহি !

বলতে বলতে ওর সুন্দর মুখখানি রাঙা হয়ে উঠল।

আমি ওর মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। এই বিচিত্র ও স্বাদু অভিজ্ঞতা অনেক হল। আর কি ! একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ জীবনের খেলা-ঘরের অভিজ্ঞতা ও বালককালের স্বপ্ন নিয়ে কতক্ষণ নিজেকে ব্যাপৃত রাখতে পারে ?

আমি উঠবার জন্য পা বাড়াতেই দেখলাম ওদিক থেকে সুরসুতিয়ার মা মাথায় ঘোমটা টেনে হাতে একটা কাঁচের গেলাস সযত্নে ধরে ধীর পায়ে আমার দিকেই আসছে। তার গ্লাসের দিকে চেয়ে ধীর পদক্ষেপ দেখে বুঝলাম গ্লাসের মধ্যে কোন তরল আধেয় আছে।

ওর মা আমার কাছে এসে বাঁ হাত দিয়ে মাথার ঘোমটাটি বাড়িয়ে নিজের সুন্দর মুখখানি আবৃত করে গ্লাসটি মেয়ের হাতে ধরিয়ে দিয়ে ফিস ফিস করে বললে—বাবুজীকে দাও !

গ্লাসটা মায়ের হাত থেকে নিয়ে সুরসুতিয়া আমার দিকে হাসিমুখে বাড়িয়ে দিয়ে বললে—পিজিয়ে বাবুজী ! গরম ভঁয়সা দুধ !

এ অরণ্য অঞ্চলের অতি উপাদেয় খাদ্য ! যে কোন অতিথিকেই এ দিয়ে উৎকৃষ্ট আপ্যায়ন চলে !

আমি হাত বাড়িয়ে গ্লাসটি নিয়ে চুমুক দিলাম।

আঃ, চমৎকার ! খাঁটি গরম দুধে চিনি দেওয়া হয়েছে। বেশ পরিতৃপ্তির সঙ্গে

চুমুক দিয়ে আস্তে আস্তে দুধটুকু খেতে লাগলাম। খেতে খেতে হঠাৎ একটা কথা মনে হল। জিজ্ঞাসা করলাম—তোমরা চিনি খাও?

সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নেড়ে সুরস্থতিয়া বললে—হাঁ! চিনি গুড় দুইই খাই! বাবুজী সাহাব সহর থেকে মধ্যে মাঝে চিনি এনে দেন!

বুঝলাম! বুঝলাম চামারিয়ার পরিবারটি শিবাজীর বিশেষ স্নেহপুষ্ট! কিন্তু এ স্নেহের উৎসমূল কোন্‌খানে তা ধরতে পারলাম না। এর কারণ কি? কে? চামারিয়া, না তার স্ত্রী না তার কন্যা? এ জানা যাবে না। এ প্রশ্ন শিবাজীকেও করা যাবে না। করলে হয়তো শিবাজী এর জবাব দেবে না। সে নিজের মনের দিক থেকে নির্মল হলেও হয়তো উত্তর দিতে পারবে না!

আমি দুধ খাওয়া শেষ করে ওদের ধন্যবাদ জানিয়ে গ্লাসটি সুরস্থতিয়ার হাতে দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। হেসে বললাম—সুরস্থতিয়া, তুমি বড় হলে পুরো বাঙ্গালীন্ হয়ে যাবে।

দেখলাম সুরস্থতিয়ার মা ঘোমটার আড়ালে আমার কথা শুনে হাসছে।

আমি পা বাড়ালাম।

এতক্ষণ বসেছিলাম পিপুল গাছের ছায়ায়। রোদের তাতটা ঠিক বুঝতে পারিনি। রৌদ্র ইতিমধ্যে তীব্র ও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। পিছন ফিরে চেয়ে দেখলাম একবার। যখন ছায়ায় প্রথম বসেছিলাম তখন আমার মাথার উপরের ছায়া আর পাশের রৌদ্রের বর্ণে ও উত্তাপে খুব একটা পার্থক্য ছিল না। এখন ছায়া যত গভীর ও শ্যামস্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে রৌদ্র তত তীক্ষ্ণ ও তীব্র। পিছন ফিরে সেই ঘন শ্যাম ছায়া আর তীব্র আলোর বৈপরীত্যটুকু বড় ভাল লাগল।

কিন্তু বিশ্বসংসারের এ রূপ আর সৌন্দর্য দেখার মন আর সময় দুইই কোথায় মানুষের! আমার হাতে অলস অবসর ছিল, তাই দেখবার সুযোগ হল।

পা বাড়ালাম।

পিছন না ফিরেই বুঝলাম, সুরস্থতিয়ার মা সুরস্থতিয়াকে কিছু বলছে ফিস ফিস করে। তাই শুনে আমার পিছন থেকে সুরস্থতিয়া মিষ্টি গলায় হেঁকে বললে—বাবুজী, কাল ভি সবেরে আনা। গরম ভঁইসা দুধ পিজিয়েগা চিনিকে সাথ।

পিছন ফিরে হেসে বললাম—আসব!

তারপর চলতে লাগলাম বাংলোর দিকে।

চলতে চলতে ভাবলাম, এখন বাংলোয় ফিরে কি করব! আমার তো মনে হতে লাগল, আমি বাংলাদেশের এক পাড়াগাঁয়ের ছেলে, কর্মসূত্রে গিয়ে পড়েছি

কলকাতা মহানগরীতে। সেখান থেকে সামান্য মাসিক অর্থের বিনিময়ে সেই কাজের সুতোর টানে এসে পড়েছি ভূগোলের বাইরের এই দেশে। যার আমি কিছুই চিনি না, জানি না ; এবং জানবার বা চিনবার মনও নেই।

তবু এই অজানা রাজ্যের একমাত্র আশ্রয় আমার যেখানে সেইখানে ফেরাই ভাল। চারিদিক একান্তভাবে নিস্তব্ধ। গোরু-মোষগুলো এদিক ওদিক চরে বেড়াচ্ছে। তাদেরই কারও ডাক শোনা যায় কচিৎ। সে ক্ষণিক ডাক শেষ হলেই যেন স্তব্ধতা আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে। এদিকে ওদিকে ছড়ানো এলোমেলো ছোট-বড় গাছপালা। দূরে দূরে ঘাস-ঢাকা মাঠ আর আমার চারিপাশে ধুলো-ভরা জমি আর রাস্তা। বেলা বেড়েছে, রোদ চড়েছে, এলোমেলো বাতাস বইছে। তার সঙ্গে উড়ছে ধুলো। একপা একপা করে অলস মনে এগিয়ে চলতে চলতে মনে হল আমার চারিপাশের বিশ্বসংসার যেন গভীর শান্তি ও নিশ্চিন্ততায় রৌদ্রস্নান করছে।

কথাটা ভাবতে ভারী ভাল লাগল।

কথাটার গায়ে গায়ে অলস মনে আরও কথা এসে গেল। এই রৌদ্রস্নান করতে করতে এই নিস্তব্ধ বিশ্বসংসার কি ভাবছে ?

তা জানি না।

হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হল। পিছনে যেন ট্রাকের শব্দ উঠছে।

ফিরে চাইলাম।

দেখলাম একটা ট্রাক বনের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে বেশ জোরে। আর একটু দেখতেই মনে হল যে ট্রাকটা এখুনি হরিয়া-টরিয়াকে নিয়ে গেল সেই ট্রাকটাই ফিরছে।

কি ব্যাপার ?

আমি ভাবতে ভাবতেই ট্রাকখানা প্রবল বেগে এসে দাঁড়াল আমার পাশে ব্রেক কষে। ড্রাইভারের পাশ থেকে শিবাজী গলা তুলে আমাকে বললে—উঠে পড় ভাগনা। জলদি !

কেন রে বাবা ! এখান থেকে এই বাংলো পর্যন্ত এইটুকু যাব তার জন্যে আবার ট্রাকে উঠব কেন ?

আবার গলা বাড়িয়ে তাগিদ এল—কি করছ খুনি ভাগনা ! উঠে পড়, উঠে পড়, দেরী ক'রো না !

আর ভাববার অবকাশ পেলাম না। কিন্তু ! কিন্তু শিবাজীর মুখখানা অমন কেন ?

উঠে পড়লাম ড্রাইভারের পাশে। ওদিকে লরা আর শিবাজী বসে আছে। তাকালাম ওদের দিকে!

আরে, একি ব্যাপার! শিবাজী আর লরা দুজনেরই মুখ কেমন যেন ফুলে উঠেছে। লরার বেশী। সে ঝিমিয়ে পড়েছে। তার চোখের পাতা দুটো ভারী হয়ে বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—কি হল?

ফোলা ফোলা মুখে হেসে উঠল শিবাজী। হাসতে হাসতে বললে—সে এক কাণ্ড ভাগনা!

দেখলাম যদিও শিবাজী তার আনন্দময় স্বভাবমত হাসছে, তবু হাসতে তার কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু কাণ্ডটা যে কি তা ঠিক বুঝছি না।

ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করলাম—কি হয়েছে?

ড্রাইভার বললে—মদ্মে কাটা হ্যায়! দোনোকো!

তার মানে মৌমাছিতে কামড়েছে!

মাথামুণ্ডু কিছুই ঢুকছে না মাথার মধ্যে। দুজন বয়স্ক মানুষকে কি করে মৌমাছি কামড়াতে পারে এটা কিছুতে বোধগম্য হল না আমার কাছে। এমন কোন্ বিপত্তির মধ্যে ওরা দুজনে পড়তে পারে তা আন্দাজে আসছে না আমার। তা হলে ওই দুটি বয়স্ক মানুষ কি এমন কোন প্রগলভতা বা চাপল্য প্রকাশ করেছিল সেই প্রথম ভাগের বেণীর মত যার ফলে রুষ্ট মৌমাছিরা ওদের দংশন করেছে?

কি জানি!

যাই হোক, আমরা কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বাংলোয় পৌঁছে গেলাম। কষ্ট হলেও শিবাজী গভীর ফূর্তি দেখিয়ে লাফিয়ে নামল ট্রাক থেকে। তারপর গভীর মমতার সঙ্গে দু হাত দিয়ে আদর করে সে লরাকে নামিয়ে নিলে। যে মমতা ও স্নেহের সঙ্গে সে নামিয়ে নিলে লরাকে তাতে আমার ভারী ভাল লাগল তার আতিশয্য সত্ত্বেও।

লরা তখন প্রায় বিপর্যস্ত। সে টলছে। তার মুখখানা এবং দুই হাত এরই মধ্যে ফুলে উঠেছে। ফর্সা রঙ রাঙা হয়ে উঠেছে। মুখখানা এই কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই যেন আরও খানিকটা ফুলে উঠল। একদিকে শিবাজী, অন্যদিকে আমি তার হাত ধরে বাংলোর মধ্যে তার ঘরে তাকে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলাম।

এই সময় হরিয়া এসে দাঁড়াল। অন্যেরাও এসে দাঁড়িয়েছে বাংলোর নীচে ভীড় করে।

হরিয়া শিবাজীকে বললে—বাবুজী সাহাব, আপনি শুয়ে পড়ুন। আমি আপনার এলাজ করে দি!

ফোলা মুখে তখনও হাসছে শিবাজী। হাসতে হাসতে বললে—কি এলাজ করবিরে হরিয়া?

সে কোমরের থেকে ঝোলানো ছোট্ট একটি থলে হাতে নিয়ে তার থেকে কিছু বের করলে।

শিবাজী জিজ্ঞাসা করলে—কি রে ওটা?

আমি পাড়াগাঁয়ের ছেলে। ব্যাপারটা সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম। হরিয়া সন্না বের করেছে হুলগুলি তুলে ফেলবার জন্য। হরিয়া কিছু বলার আগে আমিই বললাম—তোমার গায়ে মুখে যে হুলগুলো বসে আছে সেগুলো সন্না দিয়ে টেনে তুলে ফেলতে পারলে যন্ত্রণা এবং কষ্টটা অনেক কম হবে বুঝলে মামা!

ফোলা মুখে আবার হাসল শিবাজী। হাসিমুখে সে হাত বাড়িয়ে দিলে হরিয়ার দিকে—কই তোর সন্না দে, দেখি!

আমি বললাম—তুমি নিজে সন্না নিয়ে কি করবে? নিজে তো তুলতে পারবে না, হরিয়া তুলে দিক।

শিবাজী তখনও সন্নার জন্যে হাত বাড়িয়ে আছে। সেই অবস্থাতেই আমাকে বললে—ভাগনা, তুমি খুনি, মানে খুনি তোমার মাথায় বুদ্ধি একটু কম আছে!

—কেন? ভুরু কুঁচকেই জবাব দিলাম।

—বুঝছ না lady's first. আগে লরার গুলো তুলে দিতে হবে না?

সত্যিই তো! লরার কথাটা খেয়ালই হয়নি। বললাম—হ্যাঁ, তা তো বটে!

আমার সমর্থনে উৎসাহিত হয়ে শিবাজী বললে—কি ভাগনা, আমি খুনি ঠিক বলিনি?

বলেই আমাকে হাতে ধরে টেনে সে ডাকলে—আয় রে হরিয়া!

আমরা তিনজনে লরার ঘরে ঢুকলাম। বাংলোর চারিপাশে বড় বড় গাছপালার জন্যে এই সকালবেলাতেও ঘরে খানিকটা আবছা অন্ধকার। সন্না হাতে নিয়ে সে ঝুঁকে পড়ল লরার মুখের উপর।

হরিয়া বললে—বাবুজী সাহাব, আমাকে দিন, আপনি পারবেন না—

কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে ধমকে উঠল শিবাজী—বলিস কি রে, আমি পারব না?

ছোট ছেলেকে যেমনভাবে বয়স্ক মানুষ মিথ্যে স্তোক দেয় তেমনিভাবে হেসে হরিয়া বললে—উ তো ঠিক বাত হুজুর! তবে আপনার অভ্যেস নেই, আমার

আছে এই আর কি। আমি এই তো দু দিন পহেলে চিমনীর হুলগুলো দো মিনটমে তুলে দিয়েছি।

—তবে তুই তোল। বলে সম্নাটা সে হরিয়ার হাতে ধরিয়ে দিলে।

সঙ্গে সঙ্গে কাজে লেগে গেল হরিয়া। লবার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে সে ক্ষিপ্রহাতে টুক টুক করে বিষাক্ত হুলগুলো টেনে তুলে নিজের বাঁ হাতের তালুতে চেঁছে রাখতে লাগল।

লবা প্রথমটায় যন্ত্রণাকাতর আক্ষেপ করে উঠেছিল। তারপর তাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিতেই সে এই সামান্য উপদ্রবটুকু মেনে নিলে। হরিয়া আস্তে আস্তে ওর মুখের সামনের দিকের সব হুলগুলি তুলে ওর ঘাড় মাথা সব তন্ন তন্ন করে দেখে সে জায়গাগুলিও দোষমুক্ত করলে।

শিবাজী বললে—আব উনকি পায়ের দেখো। পায়েরসে উঠাও।

শিবাজী যেন কি। অল্পবয়সী মেয়ে লবা। তার পা দেখবে হরিয়া কেমন ভাবে? তা ছাড়া ওর পা ছাড়িয়ে ওর যুবতীদেহের নানান স্থানে মৌমাছির দংশনক্ষত রয়েছে। সে সব হরিয়া পরীক্ষা করবে কি করে? আমি বললাম—মামাজী, ও কাজ তো হরিয়া পারবে না, পারবার কথাও নয়। তুমি সুরস্থতিয়ার মাকে ডেকে পাঠাও বরং। সে এসে ওর সমস্ত দেহটা দেখে আস্তে আস্তে সব হুলগুলো তুলে দিক।

শিবাজী বোধহয় বুঝল আমার কথাটা। সুতরাং একটু পরেই সুরস্থতিয়ার মা এসে হাজির হল। শিবাজী দেখলাম বেশ ঘনিষ্ঠতা অথচ সম্রমের সঙ্গে বললে—ফুফাজী, দেখিয়ে তো উযো লেডকীকো। থোড়া কাম হ্যায়। হরিয়া দেখলা দেগা আপকি।

শিবাজীর ফুফাজী, সুরস্থতিয়ার মা হরিয়ার সঙ্গে ঘরের ভিতর চলে গেল। তারপর হরিয়া বেরিয়ে আসতেই সে ঘরটা বন্ধ করে দিলে।

আমরা বারান্দায় ব'সে রইলাম। শিবাজীর মুখখানা এই সময়ের মধ্যে আরও ফুলে উঠল। দেখে আমি বললাম—মামা, তোমার হুলগুলো আর একটু আগে তুলতে পারলে ভাল হত।

তার হাতের পাতা এবং আঙুলগুলোও বেশ ফুলে উঠে রাঙা হয়ে উঠেছে। সেই ফুলো হাত নেড়ে সে সোৎসাহে বললে—কই ডর নহি ভাগনা। হম তো ফৌজী আদমি হ্যায়। হমারা কুছ নহি হোনা।

ফৌজী আদমি যখন শিবাজী, তখন তার আর কিছু হবে না এ কথা ভালই। তবে ও একাধারে হয়ে মানে এক হৈ চৈ করা লোক এবং কিঞ্চিৎ বোকা। তবে

হ্যাঁ, ওর সহ্য করার শক্তি যেমন, মনটাও তেমনি। এত ক্লেশের মধ্যেও ওর মনের ফূর্তি ও প্রসন্নতার বিন্দুমাত্র কমতি ঘটেনি। সমানে হৈ হৈ করে যাচ্ছে যন্ত্রণার মধ্যেও। যেন কিছুই হয়নি।

বেশ কিছুক্ষণ পর স্বরস্বতিয়ার মা ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

শিবাজী জিজ্ঞাসা করলে—সব হো গয়া ফুফাজী?

মাথার ঘোমটা টেনে, মাথা নেড়ে ফুফাজী জানিয়ে গেল—হ্যাঁ, সব ঠিক হয়ে গিয়েছে।

তবে সে বলে গেল—উনকি বোখার আগিয়া! বেশ জ্বর এসেছে। আমি গায়ে ঢাকা দিয়ে চাপা দিয়ে এসেছি।

হরিয়া সন্না হাতে এসে দাঁড়াল শিবাজীর সামনে। হেসে বললে—চলিয়ে বাবুজী সাহাব, আব আপকো ইলাজ। এবার আপনার চিকিৎসা, আপনার গায়ের হুলগুলো তুলে দি।

ফুলো মুখে তখনও হা হা করে হেসে নিয়ে শিবাজী বললে—আয়, তোল তা হলে।

হাসতে হাসতেই সে আমাকেও বললে—এসো ভাগনা, হরিয়ার অপারেশন দেখবে এস!

সে নিজের ঘরে চৌকির উপর শুয়ে পড়ল হাত-পা ছড়িয়ে। তারপর প্রায় হল্লা করেই বললে—আয়রে হরিয়া!

হরিয়া কাজে লেগে গেল। বাহাদুরী আছে শিবাজীর। সে সেই যে হাত-পা ছড়িয়ে চুপচাপ শু'ল, একবার নড়ল না। হরিয়া সন্না দিয়ে খুজে খুঁজে প্রথমে ওর মুখ, তারপর সর্ব অঙ্গ থেকে একটি একটি করে মৌমাছির হুল তুলে ফেললে। দেখলাম, শিবাজীর যেমন যন্ত্রণা ভোগ করবার শক্তি অপরিসীম, তেমনি ওর লজ্জাও কম। হরিয়ার ও আমার সামনে নিজের দেহটাকে প্রায় সম্পূর্ণ অনাবৃত করতেও ওর বিশেষ সঙ্কোচ দেখলাম না। খানিকটা অদ্ভুত লাগল বৈকি!

অনেকক্ষণ পর যখন হরিয়া ওকে সম্পূর্ণ হুলমুক্ত করে দিলে তখনও সে তেমনি নিঃসাড়ে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে। হরিয়া কাজ শেষ করতেই সে বললে—আরে হরিয়া, বেশ জোর বুখার এসে গিয়েছে। তুই আমার গায়ে বেশ ভাল করে একটা চাপা দিয়ে দে!

তারপর হেসে আমাকে বললে—বুঝলে ভাগনা, 'মদ'গুলো বহুত জোর কামড়েছিল!

আমি ওর গায়ে চাদর চাপা দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম! যাক এক পর্ব শেষ হল। মৌমাছি-দংশনের ফলে লরা এবং শিবাজী ছ জনেরই জ্বর এসে গেল! কিন্তু ব্যাপারটা কেমনভাবে ঘটল সেটা জানা হল না।

ব্যাপারটা শুনলাম হরিয়ার কাছ থেকে।

হরিয়ার নির্দেশ মত ঠিক চিনে চিনে ছ' নম্বর শালগাছের পিছনে বুড়ো শিরীষ গাছটার কাছে পৌঁছুল। তখন কিছুক্ষণ আগে সূর্য উঠেছে। ঘন শালবনের অন্ধকার তখনও পুরো না কাটলেও বড় বড় গাছের ফাঁক দিয়ে আলো এসে পড়ছিল অরণ্যের মাটিতে পাতলা কুয়াশার আবরণ ভেদ করে। সৌভাগ্যক্রমে যেখানটায় অর্কিডটা ফুটেছিল তার উপরেও আলো পড়েছিল।

লরা আর শিবাজী মাটির উপর থেকে সেই আলোকসম্ভূত পুষ্পগুচ্ছকে দেখলে নন্দনের পারিজাতের মত। লরা তো গভীর উৎসাহে উৎসাহিত। সে প্রায় কচি খুকীর মত অনেক উঁচু ডালের সেই ফুলের দিকে হাত তুলে লাফাতে আরম্ভ করেছে।

শিবাজী বেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ফুলগুলির আবির্ভাবস্থলটি লক্ষ্য করছিল এবং মনে মনে হিসাব করছিল কি ভাবে সে ফুলগুলির কাছে যাবে। দুটো অসুবিধা আছে। প্রথম হল বুড়ো শিরীষ গাছের একটা ডালের একান্ত প্রান্তভাগে ফুলটা ফুটেছে। তার চেয়েও বড় কথা, ফুল যেখানে ফুটেছে তারই ঠিক উপরের সমান্তরাল ডালে অর্কিড গাছটার মাথার প্রায় ঠিক উপরেই মস্ত এক মৌমাছির চাক।

লরার প্রবল উৎসাহে জুতো খুলে রেখে শিবাজী হরিয়ার নির্দেশমত তার পাশের শাল গাছে না চড়ে বহু কষ্টে চড়ল শিরীষ গাছটাতেই। তার হাতে একটা তীক্ষ্ণ মুখ লাঠি ছিল, যার খোঁচায় সে অর্কিডটাকে তার মূলশুদ্ধ শিরীষ গাছের দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করবে।

সে শিরীষ গাছে উঠল, আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল ডাল ধরে অর্কিডের গাছের কাছে। তারপর লাঠি দিয়ে গাছটাকে বিচ্ছিন্ন করবার চেষ্টা করতে লাগল। এমন সময় লরা এক কাণ্ড ঘটালে। উৎসাহের আতিশয্যে সে নীচে থেকে ক্রমাগত শিবাজীকে পরামর্শ ছুঁড়ে দিচ্ছিল। শেষে আর থাকতে না পেরে সে বলে উঠল, শিকড়গুলোর অনেকগুলো তার চোখের আড়ালে রয়ে গিয়েছে ডালটার নীচের দিকে। বলতে বলতে সে মাটি থেকে একটা শুকনো ডালের টুকরো নিয়ে উপর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললে—দেয়ার! দেয়ার!

আর তারপরই কাণ্ড। ডালটা লাগবি তো লাগ লাগল মৌচাকে। সঙ্গে সঙ্গে ক্রুদ্ধ মৌমাছিরা চঞ্চল হয়ে উঠল। সুতরাং অর্কিডে শেষ খোঁচা দিয়ে, অর্কিডকে স্থানচ্যুত করে নীচে লাফিয়ে পড়ল শিবাজী। গাছ আরও দুলল। আক্রমণ সুতরাং প্রবলতর হয়ে উঠল। তার ফলে লরা এবং শিবাজী দুজনেই পরাজিত এবং বিধ্বস্ত।

আট

ভয় সত্যই হয়েছিল। বেশ খানিকটা। কিন্তু হুলগুলো সন্না দিয়ে টেনে বের করে দেওয়ার জন্য জ্বালাযন্ত্রণাব অনেকটা উপশম হয়েছিল। আমি নিজে পল্লীগ্রামের ছেলে, আমি এ তথ্যটা জানতাম। দশ পনের মিনিট বাদে লরা সুস্থ বোধ করলে এবং বললে you are a magician Mr. Sircar জ্বালা-যন্ত্রণা আর নেই!

শিবাজী বললে—গুড্। এখন সকাল সকাল খেয়ে-দেয়ে ঘুমোও।

লরা হি-হি কবে হেসে উঠল। সে হাসি তার গড়িয়ে গড়িয়ে চলছিল। লরা যে সুস্থ হয়েছে অনেকটা তাতে সন্দেহ রইল না কিন্তু তাব হাসিটা বড় নির্লজ্জ মনে হচ্ছিল। আমিই বললাম—কিন্তু এমন হাসছ কেন?

লরা নির্লজ্জের মত শিবাজীর ফুলে ওঠা মুখখানার দিকে আঙুল দেখিয়ে কিছু বলতে গেল কিন্তু বলতে পারলে না, আবার হাসতে লাগল।

এবার শিবাজীও হা-হা শব্দে অট্ট হেসে ফেটে পড়ল। এবং সেও তার মুখের দিকে আঙুল দেখালে।

আমিও না হেসে পারলাম না।

এই হাসি অল্পক্ষণে শেষ হ'ল না। এ হাসি চলল প্রায় গোটা একটা দিন—মানে পুরো চব্বিশ ঘণ্টা। সে রাত্রি এবং পর-দিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। পরের দিন আমার হাসি আর পায় নি। বরং বিরক্তি বোধ করছিলাম। মনে হচ্ছিল বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে।

পরের দিন সকাল পর্যন্ত দুজনেরই মুখ প্রায় হাঁড়ির মত গোল হয়ে উঠেছিল। পল্লীগ্রামে বলে, মুখখানা হাঁড়ির মত ফুলেছে। সেদিন হাঁড়ির উপমাটাই মনে পড়েছিল। তার আগে একটা কাণ্ড ঘটেছিল কয়েক মিনিটের জন্য সেটা হল সকালে উঠেই লরা প্রথমটা কাঁদতে সুরু করেছিল। সকালে উঠেই মুখে হাত

বুলিয়ে দেখে, আয়না বের করে তার চক্ষু-নাসিকাবিহীন মাংসপিণ্ডাকৃতি মুখের প্রতিবিম্ব দেখে সে কেঁদে ফেলেছিল। শিবাজী তখন তার বাংলোয় ছিল না—সে বেরিয়ে গিয়েছিল কাজে।

পুতনলাল, শিবাজীর একচক্ষু বেয়ারা, সে এক বাটি চা তৈরী করে মেম সাহেবের দরজায় ডাকতে গিয়ে তার উত্তর পায় নি, শুধু কান্নার ফোঁসফোঁসানি শুনে ফিরে এসেছে। এসে আমাকে কথাটা বলতেই আমি লরার ঘরের দরজার কড়া নেড়ে তাকে ডাকলাম। লরা—শুনছ। লরা!

লরা কান্না থামিয়ে তিক্তকণ্ঠেই বললে—কি চাই তোমাদের? আমি এখন বাইরে বেরুতে পারব না! আমাকে বিরক্ত ক'র না। যাও। যাও।

জিজ্ঞাসা করেছিলাম—কি হ'ল তোমার? বেশি যন্ত্রণা হচ্ছে?

—না—না—না!

—তবে

লরা এবার খুব রাগ ক'রেই হঠাৎ দরজা খুলে মুখখানা আমাকে দেখাবার জন্যই বের ক'রে বলেছিল—এই মুখ দেখানো যায়? মুখখানা সত্যই বীভৎস কুৎসিত দেখাচ্ছিল; শুধু ফোলাই নয়—তার উপর শিবাজীর লাগিয়ে দেওয়া পাতা-বাঁটা প্রলেপের রসে মুখখানা কাল দাগের ছাপ হোলির দিনের লাল কালো আবীর এবং রঙমাখা মুখের মত বিচিত্রিত হয়ে উঠেছে। পাতার ছোপ লাগা জায়গাগুলো কালো এবং বাকীটা এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান নন্দিনীর ফ্যাকাসে অংশটা ফুলে উঠার জন্য লাল রঙমাখানো মনে হচ্ছে!

একবার মুখ দেখিয়েই সে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলে। এবং কাঁদতে কাঁদতে বললে 'এমন ফুলেছে এ নিশ্চয় সেফটিক হয়ে গেছে, পেকে উঠবে। অপারেশন ভিন্ন ভাল হবে না। এ আমি কি করব? একটা আগ্‌লি হ্যাগ হয়ে যাব চিরদিনের মত নো বডি উইল লুক এ্যাট মাই ফেস।' বলেই লাফ দিয়ে উঠল। ধিঙ্গী মেয়ের খুকীপনা অসহ্য। নইলে অবশ্যই হাসির কথা। ছোট মেয়ে এ কথা বললে সস্নেহ কৌতুকে নিশ্চয় হাসতাম। বিরক্তিভরে ফিরে আসছিলাম কিন্তু হঠাৎ কাজের কথা মনে পড়ল। আমার মালিক—শ্বশুর হলেও তাঁকে মালিকই বলে—তিনি নিচের দিক ছাড়া উপরের দিকে তাকান না। অহরহই সেখানে ব্যস্ত জগতের স্বার্থান্ধতার অন্ধকার গগ্‌লসের মত পরানো আছে। সেটা প্রায় কর্ণের জন্মগত কবচকুণ্ডলের মত। মুহূর্তের জন্য তাকে খুলে রাখা যায় না। তিনি মৌমাছি-লরা সংবাদ বিশ্বাসই করবেন না। মনে মনে ভাববেন শিবাজীর সঙ্গে জুটে লরাকে নিয়ে নিশ্চয়ই অশোভন হৈ-হৈ রৈ-রৈ উল্লাসে

প্রমত্ত হয়েছি। তাই আমি ফিরে গিয়ে আবার দরজায় ধাক্কা দিয়ে বললাম—কিন্তু কাজের কি হবে? কৈফিয়ৎ কি দেবে রায় সাহেবকে? তিনি তো পাঁচদিন সময় দিয়ে গেছেন। তার দুদিন চলে গেল!

—তুমি যাও না, কাজ কর গে। আমি পারব না!

—তা হ'লে কলকাতা ফিরে চল। অন্তত ওই মুখখানা বস্‌কে দেখিয়ে বলতে পারবে—এর জন্যে ফিরে আসতে বাধ্য হলে!

—এই বিশ্রী মুখ নিয়ে আমি বেরুব? হাওড়া স্টেশনে নামব? নো—নো—নো! তোমার যা খুশী করগে যাও! যাও না—একলা কাজগুলো করগে!

ঠিক এই সময়েই শিবাজী ফিরল। সঙ্গে একদল লোক তারই এখানকার মিস্ত্রী, সর্দার, মজুর।

শিবাজীর মুখখানাও হাঁড়ির মত ফুলেছে। কিন্তু ওই কালো দাগটা বিশেষ বোঝা যাচ্ছে না। একে বঙটাই তামাটে—তাও উজ্জ্বল তামাটে নয়, কিন্তু তবুও সে কোন কিছু দিয়ে সকালেই—ওই পাতার রসের দাগ মুছে ফেলেছে—তাতে সন্দেহ নেই। হাতে একটা কাটা ডালে সেই পুষ্পিত অর্কিড এবং কাঁধের উপর একটা বাঁদর ছানা। সেটাব গলায় দড়ি বাঁধা, দড়িটা শিবাজী হাতেব মুঠোয় ধরে আছে।

সে বললে—কি ব্যাপার খুনি ভাগ্না।

বললাম—লরা কাঁদছে।

—কাঁদছে? কেন? আবাব কি হ'ল-খুনি?

—হবে কি? বদনখানি সুডোল একটি গোলাকার বস্তুতে পরিণত হয়েছে তোমার মতই তাতে খুকী লজ্জায় মরে গেলেন।

হা-হা ক'রে হাসতে লাগল শিবাজী।

আমি মরে গেলাম। সে উদ্ভট ভাবনা কত? এত যখন ফুলেছে তখন নিশ্চয় সেপটিক হয়েছে। পেকে উঠবে। অপারেশন করতে হবে। এবং তারপর ওর চন্দ্রবদন পূর্ণিমার চাঁদের রূপ হারিয়ে শেয়ালে খাওয়া তরমুজের মত চেহারা নেবে। তখন কেউ আর ওর দিকে তাকাবে না। তাকালে হাসবে।

শিবাজীর সেই অট্টহাসি তখনও চলছে। আমি অবশিষ্ট কথাগুলি বলে, বললাম—কলকাতাও ফিরবে না—ওই মুখ নিয়ে।

শিবাজী এবার দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকলে—হ্যালো মিস! হ্যালো!

এবার ক্রুদ্ধ স্বরেই জবাব এল—What? What do you want? তার

সঙ্গে পদশব্দ শুনলাম। বেশ সশব্দ পদধ্বনি। এবং দরজাটাও সশব্দে খুলে বললে—কি ? কি চাই ? কোন অসুস্থ লোককে—

কথাটা সে শেষ করতে পারলে না। শিবাজীর মুখের দিকে তাকিয়ে সে হেসে উঠল। সেই কালকের মত। শিবাজীর হাসিও বেড়ে গেল।

তার মধ্যেই লরার দৃষ্টি পড়ল—শিবাজীর হাতে সেই ডাকশুদ্ধ অর্কিডের উপর। তার হাসি থেমে গেল। Oh ! সেই অর্কিড ! ও !—কি সুন্দর বলে সে হাত বাড়ালে। কি ভাল লোক তুমি সরকার। ও !—দাও—দাও !—

সে অর্কিডটা প্রায় ছিনিয়েই নিলে। এবং তুলে ধ'রে দেখতে লাগল ! শিবাজী বললে—আরও দেখ। কি এনেছি তোমার জন্যে ! বলেই সে হাতের দড়িটা ধরে একটু টান দিয়ে ডাকলে—আরে যাদ্দু !

বাঁদর ছানাটা এতক্ষণে শিবাজীর কাঁধের উপর পিঠের দিকে লুকিয়েছিল। লরা যখন সশব্দে দরজা খুলে আচমকা চীৎকার করে বেরিয়ে এসেছিল তখন সে কাঁধ থেকে পিঠের দিকে একটু ঝুলে পড়ে লুকিয়ে পড়েছিল। এবার দড়ির টানে কাঁধে উঠে—ঝুপ ক'রে নেমে—শিবাজীর হাতের উপর এবং তার মুখের দিকে তাকিয়ে, কিচ্ কিচ্ শব্দ ক'রে কিছু বললে।

একটা ভয়ার্ত—ই—শব্দ করে লরা হাতের অর্কিড ফেলে দিয়ে ছুটে ঘরের মধ্যে পালিয়ে গিয়ে চীৎকার করতে লাগল। নো—নো—নো। সরকার—প্লিজ্—প্লিজ্—প্লিজ্ !

শিবাজী বললে—কোন ভয় নেই। কোন ভয় নেই !

—না—না—না। ও কামড়ে দেবে—না। ফেলে দাও—ওটাকে ফেলে দাও। সরকার প্লিজ্। ফর হেভেন্স্ সেক !

শিবাজী—বললে—যাদ্দু উত্রো, নিচে নামো।

—পায়ের দাবাও—

যাদ্দু শিবাজীর একখানা পা দু'হাতে জড়িয়ে ধরলে। শিবাজী একটু ধমক দিয়ে বললে—দাবাও !

এবার যাদ্দু তার দুহাত দিয়ে পা টিপতে লাগল।

শিবাজী এবার বললে—অব তো নাচা করো। নাচো ! যাদ্দু উঠে দুপায়ে দাঁড়িয়ে তার লেজটা টেনে দু হাতে ধ'রে নাচতে লাগল।

শিবাজী সমঝদারের মত মাঝে মাঝে—আ হো—আহো—বলে বাহবা দিলে। বাঁদরটা দুটো লাফ দিয়ে নৃত্য শেষ করে আবার একটা সেলাম জানালে।

এতক্ষণ লরা মুগ্ধ এবং সকৌতুক বিস্ময়ে দেখছিল। কিন্তু দাঁড়িয়েছিল সেই

কোণেই! তবে চীৎকার আর করছিল না এবার সে হাতে তালি দিয়ে বললে—ওয়াণ্ডারফুল। ডার্লিং ইট ইস্ এ ডার্লিং! বলে দু পা এগিয়ে সে এল।

শিবাজী তার হাতের দড়িটা লরার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে—নাও। এটাও তোমার জন্যে নিয়ে এসেছি!

লরা সভয়েই এগিয়ে এসে দড়িটা কুড়িয়ে নিলে।

শিবাজী বাঁদরটাকে বললে—যাও, মেম সাবকে গড় করো।

বাঁদরটা ঝুপ ক'রে একটি লাফ দিয়ে লরার পায়ের কাছে পড়ল। লরা আবার ভয়ে চীৎকার করে পিছিয়ে গেল। বাঁদরটা ছুটে পালিয়ে এল শিবাজীর কাছে।

আমার বিরক্তি লাগল—আমি চলে এলাম!

এরপর সারাদিন চুপ ক'রে ব'সে থাকা ছাড়া আর কোন কাজ ছিল না। কিন্তু নিজের মর্যাদা এবং সুনাম রক্ষার জন্য আমি একখানা চিঠি লিখলাম কলকাতা আপিসে। ওদিকে লরা শিবাজীকে নিয়ে সারাটাদিন ওই বাঁদরটাকে নিয়ে খেলা করলে। তার ফুলে ওঠা মুখের জন্য লজ্জা রইল না—অপারেশন করতে হবে বলে দুশ্চিন্তা রইল না। লরা খিল খিল শব্দে হাসলে, শিবাজী হা-হা শব্দে। আমার প্রতি ভ্রূক্ষেপই করলে না। এমন কি দুপুর বেলা আমি একলা খেলাম; ওরা দুজনে লরার ঘরে টেবিল পাতিয়ে খেতে বসল। ওই যাদু, বাঁদরটাও ওদের সঙ্গে লাঞ্চ করলে একটা চেয়ারের ঠেসানের মাথার উপর ব'সে।

সন্ধ্যে বেলা পর্যন্ত আমার বিরক্তির তাপমাত্রা এমনি উপরে উঠে গেল যে,—আমি সন্ধ্যের সময় শিবাজীকে ডেকে বললাম—শিবাজী আমি একবার গয়া যেতে চাই। তোমার তো গাড়ী রোজই যায়—আজও যাবে। আমি চলে যাই।

শিবাজী বললে—ই তো আচ্ছা বাত! খুব ভালো কথা খুনি। বিগ ব্রাদার মনে মনে খুনি একটু তুমারা পর নারাজ বেখুস্ হুয়া হোঙ্গে। গয়াতে নেমে সটান খুনি এখানে এলে, মামা বাড়ী গেলে না! জরুর দুখ পেয়ে থাকবেন খুনি। তুমি আজ চলে যাও! ওখানে দুদিন থেকে তারপর-খুনি-আসবে। তখন খুনি লরার মুখের ফুলোটা ক'মে যাবে।

বলেই সে হাঁকতে লাগল—পুত্তনলাল! পুত্তন লাল।

লরার দরজাটা ভেজানো ছিল। গিয়ে কড়া নেড়ে ডাকলাম—লরা!

কোন উত্তর পেলাম না। আবার নক্ করে বললাম—লরা—মে আই কাম ইন! উত্তর পেলাম এবার—দরজাটা একটু খুলে গেল আপনা আপনি—হুম

বাতাসে নয় আমারই নকিং একটু জোরে হয়েছিল বলে। দেখলাম লরা বিছানার উপর পড়ে ঘুমুচ্ছে। বাঁদর যাদ্দুটা মাথার দিকে টেবিলটার উপর ব'সে টুথ পেষ্টের টিউবটা দুই হাত ধরে মধ্যে মধ্যে দেখছে এবং মধ্যে মধ্যে চিবিয়ে খাচ্ছে। আমি দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে চলে এলাম।

গাড়ীতে উঠবার সময় আমি শিবাজীকে বললাম—দেখ মাতুল-একটা কথা বলি।

—হাঁ। বাতাও! রূপাইয়া জরুরৎ হ্যায়—

—না। টাকাকড়ি নয়। বলছিলাম লবাব সম্বন্ধে।

—কিছু ভেবো না ভাগ্না। কুছ ডর নেহি হ্যায়। দো রোজ মে বিলকুল আরাম হো যায়েগী।

—হ্যাঁ—তা' হবে। সে আমি জানি। কিন্তু দেখো—তুমি যেন নিজেকে জড়িয়ে ফেলো না। এতখানি মাখামাখি—আমার ভাল লাগছে না!

শিবাজী ডান হাতখানা বাতাসে ঘুরিয়ে একটা বেপরওয়া ভঙ্গি ক'রে বললে—কৃত্-অল, হামারা বসরা বাগদাদসে লাউটকে আয়া হুঁ। বসরাই গুলাবের মত লেড়কী শিবাজীর মন ভোলাতে পারেনি। আব এ তো ভাগ্না—এক ফিরিঙ্গী লেডকী। আধা কালী—আধা গৌরী! যাও যাও! চলে যাও! আর—

একটু থেমে বললে—and she is a baby you see—অত্যন্ত সরল খুনি অত্যন্ত কি বলব খুনি—অত্যন্ত সরলা—

আমি গাড়ীতে চড়ে বসলাম। গাড়ী চলতে লাগল।

আমার বড় মামা শিবাজীর বিগ ব্রাদার—বড়কা ভাইয়া। গুরুদেব বলতে গেলে। অনেক ভেবে চিন্তেই কথাটা তাঁকে খুলে বললাম। বললাম—শিবাজীর জন্যই। আমি লরাকে জানি। চতুর মেয়ে। কলকাতার মিত্তির বাড়ীর এতবড় ঘাঘী ছেলেকে নাকে বঁড়শী বেঁধে ঘোরাচ্ছে সে—তা আমি জানি এবং দেখেছি। আমার নিজের নেশা একটু লাগেনি—তা বলব না। কিন্তু পাড়াগাঁয়ের ছেলে এবং তার সঙ্গে একটু ভীরু বলে—সে নেশার কোন প্রকাশ কেউ দেখতে পায় নি। সব চেয়ে জোর দিয়েছিল আমার প্রভু এবং দুর্ভাগ্যের ফেরে আমার ওই শ্বশুর মহাশয়ের অবজ্ঞা। কর্মজীবনে এতটুকু এদিক ওদিক হলে আমাকে মনে পড়িয়ে দিতেন আমি তদীয় ভৃত্য।

আমার একমাত্র অস্ত্র ছিল ভৃত্য হিসেবে আমার ন্যায়পরায়ণতা এবং জামাতা হিসাবে আমার শুদ্ধ চরিত্র। আমি যে কোন কাজ করতে মর্যাদা বিচার

করতাম না, কিন্তু কোন অসৎ কাজ বললে তা করতাম না। ভয় তিনি এখানেই করতেন। ওই দুটির জন্য তিনি আমাকে সমীহ করতেন। এবং এ ভিন্ন তাঁদের ধনী পরিবারের মধ্যে অবজ্ঞা উপেক্ষাকে পরাজিত করবার কোন অস্ত্র ছিল না।

আরও একটা কথা ছিল—সেটা প্রেমের ব্যবসায়ে মূলধনের কথা। এ ব্যবসায়ে মূলধন দুটো। একটা হল—বাস্তবজগতের মূলধন টাকা পয়সা—অন্যটা হল রূপ। টাকা পয়সা না থাকলেও রূপ এবং সাহস যার থাকে সে এতে চৌঘুড়ি হাঁকিয়ে চলে যায়।

আমার কথা থাক, বলছিলাম লরার কথা। আর আমার এই নিস্পৃহতাকে জয় করবার জন্যই—বোধহয় আমাব সঙ্গে একটু আধটু মেলামেশা করত। হয়তো করুণাও তার হ'ত।

বড় মামাকে কথাটা বলবা মাত্র মামা বললেন—উঁহু! ও হতে পারে না। আমি বিশ্বাস করব না। শিবাজীর বিয়ে দেবার কত চেষ্টা হয়েছে। ও রাজী হয়নি। ওর কথা তো জানিস। ও বোকা। কিন্তু একটা চরিত্র আছে। ওর সেই শিবাজীর মাওলী সৈন্য তৈরী করার স্বপ্ন এখনও ঘোচেনি। জানিস—ছেলেবেলা থেকে এইসব ছোট জাতের সঙ্গে মেলামেশা করতে বারণ সকলেই করত, আমিও করেছি। আমাকে একদিন বললে—এই কল্পনার কথা—

আমি বললাম—আমি সে জানি বড় মামা। আমাকেও সে বলেছে। কিন্তু একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন—শিবাজী মানুষ। এবং ওর এই বয়েসটা—।

বড়মামা বললেন—নভেল নাটক পড়ে আর ওইসব লিখে তোর এইসব উদ্ভট কল্পনা হয়েছে। Have faith in him.

এরপর আমি চুপ করে গেলাম।

বড়মামা চুপ করলেন না। বললেন আমাদের এখানকার পুঁটি সেও তো ওর সঙ্গে গিয়েছিল—মেসোপটেমিয়া, সে তো সেখানে এক—ওদেশের মেয়েকে বিয়ে করে সেখানে থেকেই গেছে। পুঁটে মধ্যে মধ্যে আসে। কিছুদিন থাকে, থেকে চলে যায়। সেখানে ছেলেপুলে ঘর সংসার হয়েছে। প্রথমবার যখন এল তখন বললাম—পুঁটে এটা তুই কি করলি। পুঁটে বললে—কি করব বিগ ব্রাদার—প্রেমে পড়ে গেলাম। বুঝেছ না। ওখানে ইংরেজরা যখন মেসোপটেমিয়া দখল করলে তখন প্রথমটা তো ওদের ওপর অত্যাচারের বাকী রাখেনি। তখন একদিন একটা বাড়ীতে কটা গোরা ঢুকে—বিশ্রী অত্যাচার করছিল। আমরা কজন যাচ্ছিলাম, আমি শিবাজী আর হস্ত, ঘোষ বলে দুজন, মোট চারজন।

ঘরের মধ্যে মেয়ের চীৎকার শুনে শিবাজী ঢুকে পড়ল—সঙ্গে সঙ্গে আমরাও। গিয়ে দেখি একটা ফুলের মত মেয়ের উপর এক বেটা গোরা অত্যাচার করছে। শিবাজী লাফ দিয়ে পড়ে তাকে তার জামার কলার ধরে টানলে! সে বেটা খেপে গেল। ওরা দুজন ছিল। সুরু করে দিলে আমাদের সঙ্গে মারামারি। সে মারামারি—মিলিটারী মারামারি। আমরা চারজন ওবা দুজন। কাজেই হারলে। শিবাজী একজনের সঙ্গে একা মারামারি করছিল। মার খেলে খুব। কিন্তু জিতল। ও বেটারা তো পালাল।

শিবাজী মেয়েটাকে তুলে নিয়ে মেসোপটেমিয়াব যারা ইংরেজদেব তাঁবেদার, যাদের বেশ খাতির আছে, যাদের ইংরেজরা সামনে খাড়া করেছে তাদের কাছে নিয়ে গিয়ে জিম্বা ক'রে দিয়ে বললে—আমি একে বাঁচিয়েছি। কিন্তু বরাবর তো বাঁচাতে পারব না। আপলোক—এবার বাঁচান।

শিবাজীর কোর্টমার্শাল হল। একমাস জেল। এদিকে লোক আসতে লাগল। ওই মেয়েটার লোক। অবস্থা ওদের ভাল। লোক পাঠাত শিবাজীর জন্যে শিবাজী বললে—না।

বড় মামা বললেন—পুঁটে বললে, জানেন বিগ-ব্রাদার, শিবাজী জপ করতে বসত। বাঁচাও আমাকে বাঁচাও। আমি কিন্তু সুযোগটা ছাড়লাম না। আমি চলে গেলাম। খুব খাওয়ালে। তারপর বুঝলেন না ফাঁক পেলেই যেতাম। মেয়েটা ভালবাসতে চেয়েছিল শিবাজীকে, কিন্তু শিবাজীকে পেলে না আমাকেই ভালবেসে ফেললে। বিয়ে ক'রে ফেললাম। ওখানেই সার্বিস নিয়ে পারমেনেন্ট হয়ে গিয়েছিলাম। ওদেরও সুবিধে হল। আমি ইংরেজের সার্বিসের লোক; আমার বাড়ীতে ইংরেজ সেপাইরা উপদ্রব করতে আর ঢুকত না। বেশ থেকেই গেছি দাদা আপশোস নেই। শিবাজীকে আমি প্রথম প্রথম বলতাম—কেন মিছে জপ করিস? এমন সুযোগ ছাড়িসনে। শিবাজীকে তো জানেন ও আমাকে গালাগাল করত। বলত—মাদার ইণ্ডিয়ার ডাক তুই শুনতে পাসনে পুঁটে! আমাকে তো জান আমি বলতাম—বাপ্‌স—তুই বাবা দেখালি খুব। বাপ মায়ের চিঠি আসে মিলিটারী ডিপার্টমেন্টের সেন্সার পার হয়ে। তার সব কাটা থাকে কেবল—তুমি কেমন আছ—আমরা ভাল আছি। বড় জোর—আশীর্বাদটাও থাকে। এর মধ্যে মাদার ইণ্ডিয়ার ডাক! শিবাজী বললে—তুই খুনি মাদারের ত্যাজ্য পুত্তুর।

গল্পটা শেষ করে বড় মামা বললে—ওসব কথা ওর সম্বন্ধে বলিসনে। ওতে পাপ হবে।

আমার চিন্তাটা দুশ্চিন্তা ছিল না। তবু একটু বেদনা বোধ করেছিলেন। মনে হচ্ছিল গোটা ব্যাপারটাই আমাদের 'বসে'র একটা তৈরী করা জাল।

তার দুদিন পর আমি শিবাজীর ওখানে ফিরে যাব ভাবছিলাম। দুদিনে লরার ফোলা মুখ নিশ্চয়ই স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। এবং সে এবার নিশ্চয়ই কাজ করবার জন্য ব্যস্ত হয়েছে। মেয়েটা যাই হোক যেমনই হোক চাকরীই তার প্রধান অবলম্বন। যা করে, চাকরী বাঁচিয়ে করে।

একখানা বয়েল গাড়ী ভাড়া ক'রে রওনা হলাম। সকালবেলা রওনা হলে সাড়ে দশটা নাগাদ পৌঁছুনো যাবে। গাড়ীটা সিকি পথ প্রায় গিয়েছে এমন সময় পিছন থেকে এক অশ্বারোহী বীর—হট হট যাও শব্দে চীৎকার করতে করতে এসে হাজির হলেন। একটু বিস্মিত হলাম, দেখলাম অশ্বারোহী এবং অশ্ব দুটিই আমার পরিচিত।

অশ্বটি শিবাজীর আরোহী আমাদের কলকাতা আপিসের শ্রীযুত মিত্র সাহেবী পোষাক; খাঁকী হাফ্‌প্যান্ট খাঁকী সার্ট—মাথায় শোলাহ্যাট।

আমাকে দেখে বিস্মিত সেও হল তাকে দেখে আমারও বিস্ময়ের সীমা রইল না। সেই প্রথম কথা বললে হ্যালো বয়েল গাড়ীকে আসোয়ার পথিমধ্যে কোত্থেকে বাওয়া। বলি গেস্‌লে কোথায়? এঁ্যা?

বললাম—গিয়েছিলাম মামাদের বাড়ি। আমার চিঠি পাওনি?

—না পেলে এ রকম উর্ধ্বশ্বাসে অশ্বারোহণে ছুটব কেন? আমাকে পাঠালেন বস্‌। তোমার উপর হুকুম—you are to go back by the next train. এবং এখন রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করবেন মিঃ মিটার! তুমি গাড়ী ফেরাও।

বললাম—তা তো হয় না। আমার জিনিষ পত্তর পড়ে আছে ওখানে। সেগুলো নিয়ে ফিরতে হবে।

—আরে—আমি নিয়ে যাব তুমি যাও।

—কেন? আমি গুছিয়ে নিয়ে না হয় এই গাড়ীতেই ফিরব। তাতে তোমার ডিষ্টার্বেন্‌স কি হবে?

—ক্লেভার চ্যাপ তো দেখি! তা চল' কিন্তু ইন্টারফিয়ার করো না কিছুতে। প্রমিস্‌!

—মানে?

—মানে—আমি যা করব—তার কোন কিছুতে ইন্টারফিয়ার করতে পারবে না!

—ঠিক আছে! কিন্তু ব্যাপারটা কি?

—যাচ্ছ যখন তখন সবই দেখবে!

বলে সে ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে গেল। এতক্ষণে মনে হল ঘোড়াটা ও পেল কি ক'রে? পরক্ষণেই মনে পড়ল মিত্তিরের কথা। 'বসের' হুকুমে আসছে মিত্তির। সুতরাং তার-টার আগে এসেছে এবং শিবাজী ঘোড়া পাঠিয়েছে। মিত্তির সামনে খানিকটা দূর গিয়ে একটা বাঁকে মোড় নিয়ে গাছের আড়ালে ঢাকা পড়ল। আমার বয়েল গাড়ির গাড়োয়ান সম্ভবত ঘোড়াটার কাছে হেরে যাওয়ার ক্ষোভে একটা গরুর লেজ ধ'রে মুচড়ে দিয়ে,—অন্যটার পিঠে তার পাঁচন চাবুক দিয়ে আঘাত ক'রে—খানিকটা জোরে ছুটিয়ে দিলে।

ওখানে পৌছে মনে হল—না এলেই ভাল করতাম। প্রথমেই যা দেখলাম তাতে হতভম্ব হয়ে গেলাম। শিবাজীর বাংলোটার বাইরের পথের উপরেই দেখি মিত্তির নন্দন-একটা গাছ তলায়-গুড়িটায় ঠেস দিয়ে বসে আছে! সর্বাঙ্গ ধূলি-ধূসর। প্যাণ্ট সার্ট ধুলোতে সমাকীর্ণ। সার্টটা খানিকটা ছিঁড়ে গেছে। মুখখানার দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠলাম। কপালে দুটো আব উঠেছে, সে দুটো রক্তাভ, খানিকটা কেটেও গেছে। দুই গালে ক্ষত চিহ্ন। নাকটা যেন ফুলেছে খানিকটা। রক্ত পড়ছে। সার্টের বুকেও রক্ত লেগেছে। মিত্তিরের লম্বা চুলের বাহার প্রসিদ্ধ। হেয়ার ক্রীম বা লোশন মেখে সযত্নে ব্রাস করত; যাতে একটি চুল এদিক ওদিক হ'ত না। সে আমলের এইটেই ছিল ফ্যাসন! টুপিটা পরে কোন পলাতকের মত বা হতভাগ্যের মত। আরও পিছনে রাস্তার মধ্যে দেখলে ভাবতাম—ঘোড়া থেকে পড়েছেন সাহেব। এবং ঘোড়াটা চলে গেছে। কিন্তু এতো শিবাজীর বাংলোর গেটের সামনে। এখানে এমনভাবে? আমি গাড়ী থেকে নেমে জিজ্ঞাসা করলাম—কি হল মিত্তির? এমনভাবে—

সে হাত বাড়িয়ে বললে—দেশলাইটা দাও তো। সিগারেট ধরাই।

দেশলাই নিয়ে সিগারেট ধরিয়ে একরাশ ধোঁয়া টেনে বললে—আঃ। তারপর বললে—ছাট স্কাউণ্ড্রেল এণ্ড ছাট বিচ!

—মানে?

—মেরেছে আমাকে। কিন্তু সে কথা এখানে বলব না। ভেরী আনসেফ হিয়ার! তুমি এই গরুর গাড়ীতে ফিরবে তো? জলদি এস। আমার পায়ে লেগেছে। হাতে লেগেছে। শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তের সেই ভশ্‌চাজ মহাশয়ের 'কিলায়কে কাঁঠাল পাকায় দিয়া' অবস্থা মাইরী। শিগগির ফিরো। এ থামবে না। হাঁটবার ক্ষমতা নেই। গাড়ীটাড়ী ভাড়া পাওয়া যায় না। বনে বাঘ আছে। মা কালীর দিব্যি রইল মাইরী শিগগির ফিরো।

বললাম—কিন্তু হ'লটা কি? এমন ভাবে—

—ও হি ইজ এ বুল! আমি আন্দাজ করতে পারিনি। ঘুঁষি, চড়, লাথি মেরে একেবারে বংপাট করে দিয়েছে।

—কেন?

—যাওনা গিয়ে দেখ না! দেখো তুমি আবার হাঙ্গামায় পড়োনা। কিছু বলতে যেয়ো না। নেগেটিভ পজেটিভ মিলে আলো জ্বলছে—দেখ না। বলে—সে সিগারেটে আর একটা টান মারলে। এবং দেশলাইটা নিজের পকেটে পুরলে।

নয়

'মিস্ত্রিরের পো বললে—নেগেটিভ এবং পজেটিভ মিলে আলো জ্বলছে; গিয়ে দেখনা!' কথা কয়েকটা গুরুতর কথা। কারণ এই কথাটাই আমিও বলেছি আমার মামাকে একটু ঘুরিয়ে।

লরা এবং শিরাজীকে অতনু অদৃশ্য আড়াল থেকে বিদ্ধ করেছে কি না জানি না—তবে মৌমাছিরা দুজনকেই হুল-বিদ্ধ ক'রে খুব কাছাকাছি এনে দিয়েছে। দুজনেরই মুখ ফুলেছিল—দুজনেই দুজনের ফুলে ওঠা মুখ দেখে হেসে গড়িয়ে পড়েছে। লরার মুখ থেকে সযত্নে বিদ্ধ হুল তুলে দেওয়া স্বচক্ষে দেখছি, লরার জ্বর হয়েছে, শিবাজীকে শিয়রে বসে থাকতে দেখেছি। মনে হয়েছে জ্বরের অবস্থায় লরা উমার তপস্যা সম্পূর্ণ করেছে এবং শিবাজী শিবের মত ছদ্মবেশে এসে শিয়রে বসে সেবা করে তাকে ধরাও দিয়েছে।

অবশ্য শিবাজী যদি শিব হয়—তবে। শিবাজী শিব নয়—লরা তো উমা নয়ই। একজন একটা বোকা সোকা দুর্দান্ত দুর্ধর্ষ বিষয় বুদ্ধিহীন জোয়ান, আর লরা বিংশ শতাব্দীর প্রথম যুদ্ধোত্তর কলকাতার একটা এ্যাংলো মেয়ে।

তাহ'লে আমি চলে যাওয়ার পর এই ক'দিনে ব্যাপারটা কি অনেকদূর এগিয়ে গেছে?

ভাবতে ভাবতেই আমি গাড়ীখানা নিয়েই ভিতরে গিয়ে ঢুকলাম। বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল পুত্তন রাম। আমি গাড়ী থেকে নামতেই, সম্ভবতঃ গাড়ীর শব্দ শুনে ঘরের ভিতর থেকে শিবাজীর গলা শুনলাম।

—পুত্তন রাম!

—হুজুর।

—উয়ো শূয়ার কি বাচ্চা কো—ভাণ্ডা মারকে ভাগা দো। মৎ ঘুষনে দো!

—হুজুর!

আমি হেঁকে বললাম—মামু সাহেব! আমি—।

—কৌন? বেরিয়ে এল শিবাজী এবং আমাকে দেখে সবিস্ময়ে বললে—ভাগ্না!

হেসে বললাম - হ্যাঁ মামুসাহেব।

গম্ভীর ভাবেই শিবাজী বললে—এসো ভাগ্না। তারপরই বললে—ওই এক হারামী মিটার এসেছিল ভাগ্না, তাকে আমি শূয়োর মারা করে ভাগিয়েছি। হারামী কাঁহাকা! তুমাবা সাথ মুলকাত নেহি হুয়া—রাস্তে পর? দেখা নেহি?

—হ্যাঁ তা দেখেছি! কিন্তু ব্যাপারটা কি?

— উ হারামী হ্যায়। ছোট আদমী! বেতরিবৎ-বদমাস। এ স্কাউণ্ড্রেল!

—তাই না-হয় হল। কিন্তু কি করলে—ও?

—এস, ভিতরে এস বলছি।

সিঁড়িতে উঠতে উঠতেই বললাম—লরা কোথায়?

—ওই ঘরে আছে।

—মুখের ফুলো কমেছে?—

—কমেছে, তবে নিচের দিকে নেমে গলার কাছে মামসের মত ফুলো বসে রয়েছে। দাত কড়াও বলতে পার। দেখ না, আমার মুখ দেখ না।

পুত্তন রামের দিকে তাকিয়ে বলল – চা বানাও! ভাগ্নাবাবু আয়া হ্যায়।

তারপর চলতে চলতে বললে—গ্বাট সোয়াইন আসবে বলে তার করেছিল—তোমার ফাদার ইন ল। আমি ভাগ্না—খাতির করে ঘোড়া ভেজলাম টিশন পর। লরা বললে—মিটার-ব্যানার্জী নয়, সে খুব আপটুডেট লোক—হি ড্রিঙ্কস। তা ছাড়া খুব মাংসটাংস খায়। বিলেত ফেরৎ ইঞ্জিনীয়ার মিটার সাহেব ওর ছোট ভাই। সেই মিটারই আসলে ফার্মের সব। সেই কাঠ সিলেকশন করবে। ব্যানার্জীর শ্বশুর ফিনান্সিয়ার-পার্টনার! লাভ লোকসান দেখে খালাস। সুতরাং —ওকে একটু খাতির টাতির করো শিবাজী বাবু। আমি ভাগ্না সকালে বন্দুক ঘাড়ে বেরিয়ে বন মুরগী মেরে আনলাম। কাটলেট বানালাম। হুইস্কী আনিয়ে রাখলাম। লোকটা যাই হোক, গেষ্ট-ও বটে—তা ছাড়া খদ্দেরের রিপ্রেসেণ্টটিভও বটে—খাতির করতে হবে বৈকি! বাট -।

বাট—হি ইজ এ সোয়াইন। শূয়ার কি বাচ্চা। এখানে এসেই মেজাজ দেখাতে

লাগল। পুয়োর লরাকে খুব এক চোট বকলে। এখানে বসে আছ—আমোদ করছ। মৌমাছি কামড়েছে—মুখ ফুলেছে বলে ফর্তি ওড়াচ্ছ! লরা কাঁচুমাচু করছিল। তবু ছাড়ে না।

আমি বললাম—মিঃ মিটার—সত্যিই মিস লরা খুব কাতর হয়েছিল। মুখ খুব ফুলেছিল—সে আপনি দেখেন নি। জ্বর হয়েছিল। তিনি কি করবেন?

খুব বসগিরি ফলিয়ে গম্ভীর ভাবে বললে—মাই ডিয়ার সার, কথা হচ্ছে আমার মিস লরার সঙ্গে—সে আমার অফিস ষ্টাফ্। এর মধ্যে অনুগ্রহ ক'রে নাক না গলালে খুশী হব।

আমি চুপ করলাম। কি করব? কিন্তু লরার অবস্থা দেখে দুঃখ হল। পুয়োর গার্ল। চাকরীর জন্যে ওই ব্রুটটার কাছে এই সব শুনছে মুখ বুজে!

পুত্তন রাম বললে—চা তৈয়ার। আমি মিটারকে বললাম—আগে চা খেয়ে নিন স্যার। তারপর হবে!

লরা বললে—ওয়াইল্ড ফাউলের কাটলেট মিটার! চল, চল, আমার দোষ হয়েছে। তার কৈফিয়ৎ দেব আমি। কিন্তু কাটলেট ঠাণ্ডা হতে দিও না।

বেটা এসে টেবিলে বসে বলব কি ভাগ্য—চারখানা কাটলেটের তিন খানা খেয়ে দিলে। তারপর চোখে পড়ল—মিট সেফের মাথায় হুইস্কির বোতলটার উপর। দেখেই চায়ের কাপ ঠেলে দিয়ে বললে—ও—মাই-গুডনেস—হুইস্কি? আন-আন!

লরা বললে—এখন খাবে?

—সারটেন্‌লি।

বোতলটা নিয়ে বসে একটা কাটলেট লরাকে দিয়ে বলল—খাও ওটা। আমাকে বললে—আপনি দয়া করে যদি কিছুক্ষণ বাইরে যান মিঃ সরকার তবে খুব কৃতজ্ঞ হব। অফিস সংক্রান্ত কতকগুলো জরুরী কথা আছে—আমার লরার সঙ্গে। সেগুলো সেরে নিতে চাই।

কি করব বেরিয়ে গেলাম। গেলাম বনের ভিতর দিয়ে। যদি আর দু চারটে ফাউল পাই কি মেরে আনব। বিগ ব্রাদার আমাকে শিখিয়েছেন—ব্যবসা যদি করবি শিব্বা—তবে শিখে রাখ খদ্দের লক্ষ্মী। তা লক্ষ্মী পুজোর নৌবিদ্যির জোগাড় করব। হঠাৎ পুত্তনরাম গিয়ে বললে—হুজুর—উ নয়া সাব—মেম সাবকে-বহুৎ ধমকাচ্ছে। মেম সাব ভি চিল্লাতি হ্যায় রোতি ভি হ্যায়। আধা বোতল হুইস্কি খা লিহিস। মাতোয়ারা হোয় গিয়া হোগা! কি ব্যাপার? তাড়াতাড়ি এলাম।

এসে দেখলাম— লবাব ঘরেব মধ্যে দবজা বন্ধ কবে দুজনে হুল্লোড় করছে। এ বেটা চেঁচাচ্ছে—দুজনে এই বনেব মধ্যে বাংলোতে বসে মেরীমাযেব যীশুখৃষ্টের নাম জপেছিলে? গঙ্গাজল খাচ্ছিলে? না! চালাকী! কচি খোকা পেয়েছ আমাকে?

লবা চেঁচাচ্ছে—You are a brute, a devil—

—হাঁ-হাঁ। মিটাব সব। তাকে হুইস্কির বোতল।—প্রষ্টিটিউট কোথাকার! আমাব আব সহ্য হ'ল না। ভাগ্যি আমি দরজায মারলাম লাথি। ভিতর থেকে বটা শাসায আমাকে—আমাব কাছে বিভলবাব আছে। I shall shoot you—get away from here.

শিব্বাকে বিভলবাবেব ভয দেখায ওই নড়বড়ে চেহাবাব কলকাতাব ইডিযট। তিন লাথিতে দবওযাজা তোড গিযা।

বটা তেড়ে মাবতে এল—অশ্লীল কথা ব'লে। আমি ঝাঁপ দিয়ে পডলাম বটাব ঘাডে তাবপব কিল চড ঘুঁষি। একটা ঘুঁষি একটা চড় একটা কিল। চিৎ হযে পডল। বুকে বসে পডলাম। পুত্তন বাম—বশ্শি লে-আও। বাঁধো বটাকে। বেঁধে কাঁধে তুলে—নিযে চল বনেব অন্দরে। মৌচাক আছে যে গাছে—সেই গাছেব তলায ওটা ফেল। আমি গুলি ক'বে চাকটা ভেঙ্গে দেব। তাবপব বেটা মজাটা দেখবে। বুঝবে—ব্যাপাবটা কি। বশ্শি লে আও!

ভা। কবে কেঁদে ফেলল বাঁদরটা হে। ছোট বাচ্চাটাব মত কেঁদে উঠল। সে রুডিক্রাস ব্যাপার। লরা একটু আগে কাঁদছিল—সে খিলখিল করে হেসে উঠল। মত্তিব বলে—পাযে পডি, সরকারবাবু আপনাব পায়ে পডি। দোহাই আপনাব সরকাব বাবু।

আমি বললাম—ব্রুট—বর্বর—মিস লবাকে তুই জঘন্য কথা বলেছিস, বল্—

—আব বলব না।

—বলেছিস তাব প্রাযশ্চিত্ত কর। বল—মা লরা ক্ষমা কব। বল। হাত জোড় করে বল।

তখন লবাব দিকে তাকিযে বলে—লরা, Please—লরা—সেভ্ মি।

লরা মদ খেয়েছিল—পাষণ্ডটার সঙ্গে। তারও কৌতুক বোধটা নেশার ঝোঁকে বেড়ে গেছে তখন—,তখন সে কথা বলবে কি—হেসেই সারা।

বটা তখন বললে—মা লরা ক্ষমা কর মা।

তখন বেটাকে ছেড়ে দিলাম। কলার ধ'রে বেটাকে উঠিয়ে ঘাড়ে ধরে বের করে দিয়ে এলাম—বললাম, ভাগো হিঁয়াসে। যদি এ এলাকায় দেখতে পাই তবে—

তোমাকে বেঁধে এবার রাত্রে যেখানে বাঘ বের হয় সেখানে ফেলে দিয়ে আসব। পুত্তন লাল বেটার স্যুটকেস আর বেডিংটা দিয়ে এল। যাক বেটা যে ক'রে হোক ফিরে আমার দায়টা।

আমি অবাক হয়ে শুনছিলাম। শিবাজীর কাণ্ড শিবাজীতেই সম্ভব। তবে মিটারের যে-কাণ্ড বললে—তার এক বিন্দুও অবিশ্বাস হল না আমার। শিবাজীর কাণ্ড যেমন শিবাজীতে সম্ভব—মিটারের কাণ্ড তেমনি মিটারেও সম্ভব। মনে পড়ল পথে মিটার আমাকে বলেছিল—Don't interfere in my affairs. তাহ'লে এই মতলব মনে নিয়েই সে এসেছিল। ভেবেছিল খুব কায়দায় সে পেয়েছে লরাকে এবার। কিন্তু—। বেচারী শিবাজী সরকারকে জানত না। ওদের কথা বাদ দিয়ে আগ্রহ হল লরার কথা জানবার জন্য।

বললাম—লরা কই?

—স্নান করতে গেছে।

পুত্তনলাল সেলাম করে বললে - চা তৈয়ার। গিয়ে বসলাম—চায়ের টেবিলে। চা খেতে খেতে মনে পড়ল—বেচারী মিত্তির নন্দন গাছতলায় অনাথ বালকের মত বসে আছে আমার প্রতীক্ষায়। গাড়িটাও আটকানো আছে। আমাকেও ফিরতে হবে।

বললাম—আমাকে এক্ষুণি ফিরতে হবে। পুত্তনলালকে বল—আমার বিছানা আর স্যুটকেশটা গাড়ীতে তুলে দিক। গাড়ীটা দাঁড়িয়ে আছে।

শিবাজী বললে—ইসকা মানে ক্যা হ্যায় বাবা ভাগ্না? খানা পিনা না করকে চলা যায়েগা। তুম লোগোঁ কি কাম ভি পুরা হুয়া নেহি।—লরা হিঁয়া একেলে ক্যা করেগী?

হেসে বললাম—সে লরা জানে। আমি কি করে বলব? -আমার হুজুরের হুকুম এসেছে—আমাকে আজই ফিরতে হবে। তা-ছাড়া—

—কেয়া বাবা তা ছাড়া? বাতাও।

—মিত্তির বসে আছে পথের ধারে। খোঁড়া করে দিয়েছ বেচারাকে তাকে নিয়ে যেতে হবে আমাকে ওই গাড়ীতে।

হা-হা করে হেসে উঠল শিবাজী।

ঠিক এই সময় লরা স্নান প্রসাধন সেরে এসে খাবার ঘরে ঢুকল। এবং আমাকে দেখেই সবিস্ময়ে বললে—ব্যানার্জী তুমি কখন?

—এই পনের-কুড়ি মিনিট। কিন্তু এসব কি করে বসেছ?

—ও—তুমি সেই—মিটার ঘ্যাট ভালগার রোগের কথা বলছ? তাতে আমার

অপরাধ নেই। মিঃ সরকার তার সাক্ষী। তুমিত সে রাস্কেলকে জান ব্যানার্জী। কলকাতায় সে আমাকে ট্র্যাপ করতে পারে না, এখানে এসে ভেবেছিল ট্র্যাপ করবে সে। ইউ নো—অফিসের প্রাইভেট কথা আছে বলে মিঃ সরকারকে বাইরে পাঠিয়ে আমাকে একলা পেয়ে—যে-সব অবসিন্ শ্ল্যাং কথা বলছিল—সে শুনে আমি হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। ব্ল্যাক মেলিংয়ের ভয় দেখাচ্ছিল। আমি মিঃ সরকারের সঙ্গে এক বাংলোয় রয়েছি পাঁচ-ছ দিন—সে তার কদর্থ করে-বিশ্রী কথা বলেছিল। এ্যাণ্ড—

একটু থেমে আবার লরা বললে—চা খেতে বসে চা খেলে না। হুইস্কী খেলে। আমাকে খেতে বললে। টু কীপ কম্পানী আমি খেয়েছিলাম। সে তারপর নেশা করে এই সব জুলুম আরম্ভ করলে। আমার হাত ধরলে। আমি চীৎকার করলাম। গালে চড় মারলাম। ফরচুনেটলি মিঃ সরকার এসে পড়েছিলেন। লাথি মেরে দরজা ভেঙে—

লরা থেমে গেল। তারপর সে হেসে উঠল খিল্-খিল্ করে—বললে—ব্যানার্জী সে একটা দেখবার মত সীন। ক্যালকাটা বাবু সাহিব—ফেল ফ্ল্যাট অন দি গ্রাউণ্ড, মিঃ সরকার তার বুকে বসে—।

খিল-খিল করে হাসতে লাগল লরা।

আমি বললাম—শুনেছি আমি।

—শুনেছ? মিঃ সরকার বলেছেন?—লরা একখানা চেয়ারে বসে আবার একদফা হেসে বললে—মিঃ সরকার কম্পেল্ড হিম টু কল মি হিজ···মাদার। উইথ ফোল্ডেড হাণ্ডস। নিজেই হাত জোড় করে ভেজিয়ে লরা দেখালে—এবং মিত্তিরের অনুকরণ করে বললে—মা ক্ষোমা করো। এবং কথার শেষে আবার হাসতে লাগল।

শিবাজী সিগারেট টানতে টানতে বললে—ওসব কথা থাক মিস লরা।—লিভ ইট! এখন কাজের প্রোগ্রাম কর! ভাগ্না এসে পড়েছে।

আমি বললাম—কাজের প্রোগ্রাম আমাকে বাদ দিয়ে মামাজী!

—মানে।

—মানে—আমার উপর হুকুম এসেছে কলকাতা থেকে—আজই রাত্রে রওনা হয়ে কাল সকালেই আপিস পৌছুতে!

—দেন? আমি কি করব? চল আমিও যাই।

আমি মিটারের কথা স্মরণ করে বললাম—মিটারও আজ ফিরবে। তার থেকে তুমি এখানে থেকে যাও লরা, যেমন ছিলে। বরং চিঠি লেখ সমস্ত জানিয়ে।

লেখ আপিসের কোন ডিরেকশন না পাওয়া পর্যন্ত তুমি এখানেই রয়েছ এবং একলা যতখানি পারছ কাজ করছ।

লরা খানিকটা চুপ করে ব'সে রইল। তারপর বললে—নো। আই শ্যাল রিজাইন। ওই মিটারের সঙ্গে কাজ আমি করব না। নেভার!

বললাম—চাকরি ছেড়ে দেবে?

—দেব! বলে সে উঠে চলে গেল।

আমি শিবাজীকে বললাম—মামাজী, কেন এরকম হুজ্জোত করলে—বলতো?

—কেন? এই বাত্ তুমি বলছ ভাগ্না?

—বলছি—তার কারণ আছে।

—কারণ?

—হাঁ। আমি জানি আমি দেখেছি—ওরা দুজনে কলকাতায় এই রকম খেলা করে। লরার এই ধরনের খেলানোর হ্যাবিট আছে। মিটার ইজ এ রোগ। কিন্তু ও মেয়েটা—

—ডোণ্ট সে এনিথিং ব্যাড অ্যাবাউট লরা ভাগ্না।

চমকে উঠলাম। মিটার তো তা হলে - খুব মিথ্যে বলে নি। দরদ তো খুব গায়।

শিবাজীই আবার বললে—She is my mother.

অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম শিবাজীর মুখের দিকে। কি বলে শিবাজী?

শিবাজী বললে - তুমি যা বললে—সে সব শুনেছি আমি লরার কাছে। She has told me everything. কিছু গোপন করে নি। তাই বা কেন—তার চেহারাও আমি দেখেছি!

শিবাজী যা বলল সে শুনে আমার বিস্ময়ের অবধি রইল না।

আমি গয়া চলে যাবার পর—ফুলে-ওঠা মুখ থেকে একটি বিচিত্র সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। হাসি।

এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে খিলখিল করে হাসে। ও এর মুখের দিকে তাকিয়ে হা-হা করে হাসে। এই হাসির মধ্যে দিয়ে দুটি প্রাণী যে কেমন করে নিবিড় অন্তরঙ্গতার মধ্যে উপনীত হয়েছিল বোধ হয় দুজনেই জানত না। অথবা লরা জানত, বুঝত এবং ইচ্ছে করেই একে প্রশ্রয় দিয়ে— ফুঁ দিয়ে জ্বালানো আগুনের মত জ্বালিয়ে তুলেছিল। কিন্তু শিবাজী এসে পড়েছিল নিজের অজ্ঞাতসারেই। সে বুঝতে ঠিক পারে নি, কোথায় চলেছে সে - এই কৌতুক ও হাস্যমুখরতার মধ্যে দিয়ে।

মৌমাছি বা বোলতার কামড়ের যন্ত্রণা—হুল তুলে দেওয়ার পর কয়েক ঘণ্টার

মধ্যেই কমতে-থাকে এবং ঘণ্টা বারো চৌদ্দর মধ্যেই একরকম সম্পূর্ণই চলে যায় কিন্তু ফুলোটা থাকে। ক্রমশঃ নিচের দিকে নামে। এই অবস্থায় আমি গয়া চলে গেলাম, গেলাম—ওই ব্যাপারটা আমার চোখে বিসদৃশ ঠেকেছিল বলেই। শিবাজীর খেয়াল ছিল না।

একদিন পর বিকেলের দিকে লরার হুইস্কী ফুরিয়েছিল। ফুরোবার কথা নয় কিন্তু বোতলটা পড়ে ভেঙে গিয়েছিল।

লরা একেবারে অন্ধকার দেখেছিল ত্রিভুবন! রঙ্গময়ী লরা কাঁদতে বসেছিল ছোট মেয়ের মত।—আমি ম'রে যাব শিবাজীবাবু। আমি ম'রে যাব! কি হবে? না খেলে আমার ঘুম আসে না। You donot know শিবাজীবাবু!

তখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে—ঘোড়ায় গয়া পর্যন্ত লোক পাঠিয়ে ফিরতে রাত্রি হবে—অন্তত এগারটা। তার উপর পথটা ভাল নয়। দশটার পর এ পথে একলা পথ কেউ হাঁটে না। পথের উপর চিতে বাঘ তো একটা দুটো থাকেই, মধ্যে মধ্যে ডোরা বাঘও দেখা যায়। সুতরাং—।

শিবাজী বিরক্ত হয়ে বলেছিল—তাড়ি খাবে? টডি? তাহলে কুলীদের কাছ থেকে আনিয়ে দিই।

লরা—শিউবে উঠেছিল।

শিবাজী বলেছিল—তাহ'লে ভাঙ খাবে?

—ভাঙ?

—হ্যাঁ। গাছের পাতা, বেঁটে দুধ দিয়ে এমন তোফা বানিয়ে দেবে যে ভুলতে পারবে না। তাতে খোড়াসে গুলাব জল দিয়ে দিলে এমন হবে! আমি খাই। বুঝলে না—ওয়াণ্ডারফুল থিং। জান—পারসিয়ান যে পারসিয়ান যাবা সিবাজীতে মশগুল থাকে,—যা হ'ল ওয়ান অব দি ফাইনেস্ট ওয়াইন অব দি ওয়ার্ল্ড—তা ছেড়ে তারা দিল্লীতে এসে ওই ভাঙ খেত। আর এমন ঘুমোবে যে মড়ার মত। এবং—যদি হাসতে শুরু কর,—তবে শুধু হেসেই যাবে।

—তুমি খাও?

—হ্যাঁ মধ্যে মধ্যে মৌজের জন্যে খাই।

—আমার সঙ্গে খাবে?

—খাব!

* * *

ভাঙ খেয়ে দুজনে হাসতে শুরু করেছিল। সে হাসি আর থামে না। কারণেও হাসি—অকারণেও হাসি।

এরই মধ্যে লরা তাকে শিব্বা বলতে শুরু করেছিল। এবং লরার মনে হয়েছিল শিব্বার মত ডারলিং আর দুনিয়ায় নেই। বলেছিল—ইউ আর এ ডারলিং—শিব্বা ইউ আর এ ডারলিং।

তারপর মেয়েটা একসময় এসে তার গলা জড়িয়ে ধরে তাকে চুমো খেয়ে বলেছিল—আই লাভ ইউ শিব্বা ডারলিং আই লাভ ইউ!

ভাঙ প্রমত্ত শিব্বা চমকে উঠেছিল? ডেকেছিল—লরা-লরা।

—ও ডারলিং—আই লাভ ইউ। ডোণ্ট ইউ লাভ মি? এ্যাম আই নট বিউটিফুল শিব্বা?

—লরা লরা!

—আই ওণ্ট লিভ ইউ। গিভ মি এ কিস্—

শিব্বা এবার তার দুহাত নিজের হাত দিয়ে টেনে খুলে মুক্ত করে নিয়ে বলেছিল—ইউ আর মাই মাদার—লরা ইউ আর মাই মাদার!

থমকে গিয়েছিল লরা। চোখ দুটো বিস্ফারিত করে তার দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছিল—শিব্বা ডোণ্ট সে, ডোণ্ট সে দ্যাট!

নেশার ঝোঁকে প্রমত্ত শিব্বা খুব আবেগের সঙ্গে বলেছিল—ও মাদার; ইউ আর মাই মাদার। মাদার, অল উয়োমেন অব দি ওয়ার্ল্ড আর মাই মাদার আই অ্যাম ইওর সান্। চাইল্ড! বেবী!

শিবাজী বলছিল। আমি শুনছিলাম।

শিবাজী খুব স্বাভাবিক ভাবেই সগৌরবে কথাগুলি বলছিল। হঠাৎ এই সময় লরা এসে ঢুকল। এবং কথার কিছুটা শুনেই সে বললে—ব্যানার্জী—হি ইজ রিয়ালি এ বেবী। হাসলে সে।

শিবাজী বললে—বাট ভেরী নটী, দামাল চাইল্ড মাদার।

—ইয়েস। তা তুমি বটে! জান ব্যানার্জী—হি নেণ্ট ডাউন। এ্যাণ্ড—, হি টোল্ড মি এ ষ্টোরী। এ ষ্টোরী অব শিবাজী মহারাজা!

শিবাজী সেই মুসলমান দুর্গাধিপের বন্দিনী পুত্রবধূর কথা বলেছিল। যার রূপ দেখে শিবাজীর সেনাপতি তাকে ছত্রপতিকে উপহার দেবার জন্যে নিয়ে এসে দরবারে হাজির করেছিলেন এবং ছত্রপতি তাকে দেখে সিংহাসন ছেড়ে নেমে এসে হাত জোড় করে বলেছিলেন—মা—আমার সেনাপাত জানে না। সে মূর্খ। তাই তোমাকে এমন করে এখানে এনেছে। ছত্রপতি শিবাজী ভবানীর সন্তান; তার কাছে সংসারের রমণীরা ভবানীর অংশ—তার মা। অপরূপ

তোমার রূপ মা। আমি ভাবছি—আমি যদি তোমার গর্ভে জন্ম নিতাম—তবে কত রূপেরই না অধিকারী হতাম! তুমি আমার জননী, আমি তোমার সন্তান। কোন ভয় নেই তোমার, এখুনি শিবাজীর জননীর উপযুক্ত মর্যাদার সঙ্গে তোমাকে তোমার স্বামীর গৃহে পৌঁছে দেবে।

গল্পটা শুনে লরা নেশার মধ্যেও অবাক হয়ে গিয়েছিল। অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকেছিল শিবাজীর মুখের দিকে।

লরা হঠাৎ হেসে উঠে বললে—জান ব্যানার্জী—হোয়াট হি ডিড আফটার ছাট?

শিবাজী বললে—কি করব? তখনও আমার মাদারেব তাকানি দেখে আমার ভয় যায়নি। আমারও তখন জোর ভাঙের নেশা। আমি চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে কচি ছেলের মত ওঁয়া ওঁয়া কবে হাত পা ছুঁড়তে লেগেছিলাম। তখন মাদারেরও নেশার ঘোর। সে খিল খিল কবে হেসে ফেললে।

তারপর নেশার মধ্যে সারারাত সেই মা ছেলে খেলা এবং খিল খিল হা-হা শব্দে হাসি!

লরা বললে—শুধু তাই নয় ব্যানার্জী—শিব্বা তার লাইফের মিশনের কথা আমাকে সব বলেছে। সে সৈন্যদল তৈরি করবে। বিগ আইডিয়া। এবং শিবাজী মহারাজ দুটো বিয়ে কবে যে মিষ্টেক করেছিল তাও সে করবে না।

শিব্বা আমাকে সমস্ত বলেছে ব্যানার্জী। হি ইজ এ হিরো। এ গ্রেট হিরো। তুমিও কিছুটা জড়িয়ে আছ—তাও বলেছে শিব্বা। তবে নিশ্চিন্ত থাক—আমি একথা কাউকে বলব না। নেভার!

আমি হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। কিছু বলবার মত কথা খুঁজেও পেলাম না। তবে নিশ্চিন্ত জানলাম - ভাবী কালে কপালে দুঃখ আছে এই নবযুগের শিবাজীকে নিয়ে।

পরিত্রাণ করলে গাড়োয়ানটা।

সে এসে দাঁড়াল বারান্দার উপর, বললে—আর কতক্ষণ হবে বাবু?

আমি বললাম—পুতনরাম—আমার স্যুটকেস বিছানাটা তুলে দাও। তুমি থাক লরা ইয়োর ওল্ড এ্যাণ্ড বিগ বেবীর কাছে। এবং হেড অপিসে সব জানিয়ে লেখ। আমাকে সে জিজ্ঞাসা করলে সব বলব।

লরা বললে - নো ব্যানার্জী - আই এ্যাম নট গোয়িং ব্যাক টু—দিস্ অফিস। আমিও সমস্ত কন্‌সপিরাসির কথা বলেছি শিব্বাকে। এবং আমি ভাবছিলাম— আগেই ঠিক করে ফেললাম শিব্বাকে নিয়ে বিজিনেস ষ্টার্ট করব! ভে-রী বিগ বিজিনেস!

দশ

এরপর বছর চারেক আর শিবাজীর সঙ্গে দেখা হয় নি। এই ঘটনাটা নিয়ে শ্বশুরের আপিসের চাকরিতে আমি ইস্তফা দিয়ে আমার দেশের বাড়ীতে এসে আমার পৈত্রিক বিষয়ের কাজ এবং আমার নিজের জীবনের জোটানো যত অকাজ নিয়েই বেশ আরামে না হোক আনন্দেই কাটাচ্ছিলাম, সে স্ত্রীর তাড়া এবং তাড়না সত্ত্বেও।

চাকরিটা ছাড়লাম—শ্বশুর আমাকে অপদার্থ, সুবোধ—(যার অর্থ নিৰোধ) বলে। একটা ঙ্গী ফিরিঙ্গী মেয়েকে এইভাবে শিবাজীর খপ্পরে তুলে যে দেয় সে অপদার্থ—নির্বোধ ছাড়া কি? এতবড় একটা মতলবের জালটার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পালাল!

শিবাজী ভাঙ খেয়ে খাইয়ে হাসতে হাসতে মাদারের চাইল্ড হয়ে গেল। তুমি কিছু খাইয়ে খেয়ে—হাসতে না পার কাঁদতে কাঁদতে গ্র্যাণ্ড মা গ্র্যাণ্ড চাইল্ড হতে পারতে তো! তা না—একটা রিপোর্ট ঝেড়ে মামার বাড়ী চলে গেলে। এবং মেয়েটাকে স্রেফ জলে ভাসিয়ে দিয়েছেন বলে আক্ষেপের আর বাকী রাখলেন না। আমি সেই দিনই সন্ধ্যের সময় স্যুটকেস গুছিয়ে নিয়ে বাকী জিনিষগুলো ফেলে—পাওনা মাইনে এবং টি-এ বিল বাকী রেখেই সটান বাড়ী চলে এলাম এবং পরদিন পত্রযোগে—ডিয়ার সার—আই বেগ টু রিজাইন—বলে এক লাইনে চাকরিতে 'খস্‌খস্‌ করে বাড়ীতে চেপে বসলাম।

একদিন দু দিন তিন দিন চার দিন সাত দিন যেতেই শ্বশুর কন্যা বললেন—তুমি যাবে না?

বললাম—না।

—কেন?

—চাকরি ছেড়ে দিয়েছি।

অতঃপর অনেক অশ্রু অনেক ভীতি অনেক মানের পালা এবং শ্বশুরের দিক থেকেও নানাবিধ সুন্দর সুললিত উপদেশ এবং সান্ত্বনাপূর্ণ পত্রের পালা চলল। আমি কিন্তু অনড় রইলাম। 'পাদমেকং ন গচ্ছামি' বলে ডুগি তবলা নিয়ে বসে রইলাম। গ্রামের থিয়েটারে মাতলাম। নাটক লিখতে লাগলাম। হঠাৎ দেশে কলেরা লাগতে ওসব ঝেড়ে ফেলে—ওই নিয়ে বেগার খাটতে শুরু ক'রে

দিলাম। আবার তার মধ্যে কণ্ট্রাকটারি কাজেও নেমে গেলাম। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তার কাজ; দু চারটে বৃয়ো—পাঁচ-দশটা ছোট কালভার্টের কাজ। 'সময় চলিয়া যায় নদীর স্রোতের প্রায়'—দেখতে দেখতে বছর তিন চলে গেল; এল ১৯২৪ সাল। এবার কংগ্রেসের ইলেকশনের ঢাক বাজলো। আমি নেমে পড়লাম। সরকারী খেতাবধারী আব কংগ্রেস প্রার্থীর মধ্যে প্রতিযোগিতা। শ্বশুরের খেতাবধারীর পক্ষে। আমি কংগ্রেসের পক্ষে। জয় কংগ্রেসের হল। শ্বশুর খুব ক্ষিপ্ত হলেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁর ক্ষ্যাপামী সেরে গেল একটা নালিশের ধাক্কায়। একটা নালিশ হয়েছে তাঁব ফার্মের বিরুদ্ধে। তাতে তাদের হাজার পঁয়ত্রিশ টাকা দাবী। কণ্ট্রাক্ট মত মাল না দেওয়ার জন্য তাঁদেব লোকসান হয়েছে—তার জন্য তাঁরা নালিশ ঠুকেছেন। এ মামলায় আমার শ্বশুরের একমাত্র আমি সাক্ষী। তাঁরা ফাইলে একটা চিঠির নকল পেয়েছেন তাতে লেখা আছে আমাদের প্রতিনিধি চন্দ্রশেখর ব্যানার্জীকে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছিলাম জাহাজের মালের রসিদ নিয়ে-তোমরা নাও নি রসিদ সুতরাং আমরা রসিদ তোমাদের রিস্কে বিক্রি করে দিচ্ছি লোকসান করে। ক্ষতিপূরণের জন্যে দায়ী তোমরা হবে। ব্যাপারটা ঘোরালো, মালটা ছিলই না। রসিদটা ছিল ভূয়ো; আমি গিয়েছিলাম হুকুম মত রসিদ নিয়ে, বলেছিলাম আমার কোম্পানী এই বসিদ পাঠিয়েছেন এটা নিয়ে তোমরা এ্যাডভান্স বাদে বাকী টাকার চেক দাও। তারা ব্যাপারটা জেনেছিল। তাই তারা নেয়নি বসিদ। ফিরিয়ে দিয়েছিল। চিঠিও কিছু দেয় নি। আমাকে বলতে হবে—রসিদ নিয়ে আমি গিয়েছিলাম। ওঁরা নেন নি। হাইকোর্টে কেস—হাইকোর্টের কেস লিস্টে কেসের নাম ছাপা হ'য়ে গেছে—কবে হবে ঠিক নেই-আজও হতে পারে কালও পারে দশ দিন পরও হতে পারে সুতরাং—আমাকে যেতে হবে সাক্ষী দেবার জন্য।

শ্বশুর লিখেছিলেন তুমি কংগ্রেসী লোক, গান্ধীজীর তুমি ভক্ত। সত্য কথা ছাড়া যেমন মিথ্যা কথা বল না—তেমনি সত্যকথা বলিবার জন্য এক্ষেত্রে তোমার আসা অবশ্য কর্তব্য বলিয়া মনে করি। এবং পরিশেষে লিখেছিলেন তোমার গৌরবে আমি অন্তরে অন্তরে গৌরব অনুভব করি। ইহা হয়তো তুমি জান না। আজ ইহা তোমাকে জানাইতে পারিয়া অন্তরে অন্তরে যে কি তৃপ্তি অনুভব করিলাম তাহা সামান্য পত্রে কি ব্যক্ত করিব।

আমি বিগলিত হলাম। এতবড় অর্থশালী শ্বশুর এতদিনে যে আমার উপরের পাথরের ছিলকের মধ্যে অবস্থিত খাঁটি একখানি হীরের সন্ধান পেয়েছেন—এমন খবরে খুসী হয়ে বিগলিত না হয়ে উপায় কি? তার উপর শ্বশুরের কন্যা এখন

একগাল হেসে বললেন—দেখ-দেখ, বলতে খারাপ ছাড়া ভাল দেখবার মত চোখই নেই বাবার। দেখ। চোখ আছে -বোঝেনও সব—তবে জামাই করে জামাইয়ের মধ্যে ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে দেখলে কে না সতর্ক হয় বল! কে না বিষয় আশয় ব্যবসা টাকার দিকে তার চোখ ফিরিয়ে দিতে না চায় বল! যাও চলে যাও।

তখন ১৯২৪ সাল। তখনও ঈশ্বরের সঙ্গে ঠাকুর দেবতারা নিরাকার হয়ে বিলুপ্ত হন নি; বিপ্লবীরা গীতা পড়ে ফাঁসি কাঠে উঠবার মত মন তৈরী করে, অনেকে কালী পূজো করে। 'সুদর্শনধারী মুরারে' কে ডাকে। আমার স্ত্রীতো আবার এমন ঘরের মেয়ে—যে ঘরে ঠাকুর দেবতারা সারি বন্দী—ঘরে ঘরে আটনের উপর—ইংরেজ আমলের নজরবন্দী বা সলিটারি সেলের প্রিজনারদের মত আটকে আছেন। খেতে দেতে পান—ভালই পান—তার উপর জেলে যেমন পলিটিক্যাল প্রিজনাররা বা ফার্স্টক্লাস প্রিজনাররা সেবক হিসেবে কয়েদী ফালতু পায় -তেমন পূজক পরিচারক পান—এবং মালিকের হুকুম মত—তাঁর মামলায় মকদ্দমায়, দেওয়ানীতে ফৌজদারীতে, ব্যবসার কণ্ট্রাক্টের ব্যাপারে মালিককে সাহায্য করেন! মালিক অকৃতজ্ঞ নন—মিথ্যে বলবার সময়—শ্রীদুর্গা বলে মিথ্যে বলেন, ফাঁকি দেবার মতলব নিয়ে কণ্ট্রাক্ট সই করবার সময়—শ্রীহরি বলে করেন কোথাও পা বাড়াতে হলে—সে বাগান বাড়ী পর্যন্ত—সিদ্ধিদাতা গণেশ এবং 'বামন' ঠাকুরকে ডেকে পা বাড়ান। সেই বাড়ীর কন্যাটি বেশ বার কয়েক শ্রীদুর্গা থেকে গণেশ নাম উচ্চারণ করে আমার বাক্স বিছানা গুছিয়ে দিয়ে বললে, —দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা, জয় গণেশ-জয় গণেশ। কার্য সিদ্ধি হোক। চলে যাও। এরপর না এসে উপায় ছিল না। কলকাতা এসে হাজির হলাম।

জামাই আদর মিলেছিল এবার। ওঁদের বাসার বৈচিত্র্য ছিল—বাসা ঠিক বাসা ছিল না, ছিল একটা মেস। আফিসের কর্মচারীদের নিয়ে বস-বাস করতেন। তবে তাঁর একটা স্বতন্ত্র দিক ছিল দোতলায়। তার পাশেই ছিল অভ্যাগত-জনদের জন্য একটা লম্বা ঘর। তার পাশে একখানা ছোট ঘর। সেই ঘরে হল আমার আস্তানা। সকালে গিয়ে পৌঁচেছিলাম। বস আফিস যাবার সময় বলে গেলেন—আপিসে এসো, ওখানে ল সুপারিনটেণ্ডেণ্টের সঙ্গে দেখা করে জেনে শুনে নিয়ে চলে যাবে হাইকোর্ট। কেস উঠে আসে লিস্টে কোনদিন ঝট করে ডাক পড়বে তার তো ঠিক নেই। অরিজিনাল সাইডে বাকল্যাণ্ডের ঘরে কেস, লোকটার মেজাজ কড়া—দু মিনিট দেরী হলেই বাস—খতম করে দেবে। আমি বরং গাড়ী—না—তুমি একখানা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করে চলে এস।

আপিসে এলাম। আপিস ঢুকতেই অবাক হলাম—লরাকে দেখে।

—লরা! এখানে?

—লরাও সবিস্ময়ে বললে—ব্যানার্জী—তুমি?

—হ্যাঁ। এটা কোম্পানীর আপিস হলেও ডিরেক্টরের সঙ্গে সম্বন্ধ জানতো!

—জানি! আবার তুমি চাকরি নিয়ে এলে?

—না। এবার সাক্ষী দিতে এসেছি।

—ও।

—কিন্তু তুমি? বিজিনেস? মাদার এ্যাণ্ড চাইল্ড কোম্পানীর সঙ্গে ব্যবসাটা তাহলে আবার চলছে?

—সে অনেকদিন গেছে। তিন বছব আগে। তবে কলিয়ারীর প্রপিংএব জন্যে শাল 'রলা' বিক্রীর কাজ কবি, উই হ্যাভ গট এ ফার্ম-অফ আওয়াব ওন। তাই বিক্রি করতে এসেছিলাম। ওল্ড বস—ইজ নট অলওয়েজ ব্যাড!—

—শিবাজীব খবর কি? সে কি করছে? ইযোব বিগ বেবী?

—মাই গড, ব্যানার্জী- তার সম্বন্ধে কি বলব তা জানি না' এ ফুল অব-এ রাস্কেল অর হোয়াট - আই ডোণ্ট নো। তবে অদ্ভুত মানুষ! ইট ইজ এ গুড ষ্টোবী! তুমি জান না?

বললাম—না। তারপর থেকে আর কোন খবব রাখি নি। তোমবা দুজনেই একসঙ্গে পত্র দিয়েছিলে—তোমার মনে আছে কিনা জানি না।—আমি তাব উত্তর দিই নি।

সে বললে—মনে আছে। তোমাকে আমাদের সঙ্গে জয়েন করতে বলেছিলাম বিজিনেসে। তুমি উত্তর দাও নি। তারপব অনেক কাণ্ড! ওয়েল, তোমাব সময় হলে একদিন একটা এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করে এস না। বলব তোমাকে একদিন সন্ধ্যে বেলা! কিম্বা কোন রবিবার?

সময়ের অভাব ছিল না এবং 'বসের' চাকরও ছিলাম না। এই বস মশায়টিব চাকরির একটা বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে—চাকবি এঁর কাছে দশটা পাঁচটা নয়, বলতে গেলে সকাল সাতটা থেকে রাত্রি বারোটা পর্যন্ত—আফিস কোয়ার্টারেব আপিসে—বাকীটা ওই ওঁর মেস বাসায়। এবার চাকরি নিয়ে আসি নি—সাক্ষী দিতে এসেছি। সেই কর্তব্যে দশটার সময় খেয়ে দেয়ে 'ল সুপারইন্টেণ্ডেণ্ট'ব সঙ্গে গাড়ী করে হাইকোর্টে যাই। এবং পাঁচটা পর্যন্ত বা চারটে পর্যন্ত অপেক্ষা

করে চলে আসি। কোর্টের কেস দেখি ; শুনি ; বাইরে এসে সিগারেট চা খাই এবং বিচিত্র হাইকোর্ট দেখে বেড়াই।

বাসায় ফিরে এসে বেরিয়ে পড়ি, সিনেমায় যাই বা পায়ে হেঁটে ঘুরি। বা কোন বন্ধুবান্ধবের কাছে সন্ধ্যেটা কাটিয়ে এসে খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ি। সুতরাং তাঁবেদার কারুর নই, আমার সময় আমার।

বাসায় খাওয়া দাওয়া হাইকোর্ট যাওয়া আসা ছাড়া খরচ খরচা সামান্যই বটে—সেটা নিজেই করি। ওটা দিতে চাইলেও নিইনি। তবে বসের চাকর সিগারেট এক প্যাকেট বালিশের তলায় রেখে যেত। 'সেটা আমি নিতাম।

সুতরাং সামনের রবিবার এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করলাম ; লরা থাকে কপালীটোলা অঞ্চলে। আমাকে ঠিকানা দিয়ে গেল। বললাম চারটের সময় যাব।

এই ফাঁকে বসের মিটার কোম্পানীর কথাটা বলে নি – যে কোম্পানীর কাজে শিবাজী লরা মিটারের ভাই মিটার ঘটিত ঝগড়ায় আমি – চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে বাড়ী গিছলাম—সেই মিটার কোম্পানীর কথা। সে কোম্পানী লিকুইডেশনে গেছে। তার সঙ্গে বসের হাজার চল্লিশেক টাকা জলে পড়েছে।

মূল মিটার তার বেলজিয়ান মেমকে নেটিব স্টেটে হারিয়ে যা পেয়েছেন টাকা-কড়ি নিয়ে ভেগে গেছেন। কোথায় তা কেউ ঠিক জানে না, কেউ বলে বোম্বে —কেউ বলে, না, ইউরোপ।

এখানে 'বস' নেটিব স্টেটের যেখানে হাউসবোট হচ্ছিল সেখানে লোক পাঠিয়ে কাউকেই পান নি এবং বিলের টাকা দাবী করতে গিয়ে দেখেছিলেন যে মিটার সাহেব পাই পয়সা মিটিয়ে নিয়েছে। অথচ হাউসবোটের কাজ এখনও চার আনা বাকী যা শেষ করতে অন্তত আরও হাজার দশেক ঘর থেকে দিতে হবে! সুতরাং তিনি সর্বপ্রথম মিটারের ভাই ওই আমার 'মিত্তির পোকে' ঘাড় ধরে বের করে দিয়ে, পার্টিশান দেওয়া কামরাটার মাথায় মিটার এ্যাণ্ড কোং লেখা বোর্ডটাকে খুলে—সেখানে অন্য একটা বোর্ড টাঙিয়ে দিয়ে নতুন লোক বসিয়ে দিয়েছিলেন। মূল আপিসের বাইরে বোর্ডে দশ বারোটা বিভিন্ন লিমিটেড কোম্পানীর নামের সপ্তম নাম ছিল মিটার এ্যাণ্ড কোং সেটার উপর কালো রঙ বুলিয়ে মুছে দিয়ে অন্য একটা নাম লেখা হয়ে গেছে। শুনলাম কোম্পানীর টাকায় বড় মিটার একটা দামী ওয়াটার প্রুফ কিনেছিল – সেটার দাম কেটে নিতে চেয়েছিলেন বলে বড় মিটার ছেঁড়া ওয়াটার প্রুফটাকে ফেলে দিয়ে গেছে। থাকবার মধ্যে কোম্পানীর এ্যাসেট বলতে ওইটেই আছে—আর কতকগুলো খাতাপত্র ; সেগুলো বাক্সবন্দী ক'রে নিয়ে গেছে লিকুইডেটর।

রবিবার দিন একটি মধ্যবিত্ত হোটেলে লরার সঙ্গে দেখা হল। লরা যখনই তার বনভবন থেকে কাজের উপলক্ষ্যে কলকাতায় আসে তখন সে এখানেই বাসা নেয়। লরা একটা পানীয় তৈরী করছিল। সবুজ রঙের পানীয়, দুটো কাচের জগে এটা থেকে ওটাতে, ওটা থেকে এটাতে ঢালছিল।

আমি আসতেই বললে—এস। হ্যাভ এ ড্রিংক ফার্ষ্ট।

—ড্রিংক? তুমি জান—

বাধা দিয়ে বললে—ব্যানার্জী—এ ড্রিংক সে ড্রিংক নয়, দস্তুর মত ইণ্ডিয়ান ড্রিংক; এবং ধর্মসম্মত। শিবাজী আমাকে খাইয়েছিল—সেদিন এমন হাসি হেসেছি যে—প্রাণ যায় যায় হয়েছিল। তারপর থেকে এটা আমি খাই। ভেরী অফন।

বুঝলাম—সিদ্ধির সরবৎ।

বললাম—তুমি খাও। ও আমি খাব না, বাপরে ওতে পাগল হয়ে যাব আমি। ছেলেবেলায় পূজোর সময় মহাষ্টমীর দিন একবার খেয়ে তিনদিন বুঁদ হয়ে পড়েছিলাম। আমার মাথা বড় কাঁচা। ওসব পাকা দ্রব্য আমার সহ্য হয় না।

—ব্যানার্জী তুমি একজন অপদার্থ লোক।

—তাই। এখন বল—যা বলবে। শিবাজীর কথা।

বললে—লঙ ষ্টোরী।

—যথা সম্ভব শর্ট করে বল।

—দাঁড়াও তা হলে খেয়ে নি এটা।

একটি গ্লাস পান করে, বাকীটা সে নিয়ে বললে—দাঁড়াও—এটা ফেলে দিয়ে আসি। নইলে কখন যে খেয়ে ফেলব তার ঠিক নেই। বেশী খেলে তুমি যা বলছ তাই হয়। মনে হয় কি জান—মাথার দিকটা গড়িয়ে নিচে এই কোথায় নেমে যাচ্ছে তার ঠিক নেই।

চলে গিয়ে ফিরে আসতে আসতে বললে—বাট ইউ নো—শিবাজী গ্লাসের পর গ্লাস খেত এবং স্রেফ দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে থাকত, মুখটা বুকের উপর ঝুঁকে পড়ত, চোখ দুটো আধখানা আধখানা হয়ে কেমন হয়ে যেত। কিন্তু তারই মধ্যেই ইউ সি—বাঘ এসেছে শুনলে—বন্দুক ঘাড়ে করে বেরিয়ে যেত। দমাদম গুলি ছুঁড়ত। বাঘ পালাত। একবার কিন্তু এই অবস্থাতেই হি ব্যাগড ওয়ান লেপার্ড।

বিছানায় বসে একটা সিগারেট ধরিয়ে বললে—ইউ সি ব্যানার্জী—শিবাজী

সত্যিই একটি বিগ বেবী। ছেলেমানুষের মতই সে সাপ ধরতে হাত বাড়ায় বাঘের সামনে হাসে এবং রাগলে মাথার চুল ছেঁড়ে, মাথা ঠোকে। এবং যার সঙ্গে ঝগড়া হয় তার সঙ্গে লড়ে যায়। মারও খায়, মারধরও করে। ওয়াণ্ডার-ফুল, ভয় দুনিয়ার কাউকে করে না, কিচ্ছুকে করে না।

এখন শোন, সেদিন তুমি ছাট ভ্যালগার রোগ্ মিটারকে নিয়ে চলে এলে—আমি বললাম,—আমি রিজাইন দেব। এ্যাণ্ড শিবাজীকে নিয়ে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বিজিনেস করব। এত বড় প্রপার্টি। এতবড় বন। এত গাছ। তাছাড়া কুলিগুলো শিবাজীর এমন অনুগত, এর থেকে বড় ক্যাপিটেল কি হ'তে পারে! এ্যাণ্ড ইউ নো আমি বিজিনেস কি করে করতে হয় তার ছকটা জানি। পাঁচ বছরের বেশী টাইপ করা হয়ে গেছে। কি করে কি করতে হয় জানি।

ফার্ম একটি রেজেস্ট্রী করাতে হবে। নামটা তোমাকে বলেছিলাম—মাদার এ্যাণ্ড চাইল্ড টিম্বার কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড।

কলকাতার বড় বড় কাঠের কারবারীদের নাম সংগ্রহ করলাম—টেলিফোন ডিরেক্টরী থেকে। লেটারহেড ছাপানো হল। কোম্পানী রেজেস্ট্রী করা হল পাটনায়। তাতে আমাকে শিবাজী নিজে অংশ দিলে। বললে—মাদার—তোমার এতে চারআনা অংশ থাকবে।

আমি দু আনা অংশ চাইব ভেবেছিলাম কিন্তু শিবাজী বললে—চার আনা। এ্যাণ্ড খাওয়া দাওয়া আর হাত খরচার জন্যে মাসিক এইটটি রূপীজ।

নিজের বাংলোটা আমাকে ছেড়ে দিয়ে, খুব জলদি অনেক লোক লাগিয়ে কাঠের একখানা ছোট্ট বাংলো মত ঘর সে করে নিলে।

কিন্তু দেয়ার ওয়াজ সাম আনইজিনেস—ইউ সি। শিবাজী বলেছিল—সে শিবাজী দি গ্রেটের মত এই সব লোকদের নিয়ে একটা সৈন্যদল তৈরী করবে এবং ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করবে। ব্লাড ইজ থিকার ছান ওয়াটার। আমি এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান হলেও ইংরেজই আমার বেশী আপন। এ্যাণ্ড সত্য বলতে ব্যানার্জী, হোম মানে ইংল্যাণ্ডই আমার ড্রীমল্যাণ্ড।

আমি লুকোব না, আমি একদিন গয়া গিয়ে এস-পির কাছে গেলাম। সে একজন খাস ইংরেজ। বয়স হয়েছে। এবং সারা সার্ভিসটাই বেহারে কাটিয়েছে। বেহার ইজ হিজ ভেরি ফেবারিট প্রভিন্স!

বললাম তাকে একটু ঘুরিয়ে। বললাম দেখ—এখানে একটা কাজের খোঁজ পেয়ে আমি এসেছি। কিন্তু কাজটা নেবার আগে তোমার একটু এ্যাডভাইস চাই। মিঃ গ্র্যাণ্টস বললে—ইউ আর লয়া প্রেন্টিস। নয়?

—হ্যাঁ। কি করে জানলে ?

—বললে—সবই পুলিশকে জানতে হয় ! হাসলে গ্র্যাণ্টস্। তারপর বললে—আওয়ার ম্যান ইজ দেয়ার !

—ইয়োর ম্যান ইজ দেয়ার ? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

—বুঝতে কি কষ্ট ? তুমি যা এ্যাডভাইস চাইতে এসেছ—তাই জানবার জন্যে আমাদের লোক সেখানে রেখেছি !

—স্পাই ?

—ত্যাটস্ রাইট।

—কি নাম ? কে ?

—ও। মিস প্রেণ্টিস, ইউ আর ফরগেটিং ইয়োর সেল্ফ !

লরা বললে—জান ব্যানার্জী আমি ক্ষমা চেয়ে বলেছিলাম—তা আমাকে কি এ্যাডভাইস করেন—ওর চাকরি নিতে পারি আমি ?

—হোয়াট ইজ ইয়োর চার্ম হিয়ার ? কলকাতা থেকে মিটার কোম্পানীর হয়ে তুমি এখানে এলে। তারপর মৌমাছির কামড় খেয়ে মুখ ফুলিয়ে রইলে এখানে, তার মধ্যে হ'লটা কি—যে এখানে থাকতে চাচ্ছ। বি ফ্র্যাঙ্ক প্লিজ। ত্যাট পিকিউলিয়ার গুড হার্টেড ফুলের ওপর এত ঝোঁক পড়ল কেন। এনি ম্যাগনেটিক—এ্যাট্রাকশন ?

ব্যানার্জী, একটু চুপ করে থেকে বলেছিলাম—ইয়েস। প্রথমটা ছিল—কিন্তু সে আর নেই।

গ্রাণ্টস বলেছিল—মানে ?

আমি তাকে সমস্ত বিবরণটা বলেছিলাম। এ-ভ-রি থিং, ইন ডিটেলস। বিস্তারিত করে খুলে বলেছিলাম।

গ্র্যাণ্টস মুচকে মুচকে হাসতে হাসতে শুনছিল। হঠাৎ হো-হো ক'রে হেসে উঠল—সিদ্ধি খেয়ে শিবাজীর আমাকে মা বলার গল্প শুনে।

অনেকক্ষণ হেসে বললে—ইয়েস, হি ইজ লাইক ত্যাট। তোমার কথা অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস করছি। এভ্রি ওয়ার্ড অব ইট।

তারপর বললে—তুমি ওখানে ইচ্ছে হলে স্বচ্ছন্দে থাকতে পার মিস প্রেণ্টিস। এবং গয়াতে আমরা যারা ইউরোপীয়ান্স আছি—তারা খুব খুশী হব—তুমি মধ্যে মধ্যে গয়া আসবে এবং আমাদের সঙ্গে একটা ছুটো ইভিনিং কাটিয়ে যাবে। হি ইজ এ্যান ইনোসেন্ট ম্যান। এই ইনোসেন্সই ওকে বাঁচিয়েছে। উই নো এভরিথিং অব হিম এ্যাণ্ড হিজ প্ল্যান। হিজ ফাদার ওয়াজ এ বিগ প্লিডার

হিয়ার। তারও অনেক রকম বাতিক ছিল। তার মধ্যে এই একটা। ইংরেজদের হাত থেকে দেশকে স্বাধীন করবে। উই ডিড নট লাইক হিম। কারণ সে তবু খানিকটা বিঘ্ন সৃষ্টি করত। কাগজে সমালোচনা করত। মুখে বলত। ছেলেদের নাম রেখেছিল—ইণ্ডিয়ার গ্রেট হিরোদের নামে। সেই জন্যেই এই ইয়ং ম্যানটি শিবাজী। ছেলেবেলা কিছু কিছু টাচে এসেছিল—টেররিস্টদের। তারা ওকে কেউই বিশ্বাস করত না। কারণ ওর দোষ হ'ল কোন কথা গোপন রাখতে পারে না। তবে ওই টাকাকড়ি পেত ওর কাছ থেকে। এক আধ দিন লুকিয়েও থাকত ওর কাছে। তারপর আমরা তাদের সকলকেই ধ'রে জেলে পুরেছি। ও গিয়েছিল যুদ্ধে। যুদ্ধে ওর রেকর্ড সুন্দর। হি বিকেম এ্ হাভিলদার।

এখন ওই বনে কাঠের ব্যবসা করছে, মতলব ওই সব কুলীদের ট্রেন করে সোলজার করবে। প্রথমটা উই গট এ্যালার্মড। পরে ওখানে লোক রেখে খবর নিয়ে বুঝেছি—সে ওর সাধ্যাতীত।

ওদের নিয়ে সোলজার করা সোজা কথা নয়। কিন্তু ওদের নিয়ে স্বচ্ছন্দে শিবাজী ডাকাতের দল তৈরী করতে পারে। কিন্তু তা ও করবে না। নেভার। আগে ওই সব ব্রুট-কুলীদের ধার্মিক লোক যতক্ষণ না করছে ততক্ষণ ও এমন কোন কাজ করবে না। তার থেকে ইণ্ডিয়া পরাধীন থাকে থাক। নো সিন। জাষ্ট লাইক ইণ্ডিয়াজ নিউ লীডার ফ্রম সাউথ এ্যাফ্রিকা—গ্যাণ্ডি!—সাম স্ক্রু লুজ ইন দি হেড।

হাসতে লাগল—গ্র্যাণ্টসাহেব।

তারপর বলেছিল—দেখ, সিদ্ধির লোভে যদি এই বনে এসে বুনো হয়ে থাকতে চাও তো বারণ করব তোমাকে। এ দেশে যত লোক পাগল হয় তাদের পঁচাত্তর জন পাগল হয় গাঁজা এণ্ড ভাঙ খেয়ে। এ ছাড়া যদি আদার প্রসপেক্ট কিছু থাকে তোমার তা' হ'লে তুমি থাকতে পার। হ্যাভ ইউ এনি?

ব্যানার্জী সত্যি বলতে কি—আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। তবে উত্তর দেবার সময় ঠিক উত্তর দিইনি। বলেছিলাম শিবাজী চার আনা শেয়ার দিতে চেয়েছে এ্যাণ্ড এইট্টি রুপীজ এ মান্থ—।

—খুব ভাল কথা। থেকে যাও। অপরচুনেটি ছেড়ো না। কোনদিন না কোনদিন তাতে বেশীদিন দেরী নেই, ইয়োর হিরো সব হারাবে আই অ্যাম সিওর। ও লাভ করতে জানে। জানে লোকসান করতে। মধ্যে মধ্যে কাম্ টু গয়া। এসে দেখা করো আমার সঙ্গে। বুঝেছ।

এগারো

হোটেলে বসে কথা হচ্ছিল।

লরা বললে—দেখ, গ্রাণ্ট আমাকে বলেছিল—লরা, তোমার বিগ বেবীটি লাভ করতে জানে না। ও জানে শুধু লোকসান করতে। লেগে থাক্ যদি ক্লেভারলি ম্যানেজ করতে পার—তবে হয় তো লাভ হবে তোমার। ইউ সি—ওর প্রপার্টি ভাল। বাট্—হোয়াই—মাদার এ্যাণ্ড সন্? ওতে তো সুবিধে হবে না!

লরা বললে—আমি বিস্মিত হয়ে বলেছিলাম—হোয়াট ডু ইউ মীন।

গ্র্যাণ্ট বলেছিল—বোঝা খুব শক্ত নাকি? মাদার এ্যাণ্ড সন হলে কি বলে ক্লেম করবে? মেণ্টেনেন্স বা কম্পেনসেশন?

এরপর একটু চুপ ক'রে রইল লরা। জোরে জোরে সিগারেট টানতে লাগল। তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম আমি। দেখলাম—না—চোখে সিদ্ধির ঘোর এখনও লাগেনি, এত তাড়াতাড়ি লাগবার কথাও নয়।

একটু পর বললে—সত্যি কথাই বলব তোমাকে—গ্র্যাণ্টের সঙ্গে আমার একটু ইণ্টিমেসি হয়েছিল। মধ্যে মধ্যে গয়া যেতাম, এবং ওখানকার সারকিট হাউসে কাটিয়ে আসতাম। শিবাজীকে বলতাম—ইয়োরোপীয়ান ক্লাবে যাই। এই জঙ্গলে থাকি, হাঁপিয়ে উঠি। শিবাজী ওয়াজ এ—।

একটু হেসে বললে—গ্র্যাণ্ট বলতে এ্যান ইডিয়ট—ফু—ল। কিন্তু আমি তা বলব না। বলতে পারব না। ব্যানার্জী—সত্যিই হি ওয়াজ এ বিগ বেবী। সে আমি যা বলতাম তাই বিশ্বাস করত। আমাকে সত্যিই চাইল্ডের মত ভালবাসত। আমি মধ্যে মধ্যে ভাবতাম। এ কেমন ক'রে হয়? একজন সুস্থ সবল ইয়ংম্যান, ইয়ংম্যান অফ টোয়েন্টি ফোর আর ফাইভ—আর আমি যুবতী—এ্যান এ্যাংলো গার্ল, নট শাই—এ্যাম ফ্রি—লাইক এ বাটার ফ্লাই অর এ ওয়াইল্ড ডাক—; তবু এ কোন এ্যাট্রাকশন ফী—ল করে না! আমি তা জানি ব্যানার্জী কলকাতায় ইয়ং বেংগলী বাবুজ কিভাবে এ্যাংলো গার্লসদের দিকে তাকায়। তোমার মিটার হোল তার একজাম্পল।

ফিক্ করে হেসে ফেলে লরা বললে—শুধু মিটার কেন? সেটা তো একটা রোগ্। তোমার ফাদার-ইন-ল—তার চোখেও আমি দেখেছি—ক্যাট এ্যাণ্ড মাউসের খেলায়—ক্যাট'স লুক্। আমার উপর অনুগ্রহের কথা তো জান। আরও নিশ্চয় জান—যে এই গেম খেলবার জন্যেই—'বস্' আমাকে শিবাজীর

পিছনে লাগিয়েছেন। সেদিন সিদ্ধির নেশার ঘোরে—যখন আমি তাকে বলেছিলাম—ইউ আর এ ডার্লিং—আই লাভ ইউ—শিবাজীবাবু আই লাভ ইউ ;—তখন আমি অভিনয় করিনি। আমার মনে—উয়োম্যান'স ডিজায়ার—নদীর জোয়ারের মত আমাকে ভাসিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু সে নিল ডাউন হয়ে আমাকে বললে—ইউ আর মাই মাদার, ইউ আর মাই মাদার! সত্যি বলছি ব্যানার্জী আমি কেমন হয়ে গিয়েছিলাম। ইউ সী—মেয়েরা এমন ক্ষেত্রে ইনসাল্টেড ফীল করে। করা স্বাভাবিক। কিন্তু আশ্চর্য আমি তা করিনি। ইট ওয়াজ সো—সিনসিয়ার এ্যাণ্ড সো,—সো,—কি বলব ব্যানার্জী?—সো ফুল অব পেথোজ—যে আমার সমস্ত মনটা ভিজে ভিজে হয়ে গিয়েছিল। তারপর বললে—গ্রেট হিন্দু কিং শিবাজী দি গ্রেটের সেই গল্প। আমি অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম।

লরা হাতের সিগারেটটা ফেলে দিয়ে আবার সিগারেট ধরালে। তারপর বললে—জান ব্যানার্জী—গ্র্যাণ্ট আমাকে মধ্যে মধ্যে বলত—লরা—অল ফলস্। অল ফলস্! হিপোক্রেসী দেখ না পরখ ক'রে। বাট্—। কিন্তু ব্যানার্জী যখনই এই বিগ বেবীকে আমি দেখেছি—তখুনি কেমন অভিভূত হয়ে গিয়েছি।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললে লরা।

তারপর বললে—যাক ও কথা, এখন যা হয়েছিল তাই বলি—, মাদার এ্যাণ্ড সন কোম্পানী নাম দিয়ে ব্যবসা গড়ে তুলবার চেষ্টায় লাগলাম আমি। শিবাজীর দাদোজীকে তুমি জান—

বললাম—জানি। তিনিই তো আমার আসল মামা, তাঁর সম্পর্কেই তো শিবাজীর সঙ্গে সম্পর্ক।

—হ্যাঁ। এই আর এক পিকিউলিয়ার পারসন—আই হ্যাভ এভার মেট! এমন অল্পে রাগ, আবার এমন অল্পে খুশী হওয়া এ আমি দেখিনি। দিস দাদোজী এসে সমস্ত কাগজ পত্র তৈরী করার কাজ করলেন এ্যাণ্ড—লিমিটেড কোম্পানী করবার কথায় খুব রেগে উঠে বললেন শিব্বা তুই কি লোককে ফাঁকি দেবার মতলব নিয়ে কোম্পানী খুলবি? তাহলে আমি এতে নেই। লিমিটেড কোম্পানী মানেই হল—লোকসান হলে—কোম্পানী লিকুইডেশনে দিয়ে—বেরিয়ে আসার মতলব। তখন আর তোকে কেউ ছুঁতে পারবে না। আমাকে দাদোজী বলত—আণ্টি। আমাকে বললে—আণ্টি—আই উড এ্যাডভাইস ইউ নট টু লিভ হিয়ার।—ইন দিস জাংগল। তুমি গয়াতে থাক আণ্টি। সেখানে তুমি আপিস কর,—সেখান থেকে কারবার কর—. এখানে আমরা যাবে।

দরকার হ'লে শিব্বা যাবে। আমিও তাহ'লে কাজ-কর্ম দেখতে পারব। এমন কি অর্ডার সিকিওর করতে, কি পার্টির সঙ্গে দেখা করতে বাইরে যেতে হলেও যাবে। তোমার এ্যাবসেন্সে কাজ আমি চালাব।

আমারও ভাল লাগল ব্যানার্জী। খুব চমৎকার আইডিয়া। হাজার হলেও—আমি কলকাতা শহরে জন্মেছি—মানুষ হয়েছি। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সোসাইটিতে ঘোরা-ফেরা অভ্যাস। এই জাংগলের মধ্যে মাসখানেকের মধ্যে মনে হচ্ছিল—আমার যেন ফিস—আউট অব ওয়াটার অবস্থা হয়েছে। গয়া টাউন কলকাতা শহরের তুলনায় কিছু নয়। তবু রেলওয়ে কলোনীতে এ্যাংলো ইণ্ডিযানরা আছে, ক্লাব আছে, গ্র্যাণ্ট আছে—। আরামে এবং আনন্দে থাকব। সেই ব্যবস্থা করেই কাজ আরম্ভ হ'ল। এ্যাণ্ড তোমাকে কি বলব ব্যানার্জী—পাঁচ ছ মাসের মধ্যে বিজিনেস আমাদের ভালো বিজিনেস দাঁড়িয়ে গেল। তিনমাস আমি টুর করলাম। এ্যাণ্ড অনেক অর্ডার পেয়ে গেলাম।

গ্র্যাণ্ট বলত—এ তোমায় স্থইট ফেসের জন্যে লরা। নট ফর ইওর বিগ বেবী। কতকটা হয় তো বটে। বিশেষ ক'রে কলিয়ারী অঞ্চলের অর্ডারের ক্ষেত্রে। অনেকগুলো বড় বড় ইওরোপীয়ান কোম্পানীর কলিয়ারীতে শাল প্রপের হিউজ অর্ডার পেয়েছিলাম, এবং সে শুধু আমার জন্যে। সাহেব ম্যানেজারদের খুশী করতে আমাকে খুব বেগ পেতে হ'ত না। পাঁচ সাতটা ম্যানেজারকে আমি এমন বশ করেছিলাম যে তারা সিদ্ধির সরবতও খেয়েছে। খেয়ে তারিফ করেছে। শাল প্রপের হাঙ্গামা কম ; মাপ সই করে কাটো, ডালপালাগুলো ঝেড়ে সাফ করে দাও এ্যাণ্ড দেন ইউ লোড দেম অন এ রেলওয়ে ওয়াগন। ব্যস্।

শিব্বা খুব খাটত। লাইক এ বাফেলো। হঁ্যা লাইক এ ব্যাফেলো। টাকা-কড়ি খরচও তার কম। বনে থাকত ; তার পুতনলাল—রুটি বানাতো—শিব্বা পাখী মারত তাতে সুরুয়া বানিয়ে খেতো। হা-হা করে হাসতো।

ব্যানার্জী—ছমাসের মধ্যে আমাদের কোম্পানী তিরিশ হাজার টাকা প্রফিট করেছিল। শিব্বা একটা ভাল ঘোড়া কিনে ফেললে। আর হাজার পাঁচেক টাকা খরচ করলে—টু ইম্প্রুভ দি কণ্ডিশন অব দি কুলী হার্টস।

আটমাস পরে ব্যানার্জী শীতের সময় হঠাৎ সব লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। পক্স আরম্ভ হয়ে গেল—গয়ার চারিদিকে। গয়া টাউনেও শুরু হল। একদিন খবর পেলাম আমাদের জংগলে কুলীদের মধ্যে পক্স আরম্ভ হয়েছে। খবর পেলাম কিভাবে শোন। শাল প্রপ আসবার কথা জংগল থেকে, আমাদের ওয়াগন ইণ্ডেণ্ট হয়ে

আছে অথচ তিনদিন ধরে জংগল থেকে একখানা গাড়ীও এল না যে ইনডেণ্ট করা ওয়াগন ফিরে যাবে। রেলওয়ে কোম্পানী ড্যামেজ চাইবে। গয়ার রেলওয়ে ইয়ার্ডের মাল শেষ হয়ে গেছে। কি করব—ভাবছি। শুধু আমি না, দাদোজীও ভাবছেন। হোয়াট হ্যাজ হ্যাপেনড টু শিব্বা। কোন খবর নেই।

সেদিন শেষ—দাদোজী আমাদের ওখানে যে একটা টাঙ্গা থাকত সেইটা নিয়ে চলে গেল জংগলে। বিকেল বেলা গেল—বললে—কাল সকালে বাই নাইন ফিরবে।

পরের দিন নাইন টেন ইলেভেন—ব্যানার্জী। তিনটে বেজে গেল—দাদোজীও ফিরল না। সেদিন সব ওয়াগন ফিরে গেল। যার জন্যে আমাদের অন্তত হাজার দেড়েক টাকা মাশুল দিতে হবে রেল কোম্পানীকে।

কিছু একটা ঘটেছে—তাতে আর সন্দেহ রইল না।

সেদিন রাত্রে গ্র্যাণ্টকে গিয়ে বললাম। গ্র্যাণ্ট বললে—তুমি জান না? তোমাদের জংগলে পক্স শুরু হয়েছে।

বললাম—নিশ্চয় জান তুমি?

গ্র্যাণ্ট বললে—ও সিওর। এ খবর পুলিশের খবর। এ মিথ্যে হয় না। তোমাকে বলিনি লরা—ওখানে আমাদের লোক আছে। যে লোকটা জংগলের মুখে রাস্তার উপর বিড়ি বিক্রি করে ম্যাচিস এ্যাণ্ড সাম আদার স্মল থিংস বিক্রি করে—হি ইজ আওয়ার ম্যান। সে পরশু এসে বলে গেছে—তোমাদের জংগলে দশ বারোজনের পক্স হয়েছে। একজন মরেচে। সে পালিয়ে এসেছে ভয়ে। এ্যাণ্ড ইওর বিগ বেবী—দিন নেই রাত নেই ইজ নার্সিং দেম। এ্যাণ্ড এভরি মর্নিং এবং ইভনিং ওয়ারশিপিং মাদার শীটলা।

ব্যানার্জী—সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম—ভেটারন্ দাদোজী গিয়ে শিব্বার সঙ্গে সেবার কাজে লেগে গেছে।

পরের দিন আমি গ্রাণ্টের কাছে গিয়ে বলেছিলাম—দেখ আমি কি করব বলতে পার?

—কি করবে?

—তারা তো কেউ ফিরল না। তুমি যা বললে তাতে তো ভাবনা বেড়ে গেল। রোজ এম্পটি ওয়াগন ফিরে যাচ্ছে। আমি কি করব?

—দুটো করতে পার। এক করতে পার সেই জঙ্গলে গিয়ে তোমার বিগ বেবীর সঙ্গে পক্স ঘেটে পক্স ধরাতে পার—

—বাট আই এ্যাম ভাকসিনেটেড।

—তাতে চিকেন আটকায় না। সেটা অবশ্য ডেঞ্জারাস নয় স্মল পক্সের মত। আর এক করতে পার, আপিসে এখানে যা টাকাকড়ি আছে তা থেকে তোমার টাকা না নিয়ে কলকাতা চলে যেতে পার। ইওর বিগ বেবীর ছেলেবেলায় দুরন্ত স্মল পক্স হয়েছিল—ওর আর হবে না। স্মল তো হবেই না। চিকেন হলে হতে পারে। কিন্তু তাও না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। পক্স যদি ওর না হ'ত তা'হলে তোমাকে বলতাম—ইওর চান্স ইজ কামিং। তুমি নতুন কোম্পানী ফ্লোট কর। বিফোর ছাট, ম্যারী সাম ওয়ান অ্যাণ্ড নাম দাও ওয়াইফ হাজব্যাণ্ড এ্যাণ্ড কোম্পানী।

হাসতে লাগল গ্র্যান্ট।

ব্যানার্জী—আমার কোন পরামর্শই ভাল লাগল না। আমার উদ্বেগেব সীমা ছিল না—আমি তোমাকে সত্যি বলছি ব্যানার্জী—শিব্বাকে আমি বড ভালবাসতাম। যদিও মাদার আমি হইনি তবু বলছি আমি তাকে উয়োম্যান যেমন ভাবে ম্যানকে ভালবাসে—তা নয়—যেমন ভাবে ফ্রেণ্ডকে ভালবাসে তেমনি ভাবে। শেষ আমি গিয়েছিলাম খৃশ্চান মিশনে। তারা কোন সাহায্য কবতে পারে কিনা জিজ্ঞাসা করেছিলাম—মিশনের ফাদারকে। ফাদার আমাকে ওঁদের একজন ভ্যাকসিনেটার এবং ভ্যাকসিন দিয়ে বলেছিলেন—তুমি একে নিয়ে যাও প্রথমে সকলকে ভ্যাকসিনেট কর। তারপর খবর পেলে আমবা আবও সাহায্য পাঠাব।

আই লাইকড দি আইডিয়া। সেইদিনই আমি একজন ভ্যাকসিনেটবকে নিয়ে আমাদের জঙ্গলে গেলাম।

পুত্তনরাম তখন সিদ্ধি সরবত তৈরী কবছে। দাদোজী বসে রয়েছে। জঙ্গলেব ভিতরে কোথায় যেন তোমাদের রিলিজিয়ার্স সংএর সঙ্গে যে বাজনা বাজে সেই বাজনা বাজছে।

দাদোজী আমাকে দেখে বললে—লরা?

বললাম—হ্যাঁ।

—তুমি এলে এর মধ্যে? জান এখানে কি হচ্চে?

—জানি—পক্স। কিন্তু তোমরা কোন খবর দিলে না আমাকে, কি কবব আমি। ওয়াগন ফিরে যাচ্ছে এম্পটি। এদিকে শুনছি এখানে—মেন আর ডাইং লাইক ফ্লাইজ—আমি এখানে ভ্যাক্‌সিনেটর নিয়ে এসেছি। ইট মে হেল্প আস।

—মেনি থ্যাংক্স লরা। তার সঙ্গে আমি তোমার কাছে ক্ষমাও চাচ্ছি যে তোমাকে কোন খবর পাঠাতে পারিনি। উপায় ছিল না লরা। এখানকার

নিয়ম হচ্ছে যেখানে—মাদার শীতলা ইজ প্লিজড টু এ্যাপিয়ার—, পক্স হলে আমরা তাই বলি। আই মীন—দিজ পিউপল—সেখান থেকে কোন লোক কোথাও যায় না, এ্যাণ্ড কেউ আসে না। এলে তাকে—যতদিন পক্স না সেরে যায় ততদিন যেতে নেই। তুমি বুঝতে পার :—ইনফেকসন যাতে না—ছড়ায় তার জন্য এ ব্যবস্থা। গুড অর ব্যাড—যা খুশী বলতে পার। শিব্বা এটা খুব মানে। কোন লোক যেতেও চায় নি—শিব্বাও পাঠাতে চায় নি। সেই জন্যে খবর পায়নি। তুমি এসেছ—তোমারও এখান থেকে আর এখন ফিরে যাওয়া বোধহয় হবে না। থাকতে হবে এখানে!

আমি ভয় পেয়েছিলাম ব্যানার্জী। এখানে আমাকে থাকতে হবে?—

—হ্যাঁ। যতদিন না পক্স থামে ততদিন? ভয় কি? এই তো আমি রয়েছি। তা ছাড়া তোমার তো ভ্যাকসিনেশন হয়েছে।

—দাদোজী, প্লিজ। ও কথা বলো না। তা হ'লে বরং—আমি এক্ষুণি চলে যাই। টাঙা এখনও দাঁড়িয়ে আছে। এখানে এই পক্সের মধ্যে আমি থাকতে পারব না।

দাদোজী বলেছিলেন—কোন ভয় নেই তোমার। ডোণ্টওরি। অলরেডি আমরা পক্স বন্ধ করার ব্যবস্থা করেছি। ইন এ ডে অর টু অর থ্রি অর এ উইক—ইন দি মোষ্ট বুঝেছ—পক্স উইল স্টপ। ইউ উইল সী দি ম্যাজিক!

—ম্যাজিক!? কি বলছ দাদোজী?

—ঠিক বলছি; ইউ ষ্টে হিয়ার এ্যাণ্ড সী থিংস ইওর সেল্‌ফ উইল ইওর ওন আইজ!

অবাক হয়ে আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

দাদোজী বললে…এ গ্রেট সাধু সন্ন্যাসী উইল কাম টু মরো। হি উইল ষ্টে হিয়ার। যতদিন না থামে ততদিন থাকবে। অবশ্য বললাম তো তা এক সপ্তাহের বেশী নয়। হ'তে পারে না। একদিনেও হতে পারে। হি উইল—সে মাদার শীটলা—ইউ প্লিজ টেক আওয়ার পূজা এ্যাণ্ড গো অ্যাওয়ে ফ্রম হিয়ার। এ্যাণ্ড শী উইল গো অ্যাওয়ে।

আমার খুব রাগ হয়ে গেল ব্যানার্জী। আমি রাগ করে বলে উঠলাম হোয়াট ননসেন্স ইউ আর টকিং দাদোজী—আমি এখুনি চলে যাব—

দাদোজী রাগী মানুষ। সেও চটে গেল, বললে—তুমি লেডী না হলে তোমাকে আমি গালে চড় মেরে জবাব দিতাম। তা দেব না। তুমি যেতে চাচ্ছ—তা যাও না। গো ব্যাক। দেখ কি হয়!

থমকে গিয়েছিলাম—কি হবে ?

—নির্ঘাৎ তোমার পক্ষ হবে সেখানে গিয়ে। ইউ হ্যাভ ইনসলটেড আওয়ার সাধুজী এ্যাণ্ড মাদার শীতলা দি গডেস! ইউ উইল এ্যাণ্ড ইট।

কি বলব ব্যানার্জী ভয়ে আমার বুক দুরদুর করে উঠল। আমার হাত পায়ের ডগাগুলো ঠাণ্ডা হয়ে গেল। বুকের ভিতরটা শুকিয়ে উঠল।—মাই—গড! তা—হলে ?

ঠিক এই সময়েই একটা ঘটনা ঘটল ব্যানার্জী—দ্যাট—আই উইল নেভার ফরগেট। আমার সঙ্গে ভ্যাক্‌সিনেটর আর টাঙাওয়ালা এসেছিল—তারা দুজনে চীৎকার করতে করতে এসে আছড়ে পড়ল।

দাদোজী আমি দুজনে ছুটে গিয়ে বললাম—কি হয়েছে কি হয়েছে? চীৎকার করছ কেন? কি হয়েছে ?

লোক দুটো আঁ—আঁ শব্দ করছে তখনও। দাদোজী টাঙাওয়ালাটাকে ঝাঁকি দিয়ে বলল—চীৎকার করবি তো তোকে আছড়ে ফেলে দেব ওই পাথরের উপর। বল—কি হয়েছে ?

সে এবার বলল—বা—বা বাঘ।

—বাঘ ?

—হাঁ সাহেব। পথের উপর। আমরা এখানকার রকম সকম দেখে গাড়ী নিয়ে পালাচ্ছিলাম। খানিকটা গিয়েই দেখি একটা চিতাবাঘ রাস্তার ধারের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে পথের উপর দাঁড়াল। এল যেন মাতোয়ালার মত। তারপর দাঁড়িয়ে টলছিল। তারপর শুয়ে পড়ল। আমার ঘোড়া তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরিয়ে ছুটল। আমার হাত থেকে লাগাম ছেড়ে গিয়েছিল। গাড়ীর চাকাটা লাগল একটা গাছে, সঙ্গে সঙ্গে মড়মড় করে ভেঙে গেল—আমরা দুজনে উল্টে পড়ে গেলাম পথের উপর, বাঘটা থেকে বিশ হাত দূরে। ওদিকে ঘোড়াটা সেই একচাকা ভাঙা টাঙাটা ছেঁচড়ে নিয়ে ছুটে এল। আমরাও পিছু পিছু ছুটতে ছুটতে আসছি।

ভ্যাকসিনেটরটি এদেশী খ্রীশ্চান।—সে বললে—এ বিগ চিটা!

দাদোজী বললে—ভয় নেই। বাঘটা তখন মাতোয়ালার মত টলছিল এবং টলতে টলতে বসে পড়েছে তার ওটার পক্ষ হয়েছে। বেটা যত পক্ষের মরার মাংস খেয়েছে মরবে ওটা। না—হলে বিশ হাত দূর থেকে একটা ঘোড়া দুটো মানুষ-এর একটা-না একটা বেটা নিশ্চয় নিত।

অবাক হয়ে বললাম—বাঘের পক্ষ ?

—হ্যাঁ গো। যখন হয়—তখন কাকের হয়, শিয়ালের হয়। বাঘের হয়। ঘোড়ার হয়, গরুর হয়। তুমি নিশ্চয় জান—গরুর পক্সের পুঁজ থেকেই ভ্যাকসিন হয়েছে। চল—দেখে আসি।

দাদোজী শিব্বার দাদোজী। বন্দুকটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। একলাই যাচ্ছিল আমার এবার সাহস হ'ল। আমি তার সঙ্গ নিলাম। হাতে টর্চ ছিল সেটা আমিই জ্বেলে চলছিলাম। কিছুদূর যেতেই দেখলাম সত্যিই পথের উপর বাঘটা পড়ে আছে! বেটা গোঙাচ্ছে কিন্তু উঠবার শক্তি নেই।

আমি দাদোজীকে বললাম—দাও আমাকে বন্দুকটা।

—কেন ?

—ওটাতো মরবেই। আমি বাঘ মারার ক্রেডিটটা নিয়ে নি।

দাদোজী একটু ভাবলে। বাঘটা তখন শেষ চেষ্টা করছে একবার উঠে দাঁড়াবার জন্যে। সামনের দুটি পায়ের উপর ভর দিয়ে বসেছে। এ্যাণ্ড ইট ওয়াজ ফাইন টার্গেট।

দাদোজী বন্দুকটা আমার হাতে দিলে! বললে—মার। ওটাকে মেরে ফেলাই উচিত।

আমি মারলাম গুলী। বাঘটা তার শেষ চীৎকার করে পড়ে গেল। বাঘটা ক্ষেপে লাফ দিতে চেষ্টা করে। চেষ্টাও করেছিল—কিন্তু পারেনি।

পিছন থেকে হাঁক শুনলাম—দাদোজী—হো!

দাদোজী সাড়া দিলে—শি—ব্বা!

—বাঘ মেরেছ ?

—আমি না—লরা মেরেছে।

—লরা ? মাদার ? সাবাস—সাবাস সাবাস!

লরা বললে—ব্যানার্জী সেদিন রাত্রে আমি বড় ভয় পেলাম। ভ্যাকসিনেশন অবশ্য নিয়েছি কিন্তু এখানে শুধু মানুষ নয় জন্তু জানোয়ার পর্যন্ত পক্সে এ্যাটাকড হচ্ছে তাতে আমি ভয়ে প্রায় মরে গেলাম। সারা রাত্রি আমার ঘুম হল না। এ্যাণ্ড আমি গলা পর্যন্ত ঠেসে মদ খেয়ে অজ্ঞান আই মীন ব্যানার্জী—আমি জ্ঞান হারাবার চেষ্টা করলাম। একলা ঘরের মধ্যে কেমন যেন একটা ভয় আমাকে পেয়ে বসেছিল।

কথাটা তোমাকে বোধহয় বলিনি—কিছুদিন আগে একটা দেশোয়ালী পাণ্ডা জাতের লোক এসেছিল এক শীতলা মাঈ নিয়ে—।

এখানকার লোকেরা খুব বাজনা বাজিয়ে ধূপ ধুনো দিয়ে পূজো করছিল—আর সকলে মিলে তারস্বরে চেঁচিয়ে গান করছিল। আমি মদ খেয়েছিলাম ব্যানার্জী এ্যাণ্ড অন মাই ওয়ে ফ্রম গয়া—টু দিস জাংগ্‌ল্‌—আই মেট দেম। আমি ঘোড়ায় চেপে আসছিলাম।

দেখলাম—সেটা একটা কাঠের টপ লেস বাক্সের মত একটা বাক্সের মধ্যে বসিয়ে বেশ লাল কাপড় চোপড় ঢাকা দিয়েছে এ্যাণ্ড পাথরটার গায়ে সাদা লালচে সামথিং মেটালিক, মে বি গোল্ড—মে বি সিলভার—মে বি টিনা অর পিতল্‌—গোল টোপা বসানো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—কি হচ্ছে তোমাদের?

ওদের একজন বললে—শীত্‌লা মায়ের পূজো হচ্ছে।

—কৌন হ্যায় উ শীতলা মাঈ? অাঁ?

—চিচককে দেবী হোতি হ্যায়। উন্‌কি কৃপাসে সব ভালা হোতা হ্যায় আওর উন্‌ যিনকে পর গোস্‌সা করতি হ্যায়—তো উসকো চিচক হোতা হ্যায়—যব যাতা হ্যায়। এই জাংগলমে যো এতনা চিচক হোতা হ্যায়—উ সবকুছ উনকী গোসাসে হোতা হ্যায়। উসিকে লিয়ে মাঈকী পূজা দেতা হ্যায়।

ব্যানার্জী—পাথরটা টকটকে লাল রঙ মাখানো। উইথ অয়েল। আর বলব কি—দুটো ড্যাবডেবে চোখ বসানো আছে। দেখে আমার যত রাগ হল তত যেন শরীরটাই ঘিন্‌ ঘিন্‌ করতে লাগল। ইচ্ছে হল আমার হাতের চাবুকটা নিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে লোকগুলোকে দুহাতে পিটতে পিটতে যাই আর ওই লাল পাথরটাকে কিক্‌ করে ফেলে দিয়ে লাথি মেরে মেরে ভেঙে দি। বাট্‌ ইউ সি—আই নো দিজ পিউপল। কলকাতাতে তোমাদের মত বাবুদের দেখেছি, কুলীকেও দেখেছি, অফিস বেয়ারাকেও দেখেছি। তারা এদের থেকে একটু ডিফ্‌রেণ্ট। বেশী না। অব কোর্স তোমাদের বাঙালী বাবুদের মধ্যে মিটারের মত মেকী ইংরেজ অনেক আছে যারা খাঁটী ইংরেজকেও হার মানায়। দে আর এলিট্‌স অব ক্যালকাটা। দে আর সারটেনলি নট লাইক—ইওর দিস মিটার। বাট্‌—দিজ ভিলেজ পিউপ্‌ল—দে আর সো সিম্পল্‌! সো ভেরী ডোসাইল! কিন্তু গয়ার এস পি বলে দিয়েছিল—লরা ডার্লিং একটা কথা বলে দি মনে রেখো। এ সব লোকের পিঠে চাবুক মেরো, ইউ ক্যান কিক্‌—ইফ্‌ ইউ লাইক—বাট্‌ ডোণ্ট ডু ওয়ান থিং। ওদের রিলিজিয়াস সেণ্টিমেণ্টে কখনও আঘাত কর' না। নেভার ডু ইট। সিপয় মিউটিনি ওয়াজ এ লেসন টু আস।

ব্যানার্জী, কথাটা মনে করে আমি দুমিনিট দাঁড়িয়ে দেখে একটু হেসে চলে আসছি—অমনি হল কি জান, যে লোকটা ওদের প্রিষ্ট—সে হঠাৎ চোখ দুটো

খড় করে আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে,—কি বললে তা ঠিক বুঝতে পারলাম না কিন্তু সামথিং ভেরি ডেঞ্জারাস হি টোল্ড এ্যাবাউট মি। পারহ্যাপস্ কার্সড মি।

তবু সাহস করে জিজ্ঞাসা করলাম—কেয়া বোলটা হ্যায়? আঁ?

সে সে—এক ভয়ানক ভঙ্গি করে বললে—তুমারা পর মাঈজীকি গোস্সা হো গেয়া। চি্চ—চিচক—চিচক হোগা!

আমার খুব ভয় হল, বললাম—ভেক্কো হম তো কুছ কসুর তো নেহি কিয়া হ্যায়, তব হামারা পর গোস্সা কিউ হো গয়ি তুমহারা মায়ী?—ক্যা কসুর হামারা বাতাও।

—পূজা নেহি দিয়া। কিঁউ নেহি দিয়া?

—পূজা?

—হাঁ হাঁ পূজা.—পাঁচঠো রূপেয়া দো—পূজা দিয়া যায়েগা। দো। নেহি তো তুমা—রা—চি—চ—ক হো গা। এ—ত—না বড়া বড়া চি—চ—ক! হাঁ।

পাঁচ টাকার নোট একখানা ফেলে দিয়ে এসেছিলাম কিন্তু রাত্রে ঘরে একলা বসে যত মদ খেলাম—তত ওই ভয়টা যেন আমাকে চেপে চেপে ধরতে লাগল।

কানে বাজতে লাগল—চি—চ—ক হো গা। এ—ত—না বড়া-বড়া। চীৎকার করে ডাকতে লাগলাম—শিবাজী বাবু, শিবাজী বাবু! দাদা সাহেব। বাট দেয়ার ওয়াজ নো রিপ্লাই। বেয়ারাটা ঘুমুচ্ছে, অঘোরে ঘুমুচ্ছে ভাঙ খেয়ে। বাংলোর বারান্দায় বেরিয়ে বার কতক চেঁচিয়ে ডাকলাম—তাতেও কারুর সাড়া পেলাম না। বরং ভয় পেলাম দাদাসাহেব, মনে হল জাংগলের ভিতর থেকে লাল কাপড় পরা—জাষ্ট এ ওম্যান ইন দি রেড। সী উইল বি কামিং আউট এনি মোমেণ্ট এ্যাণ্ড আমাকে ধরে কামড়াতে শুরু করবে।

সে ভয়টা এমন হয়েছিল ব্যানার্জী যে আমি বু-বু শব্দ করে কোনরকমে হামাগুড়ি দিয়ে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে বলেছিলাম—ও মাদার—ও গডেস অব পক্স স্মল এ্যাণ্ড চিকেন, বি কাইণ্ড টু মি, প্লিজ—প্লিজ, আই হ্যাভ গিভ্ন ফাইভ রুপীজ এগেন আই শ্যাল গিভ ইউ এ্যানাদার ফাইভ—নো—মাদার টেন; টেন রুপীজ আই উইল গিভ ইউ!

এ্যাণ্ড আবার খানিকটা মদ খেয়ে শুধুই বলেছিলাম—ও মাদার, ও মাদার—ও মাদার অব পক্স—ও গডেস অব পক্স—ইউ আর ভেরী গুড ভেরী কাইণ্ড টু দি পুয়োর—ইউ আর এ গ্রেট গডেস—গ্রেট গ্রেট গডেস। ফরগিভ মি—বলতে বলতে যে কখন ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম—তা বলতে পারব না। কিন্তু মদের

নেশায় এবং ঐ রকম করে গডেস অব চিচকের তোষামোদ করতে করতে ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎ অনেক বাজনায় আমার ঘুম ভাঙল।

ব্যানার্জী তখন বেলা প্রায় দশটা। দেখ রাত্রি কালটা বড় ভয়ানক। যত ভয় ওই রাত্রি কালেই বাসা বেঁধে থাকে। কাল যে এত ভয় পেয়েছিলাম—সেই আমি বাজনা শুনে উঠে বসলাম। চারিদিক থেকে আলোর ছটা বাজছে; আমি নিজের চেহারাটাও আয়নাতে দেখলাম না। দেখা উচিত ছিল। কারণ পরে আয়নায় দেখেছিলাম আমার কাপড় চোপড় সব 'ষ্টেইন্‌ড' হয়েছিল, মাথার চুলে এবং মুখে ধুলো এবং ঝুল লেগেছিল। বাজনার শব্দ শুনে প্রথমে বাইরে বের হতেও সাহস হয়নি। মনে পড়েছিল সেই লোকটার কথা! ভয়ে বুক টিপ টিপ করছিল—হয়তো বা সেই লোকটাই আসছে ঢাক ঢোল সানাই শিঙে বাজিয়ে। লোকগুলো চীৎকার করছে—জয় জয় সাধু বাবা কি জয়।

—জয় গুরু মহারাজ কি জয়!

—জয় শীতলা দেবী মাঈকী জয়!

গোটা বনটা যেন সে বাজনায় আর মানুষের জয়ধ্বনির ধ্বনি প্রতিধ্বনিতে কাঁপছে। একটা চেয়ার এনে একটা দেওয়ালের ধারে দাঁড় করিয়ে তার উপর উঠে—দেওয়ালের গায়ে গোল একটা কাঁচের জানালার মধ্যে দিয়ে দেখতে চেষ্টা করলাম।

তুমি তো সে জানালাগুলো দেখেছ ব্যানার্জী।

* * *

হ্যাঁ দেখেছি। পাথরের বাংলোটা যে তৈরী করিয়েছিল, এই রকম কতকগুলো জানালা বা ঘুলঘুলি দিয়ে বন্দুকের ব্যারাল বের করে গুলী চালানো যায়।

লরা সেই ঘুলঘুলির কথা বলছিল।

লরা চেয়ারে চেপে সেই ঘুলঘুলির মধ্যে দিয়ে যা দেখছিল তাতে সে যত আশ্বস্ত হয়েছিল—তত হয়েছিল বিস্মিত।

লরা বলল, ব্যানার্জী ইউ বিলিভ মি—এর আগে আমি এমনটি যেন আর দেখিনি মনে হয়েছিল সেদিন।

আশ্চর্য সুন্দর এক সাধু, এক মুখ দাড়ি গোঁফ—মাথায় সাদা চুলের একটা মস্ত বিঁড়ের মত খোঁপা বাঁধা। গলাতে মালা। নানা রকমের মালা ব্যানার্জী—তুমি নিশ্চয় আমার থেকে বেশী জান এ সম্বন্ধে বিডের মালা—এ্যাণ্ড হোয়াট ইউ কল…

—রুদ্রাক্ষ?

—ইয়েস ইয়েস। তার সঙ্গে অনেক ফুলের মালা। হিপস অব গারল্যাণ্ডস —অব ব্রাইট মেরিগোল্ড ফ্লাওয়ার। বাট দি—সন্ন্যাসী ওয়াজ রিয়ালী এ সেইন্ট! পীস পারসোনিফায়েড ইউ ক্যান কল হিম। ভেরী প্লেজেণ্ট ফেস। বিউটিফুলও বটে। ভেরী বিউটিফুল। সারা অঙ্গে ছাই মাখা! দেখে ভারী আনন্দ হল। সাহস হল—আমারও হল ব্যানার্জী মনে হল—দিস ম্যান, ইয়েস দিস সন্ন্যাসী হ্যাজ গট সামথিং ইন হিম। ক্যান হি ডু গড।

বড় চারটে বাঁশের উপর একটা বড় তক্তাপোষ বেঁধে তার উপর একটা রীতিমত ছত্রী তৈরী করে সবই রঙীন কাগজ আর সোনালী রূপোলী কাগজে মুড়ে দিয়েছে। এবং সেই ছত্রের ভিতরে মোটা গদী পেতে তার উপর সাটিনের চাদর পেতে তিন পাশে তিন তিনটে সাটিনের মসলন্দ (তাকিয়া) দিয়ে সাধুজীব আসন তৈরী হয়েছে। সাধুজী তাইতে বসে আছেন। স্মাইলিং ফেস ব্রাইট আইজ—হোয়াট—বিয়ার্ড এ্যাণ্ড হেয়ারস। কপালে চন্দনের দাগ।

ও, ব্যানার্জী হি ওয়াজ এ ওয়াণ্ডারফুল ম্যান! ওয়াণ্ডারফুল!

তোমাকে বলব কি, ব্যানার্জী সন্ন্যাসীকে নিয়ে এসে তাঁর জন্যে বানানো একটা সুন্দর কাঠের খুঁটো দিয়ে তৈরী করায় আস্তানায় তাকে তুললে তিনি বসলেন। গোটা জঙ্গলের মায় পাঁচ-ছ হাজার লোক তার চারিপাশে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে রইল।

শিব্বা জয়ধ্বনি দিলে—বোলো ভাই—সাধু বাবা কি—

পাঁচ হাজার কণ্ঠে ফেটে পড়ল—জয়!

—বলো ভাই গুরু মহারাজ কি—

—জয়।

কোলাহল শান্ত হলে সাধুজী বললেন—বাবা লোক! তোমাদেব এখানে চিচক হয়েছে। বহুৎ আদমীর জান নুকসান হচ্ছে। মায়ের বাচ্চা যাচ্ছে! ছোকরীর স্বামী চলে যাচ্ছে। যারা বাঁচছে তাদের বহুৎ দুঃখ কষ্ট হোতা হায়। যেত্না আদমী অন্ধা হো যাতা হায়। উস লিয়ে হামারা চেলা শিব্বা আমার পাশে গিয়েছিল। আমি আমার সাধনকে জাগা ছোড়কে হিঁয়া আয়া হায়। ভগবানকে—রামজীকে কিরপা। হম কুছ নেহি না বাবা! দেঁথে—কেয়া কিয়া যায়। রামজী—হামারা কিষণজী হামারা—মহাদেওজী কি কেয়া মর্জি হোগা।

* * *

সেদিন কথাগুলি আমার ভারী ভাল লেগেছিল ব্যানার্জী। আজ ঠিক সেভাবে বলতে পারলাম না।

তিনি যেন একটা আশ্বাস সঞ্চার করে দিলেন সকলের মনের মধ্যে। এক মুহূর্তে ওই অল্প ক'টি কথার মধ্যে।

অনেক নিয়ম করে দিলেন তিনি। বাড়ির দোরে দোরে পোড়ামাটির হাঁড়িতে আগুন দিয়ে ধূপ দিতে বললেন। ঘর দোর পথঘাট ঝাড়ু দিয়ে সাফা করতে বললেন। চিবক যার বাড়িতে হয়েছে তাদের বাড়ির জন্যে আলগ আলগ ঝর্ণ ব্যবস্থা করে দিলেন। আর বললেন, তিন রোজের মধ্যে সমস্ত লোককে যত ময়লা কাপড়া আছে কুর্তা আছে তা গরম পানির মধ্যে দিয়ে সোডা দিয়ে সাফা সফেদ করতে হবে।—আর বললেন, আশে-পাশে যত মরা জানোয়ার কি মুর্দা মানুষও যদি হয় সব দেখে শুনে মাটির তলায় গেড়ে দাও। আর দারু মৎ পিনা!

আর নাম গান লাগাও।

রাম রাম সীয়া রাম—হরে রাম হরে রাম।

পুরা তিন দিন ভর। লাগাও নাম গান।

রাম রাম। সীয়া রাম। হরে রাম। হরে রাম।

ব্যানার্জী ইট হ্যাড এ ট্রিমেণ্ডাস এফেক্ট। ট্রিমেণ্ডাস। লোকে ভয় ভাবনা ভুলে নাচতে লাগল আর ওই গাইতে লাগল রাম রাম সীয়ারাম—হরে রাম—হরে রাম।

তোমাকে মিথ্যে বলব না ব্যানার্জী আই অলসো ডান্সড। এবং আমি তিন-চার দিন মদও খেলাম না। তিন দিন পর থাকতে পারলাম না। ব্যানার্জী আমি গিয়ে সাধুজীকে বললাম সাধুজী—আমি ইংলিশ গার্ল—আমি মদ খাই। অভ্যেস হয়ে গেছে। মদ না খেলে কষ্ট হয়। তিন দিন তো চলে গেল এখন কি মদ খেতে পারি না?

তোমাকে একটা কথা বলিনি ব্যানার্জী সাধুজী কখনও কথা বলতেন না। মৌনী সাধু, তিনি উত্তর কাগজে লিখে দিতেন তাঁর চেলারা পড়ে দিত। কেবল ওই প্রথম দিন এসে কথা বলেছিলেন তারপর আর বলেননি।

সাধুজী উত্তর লিখে দিলেন শিব্বাই আমাকে পড়ে শোনালে। দেখিয়ে মেম-সাব! হিঁয়া পিনা তো ঠিক নেহি হোগা। বললেন, দেখ মেম সাহেব যদি তুমি খাও তবে ওই ছোট বুনোগুলোই বা খাবে না কেন। দেখ তোমরা আমাদের দেশে এসে তাজ্জব বানিয়েছ—লোহেকা গাড়ীয়া লোহেকা লাইনোয়া পর ছুটতি হ্যায় তুমহারা হুকুমসে। বিলকুল কানুন চলতি হ্যায়। পুলিশ সেলাম দেতি হ্যায়।—তুম লোগ যব ইয়ে হুকুম বরবাদ করে দেবে মানবে না তখন উ লোকও মানবে না।

লরা বললে—শিবাজী ওয়াজ গ্রেট। লেখা কাগজখানা থেকে মুখ তুলে সে বললে—লরা ইউ সী—তোমাকে মাদার বলেছি। তাই এখনও তুমি খাড়া আছ। না হলে—। ইউ নো—?

—হোয়াট ?

—পরশুরাম।

—হু ইজ হি ?

—হি মার্ডার্ড হিজ মাদার উইথ এ্যান আক্স। আণ্ডার দি অর্ডার অব হিজ ফাদার!

—মাই গড!

—ইউ নো, হি ওয়াজ এ অব্‌তার। আই এ্যাম নট। বাট ইফ ইউ ডিসওবে মাই ফাদার—; ইয়েস হি ইজ মাই ফাদার, সাইলেণ্ট ফাদার, আই উইল ডু সামথিং হুইচ ইউ উইল নেভার ফরগেট। এবার ভিমরুলের চাক খুঁচে দিয়ে সেখানে ফেলে দিয়ে আসব। মাইণ্ড ইউ।

সন্ন্যাসী একটি কাগজে লিখে দিলেন—তুম গয়া চলে যাও। হুঁয়া সাব লোক হ্যায়—উনকে সাথ দারু পিয়ো নাচা গানা করো, মজেমে রহো। কেয়া করেগা হিঁয়া ?

শিব্বাকে লিখে দিলেন—ওকে গয়া ভেজে দাও।

লরা বললে—ব্যানার্জী—শিব্বা বললে কি জান, পিণ্ডি সমেত বেঁধে দিয়ে ওকে ভেজে দিচ্ছি।

আমার ভয় হয়েছিল ব্যানার্জী—যে হয়তো আমাকে শুধু হাতে বিদায় করবে। কিন্তু তা ক'রেনি। আমাকে একশো টাকা দিয়ে গয়া পাঠিয়ে দিয়েছিল।

আমি কলকাতাই চলে আসব ভেবেছিলাম। কিন্তু এস পি গ্র্যাণ্ট আমার কাছে সব শুনে বলেছিল—তুমি থেকে যাও লরা আই ওয়াণ্ট ইওর সার্ভিস! অবশ্য মাইনে পাবে। যাতে সেটা বেশ ভাল হয় তার জন্যে আমি লিখব। তুমি ভেবো না।

আমি একটু আশ্চর্য হয়েছিলাম ব্যানার্জী। হঠাৎ এমন কি ঘটল যে—আমার সার্ভিস গ্র্যাণ্টের দরকার হল ?—

আমি গ্র্যাণ্টকে বললাম—আমায় দয়া করে একটু খুলে বলবে ?—

—বিশেষ বাধা কি ?—দিন দশেক পরেই ওখানে পক্ষ থেমে যাবে।

অবাক হয়ে গেলাম ব্যানার্জী। গ্র্যাণ্ট একজন পাকা ইংরেজ এবং আই-পি সার্ভিসের লোক। আই-সি-এস সার্ভিসের লোকদের মধ্যেও অনেক সেন্টিমেণ্টাল,

ইমোশনাল লোক থাকে—ব্যানার্জী কিন্তু আই-পি-এস দের মধ্যে ওসবের জায়গা নেই। সে বলছে দিন দশকের মধ্যে পক্স থেমে যাবে!

আমার মুখের বিস্ময়ের দিকে তাকিয়ে গ্র্যাণ্ট বললে—দেখ লোকটা কিছু জানে। কিছু পাওয়ার ওর আছে। যেখানে কলেরা হয় বা পক্স হয় সেখানে এই সাধুজীকে লোকেরা নিয়ে যায়—গেলেই আশ্চর্য সাত দিন বা দশ দিনের মধ্যে থেমে যাবেই। কারণ এর আগে আগে সর্বত্রই গিয়েছে। কোথাও কোন এক বারের জন্যেও এর ব্যাতিক্রম হয় নি।

লবা বলেছিল—ষ্ট্রেঞ্জ!

গ্র্যাণ্ট বলেছিল—হ্যাঁ—ষ্ট্রেঞ্জ। হি ইজ এ মিষ্টিরিয়াস ম্যান। ইউ সি। বহুবার আমরা এর সম্পর্কে অনেক খবর নিতে চেষ্টা করেছি। খবর নিয়েছি। ইউ সী, ভেরী বিগ ফাইল এ ডোসিয়ার উই হ্যাভ গট। কিন্তু মাথা মুণ্ড কিছুই ঠিক করতে পারি না। ধরা যায় না। প্রথম জীবনে লোকটার পিছনে স্পাই লাগানো হয়েছিল—সে কিছুদিনের মধ্যে ওরই শিষ্য হয়ে গেল। কথা বলে, না। কথা বলানো যায় না। কিছুতেই না।

এ্যাণ্ড ইউ সী—লোকটার বিচিত্র একটা শক্তি বল শক্তি—অব্ কোর্স ইট ইজ সাম সর্ট অব পাওয়ার—কাকদের সঙ্গে পাখীদের সঙ্গে তার কি একটা কথাবার্তা আছে। তুমি ওখানে থাকলে দেখতে পাবে হঠাৎ লিখে হোক বা যারা ইশারায় ওর কথা বোঝে তাদের ও জানিয়ে দেয় ওর ইচ্ছের কথা। একমন দুমন চাল ডাল বা পাঁটার মাংস টুকরো টুকরো করে কেটে নিয়ে এল। তার আগের দিন দিস ম্যান আঙুল নেড়ে তুড়ি দিয়ে কাক বা শালিককে ডাকে। মজার কথা সেটা এসে একেবারে কাছে বসে খুব কাছে—এ্যাণ্ড হি স্পীকস সামথিং—তারপর সেই পাখীটা ডাকতে ডাকতে উড়ে যায়। কিছুক্ষণ পর অনেক পাখী এসে জমে। তাদের সঙ্গে ইশারায় কিংবা বিচিত্র শব্দ করে কিছু বলে। পাখীরা চলে যায় সেদিন। পরের দিন ঠিক এসে কলরব করে মাথার উপর উড়তে থাকবে। গাছের ডালে বসতে থাকবে। তারপর সন্ন্যাসী হাততালি দিয়ে ইশারা করে ডাকে—ইশারা করে লাইন দেখিয়ে দেয়। পাখীগুলো ঠিক সেই মতো সারিবন্দী হয়ে বসে যায়—। এ্যাণ্ড লবা সবচেয়ে আশ্চর্য কথা—পেশেণ্টলি অপেক্ষা করে বসে থাকে, তিন চারটে লোক তাদের মাংসের টুকরো চাল ডাল মিশিয়ে—সামনে দিয়ে দিয়ে যায়। একটু মারামারি করে না একটু কাড়াকড়ি করে না। খাওয়া হয়ে গেলে—দিস ম্যান স্পীকস। এই কটি কথাই সে বলে। বলে—বলো ভাই 'রাম রাম সীয়ারাম হরে রাম হরে রাম। জয় কিষণ রাধে শ্যাম।'

পাখীগুলো কল কল চীৎকার করতে করতে উড়ে যায়।
দেশোয়ালীরা বলে তাবা ঠিক শুনতে পায় পাখীগুলোও বলছে 'রাম রাম সীয়ারাম হরে রাম হবে রাম জয় কিষণ রাধেশ্যাম।'
লরা অবাক হয়ে শুনতে শুনতে বলেছিল—Strange।
—হ্যাঁ Strangeই বটে।—তুমি ওখানে গিয়ে থাক না। গিভ আস্ ইনফরমেশন। পারবে?

ব্যানার্জী—লরা বললে।—দেখ পৃথিবী কি রঙদার হয়ে এসেছে।—আঃ কি বলব ব্যানার্জী ভাঙের নেশা কি চমৎকার!—কি করবে হুইস্কীর নেশা। শ্যাম্পেন খুব বেশী খাইনি। শ্যাম্পেনেব নেশাটা ভাল। তার সঙ্গে তুলনা হতে পারে। ও দি ওয়ার্ল্ড ইজ বি—উ—টি ফুল। ভেবী—ভে—রী বি—উটি—ফুল।—
আমি বললাম—তাহলে আমি উঠি লরা। পরে আবার বাকীটা শুনব। তুমি আজ ববং ভাঙেব নেশায় ওয়ার্ল্ডেব বিউটি নিরীক্ষণ কর। বুঝেছ!
—নো—নো—ডার্লিং।—নো—নো—নো। এখুনি যাবে কি? এখন তো সবে সাড়ে আটটা—
—এক্সকিউজ মি লবা—এসেছি যে—সেই বিকেল চারটের সময়। ইট ইজ ফোর আওয়ারস এ্যাণ্ড এ হাফ।

বারো

সেদিন লরার কাছ থেকে ফিরতে ফিরতে ভেবেছিলাম আর কোনদিন লরার সঙ্গে আমার দেখা হবে না। কিন্তু আবার দেখা হল।
আমার বয়স তখন ছাব্বিশ সাতাশ। জীবনে চাকরীর পাট শেষ করেছি। দেশে নিজের সামান্য জমিদারী সম্পত্তি, জমি-জমা দেখার সঙ্গে সঙ্গে জুড়ে গিয়েছে দেশ সেবা, আর সেই সঙ্গে দিন দিন বেশ বড় হয়ে উঠছে সাহিত্য চর্চা। তাতে মর্তলোকে চোখের সামনে চলবার পথরেখার হদিস না মিললেও কল্পনায় একটা পথ দিন দিন আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। সাহিত্য সেবার পথ।
সে সাহিত্য সেবার কল্পনার মধ্যে তখনও আমার জীবনের আসল বক্তব্যও জমাট বাঁধেনি, তা প্রকাশেব বাঞ্ছিত ভঙ্গিটিও খুঁজে পাইনি। আমার সাহিত্য সেবার আদিতে, যেমন সবাইয়েরই থাকে, ছিল কবিতা। তবে তখন কবিতার

আকাশলোক থেকে নেমে এসে দাঁড়িয়েছি নাটকের জমজমাট কল্পনার ক্ষেত্রে। ইতিহাসের পাতায় রাজা-বাদশা, আমীর-ওমরাহ, সৈন্য-সেনাপতি, রাজঅন্তঃপুরের রূপসী নারী এদের পিছন পিছন চলাফেরা করি কল্পনায়। চোখের সামনে যারা জলজ্যান্ত আমার সঙ্গে কাজ কারবার করছে তাদের দিকে তখনও চোখ পড়েনি। তাদের নিয়ে যে লেখা যায় তা তখন কল্পনায়ও আসেনি। তবে সাহিত্য সেবার পথ ধরেছি বলে ভেবেছিলাম আমার আর জীবনে ভিন্ন পথের যাত্রী লরার সঙ্গে দেখা হবে না। ওসব কোলিয়ারী, শালের খুঁটি, নানান লিমিটেড কোম্পানী, হাইকোর্ট এ সবের বেড়া ডিঙিয়ে আমি তখন আমার দেশে এসে পড়েছি। চোখের সামনে কোথাও ঊষর, কোথাও শ্যামল ক্ষেত্র, কোথাও ক্ষীণ কিন্তু ঘনশ্যাম বনশোভা, কোথাও বা মাতালের রাঙা চোখের মত রক্তাভ কঠিন প্রান্তর। চোখের সামনে যাই থাকুক, মনের চোখের সামনে তখন শুধু থিয়েটারের স্টেজ আর রাজবেশধারী নানান পুরুষ আর নারী যারা স্টেজের উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ রাজ্য তো লরার অবস্থানের সীমানা থেকে বহু দূরে। তাই ভেবেছিলাম আর দেখা হবে না।

তবু দেখা হল।

আমি যখন রাজা-বাদশা, রাজকুমারী-শাহজাদী নিয়ে কল্পনায় ব্যস্ত, যখন পাশের ফতুয়া-পরা কালো রঙের রোগা লোকটা পাশ থেকে ডাকলে ভাল করে শুনতে পাই না, তখন গয়া থেকে একদিন ডাক এল। সে ডাকে চমকে উঠলাম।

এক সঙ্গে দুখানা চিঠি। একখানা নিমন্ত্রণ-পত্র, অন্যখানা এবড়ো খেবড়ো, অসমান বাংলা হরফে লেখা একখানা পোষ্টকার্ড। দু'খানাই পাঠিয়েছে শিবাজী সরকার। গয়া থেকে। আমার মামা গয়ায় পরলোকগমন করেছেন। একখানা শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণপত্র, অন্যখানায় শিবাজী আমাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছে শ্রাদ্ধে উপস্থিত থাকবার জন্য। একটা ব্যাপারে খুব আশ্চর্য লাগল। শিবাজীই বড় মামার শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করেছে।

বড় মামা অবশ্য অকৃতদার ছিলেন। তার আত্মীয়স্বজন, জ্ঞাতি-গোষ্ঠী আর কেউ ছিল বলেও আমি জানি না। আমার মা ছাড়া আর এক বিধবা বোন ও তাঁর একটি ছেলে ছিল। তাঁরাও বিগত। সুতরাং শিবাজী আগ বাড়িয়ে বড় মামার শ্রাদ্ধ করতে এসেছে তাতে আশ্চর্য হবারই বা কি আছে? চিঠিতে ব্যাপারটা স্পষ্ট করে দিয়েছে শিবাজী। লিখেছে—ভাগ্না, দাদোজী হঠাৎ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুপাদে লীন হইয়া গেলেন। তাঁহাকে দাদোজী বলিলেও তিনি আসলে আমার দ্বিতীয় পিতা ছিলেন। বাবা অনেক দিনই গত

হইয়াছেন। দাদোজীকে পাইয়া আমি পিতৃশোক ভুলিয়াছিলাম। তিনি যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন ততদিন পিতার মত আমাকে রক্ষা করিয়াছেন, বুদ্ধি দিয়াছেন। তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুর পর আমিই তাঁহার মুখাগ্নি করিয়াছি এবং অশৌচ পালন করিতেছি। ওঁর তুমি ছাড়া আর কোন উত্তরাধিকারী আছে কি না আমি জানি না। তুমি আসিয়া তোমার সম্পত্তি বুঝিয়া লও। শ্রাদ্ধে উপস্থিত থাকা তোমার অবশ্য প্রয়োজন।

সুতরাং সব দিক বিবেচনা করে কল্পনার রাজা বাদশা আর সুন্দরীদের মাথার ভেতরে ঠেলে মনের অন্দরমহলে পাঠিয়ে বাস্তব অবস্থার মোকাবেলা করবার জন্যে গয়া রওনা হলাম। মোকাবেলা আর কি? আমি কি করব তাও আমি মনে মনে ঠিক করে নিয়েছিলাম। মামার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে প্রথমেই একটা কথা আমার মনে হয়েছিল। অকৃতদার অপুত্রক ভ্রাতৃহীন মামার একমাত্র বোনের একমাত্র পুত্র হিসেবে মামার যা কিছু সম্পত্তি আছে তা সবই আমার পাওনা। কিন্তু যে কালে আমার নিজের সম্পত্তি আমার কাছে ভারবোঝা মনে হচ্ছে সেখানে আবার গয়া নামক স্থানে আমার মাতুলের সম্পত্তিতে গিয়ে নিজের অধিকার স্থাপন করব এটা আমার কাছে হাস্যকরই মনে হয়েছিল। মামার সম্পত্তির যা হয় হোক, ও নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। সুতরাং যেখানে মাথাব্যথা হল না, সেখানে হাল্কা মাথা নিয়েই গয়া রওনা হলাম।

গয়ায় নেমে প্রথম যেখানে যাওয়া উচিত সেখানেই হাজির হলাম। মামাহীন মামার বাড়ীতেই গিয়ে নামলাম প্রথম।

তখনও শ্রাদ্ধের দিন তিনেক বাকী ছিল। মামার বাড়ীতে মামা একা থাকতেন। আজ মামা নেই, তবু সেখানেই গেলাম প্রথম।

নির্জন নিশ্চুপ বাড়ী। দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলাম বাড়ী সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। কিন্তু দরজায় কোন তালা নেই। দরজা ঠেললাম। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। বুঝলাম ভিতরে মানুষ আছে। মানুষ যেই থাকুক এ আমার মামার বাড়ী। এখন আইনের চোখে আমারই বাড়ী। সুতরাং আমার ধাক্কা দিয়ে ভেতরে কে আছে জানতে চাইলে নিশ্চয়ই খুব অন্যায় হবে না।

দরজায় কড়া নাড়লাম। কড়া নেড়ে সাড়া না পেয়ে ধাক্কা দিলাম বার কয়েক। এবার দরজা খুলে গেল। যে দরজা খুলে দিলে তাকে দেখে অবাক হয়ে গেলাম আমি। আরে এ যে সুরসুতিয়া।

সুরসুতিয়া আমাকে দেখে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে

তার অবাক মুখে একটু একটু করে হাসি ফুটে উঠল। সে একটু এগিয়ে এসে আমার হাত ধরে বললে—আইয়ে বাবুজী, ভিতর আইয়ে!

সুরসুতিয়া আর সে সুরসুতিয়া নেই। যখন ওকে প্রথম দেখেছিলাম তখন ওর বয়স ছিল পাঁচ ছ' বছর। এখন তার থেকে চার বছর পার হয়ে গিয়েছে। তার মানে ওর বয়স এখন ন' দশ বছর। কিন্তু চার বছর বয়স বাড়াটাই ওর ক্ষেত্রে প্রধান পরিবর্তন নয়। ওর আসল পরিবর্তন হয়েছে অন্যত্র। ওর মধ্যে অরণ্য বাসের বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই আর। ওর সর্বাঙ্গে নাগরিক স্পর্শ লেগেছে। ও ফ্রক পরে আছে কি সুন্দর মানানসই ভাবে। গায়ের রঙটা আরও ফর্সা হয়েছে। চুলগুলি দুদিকে দুটো বেণী করে বাঁধা। সবই বেশ পরিপাটি। ওর বাইরের চেহারা আর পোষাকেই শুধু নাগরিক স্পর্শ লাগেনি, ওর স্বভাবেও লেগেছে সে স্পর্শ আরও তীব্রতর হয়ে, আরও অভ্রান্তভাবে। ওর হাসিতে, ওর চোখের দৃষ্টিতে, ওর ভ্রূর কুঞ্চনে, ওর পদক্ষেপে, ওর ভাষা ব্যবহারে আমি তাকে দেখতে পেলাম। আর সে-দেখা আমার ভুল হয়েছিল বলে আমি মনে করি না।

সুরসুতিয়া আমাকে টানতে টানতে ভিতরে নিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ আমার হাতটা ছেড়ে দিয়ে আমাকে বললে—থোড়া ঠহর যাইয়ে! একটু দাঁড়ান।

বলে খিলটা বন্ধ করে এসে আবার আমার হাতটা ধরলে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—মামাজী কোথায়?

—বাবুজী? বাবুজী তো দেহাতে গিয়েছেন!

—দেহাত? দেহাত মানে তো সেই বনে?

—জী হাঁ! বলে হাসল সুরসুতিয়া।

আমি তার হাতের টান সত্ত্বেও থমকে গেলাম। বললাম—শিবাজী নেই, তাহলে কোথায় যাব?

সুরসুতিয়া হেসে বললে—বাবুজী নেই, কিন্তু আমরা তো আছি!

জিজ্ঞাসা করলাম—আমরা? আমরা কে রে?

—আমি, আমার মা!

বললাম—আচ্ছা!

সুরসুতিয়া আমার হাত ধরে বাড়ীর উঠোনে নিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে ডেকে তার মিঠা হিন্দীতে বললে—দেখ মা, কে এসেছেন দেখ!

ওর মা বুঝতে পেরেছিল কে এসেছে। সুরসুতিয়ার মা, শিবার ফুফাজী হাত ধুয়ে কাপড়ে হাত মুছতে মুছতে মাথার লম্বা ঘোমটা আরও লম্বা করে হেসে

দাঁড়ালেন। ঘোমটার আড়ালে তিনি হাসলেন কিনা কে জানে, তবে আমি তাঁর হাসি অনুমান করে নিলাম।

মেয়ে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তিনি তাকে কাছে টেনে নিয়ে ফিস ফিস করে কি বললেন। সঙ্গে সঙ্গে মায়ের হাত ছাড়িয়ে হাসতে হাসতে সুরস্থতিয়া অনেক কষ্ট করে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ভারী লোহাব শেকল খুলে ঘরের ভিতর থেকে সতরঞ্চি এনে বারান্দায় চৌকির ওপর পেতে দিলে। আমার হাত থেকে যে ছোট সুটকেশটি আমি নামিয়ে পাশে বেখেছিলাম সেটি তুলে নিয়ে দ্রুত পায়ে চৌকির ওপর বাখা হল। তারপর তরতরে পায়ে সে উঠোন পার হয়ে বাথরুমে চলে গেল। তারপরই কূয়োতে বালতি পড়ার শব্দ পেলাম। জল উঠল, বালতিতে জল ঢালা হল। তারপব বাথরুম থেকে ভিজে পায়ে সুরস্থতিয়া ছুটে এসে আমাকে হাসি মুখে বললে—পানি দে দিয়া। জল দিয়েছি। হাত-মুখ ধুয়ে নিন। মা এখুনি চা দেবে।

হাত-মুখ ধুয়ে চৌকিতে বসে আস্তে আস্তে চা খাচ্ছি এমন সময় মেয়েব সঙ্গে মেয়ের মা এসে দাঁড়াল।

সুরস্থতিয়া বললে—চা খেয়ে নিন। তারপর নাস্তা করবেন।

আমি চা খেতে খেতে মনে মনে বিব্রত বোধ করছিলাম। ভাবছিলাম আমি এখন কি করব? আমি এখানে থাকব না অন্য কোথাও যাব? অন্য কোথায়ই বা যাব আমি? এই তো আমাব মামাব বাডী! গয়া এসে আমি আব অন্য কোথায়ই বা যেতে পারি?

ভাবছিলাম। ভাবতে ভাবতেই জিজ্ঞাসা করলাম—এখানে আর কে থাকে বে সুরস্থতিয়া?

সুরস্থতিয়া অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে—আব কে থাকবে?

আমি ধাক্কা খেয়ে থেমে গেলাম। সুরস্থতিয়া আমার মুখেব দিকে চেয়ে কি বুঝে বললে—আমি আর মা তো দাদোজীর কাছেই থাকতাম। তা দাদোজী হঠাৎ মরে গেলেন।

একটু থেমে আবার সুরস্থতিয়া বললে—দাদোজী মারা যাবার সময় মা আমি আর বাবুজী এই তিনজনই তো খালি ছিলাম। ব্যস স্রিফ তিনো আদমী।

জিজ্ঞাসা করলাম—তোরা কতদিন আছিস এখানে?

এবার ঘোমটার ভিতর থেকে সুরস্থতিয়ার মা একটু চাপা গলায় বললে—দু'বছর হল বাবুজী! শিব্বা বাবুজীর বহুত সখ হল কি সুরস্থতিয়াকে ইস্কুলমে পঢ়ায়েঙ্গে। তা দাদোজীর সঙ্গে বাত করে আমাকে আর সুরস্থতিয়াকে এখানে নিয়ে এলেন।

সুরস্মৃতিয়াকে ইস্কুলে ভর্তি করে দিলেন। এ সুরস্মৃতিয়া, তুম কোন্ কিলাসমে পঢ়ো বাবুজীকো বতাও!

সুরস্মৃতিয়া গম্ভীর অহঙ্কারের সঙ্গে বললে—হম তো অভি ফোর কিলাসমে পঢ়' রহেহেঁ!

আমি হেসে বললাম—ফোর ক্লাস নয়, ক্লাস ফোর!

সুরস্মৃতিয়া হেসে বললে—নহি, ক্লাস ফোর নহি, ফোর ক্লাস!

আমি হেসে বললাম—নারে, তোর ভুল হচ্ছে। তুই ক্লাস ফোরে পড়িস!

ও আবার হেসে জেদী ঘোড়ার মত বললে—নহি!

বুঝলাম মেয়েটা যুক্তিহীন জেদে ভরা।

পিছন থেকে ওর মা চাপা গলায় ধমক দিলে—ওইসা নহি বোলনা! বাবুজীকে পাশ ঠিক্‌সে শিখ্ লে!

তারপর বোধহয় আমাকে কিঞ্চৎ আশ্বস্ত করা প্রয়োজন বিবেচনা করে ঘোমটার আড়াল থেকে ফিসফিস করে বললে—শিব্বা বাবুজী তো দেহাত সে আভি আ যায়েঙ্গে!

তারপর সে ঘোমটার আড়াল থেকে তার দেহাতি হিন্দীতে যা বললে আর আমি তা থেকে যা বুঝলাম তার মর্মার্থ হল—কাল সন্ধ্যেবেলা এখান থেকে বাবুজী ওঁর জঙ্গলে গিয়েছেন লোক আনতে। এখুনি এসে পড়বেন। কারণ এসে হবিষ্যি রান্না করে খাবেন। কাজেই আপনি এখন আরাম করুন।

একটু পরে সুরস্মৃতিয়া আমাকে একটা বালিশ এনে দিলে। আমি আশ্বস্ত হয়ে দেখলাম তার ওয়াড়টা পরিষ্কার এবং তার ওপরে একটা তোয়ালে ঢাকা আছে। সেটা মাথায় দিয়ে বারান্দায় সতরঞ্চির ওপরেই শুয়ে পড়লাম। সারারাত্রি ট্রেণ জার্নির ক্লান্তিও ছিল। কাজেই ঘুম আসতেও দেরী হল না।

ঘুমটা আচমকা ভেঙে গেল। ভেঙে গেল কানের কাছে চীৎকারে। শুধু বিরক্ত নয়, কিঞ্চিৎ ভয়ার্ত হয়েই জেগে উঠে বসলাম ধড়মড় করে। গভীর ঘুমে স্থান কাল ভুলে গিয়েছিলাম।

চোখের সামনে শিবাজী মহারাজ হল্লা তুলেছেন। সে আনন্দে দু হাত উপরে তুলে চীৎকার করছে—আরে, ভাগ্না, তুম আ গয়া? বহুত আচ্ছা! বহুত মেহেরবাণী! লেকেন ভাগনা তুমি কেন খুনি আমাকে আগে থেকে খুনি খবর দাওনি? তা হলে তো আমি খুনি তোমাকে স্টেশন থেকে নিয়ে আসতে পারতাম!

আমি আচমকা ঘুম ভেঙে নিজেকে ধাতস্থ করতে করতে বললাম—তুমি জঙ্গলে গিয়েছিলে কেন? আর ফিরলে কখন?

মুখে এক মুখ দাড়ি খোঁচা খোঁচা হযে আছে। মোটামুটি ফর্সা রঙ রোদ্দুরে পুড়ে তামাটে দেখাচ্ছে। খালি গা, গলায় কাছা, পায়ে এক পা ধুলো।

শিবাজী সোৎসাহে বললে—আরে ভাগনা, আমি দেহাত থেকে আমার সৈন্যবাহিনী আনতে গিয়েছিলাম। পরশু যে দাদোজীর 'শ্রাদ্ধ', দরিদ্র নারায়ণ ভোজন করাব। সে কাজ কাম করবার লোক চাইতো। তাই জঙ্গল খালি করে জওয়ানদের আনতে গিয়েছিলাম।

শিবাজী আরও কি বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু সুরসুতিয়ার মা তার খুব কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। সে একটু ঘোমটা এবং গলা, দুই তুলেই বললে—বাবুজী তো আছেনই। আপনি আস্নান করে এখুনি হবিষ্যি চাপিয়ে দিন। না হলে খেতে 'দের' হয়ে যাবে। আমার সুরসুতিয়ার, কারও খাওয়া হবে না।

শিবাজী সঙ্গে সঙ্গে উঠল। বললে—এ যে এরা খুনি কি মুস্কিল পাকায় তোমাকে কি বলব ভাগনা!

ব্যাপারটা আমি বুঝেছিলাম। বুঝে একটু আশ্চর্যও লেগেছিল। শিবাজীর হবিষ্যি করা না হলে সুরসুতিয়ার মা খাবে না তা যেন খানিকটা বুঝেছিলাম। ভব্যতা, ভদ্রতা, আনুগত্য, এবং হয়তো তার সঙ্গে স্নেহ-মমতাও মিশে আছে। কিন্তু সুরসুতিয়া? ওই ন'দশ বছরের ছোট্ট মেয়েটাও না খেয়ে থাকবে কেন? আমি বললামও সে কথা। হেসেই বললাম—সুরসুতিয়া তো খেয়ে নিলে পারে?

শিবাজী বিব্রত হয়ে বললে—তাই বলতো ভাগনা! ওই ছোটি বাচ্চি তো খেয়ে নিলে পারে! কিন্তু মুস্কিল কি! হাজার বকাবকি কর ওকে, আমি না খেলে ও কিছুতেই খাবে না! ইস্কুল যাবার সময় ঠিক ঠিক খেয়ে চলে যায়। কিন্তু 'এতোয়ার' মানে রবিবারের দিন আমি গয়ায় থাকলে দাদোজীর কাছে খেতাম। তারপর ওরা দাদোজীর এখানে আসার পর তো প্রতি রবিবারেই থাচ্ছি। প্রতি এতোয়ারেই ওই মেয়েটা এই এক ঝামেলা পাকায়! কি আর করব, যাই!

শিবাজী হবিষ্যি রান্না করতে চলে গেল।

শিবাজীর হবিষ্যি তৈরী হয়ে গেলে শিবাজী রান্নাঘরের অন্তরালে বসল, আর আমাদের জন্যে সুরসুতিয়ার মা পাকা ঘরের বারান্দায় দুখানা বড় বড় পিঁড়ি পেতে দিলে। আমার আর সুরসুতিয়ার জন্যে।

আমাদের আহার্য স্বাভাবিকভাবেই নিরামিষ। রান্নায় একটা অপরিচিত স্বাদ। তবুও খেলাম বেশ তৃপ্তি করে। দেখলাম সুরসুতিয়া বেশ ভালই খেতে পারে।

আর ওর খাওয়াটিও বেশ পরিপাটি পরিচ্ছন্ন। সুরস্বতিয়ার মা এসে দাঁড়িয়েছিল আমাদের সামনে। ঘোমটা টেনেই এসে দাঁড়িয়েছিল। ঘোমটাটা অবশ্য এখন অনেক কমেছে। সে আস্তে আস্তে বললে—মাছ-মাংস নেই, আপনার খাবার অসুবিধা হল বাবুজী। তা আপনি দু চারদিন থাকবেন তো শ্রাদ্ধ চুকে যাবার পর? তখন আপনাকে মাছ-মাংস খাওয়াতে পাবব!

আমি হেসে আমার ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে বললাম—না, কোন অসুবিধা হচ্ছে না! আর যার জন্যে এত সব করা হচ্ছে তিনি তো আমারই সবচেয়ে আপনার লোক। আমার নিজের একমাত্র মামা! তাঁর জন্যে শিবাজী মামা এত করছে, আর আমার দু দিন মাছ-মাংস না খেলে কষ্ট হবে?

এইখানে শেষ করলেই বোধহয় ভাল হত। কিন্তু আমি আরও দুটো ভাল কথা বলতে গেলাম। বললাম—তা ছাড়া আপনারাও মাছ-মাংস খান না! আমার জন্যে আলাদা করে আবার মাছ-মাংস রান্না করতে যাবেন কেন?

সুরস্বতিয়ার মা মাথার ঘোমটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে হেসে বললেন—আমি খাই না। তবে বাবুজী তো খান! আর তার সঙ্গে আমার ওই বেটীও খায়! ওটা তো একদম 'দুসাদিন' হয়ে গিয়েছে!

কথার মাঝখানে সুরস্বতিয়া দুষ্টু হাসি হেসে বললে—বাবুজী সাহাব খান, তখন আমার খেতে দোষ কি? বাবুজী সাহাব খেতে পারেন আর আমি খেতে পারি না?

সুরস্বতিয়ার মা মেয়েকে ধমক দিয়ে বললেন—শুনছেন কথা? রাজপুতের মেয়ে একদম 'দুসাদিন' হয়ে গিয়েছে!

রাজপুতের মেয়ে!? এ যে অবাক কথা শুনলাম। আমি তো জানতাম ও চামারিয়ার মেয়ে! আর চামাবিয়া তো জাতে হয় দুসাদ, নয় মুসহর নয় তো কুর্মী! তার মেয়ে রাজপুত হয় কি করে?

আমি আর ও নিয়ে কোন কথা বললাম না। এ নিয়ে আমার মনে প্রথম থেকেই সন্দেহ ছিল। প্রথম যখন জঙ্গলের ঝোপড়ির মধ্যে ওর মায়ের কোলে সুরস্বতিয়াকে ওই দুসাদ-মুসহর-কুর্মীদের মধ্যে দেখেছিলাম তখন ওই ঘোর কৃষ্ণবর্ণদের মধ্যে ওই স্বর্ণকান্তি নারী দুটিকে দেখে কালিদাসের সেই বিখ্যাত শ্লোক মনে পড়েছিল, যার অর্থ মাটির বুক থেকে আকাশের বিদ্যুত জন্মায় কি করে? তবে সে কৌতূহল মনেই চাপা ছিল, ঢাকা ছিল। তারপর মনের মধ্যেই তা হারিয়ে গিয়েছিল। আজ সুরস্বতিয়ার মা নিজেই সে কৌতূহলের হাঁড়ির ঢাকনা খুলে দিলে। তবু আমি প্রাজ্ঞের মত আর ও নিয়ে মাথা ঘামালাম না। নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করে উঠে এলাম।

শিবাজী মামারও খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। সে হাঁড়ি হাতে চলে গেল বাড়ীর খিড়কী দরজা দিয়ে বেরিয়ে। বোধহয় অশৌচের হাঁড়ি 'তালাওয়ের জলে ডুবিয়ে দিতে গেল।

আমি উঠে বাথরুমের দিকে যাবার আগেই সুরস্থতিয়া আগে ছুটে চলে গেল। আমি বাথরুমের দরজায় গিয়ে দাঁড়াতেই দেখলাম সুরস্থতিয়া জলের ঘটি হাতে দাঁড়িয়ে আছে!

আমি হাত বাড়িয়ে দিলাম ঘটির জন্যে। মুখে দুষ্টু হাসি হেসে সুরস্থতিয়া ঘটিটা আমার হাতের সীমানা থেকে সরিয়ে নিয়ে বললে—নহি। হম পানি দেগা! হাঁথ বাঢ়াইয়ে!

সুতরাং হাত বাড়াতে হল। আর হাতে জল ঢেলে দিতে লাগল সুরস্থতিয়া।

বাইরে থেকে ততক্ষণে ফিরে এসেছে শিবাজী মামা। পিছন থেকে হেসে বললে—কি, সুরস্থতিয়া তোমার সেবা করছে বুঝি? তা ভাল।

তারপর সুরস্থতিয়াকে সে বললে—সুরস্থতিয়া ওপরে আমাদের বিছানা করে দে!

সুরস্থতিয়া ঘাড় নেড়ে বললে—সব 'রেডি' হ্যায়। চলা যাইয়ে উপর। আরাম কিজিয়ে দো দোস্তমে!

চোখ পাকিয়ে শিবাজী তাকে একটা ধমক দিলে—ফাজিল মেয়ে! আমার সঙ্গে যা করিস করিস আমার ভাগনার সঙ্গে 'দিল্লগী' করা হচ্ছে? ভাগ!

বলতে বলতেই সে কথাটা ছেড়ে দিয়ে কিছু মনে পড়ায় সে বললে—এই সুরস্থতিয়া, সারা দুপুর রোদে রোদে ঘুরবি না। বই খাতা নিয়ে জারা 'লিখাপঢ়ি' কর!

আমাকে সঙ্গে নিয়ে শিবাজী মামা আমার মামার দোতলার শোবার ঘরে এসে ঢুকল। খাটে দেখলাম পরিচ্ছন্ন বিছানা পাতা, মেঝেতে পাতা জোড়া কম্বল। শিবাজী কম্বলের উপর বসতে বসতে আমাকে বললে—তুমি খাটে খুনি শুয়ে পড় ভাগনা। আমি এই কম্বলের ওপর শোব।

আমি হেসে বললাম—তুমি এই কম্বলের ওপর শোবে, আর আমি খাটে শোব? তা কি হয়? আমার মামা। তুমি যা করছ এসব তো আমারই করবার কথা! তা তুমি আমার মামার জন্যে পুরোপুরি অশৌচ পালন করতে মেঝেতে কম্বলের ওপর শোবে আর আমি—।

বলতে বলতে খাটের বালিশটা টেনে কম্বলের উপর ফেলে কম্বলের উপর তার পাশে বসে পড়লাম।

তার পাশে বসতেই শিবাজী আমাকে বললে—তুমি এসে খুব ভাল কাজ করেছ ভাগনা!

হেসে বললাম—এ তুমি কি বলছ মামা? এ আসায় আর ভালমন্দ কি? আমার মামা মারা গিয়েছেন, আমাকে তো আসতে হতই।

এই সময় নীচে থেকে সাড়া উঠল—বাবুজী সাহাব?

সেই সঙ্গে দরজার কাছ থেকে সুরস্বতিয়ার মুখ উঁকি মারলে। হাসি হাসি মুখ, দুষ্টুমিতে ভরা। সে উঁকি দিয়ে বললে—বাবুজী, নীচামে আপকো বাবু বোলাতা হ্যায়!

—কে চামারিয়া?

আবার নীচে থেকে চামারিয়ার গলা শোনা গেল।

শিবাজী বললে—তুমি থোড়া শুয়ে খুনি আরাম কর ভাগনা। আমি একটু নীচে ঘুরে আসি খুনি। দেখি চামারিয়া কি বলছে।

যেতে যেতে সুরস্বতিয়াকে বলে গেল—এই সুরস্বতিয়া, তুই আমার ভাগনা সাহেবের কাছে বস একটুখানি। বাবুজী সাহাব বহুত 'লিখিপঢ়ি আদমী'। ওঁর সঙ্গে কথা বল, বহৎ কুছ শিখতে পারবি।

শিবাজী চলে গেল, সুরস্বতিয়া হাসি মুখে এসে বসল আমার কাছে।

কম্বলের উপব আমার পাশে বসে সুরস্বতিয়া বললে—জানেন, দাদোজী মেঝেতে ঠিক এইখানটায় মারা গিয়েছিলেন। সেইজন্যে এইখানে মেঝের ওপর একটা ছোট্ট পেরেক বসানো আছে। বলতে বলতে সে কম্বলের উপর হাত দিয়ে অনুভব করতে করতে বললে—এই যে এইখানটায়! দেখিয়ে!

বলতে বলতে আমার ডান হাতের তর্জনীটা ধরে কম্বলের উপর চেপে ধরে পেরেকটার অবস্থিতি অনুভব করিয়ে বললে—দেখা?

'হুঁ' বলে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললাম। মামাকে মনে পড়ে গেল। সেই সরসহৃদয়, সহৃদয়, সোজাসাপ্টা, সত্যবাদী, রগচটা মানুষটার কটা কটা চোখ-দুটো মনে পড়ে গেল। তাঁর রাগের মূর্তি, তাঁর কথাবলার ভঙ্গি, তাঁর হাসি সব একসঙ্গে মিশিয়ে তালগোল পাকিয়ে ভীড় করে এল মনের মধ্যে।

মনটা অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেটা ভেঙে গেল সুরস্বতিয়ার কথায়।

সুরস্বতিয়া বললে—দাদোজী, বাবুসাহাবকে সবচেয়ে পিয়ার করতেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, কিছুই করার ছিল না বলেই জিজ্ঞাসা করলাম—তুই কি করে তা জানলি?

সুরস্বতিয়া ঘাড় নেড়ে বললে—বাঃ রে, আমি জানব না তো কে জানবে? আমি

প্রতিদিন সকালবেলা দাদোজীর কাছে পড়তাম। আমার ইস্কুলের সব পড়া করিয়ে দিতেন। সন্ধ্যেবেলা আবার পড়তাম। ঘুম এলে ঘুম ভাঙাবার জন্যে গল্প বলতেন।

—কি কি গল্প বলতেন?

—কত রকমের গল্প। কিষনজীর, রামচন্দ্রজীর গল্প বলতেন। আকবর বাদশা, রানা প্রতাপসিং, শিউজী মহারাজের 'গপ্' বলতেন!

—তোর কোন্ 'গপ' শুনতে সব চেয়ে ভাল লাগত?

—শিউজী মহারাজের গপ্। শিউজী মহারাজ জেনানাকে মায়ের চোখে দেখতেন। আর বলতেন আমাদের শিব্বাও এদিক দিয়ে শিউজী মহারাজের মত। জেনানাকে মায়েব মত মনে কবে। বলতেন—সেইজন্যেই আমি আমার শিব্বাকে অত ভালবাসি, অত পিয়ার করি। অমন সাচ্চা আদমী আর হয় না।

আপন মনেই বকে চলেছিল সুরসুতিয়া। ও বকে চলেছিল, আমি শুনছিলাম ওর কথা। ও বলছিল—বাবুজী সাহাব তো পাঁচ দিন জঙ্গলমে থাকতেন। কিন্তু শনিচ্চর 'সামনে' কি এতোয়ার সাবেরে জরুর এসে যেতেন এখানে। বাবুজী সাহাব এলে দাদোজী কি খুশী হয়ে উঠতেন। মাকে বলতেন—ফুফাজী অচ্ছাসে দহি বড়া বনাইয়ে! বাবুজী সাহাব দহি বড়া খুব 'পসন্দ্' করেন কি না! সেদিন সারাদিন আর কোন কাজ হত না। আমার পড়াও হত না। তখন বাবুজী সাহাবকে নিয়ে দাদোজী 'গপমে' মেতে থাকতেন। 'সোমার' সাবেরে বাবুজী সাহাব ফিন জঙ্গলমে চলে গেলে মুখ ভার কবে দাদোজী আমাকে ডাকতেন—আয়রে সুরসুতিয়া, কিতাব নিযে আয়। লিখাপঢ়ি সব উঠ গয়া কেয়া? কিতাব নিয়ে এলে পড়াতে বসতেন। সেদিন কথায় কথায় রেগে যেতেন। আমার থোড়া কুছ চুক হলে আমাকে বকতেন। আর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বাবুজী সাহাবের কথায় আসতেন। আর বলতেন—অমন সাচ্চা আদমী হয় না। আমি ওকে সবসে 'পিয়ার' করি। আমার যো কুছ আছে সব ওকে দিয়ে যাব। আমার আর কে-ই বা আছে?

সুরসুতিয়ার ন' দশ বছর বয়েস বলে কথাগুলো আমার কাছে খাঁটি সত্যের মূর্তিতে, আমার মামার অন্তরের সত্য ইচ্ছার পরিচয় বহন করেই প্রকাশিত হয়েছিল। আবার ওর বয়স যদি আর খানিকটা বেশী হত তা হলে ওর এই কথাগুলোই আমার কাছে অত্যন্ত ধূর্ত এক মিথ্যার অভিসন্ধিমূলক জাল রচনা বলে মনে হওয়াই অত্যন্ত স্বাভাবিক হত।

সুরসুতিয়া তখন একটা গল্প ফেঁদেছে। ও বলছে—গতবার শীতের সময় বাবুজী

জঙ্গলসে বড় বড় ছুটো শিশিতে করে বনের মধু নিয়ে এসে দাদোজীকে দিয়ে বললে—দাদোজী বহুৎ আচ্ছা, টাটকা মধু এনেছি। টাটকা রুটি দিয়ে আভি থোড়া খান। বলেই বাবুজী সাহাব মাকে ফরমাস করলেন—ফুফাজী, আভি বহুত অচ্ছাসে রোটি বনাইয়ে তো। ষোলা রোটি বানাইয়ে। চার আদমিকো লিয়ে চার চার রোটি। ওই মধুর সঙ্গে খাওয়া হবে।

—দাদোজী আর বাবুজী সাহাব বহুত খুস হয়ে মধুর সঙ্গে রুটি খেলেন। রোটি খেতে খেতে দাদোজী বললেন—দিল বহুৎ খুস হো গায়া! আগেকার দিন হলে বলতাম, শিব্বা তুই আমার কাছে বর 'মাঙ্' লে! তা তোকে কি বলব, আমার যা কিছু আছে, আমি মারা যাবার পর সব তুই নিস। এই সুরসুতিয়া আর ফুফাজী সাক্ষী রইল।

সুরসুতিয়ার 'গপ' তখনও শেষ হয়নি। সে বলছিল—এর আগের শনিচ্চর রোজ 'সামমে' বাবুজী সাহাব যখন এলেন তখন দাদোজীর তবিয়ৎ বহুৎ খারাপ হয়েছে। দাদোজী শুয়ে পড়েছেন। বাবুজী সাহাব যেমন হল্লা করে শোর মচাতে মচাতে আসেন সেইরকম ভাবে এসে ডাকছিলেন—দাদোজী, দাদোজী হো! আপ কঁহা ছিপাকে হ্যায়? আমি দাদোজীর মাথার কাছে বসেছিলাম। বসে বসে দাদোজীব শির 'দাবা' দিচ্ছিলাম। দাদোজীর শিরমে বহুত দর্দ হচ্ছিল। বাবুজী সাহাবেব হল্লা শুনে আমি ছুটে গিয়ে বাবুজী সাহাবকে হল্লা করতে বারণ করলাম। বললাম—দাদোজীর তবিয়ৎ বহুৎ খারাব। শুনে বাবুজী সাহাবেব কি দুঃখ্! উনি ছুটে গিয়ে বসলেন দাদোজীর কাছে। দাদোজীর বহুত জাড়া লাগছিল। উনি বাবুজী সাহাবকে মাথার কাছে বসতে বললেন। তারপর বললেন—শিব্বা, আমি আর বাঁচব না রে! আমি মরে যাব! আমি তো তোকে আগেই বলেছি। আবার বলছি, আমার যা আছে, যা থাকল সব তুই নিস! ব্যস, তারপর রাত্রিতে দাদোজী একদম বেহোঁশ হয়ে গেলেন। পরদিন দু পহরে দাদোজী খতম্ হয়ে গেলেন।

গল্প শুনতে শুনতে আমি দশ বছরের সুরসুতিয়ার মুখের দিকে চেয়েছিলাম। দেখলাম গল্প বলতে বলতে ওর দুই চোখ ছল ছল করছে, গলা ধরে এসেছে! এ কথা ঠিক যে শিব্বা সুরসুতিয়া এদের দাদোজী আমার মামা ছিলেন। কিন্তু এদের সঙ্গে তাঁর যে স্নেহ-মমতার বন্ধন ছিল আমার সঙ্গে তার একশো ভাগেরও একভাগ ছিল না। তাঁর সম্পত্তিতে আমার আইনের চোখে যতখানি বা যে অধিকারই থাকুক ন্যায়ত এদের দাবীকে অতিক্রম করে আমার কোন দাবীই ছিল না।

পরেও আমি আমার গ্রামে আমার নিজের পরিচিত পরিবেষ্টনের মধ্যে ফিরে এসে ব্যাপারটা ভেবে দেখেছি। এ কথা ঠিক যে দাদোজীর গয়ার বাড়ী আর সেই জীবনটি ঠিক সাধারণ বা সচরাচরের মত ব্যাপার নয়। কিন্তু তার মধ্যে বিন্দুমাত্র অস্বাভাবিকতা ছিল না। আমার মামা অকৃতদার, আদর্শবাদী মানুষ ছিলেন। শিবাজীও তাই! একই ধরনের মানসিকতায় এই দুটি অকৃতদার, আত্মীয়হীন মানুষ কাছাকাছি এসে দিন দিন ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠেছিলেন পরস্পরে। সেই সঙ্গে শিবাজীর জীবনে প্রক্ষিপ্ত দুই নারী তাঁদের যুক্তজীবনে স্থানান্তরিত হয়ে ওই চেহারা নিয়েছিল। সে আপাত দৃষ্টিতে অস্বাভাবিক হলেও মোটেও অস্বাভাবিক নয়।

কাজেই আমার মামা যে তাঁর যা কিছু আছে তাতে আমার ন্যায়সঙ্গত দাবী ভুলে গিয়ে যদি শিবাজীকে দান করে গিয়ে থাকেন তা অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং সঙ্গতই করে গিয়েছেন। অন্য কিছু করলেই তা বরং অসঙ্গত এবং অস্বাভাবিক হত।

সুরস্থতিয়ার গল্প শুনতে শুনতেই আমিও আমার মন এবং সিদ্ধান্ত ঠিক করে ফেললাম। এ নিয়ে যদি কথা ওঠে, যদি কেন, কথা তো উঠবেই। কারণ শিবাজী যত সরলই হোক তার একটা সাধারণ বুদ্ধি তো আছে। সেই সাধারণ বুদ্ধিতে সে আমাকে অতিক্রম করে এ সম্পত্তিতে আমার অমতে নিশ্চয়ই হাত দেবে না, হাত দিতে পারবে না। সে আমার মতামত চাইবেই। চাইলে আমি অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে এ সম্পত্তিতে তাব অধিকারই প্রতিষ্ঠা করতে পরামর্শ দেব।

সুরস্থতিয়াকে বললাম—হ্যাঁরে, তোর বাবুজী সাহাব যে গেল তো গেলই। কোথায় গেল একবার দেখবি? আর আমাকে এক গ্লাস জল খাওয়াবি?

সুরস্থতিয়া ছুটে চলে গেল আবার কয়েক মুহূর্ত পরেই ফিরে এল এক গ্লাস জল নিয়ে।

পিছন থেকে শিবাজীর গলা শুনতে পেলাম—কি ভাগনা, তুমি খুনি কি বলছ? তুমি না কি আমাকে না পেয়ে আভি, তুরন্ত্ গয়া থেকে চলে যাবে?

সঙ্গে সঙ্গে তার সেই হা হা হাসি।

বুঝলাম ওর মেজাজ বেশ শরিফ আছে।

আমি জল খেয়ে গ্লাশটা সুরস্থতিয়ার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে ওকে বললাম—তুমি এতক্ষণ কি করছিলে কি? ছিলে কোথায়?

এক গাল হেসে আমার পাশে কম্বলে বসে শিবাজী বললে—বহত থক্ গয়া মেরে পিয়ারে ভাগনা। জেরা আরাম করনে দো। তারপর বললে—আর খুনি বল

কেন? জঙ্গল থেকে কমসে কম 'ঢাই শো' জওয়ান এসেছে, তাদের এলাজ করতে গিয়েছিলাম!

একবার এর আগে যেন কথাটা আবছা শুনেছিলাম। তবু জিজ্ঞাসা করলাম—এত জওয়ান কি হবে? তুমি তো আর এই শ্রাদ্ধের সময় তোমার মাউলী বাহিনী নিয়ে লড়াই করবে না? এ তো আর যুদ্ধক্ষেত্র নয়!

'মাউলী বাহিনী' আর 'যুদ্ধক্ষেত্র' বলায় বোধহয় শিবাজীর পুরনো কথা মনে পড়ে গেল। সে একটু অতি মিষ্ট অথচ বিষণ্ণ হাসি হেসে বললে—না, তা নিশ্চয় খুনি নয়। তবে দেখবে আমার জওয়ানরা কি কাজ করে!

একটু চুপ করে থেকে সে বললে—কথাটা যখন খুনি তুমি তুললে তখন বলি। আমি অনেক ভেবে দেখেছি বুঝেছ!

আমি ওর মুখের দিকে চেয়ে বললাম—কি ভেবে দেখেছ?

ওর মুখের হাসি আরও গাঢ়ভাবে স্নিগ্ধ অথচ বিষণ্ণ হয়ে উঠল দেখলাম। শিবাজী বললে—ওই যে মাউলী বাহিনী যে বললে না, ওই কথাটা গো খুনি। বুঝলে, ও আর একালে অচল! সে কাল চলে গিয়েছে! ওভাবে ওদের দিয়ে কাজ করানো যাবে না। অন্যভাবে করাতে হবে!

তারপর কৈফিয়তের মত হেসে বললে—তখন অল্প বয়েস ছিল, বুদ্ধিও কম ছিল। ভাবতাম সেই তিন শো বছর আগের কাল আর কায়দাকে ফিরিয়ে এনে খুনি কাজ হাসিল করব। এখন অন্য রকম ভাবি।

আমি তার কথা শুনে হাসলাম। আমার হাসির কারণ হল এই যে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি শিবাজী সেই শিবাজীই আছে। বুদ্ধি পাকার যে অহঙ্কার ও করছে তা ষোল আনাই মিছে। বুদ্ধি ওর পাকেনি, আর ও বুদ্ধি কোনকালেই পাকবে না। ও বিধাতা পুরুষের কাঁচা হাতের তৈরী মাল, নয় তো তিনি তাঁর কোন দিব্য কৌতুকের মুহূর্তে ওকে সৃষ্টি করেছিলেন।

এই সব যখন ভাবছি তখন দেখলাম শিবাজী হঠাৎ খুব গম্ভীর হয়ে উঠল। একেবারে পাকা একজন কাজের লোকের মত বলে উঠল—তুমি এসে না খুনি খুব ভাল করেছ ভাগনা! না এলে আমার পক্ষে খুব 'খারাপ' হত। তোমার সঙ্গে আমার খুনি একটা জরুরী কাজের কথা আছে। সেটা আজকেই সেরে নিই।

বললাম—বল!

শিবাজী কম্বলের উপর বসে পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বললে—দেখ ভাগনা, দাদোজীর এই বাড়ী আছে, দেহাতে দশ পনরো বিঘে ক্ষেতি আছে, এ সবই

কিন্তু তোমার! এতদিন দাদোজী ছিলেন, তাঁর জিনিষ তিনি দেখেছেন। 'এখন এ সবই তো তোমার। তুমি দেখে বুঝে নাও। ক' দিন থাক, আমি সব দেখিয়ে বুঝিয়ে দোব তোমাকে।

বুঝলাম শিবাজী সত্যি সত্যিই 'সিরিয়াসলী' কথা বলছে। ওর এই মুহূর্তের বাক্য বিন্যাস থেকে 'খুনি' নামক অকারণ অঙ্গসজ্জা অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই খসে পড়েছে। কিন্তু আমি তো আমার সিদ্ধান্ত করেই রেখেছি। লেখাপড়ার জ্ঞান আমারও সামান্য। তবু আমি আমার যতটুকু আছে তাকেই সুবিধামত ব্যবহার করতে পারি। তাই পণ্ডিত না হয়েও পণ্ডিতের মত বললাম—জান মামা, আমাদের শাস্ত্রে একটা কথা আছে—পিণ্ড দত্তা ধনং হরেৎ। যার মানে হল পিণ্ডাধিকারী পিণ্ড দান করে ধন গ্রহণ করবেন। এক হাতে মৃতকে পিণ্ড অর্পণ করলে, পরিবর্তে অন্য হাতে মৃতের সম্পত্তির অধিকার পাবে। তা হলে এবার তুমি বুঝে দেখ মামাজী, আমার মামার সম্পত্তি কার!

আমার কথা শুনে শিবাজী কিছুক্ষণ অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর আস্তে আস্তে তার বসন্তের ক্ষতচিহ্ন লাঞ্ছিত মুখে ভারী সুন্দর একটি হাসি ফুটে উঠল। যে আমার হাত চেপে ধরে বললে—ভাগনা, তুমি যা বললে তা তোমারি উপযুক্ত কথা। তোমার 'দিলের' চেহারা তো আমি জানি! কিন্তু তুমি যা বললে তা তো হয় না ভাগনা!

হেসে বললাম—কেন হয় না?

শিবাজী বললে—সব দিক দিয়ে তুমি ভেবে দেখ, দাদোজীর এ সব জিনিষই তোমার! তোমার জিনিষ তুমি নেবে না কেন?

বললাম—আমাকে বল তো মামাজী, আমি এ সব নিয়ে কি করব? আমার দেশ বীরভূম জেলার এক গ্রামে। সেখানে আমার যে সামান্য সম্পত্তি আছে তাই দেখতে গিয়েই আমার জান কয়লা হয়ে গেল। আর আমি সেই কোন্ বীরভূম জেলা থেকে এই বাড়ী আর ক্ষেতি 'দেখভাল্' করতে আসব? এ কি হয়? কাজেই এ নিয়েও আমার কোন সুবিধা হবে না!

শিবাজী আমার হাত চেপে ধরলে। বললে—তুমি খুনি কিচ্ছু ভেবো না ভাগনা, আমি তোমার সব দেখে দেব।

বললাম—বুঝলাম তুমি সব দেখে দেবে। কিন্তু তুমি আমাকে একটা কথা 'সাচমুচ' বলতো দেখি!

—বাতাও!

—আচ্ছা মামাজী, আমি ধরে নিয়েছি যে আমার মামার সব সম্পত্তির

উত্তরাধিকারী আমি। কিন্তু তুমি আমাকে ঠিক ঠিক বাতাও তো আমার মামার কি ইচ্ছা ছিল ?

শিবাজী আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। আমার কথার আড়ালে আমি কি বলতে চাইছি, কি ভাবছি সেইটা আন্দাজ করবার চেষ্টা করতেই বললে—কি ইচ্ছা ছিল দাদোজীর ?

বললাম—এ সব সম্পত্তি তুমি পাও এইটাই কি তাঁর ইচ্ছা ছিল না ?

শিবাজী আমাকে জিজ্ঞাসা করলে—কে বললে তোমাকে ?

বললাম—যেই বলুক, কথাটা সত্যি কি না বল না ?

শিবাজী একটু চুপ করে থাকল। তারপর বললে—ও, মুখে মধ্যে মধ্যে সেই রকম বলতেন বটে। আর মাবা যাবার আগের দিন সন্ধ্যেতেও তাই বলেছিলেন।

আমি সাগ্রহে তার হাত চেপে ধরে বললাম—ব্যস, তবে তো সবই চুকে গেল। আইনসঙ্গত অধিকার যারই থাকুক মামা যখন তোমাকে সব দিয়ে গিয়েছেন তখন ও সবই তোমার! বুঝলে খুনি ?

বলে আমি বেশ জোরেই হেসে উঠলাম।

সেই দিনই আমি বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়ে পোস্টাপিস খোঁজ করে রেভেনিউ টিকিট কিনে এনে একখানা সাদা কাগজের উপর চারখানা রেভেনিউ টিকিট বসিয়ে লিখে দিলাম—আমার মাতুল স্বর্গীয় দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারী হিসাবে তাঁহার বাড়ী ও যাবতীয় জমিজমার সমস্ত অধিকার গয়ানিবাসী শ্রীশিবাজী সরকারের অনুকূলে পরিত্যাগ করিলাম। এ ত্যাগ যদি আইনসঙ্গত বিবেচিত না হয় সেই কারণে আইনের দৃষ্টিতে ইহাকে সিদ্ধ করিবার জন্য এক টাকা মূল্য গ্রহণ করিলাম। কারণ স্বরূপ উল্লেখ করি আমার মাতুলের আন্তরিক ও মৌখিক অভিপ্রায় অনুসারেই ইহা সংঘটিত হইল—ইতি শ্রীচন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, তাং ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৮, স্থান গয়া, বিহার।

কাগজখানা এক হাতে নিয়ে শিবাজীকে বললাম—একটা টাকা দাও দেখি!

—টাকা? একটা টাকা কি হবে?

—দাও না!

ওর কাছ থেকে একটা টাকা নিয়ে ওকে আমার হাতের কাগজখানা দিয়ে দিলাম। কাগজখানা দেখে এবং পড়ে চুপ করে রইল। তারপর মুখ তুলে বললে—তুমি আমাকে বড়ই ভালবাস ভাগনা।

আমি ওকে বললাম—তুমি কাগজখানা তুলে রেখে এস তো আগে!

কাগজখানা বাক্সে রেখে এসে শিবাজী আমাকে হাসি মুখে বললে—তোমার জন্যে খুনি একটা 'সারপ্রাইজ' আছে ভাগ্‌না। আমি তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম।

তেরো

কিন্তু ঘটনাচক্রে আমাকে 'সারপ্রাইজ' দেবার আগেই শিবাজী নিজেই একটা 'সারপ্রাইজ' পেয়ে গেল।

সেই দিনই রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সেরে কম্বলের ওপর শিবাজীর পাশে শুয়েছি, তন্দ্রায় দু-চোখ জড়িয়ে এসেছে এমন সময় নীচের দরজায় ধাক্কা শুনলাম। তন্দ্রা ভেঙে গেল। কান পেতে শুনলাম কে শিবাজীর নাম ধরে বাইরের দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে।

শিবাজী উঠে বসল কম্বলের উপর। তখন আমাদের দরজাতেও ধাক্কা পড়ছে। ধাক্কা দিয়ে ডাকছে স্থরস্থতিয়া—বাবুজী সাহাব! এ বাবুজী সাহাব! উঠিয়ে। শিবাজী দরজা খুলতে খুলতে বললে—তুমি ভাগনা, আর উঠোনা খুনি। আমি দেখছি। বলতে বলতে শিবাজী সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। ও খানিকটা নেমে যেতে যেতে আমি ভেবে নিলাম আমার কি করা উচিত! নাঃ, এভাবে ওকে এই প্রায় মধ্য রাত্রিতে একা নেমে যেতে দেওয়া খুব সঙ্গত হল না। মনে হতেই আমিও তাড়াতাড়ি বারান্দায় রাখা লণ্ঠনটা বাড়িয়ে দিয়ে নেমে গেলাম। দেখলাম তখন শিবাজী বাইরের দরজার খিলে হাত দিচ্ছে।

দরজা খোলা হল। আমার হাতের লণ্ঠনের আলোয় দেখা গেল দরজার ওপারে একজন প্রৌঢ় একটি টিনের ছোট্ট স্যুটকেশ হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। গলায় কাছা দেওয়া শিবাজীকে দেখে তিনি নমস্কার জানিয়ে বেশ সপ্রতিভ হাসি মুখে বললেন—আপনি শিবাজীবাবু?

শিবাজী বললে—হ্যাঁ, আমিই শিবাজী! কিন্তু আপনাকে তো চিনতে পারলাম না!

প্রৌঢ় হাসলেন। বললেন—আমাকে আপনি চিনবেন কি করে? আমার নাম অম্বুজাক্ষ চাটুজ্জে। আমি দেবীবাবুর পিসতুতো ভাই।

—কিন্তু আমি তো কখনও আপনাকে দেখিনি!

—দেবীদাদার কাছে আমি আগে এসেছি দু-তিনবার। দেবীদাদার মুখে আপনার নাম শুনেছি। আমি থাকি ছাপরায়। কাল একজনের মুখে দেবী-দাদার মৃত্যুসংবাদ শুনে আর থাকতে পারলাম না। তিনি অবশ্য অকৃতদার ছিলেন। লোকে বলবে, তাঁর কেউ ছিল না। কিন্তু আমরা তো আছি!

সেই মধ্য রাত্রিতে শিবাজীর পিছনে দাঁড়িয়ে প্রৌঢ় অম্বুজাক্ষবাবুর হাসি মেশানো নরম কথাগুলি শুনতে শুনতে আমি যেন বিদ্যুৎ চমকের মত ওই কথাগুলির আড়ালে একটি প্রচ্ছন্ন অভিসন্ধিকে স্পষ্ট চিনতে পারলাম। অম্বুজাক্ষবাবু মামার পিসতুতো ভাই হলে, আমার মায়েরও পিসতুতো ভাই নিশ্চয়ই। কিন্তু এরকম একজন পিসতুতো ভাইয়ের কথা আমি আমার মায়ের কাছে কখনও শুনিনি। তা সত্ত্বেও যদি এরকম কোন পিসতুতো ভাই তাঁদের থেকেই থাকেন তা হলেও তিনি গণনীয় নন। কাজেই মামার মৃত্যুর পর তাঁর প্রায় অজ্ঞাত এক পিসতুতো ভাইয়ের আবির্ভাবের কারণ যে কি হতে পারে তা ভাবতে গেলেই শুধুমাত্র একটা কথাই মনে আসে।

সেই কথাটা মনে রেখেই আমি শিবাজীর পিছনে দাঁড়িয়ে তার গায়ে বার কয়েক আঙুল দিয়ে টিপ দিলাম। আমি শিবাজীর স্বভাব জানি। সুতরাং শিবাজীকে আর বেশী কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে আমিই বললাম—তা আপনি দেবীবাবুর ভাই। তাঁর বাড়ীতে এসে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকবেন? আসুন ভেতরে আসুন!

ভদ্রলোক শিবাজীকে হাসি মুখে প্রশ্ন করলেন—এ ভদ্রলোকটিকে তো চিনলাম না শিবাজীবাবু? ইনি?

শিবাজী বোধহয় আমার পরিচয়টা দিতে যাচ্ছিল। আমি তাকে আবার টিপ দিয়ে নিজেই নিজের পরিচয় দিলাম। বললাম—আমার নাম চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। আমি শিবাজীর বন্ধু। ওকে মামা বলে ডাকি। আসুন, আসুন, ভেতরে আসুন।

অম্বুজাক্ষবাবুকে নিয়ে আমরা বাড়ীর ভিতর এলাম।

এবার অতিথি সৎকারের পালা।

মধ্য রাত্রি হয়েছে, চোখে গাঢ় হয়ে ঘুম চেপে আসছে, কিন্তু অম্বুজাক্ষবাবুর কোন তাড়া নেই, ত্বরা নেই। তিনি ধীরেসুস্থে বাথরুম থেকে হাত-পা ধুয়ে এসে বললেন—একটু সায়ংসন্ধ্যা করব যে।

সুতরাং আসন পেতে গঙ্গাজল দিয়ে মধ্যরাত্রিতে অম্বুজাক্ষবাবুর সায়ংসন্ধ্যার ব্যবস্থা করা হল।

তারপর আহার। স্বরস্বতিয়ার মা, আমাদের ফুফাজী, আবার রান্নাঘরে ঢুকলেন রুটি তরকারী তৈরী করতে। যতক্ষণ রান্নাঘরে খাবার তৈরী হল ততক্ষণে মামার ঘরে তাঁর বিছানা করে দেওয়া হল। আমরা দুজনে গরুড়ের মত প্রায় হাত জোড় করেই বসে রইলাম তাঁর সামনে।

তাঁর কোন ব্যস্ততা নেই। তিনি বিছানায় বসে অল্প অল্প হাসতে হাসতে দুলে দুলে বাঁ-পায়ের তলায় হাত বুলিয়ে বুলিয়ে নানান টুকিটাকি প্রশ্ন করে চলেছেন। সে-সব প্রশ্নের কোনটার জবাব দিচ্ছি আমি, কোনটার শিবাজী। আমার অন্তর টিপুনি খেয়ে শিবাজী সতর্ক হয়ে গিয়েছে।

অম্বুজাক্ষ দুলতে দুলতে, পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে জিজ্ঞাসা করলেন—তা শিবাজীবাবু, আপনি কি করে দেবীদাদার শ্রাদ্ধ করতে যাচ্ছেন? আপনি তো ওঁর পিণ্ডাধিকারী নন?

অম্বুজাক্ষের কথা কোন্ রাস্তা দিয়ে চলেছে তা খানিকটা অনুমান করবার জন্যে আমি চুপ করে রইলাম, আরও একটু বুঝে তাঁর সম্মুখীন হবার জন্যে। কিন্তু শিবাজীর ধৈর্য বোধহয় শেষ সীমায় পৌঁচেছিল। সে একটু বিরক্ত হয়ে বললে—দুপুর রাত্তিরে এসব খুনি কি শাস্ত্র-টাস্ত্র নিয়ে পড়লেন মশাই। ওসব কাল দিনের বেলা বরং বলা যাবে। কাল দিনেরবেলাতেই খুনি বা বলব কখন? তা আপনি তো দাদোজীর শ্রাদ্ধ দেখতে এসেছেন। শ্রাদ্ধ-ট্রাদ্ধ হয়ে যাক। তারপর খুনি সময় করে ওসব কথা বলা যাবে। এখন খাওয়া-দাওয়া করে আচ্ছাসে মজেমে 'নিদ' যান।

তখনই পিছনে ঘরের শেকল বাজছিল। বাজাচ্ছিলেন ফুফাজী। খাবার তৈরী, চৌকা লাগানো হয়েছে তারই সঙ্কেত।

শিবাজী তাঁকে ভালই ধাক্কা দিয়েছে। আমি বললাম—চলুন, খাবার জায়গা হয়েছে।

তিনি খেতে বসলেন, আমরা সামনে বসে রইলাম। আমাদের ভয়েই বোধহয় চুপচাপ করে তিনি ভাল ছেলের মত খেয়ে উঠলেন। তাঁকে শুইয়ে ফুফাজী আর স্বরস্বতিয়া নিজেদের ঘরের দরজা বন্ধ করলে আমরা আবার নিজেদের শয়ন মন্দিরে গিয়ে ঢুকলাম।

শিবাজী বললে—এ কোন নয়া চিড়িয়া এল খুনি ভাগনা বল দেখি? কোন্ জঙ্গলসে আ গয়া? কিয়া মতলব?

আমি হেসে বললাম—কি মতলব বুঝলে না? যা নিয়ে আজ দুপুরে তোমার সঙ্গে কথা হচ্ছিল আমার! মামার ভাই এসেছেন মামার সম্পত্তির দখল নিতে।

খুব সাবধান মামা সাহেব, তুমি খবরদার আমার পরিচয়টা দেবে না অম্বুজাক্ষবাবুকে। দিলেই ভেগে যাবেন ভদ্রলোক।

তারপর কি মনে হল, বললাম—কিন্তু মামাজী, ভদ্রলোককে তো তুমি জীবনে দেখনি। ভদ্রলোককে তো বাইরের ঘরে শুইয়ে রেখে এলে। ভদ্রলোক আবার রাত্তিরে উঠে পলায়ন করবেন না তো?

শিবাজী কম্বলের উপর যথাসম্ভব আরাম করে শুতে শুতে বললে—কই চিন্তা নহি। ওসব ভাবতে হবে না খুনি। এদিকে তালা, ওদিকে তালা। সে তালা ভাঙার সাধ্য ও বুড়ঢ়া বাঙালিয়ার হবে না। আরামসে নিদ্ যাও!

সকালে একটু বেলাতেই ঘুম ভাঙল।

ঘুম ভেঙে নীচে নামতে দেখলাম অম্বুজাক্ষবাবু স্নান করে পূজা করছেন। নাঃ, ভদ্রলোকের উপর আমি অবিচার করেছিলাম। উনি-পালান নি দেখছি!

বেশ মানুষটি!

মাথায় কাঁচাপাকা চুল, খাটো খাটো করে কাটা, চুলে সিঁথি নেই। চুলের যা দৈর্ঘ তাতে সিঁথিকাটার বিলাসিতা বা প্রয়োজন কোনটাই হয় না। তার উপর একটি ছোট্ট শিখা আছে। শান্ত মুখে সব সময়েই একটি স্মিত হাসি খেলা করে। আর ওঁর সমস্ত চলাফেরাই বেশ নিরুদ্বেগ, ত্বরাহীন। উনি পূজা শেষ করে চা নিয়ে বসেছেন।

আমরা একবার দেখে বেরিয়ে গেলাম। শিবাজীই আমার হাত ধরে টেনে আমাকে বাইরে নিয়ে গেল।

বাইরে তখন রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ হয়েছে। আমি দেখে অবাক হয়ে গেলাম। এ আমার কল্পনার অগোচর ছিল। মামার বাড়ীর সামনে মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তার ওপারে যে বিশাল জায়গা পড়েছিল সেই জায়গায় রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ হয়েছে। শিবাজী মহারাজের অরণ্যভূমি থেকে আনা দুশোর উপর সমর্থ মানুষের জোয়ান বাহিনী সেখানে কাজে নেমেছে। জঙ্গল পরিষ্কার আরম্ভ হয়েছে প্রাথমিক কাজ হিসেবে। মানুষগুলি যে কী খুশী হয়ে কাজে নেমেছে সেইটাই আমাকে সবচেয়ে বেশী করে আকর্ষণ করল।

আমি খানিকক্ষণ দেখে জিজ্ঞাসা করলাম—এখানে কি হবে?

ওই কর্মরত মানুষগুলির খুশী ও উল্লাস শিবাজীকেও যেন স্পর্শ করেছিল। সে হাসিহাসি মুখে বললে—আজ বিকেলে দেখবে কি হবে ওখানে? ওইখানেই কাল দাদোজীর শ্রাদ্ধ ক্রিয়া হবে।

হঠাৎ রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে শিবাজী সেই ভাদ্র-আশ্বিন মাসের রোদের তাতে

ঘামে ভেজা সেই প্রায় নগ্ন মূর্তিগুলিকে নিজের স্নেহপুত্তলীর মত দেখতে দেখতে শিবাজী হেঁকে উঠল—এ. চামারিয়া !

শিবাজী যদি মহারাজা হয় তা হলে চামারিয়া তার সেনাপতি। সেই হুকুম দিয়ে কাজ করাচ্ছিল। তার হাঁক শুনে চামারিয়া ছুটতে ছুটতে তার কাছে এসে দাঁড়াল। মুখে এক মুখ হাসি, হাত দুখানা জোড় হয়ে গিয়েছে। সে বললে—হুজুর !

শিবাজী তাকে কাছে ডেকে বললে—উ পিপুল পেঁড়কা নীচে কোন্ বৈঠা হ্যায় রে ? গণপত না ?

—জী হাঁ !

—ও অমন করে বসে আছে কেন ? কাজ করছে না ?

—ওর বুখার হয়েছে হুজুর !

—তা হলে ওকে আনলি কেন ?

চামারিয়া একটু লজ্জিত হাসি হেসে বললে—জঙ্গলেই ওব বুখার হয়েছিল। সবাই চলে আসছে দেখে ও আর থাকতে চাইল না জঙ্গলে। সবারই সঙ্গে চলে এল। এসে আবার থোড়া বুখার এসে গিয়েছে।

শিবাজী যেন তেতো কিছু গিললে। বললে—এ তো বহুত মুস্কিল করলি ! ওকে এখন দাওয়াই দোব কোথা থেকে ?

চামারিয়া হেসে বললে—দাওয়াই-ওয়াই কুছ না লাগব হুজুর। উ আপনাসে ঠিক হো যায়েগা !

শিবাজী চটে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতখানা ক্ষিপ্রবেগে আস্ফালন করে বললে—মারব্ এক থাপড় ! আপনাসে ঠিক হো যায়েগা ? কভি আপনাসে ঠিক হোতা হ্যায় বেমার ? বুলাও গণপতকো।

শিবাজীকে চামারিয়া ভালই চেনে বুঝলাম। শিবাজী হাত তুলবার আগেই ঠিক ঠিক অনুমান করে সে সরে গিয়েছিল তাব হাতের সীমানা থেকে। তারপর হাসতে হাসতে গণপতকে ডাকতে লাগল।

দেখলাম ডাক শুনেই গণপত চমকে উঠে দাঁড়িয়েছে। তার ভাবভঙ্গি থেকে মনে হল সে ছুটে পালাবার কথা ভাবছে।

আমার পাশ থেকে শিবাজী চীৎকার করে উঠল—এ গণপত্ শুন যা ! শুন যা ! নহি মারব্। আও ইধার।

এক তরুণ জওয়ান বড় বড় চোখের সরল বিনীত দৃষ্টি মেলে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। কালো রঙ, কিন্তু বড় চিকণ, মোটা মোটা কাঠামোর দেহ।

দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। সে কাছে এসে দাঁড়াবামাত্র শিবাজী অসঙ্কোচে তার গায়ে হাত দিয়ে তার দেহের তাপ অনুভব করলে। ঘাড় নেড়ে বললে—হাঁ, থোড়া বুখার তো হয়েই হ্যায়! তুম এক কাম ক'রো। ইয়ে চৌকী পর শুত্ রহো। হম্ দাওয়াই লেকে লৌটেঙ্গে! সমঝা!

তারপর আমার দিকে ফিরে বললে—চলো ভাগ্না! তুম্‌কো আভি তো এক 'সারপ্রাইজ' দেঙ্গে!

আমাদের পিছনে অনেক হৈ চৈ পড়ে রইল। আমরা রাস্তা ধরে এগুতে লাগলাম। কিন্তু মাত্র কয়েক পা এগিয়েই আমাদিকে থমকে দাঁড়াতে হল। আমাদের সামনেই একখানা রিক্সায় আসছে এক মেমসাহেব। উনিশ শো সাতাশ আঠাশ সালে গয়ার রাস্তায় মেমসায়েব! চেয়ে দেখবারই কথা বটে! শিবাজী হাসতে লাগল, আমি চেয়েই দেখছিলাম। একবারের জায়গায় দুবার দেখেই অবাক হয়ে গেলাম!

আরে, এ যে আমাদের লরা মেমসায়েব!

আমাদের দেখে লরাও তখন হাসি মুখে রিক্সাওয়ালাকে বলছে—রোকো, রোকো, রোক্ যাও।

শিবাজী হাসি মুখে বললে—আমরা তোমার কাছেই যে যাচ্ছিলাম!

লরা ডান হাতের তর্জনী তুলে বললে—ইউ নটি শিব্বা! টেলিং এ লাই টু মি! তুমি আমাকে মিথ্যে কথা বলছ!

শিবাজী রসিকতা করে বললেও বেশ জোরের সঙ্গে বললে—শিব্বা দি গ্রেট কিন্তু সামটাইমস্ টোল্ড্ লাইজ্, বাট দিস শিব্বা নেভার টেল্‌স্ এ লাই! এই শিব্বা মিথ্যা বলে না। কিসের জন্যে মিথ্যে বলবে সে? সে কাউকে ভয়ও করে না, লোভও নেই তার!

লরা অবলীলাক্রমে তার কাঁধে হাত দিয়ে বললে—দ্যাটস অল রাইট! নো কোয়ার্ল্। ঝগড়া করতে হবে না।

তারপর আমার দিকে ফিরে বললে—তুমি এসেছ, আমার যে কি ভাল লাগছে মিঃ ব্যানার্জী, কি বলব! আমি জানতাম যে তুমি আসবে! কিন্তু হাউ স্যাড, কি দুঃখের কথা বলত, দাদোজী আমাদিকে ছেড়ে চলে গেলেন। দাদোজীর মত মানুষ হয় না মিঃ ব্যানার্জী! হি ওয়াজ লাইক এ ফাদার টু মি এণ্ড টু শিব্বা এ্যাজ ওয়েল। উনি আমার আর শিব্বার দুজনেরই বাবার মত ছিলেন। আমাদের দুজনেরই ভালমন্দের জন্যে ওঁর যে কি ভাবনা ছিল!

তারপরই সচকিত হয়ে লরাই হেসে শিবাজীকে বললে—তুমি কি আমাকে

বাড়ীর ভেতর আজ নিয়ে যাবে না? রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা বলব?

শিবাজী অপ্রস্তুত হয়ে বললে—ও নিশ্চয়, নিশ্চয়! আয়াম স্যরি ম্যাডাম। ভেরী সরি! জাষ্ট লেট আস গো ইন! চল ভেতরে চল!

বাড়ীর ভিতরে ঢুকেই লরাই ডাকল—এ সুরসুতিয়া! হোয়্যার আর ইউ? তুম কঁহা ছুপা হ্যায়? আ যাও জলদি!

সুরসুতিয়া বোধহয় রান্না ঘরে ছিল মায়ের কাছে। লরার গলা শুনে সে ছুটতে ছুটতে এসে লরার হাত ধরলে। মুখে এক মুখ হাসি নিয়ে। তারপর তার হাত ধরে টানতে টানতে বললে—কাম, এণ্ড সিট বাই মি!

লরা তাকে সস্নেহে কোলের কাছে টেনে নিয়ে হেসে বললে—তুম তো বহুত ইংলিশ শিখ লিয়া!

সুরসুতিয়া তখন তাকে বারান্দার চৌকির দিকে টানছে। চৌকির কাছে তাকে টেনে নিয়ে গিয়েই সুরসুতিয়া লরার হাত ছেড়ে দিয়ে ছুটে ঘরের মধ্যে চলে গেল। আবার একখানা সতরঞ্চি নিয়ে এসে চৌকির উপর তাড়াতাড়ি পেতে দিয়ে হাসি মুখে বললে—বৈঠিয়ে।

পা ঝুলিয়ে বসল লরা।

সুরসুতিয়া আবার ছুটে ঘরের মধ্যে গিয়ে নিজের বইখাতা শ্লেট এনে লরার পাশে রেখে চৌকিতে উঠে বসল তার পাশে।

আমরাও চৌকির এক পাশে বসেছিলাম। শিবাজী হাসতে হাসতে বললে—এ সুরসুতিয়া, আজ লরা মেমসাবকে ছেড়ে দে! উনি আজ এসেছেন দাদোজীর মৃত্যুকে খোঁজ খবর করতে। তার সঙ্গে আমার এই ভাগনা সাহাব এসেছে তার সঙ্গে দেখা করতে। আজ তোর লেখাপড়া থাক। আমরা আজ গল্প করি।

সুরসুতিয়ার আদর কত দেখলাম। সে সঙ্গে সঙ্গে তার স্বরে প্রতিবাদ করে উঠল আদুরে গলায়। সে ঘাড় দুলিয়ে নাকী সুরে বললে—নহি বাবুজী সাহাব, আপ লোক তো হরবখত গপ্ করতে হেঁ। উসিসে হমারা লিখাপড়া নেহি হোতা! লরা মেমসাবকা পাছ হমারা কেতনা কুছ শিখনা হ্যায়। আপই তো গড়বড় কর দেঁতে হেঁ!

রান্না ঘরের ভেতর থেকে চাপা গলার তর্জন শুনলাম—এ সুরসুতিয়া! কিতাব উঠাও, তুমহারা লিখাপড়ি আজ বন্ধ্ ক'রো!

সুরসুতিয়া আরও তারস্বরে প্রতিবাদ করে উঠল—নহি! কভি নহি!

লরা হাসতে লাগল।

এই সময় ঘর থেকে অম্বুজাক্ষবাবু বেরিয়ে এলেন। মেমসাহেবের দিকে একবার, আমাদের প্রত্যেকের দিকে এক একবার চেয়ে বললেন—আমি একটু ঘুরে আসি। আজ আবার একাদশী। আমি কিন্তু দুপুরে ভাত খাব না, রুটি খাব। একটু দয়া করে ওই ওঁকে বলে দেবেন।

বলে রান্নাঘরেব দিকে দৃষ্টি দিয়ে ইঙ্গিত করে বলে আবার আমাদের সবাইকে এক একবার দেখে নিয়ে চামড়ার চটিটি পড়ে খুট খুট করে এগিয়ে চললেন। উঠোনে ঘরের সামনে বাঁক নেবার সময় আবার একবার আমাদের দিকে তাকিয়ে জনে জনে দেখে বাঁকের ও পাশে অদৃশ্য হলেন।

তাঁর সমস্ত ব্যাপারটাই আমার কাছে যত কৌতুককর তত বিচিত্র মনে হল। আমাদের সামনেই যেভাবে এদিক-ওদিক চাইতে চাইতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন তাতে মনে হল এক বিচিত্র রহস্যকে কক্ষপুটে লুকিয়ে তিনি বেরিয়ে এলেন। আর যেভাবে বার বার আমাদের জনে জনে দেখে গেলেন তাতেও মনে হল আমরা যেন এক বিচিত্র রহস্যকে ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা বের করবার মত পরিপক্ক করতে বসেছি।

তিনি চোখের আড়াল হতেই লরা শিবাজীকে জিজ্ঞাসা করলে—হু ইজ হি? কৌন হ্যায় উয়ো।

শিবাজীর কি বিচিত্র রসিকতা বোধ। সে বললে—হি হ্যাজ কাম টু বি মাই পার্টনার। আমার পার্টনার হবার জন্যে এসেছে লোকটি।

লরা অবাক হয়ে বললে—পার্টনার? পার্টনার ইন হোয়াট? কিসের অংশীদার?

—ব্যবসায়!

—ও মাই গড্। আই ডোণ্ট আণ্ডারস্ট্যাণ্ড! আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। বলে গালে হাত দিলে লরা।

আমি বললাম—না, না, মিস লরা। শিব্বা তোমার সঙ্গে রসিকতা করছে। সে রকম কিছু ব্যাপার নয়। উনি দাবী করছেন উনি আমার মামার 'কাজিন', পিসতুতো ভাই! কিন্তু আমরা কেউ চিনতে পারছি না ওঁকে!

আবার লরার সেই মাই গড্।

এই সময় আবার খুন খুন করে উঠল স্বরস্বতিয়া।

শিবাজী আমার কাঁধে হাত দিয়ে বললে—চল ভাগনা, গনপতের জন্যে একটা ওষুধ নিয়ে আসি। মিস লরা এখন বসবে। ও এখন স্বরস্বতিয়া আর ওর মায়ের সঙ্গে 'গপ্' করবে, স্বরস্বতিয়াকে পড়াবে।

আবার আমাদের যাওয়া বন্ধ হল।

চামারিয়া এসে দাঁড়াল হাসিমুখে, হাত জোড় করে। চামারিয়া মানেই জোড়-হাত আর হাসিমুখ। শিবাজী জিজ্ঞাসা করলে—কিয়া খবর বেটা ?

বাইরে ট্রাকের রেসিংয়ের শব্দ উড়ছে। ট্রাকের শব্দই সংবাদটা জানিয়ে দিচ্ছে। তবু সংবাদের ব্যাখ্যা করেই যেন চামারিয়া বললে—মাল তো আ গয়া হুজুর।

শিবাজী উল্লসিত হয়ে বললে—ব্যস, জয় রামজী! তব তো খুনি সব হো গয়া। সব উতরকে রাখখো হিঁয়েই!

বলে সে উঠোনটা দেখিয়ে দিলে।

চামারিয়া বললে—হিঁয়েই রাখেগা ?

—হাঁ। হরজ্ কেয়া ? আভি তো বরখা নহি হ্যায়! পানি নহি বর্ষেগা! কই তকলিফ নহি।

চামারিয়া চলে গেল।

তার কয়েক মিনিটের মধ্যেই বড় বড় মিষ্টি কুমড়ো, বস্তা বস্তা কচু, আলু এ সব এসে উঠোনে রাখা হতে লাগল। তার সঙ্গে এল বস্তাবন্দী চাল, ডাল, দু-তিন টিন তেল এবং মসলাপাতি। হাঁকডাকে এবং হৈ-চৈয়ে ফুফাজী বেরিয়ে এলেন রান্নাঘর থেকে। তিনি মসলা, তেল, ঘি সব উপবের ঘবে রাখবার হুকুম দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে এলেন।

শিবাজী বললে—চল ভাগনা, আর দেরী নয়। আমরা ঘুরে আসি!

আমরা বাজার ঘুরে একটা হোমিওপ্যাথি ওষুধের দোকানে ঢুকলাম। শিবাজী বুখারের কি কি ওষুধ আছে জেনে নিয়ে তারই মধ্যে একটা কি দুটো হোমিওপ্যাথি ওষুধ কিনে বললে—চল ভাগনা, আব লৌটেঙ্গে।

পথ চলতে চলতে বললে—তোমার হাঁটতে খুনি কষ্ট হচ্ছে না তো ?

আমি হাসলাম। বললাম—দেশে আমাকে পায়ে হেঁটে চাষের সময় প্রতিদিন আমার জমি দেখতে হয় মামা, বুঝলে ? আল পথে কখনও কাদা থাকে, কখনও শিশিরে ভিজে থাকে। তার মধ্যে দিয়ে যখন প্রতিদিন হাসি মুখে হাঁটতে পারি তখন তোমার এই সহরের রাস্তাতে হাঁটতেও কষ্ট হবে না। চল।

বাড়ীর কাছে এসে কিন্তু অবাক হয়ে গেলাম।

কাল দিনের বেলা জঙ্গল আর আগাছায় নাসাকীর্ণ যে মাঠ দেখেছিলাম তার আর বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই। মাঠ যেন হাসছে, আর তার চেহারা হয়েছে, আমাদের দিশী ভাষায় চন্দন পাটার মত। এত পরিষ্কার যে তাতে যেন চন্দন বাটা যায়!

আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম। মনে হচ্ছিল যেন ময়দানব এসে এতে যাদুহস্ত বুলিয়ে মন্ত্রবলে সব করে দিয়ে গিয়েছে।

আমার বিস্ময় শিবাজী সকৌতুক চোখে উপভোগ করছিল। চোখে চোখ পড়তেই সে বললে—কি ভাগনা, কি দেখছ খুনি? কি রকম হয়েছে দেখছ তো? দেখ আমার আর্মি কি রকম! তবে এখন দেখছ কি? কাল সব দেখবে!

—আর কি দেখব?

—আর কি দেখবে? এই জায়গাটার চেহারা দেখবে। আমার আর্মির ডিসিপ্লিন দেখবে।

বলতে বলতে সে বাড়ীর সামনের রোয়াকের দিকে এগিয়ে গেল। চৌকিতে শিবাজীর রোগী গনপত তখন গভীর নিদ্রায় অভিভূত। সে গভীর ভাবে নাক ডাকাচ্ছে।

শিবাজী এগিয়ে গিয়ে তার গায়ে সস্নেহে হাত দিলে। সঙ্গে সঙ্গে ধড়ফড় করে ঘুম ভেঙে উঠে বসল গনপত। শিবাজী ধমক দিলে তাকে—কৌন্ উঠনে বোলা তুমকো? শুত যাও, নিদ যাও আরামসে? বাকী এইশা ক'রো।

বলে সে হাঁ করে দেখিয়ে দিলে বিস্তৃত হাঁ করতে।

গনপত হাঁ করতেই তার মুখে সে একটা হোমিওপ্যাথি শিশি থেকে কটা গুলি তার মুখে ফেলে দিল।

এই ডিসিপ্লিনের আড়ালে কি আছে সেটা স্পষ্ট অনুভব করলাম।

বাড়ীর ভিতর ঢুকে দেখলাম লরার স্বরস্তুতিয়াকে পড়ানো তখন বেশ জমে উঠেছে। উঠোনে পা দিয়ে বাঁক ফিরতেই লরার পরিপাটি কণ্ঠস্বরের আবৃত্তির একটি ছন্দিত অংশ কানে এল। লরা বলছে—ইন রোব এণ্ড ক্রাউন, দি কিঙ স্টেপ্ ড ডাউন।

সৌভাগ্য ক্রমে ওই টুকরো কথা দুটি থেকেই আমি চিনতে পারলাম। কবি টেনিসনের বাজার তখন আজকের মত হয়নি। তখন তাঁর খুব আদর ছিল। টেনিসনের কবিতা স্কুল পাঠ্য ইংরেজী বইয়ে ভারতের সর্বত্র তখন অবশ্য পঠিতব্য ব্যাপার। তাই লরাও পড়েছে, আমিও পড়েছি। এক ভিখারী মেয়ে রাজা কপেচুয়ার সভায় এসেছিল। অনেক সাজসজ্জা করা সভাসদদের নিয়ে রাজা তখন রাজবেশ পরে, রাজদণ্ড ধারণ করে মাথার মুকুট নিয়ে সিংহাসনে বসেছিলেন। সেই ভিক্ষুক কন্যার অসামান্য সৌন্দর্য দেখে সেই রূপকে সম্মান দেখাতে রাজা সেই রাজবেশ অঙ্গে, হাতে রাজদণ্ড, মাথায় মুকুট নিয়ে সিংহাসন থেকে নেমে এলেন।

লরা খানিকটা ইংরেজীতে, খানিকটা হিন্দীতে সুরস্থতিয়াকে বোঝাচ্ছিল কবিতাটা। বুঝানোতে যতটা ফাঁক পড়ছিল তার মনে হচ্ছিল ততটা সে নিজের হাত নেড়ে আর গলার স্বর দিয়ে ভরাট করে দিচ্ছিল।

আমি কিন্তু দেখছিলাম সুরস্থতিয়াকে। সেই মুহূর্তে ওই ন' দশ বছরের মেয়েটা দ্রষ্টব্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মেয়েটার চোখ মুখ যেন জ্বলছে। তার ছোট্ট দেহের গভীরে কোন আবেগের দীপপ্রান্তের পলতেতে তখন আগুন ধরেছে জানি না কিন্তু সেই শিখার প্রতিচ্ছটা তার চোখে মুখে। চোখ দুটো ওর বড়ই। সেই নীলাভ বড় বড় চোখ দুটো তখন ঝকমক করছে। মুখের মধ্যে রাঙা কচি ঠোঁট দুটি ঈষৎ ফাঁক হয়ে গিয়েছে। আমি বেশ খানিকটা দূর থেকেও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ওর নিঃশ্বাস পড়ছে ঘন ঘন। সেই নিশ্বাসের ছন্দিত প্রবাহে ওর নাকের প্রান্ত ফুলে ফুলে উঠছে। তার চেয়েও বড় কথা, মেয়েটা শিরদাঁড়া খাড়া করে টান টান হয়ে বসে আছে লরার মুখের দিকে চেয়ে। তার জন্যে ও যতখানি লম্বা, তারচেয়ে খানিকটা বেশী লম্বা দেখাচ্ছে ওকে।

আমার চোখে চোখ পড়তেই লরা একটু হাসল। বক্তা আর শ্রোতার মধ্যে যে অবিচ্ছিন্ন মনোযোগের সেতু রচিত হয়েছিল সেটি, তার ফলে ছিন্ন হয়ে গেল সেই মুহূর্তে। সুরস্থতিয়া চকিত হয়ে প্রথমে লরার মুখের দিকে চেয়ে, তার দৃষ্টি অনুসরণ করে আমার দিকে চাইল। সঙ্গে সঙ্গে গভীর লজ্জায় লজ্জিত হয়ে সে এক মুহূর্তে সহজ হয়ে বসল।

গল্প বলা শেষ করে লরা বললে—খুশ হুয়া তুম সুরস্থতিয়া ?

সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে সুরস্থতিয়া নিজের বই খাতা গোছাতে গোছাতে বললে—ফিন কব আইয়েগা ?

লরা আঙুল তুলে বললে—সামনা সানডেমে ! এতোয়ার আয়েঙ্গে ! আজ তো অব হমারা ছুটটি ?

সুরস্থতিয়া বই খাতা শ্লেট হাতে উঠে পড়ল। লরা নেমে এল আমার কাছে। হেসে বললে—নাউ আই শ্যাল গো মিঃ ব্যানার্জী ! উইল উ' কাম উইথ মি ? আমি এখন যাব। আপনি আসবেন নাকি আমার সঙ্গে ? আমার বাড়ীটা দেখে আসবেন !

আমি খুশী হয়ে বললাম—নিশ্চয়ই। তুমি গয়ায় আছ, আর আমি গয়ায় এসেছি তোমার সঙ্গে দেখা না করে, তোমার বাড়ী না গিয়ে চলে যাব ?

ভারী খুশী হল লরা। সে বললে—তাহলে এখনি চল আমার সঙ্গে। না হলে আর যেতে পারবে না টিল শিবাজী রিলিজিয়াস ফাংশনস আর ওভার। ওই

শ্রাদ্ধ-ট্রাদ্ধ শেষ না হলে তো আর যাওয়া হবে না। তা তুমি একটু দাঁড়াও.
আমি একবার স্বরস্বতিয়ার মায়ের সঙ্গে কথা বলেনি।

বলতে বলতে সে রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকল—ফুফাজী!

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন ফুফাজী। লরার সামনা সামনি।

মুখে ঘোমটা নেই। মুখে এক মুখ হাসি।

আমিও এবার ভাল করে দেখলাম মুখখানি। আমি প্রথম ওই মুখখানি অনেকদিন আগে অরণ্যের ছায়ায় একবার দু'বার আলোর চকিত টুকরোর মত দেখেছিলাম। এখানে এ বাড়ীতে এসেও তাই দেখেছি। কিন্তু সব সময়েই মুখখানি ছিল অর্ধাবগুণ্ঠনের আড়ালে। আজ এই মুহূর্তে ঘোমটার ঘেরের বাইরে প্রথম পরিপূর্ণ মুখখানি দেখলাম।

হ্যাঁ, সুন্দরী মেয়ে বই কি! এ মুখে যদি নাগরিক মার্জনা আর বিলাসের স্পর্শ লাগত তাহলে এ মুখ মানুষকে পাগল করতে পারত। কিন্তু তা না থাকলেও ও রূপে এমন মৌল ও আদিম কোন কিছু আছে যার জন্যে ও মুখের দিকে চাইলে বুকের ভিতরটা একবার ধ্বক করে ওঠে। মেয়েটির মুখখানি দেখে মনে হল, যা মনে হবার কোন সঙ্গত কারণ নেই, মেয়েটা বেশ লম্বা। আর সবটাই যেন একটু ভারী ভারী। কিন্তু ভারী ভারী হয়েও বড় সুঠাম। চোখ দুটো বড় বড়, বেশ ঝকমকে। যেন দুই চোখের ভিতর দিয়ে মনের চাপা তীব্রতর একটা আঁচ পাওয়া যায়। চোখের পল্লবগুলো বড় বড়, উপরের পাতাটিও যেন কিঞ্চিৎ ভারী। সেই ভারে যেন নুয়ে পড়ছে। ঠোঁট দুটি পুরু কিন্তু বেশ পরিপুষ্ট ও রক্তাভ। ফর্সা রঙে ঠোঁটের উপরে রোমের ঈষৎ শ্যামাভা মুখখানিকে আরও লোভন করেছে। নাকটিও একটু স্থূল এবং দীর্ঘ। থুতনীটি সুগঠিত কিন্তু ভারী।

লরার পিছন থেকে আমার দুই চোখ ওকে খুঁটিয়ে দেখছে অনুভব করে ও কিঞ্চিৎ লজ্জিত হয়ে মুখটা একটু সরিয়ে নিলে।

লরা ওকে জিজ্ঞাসা করছিল—হাউ আর ইউ পার্বটিয়া? আপ কেইসি হ্যায়? অাঁ? আচ্ছা?

বুঝলাম স্বরস্বতিয়ার মায়ের নাম পার্বতী। 'ইয়া' যোগ হয়ে পার্বতীয়া হয়েছে।

পার্বতীয়া হাসি মুখে ঘাড় নেড়ে জানালে—অচ্ছাহি হ্যায়!

লরা বললে—কব্ হমকো ফিন উয়ো পত্তুরোটি খিলাওগি?

পার্বতীয়া বললে—আপ তো এতোয়ার আইয়েগা? ওহি রোজ!

লরা হাসি মুখে বললে—ঠিক হ্যায়! আচ্ছা, আজ তব চলে?

তারপর আমার দিকে ফিরে বললে—চলুন মি ব্যানার্জী! লেট আস গো!

বাইরে এসে শিবাজীর সঙ্গে দেখা হল। সে ত তখন রণাঙ্গণে নেমে পড়েছে। মাঠের মধ্যে সৈন্যসামন্ত পরিবৃত হয়ে বিবিধ নির্দেশ দিয়ে বেড়াচ্ছে। রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে হাসি মুখে দেখতে দেখতে লরা বললে—ওঃ, হি হ্যাজ সাচ্ আনটায়ারিং এনার্জি! কি অক্লান্ত উৎসাহ ওর! দেখ, দেখ, কি রকম করে কথা বলছে দেখ! কি রকম হৈ চৈ করছে? বাবাঃ, ও এতও পারে! যাও ওকে বলে এস!

আমি ওর কাছে গিয়ে বললাম—মামা, আমি একবার মিস লরার সঙ্গে ঘুরে আসি বুঝলে?

শিবাজীর উৎসাহিত মুখ এক মুহূর্তে ম্লান হয়ে গেল। সে বললে—কিন্তু আমি তো এখন খুনি তোমার সঙ্গে যেতে পারছি না ভাগনা! আমি এখান থেকে চলে গেলে সব কাজ বন্ধ হয়ে যাবে, নয় গোলমাল করে দেবে এই বুদ্ধুগুলো!

আমি বললাম—আরে সেই কথা বলবার জন্যেই তো তোমার কাছে এলাম। তুমি কাজ কর। আমি একটু ঘুরে আসি মিস লরার বাড়ী।

শিবাজী বেঁচে গেল। বললে—তাই যাও। কিন্তু দেখো বেশী দেরী ক'রো না। তাহলে খেতে দেরী হয়ে যাবে!

লরার বাড়ীতে এসে পেঁছুলাম। ওর বাড়ীতে আসার সঙ্গে সঙ্গেই মনটি প্রসন্ন হয়ে উঠল। খোলারই বাড়ী, কিন্তু আমার মামার বাড়ী আর এ বাড়ীতে কত তফাৎ। আর মামার বাড়ী পাকা। তবু এই খোলার বাড়ীর পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে তার কোন তুলনাই হয় না। আমার মামা অবশ্য অকৃতদার, একা মানুষ ছিলেন। তা সত্ত্বেও তাঁর সব দোষ কেটে যায় না। শিবাজী আর সুরসুতিয়াদের জীবন আমার মামার শেষ জীবনে তাঁর জীবনের সঙ্গে মিলে গিয়ে তার ছায়া ফেলেছিল।

যাক, মামার বাড়ীর অপরিচ্ছন্নতার নিন্দে করেই বা লাভ কি? কিন্তু লরার বাড়ী দেখে প্রতি মুহূর্তে যে আমার মনে পড়ছিল মামার বাড়ীর নীচের তলায় একটা চোর-কুঠরী আর সিঁড়ির তলাটা গমের বস্তায় ঠাসা। সে কথাটা ভুলি কি করে? অথচ আমার চোখের সামনে ফুট পাঁচেক চওড়া আর বিশ পঁচিশ ফুট লম্বা বারান্দাটা পরিচ্ছন্ন ঝকঝক করছে। পাশাপাশি তিনখানা ঘর। প্রত্যেকটি ঘরে সস্তা রঙীন ছিটের পর্দা ঝুলছে।

সামনের ঘরখানার পর্দা সরিয়ে, পর্দাটা হাতে করে ধরে লরা বললে—প্লিজ কা
ইন মিঃ ব্যানার্জী ! আসুন ভিতরে আসুন !
আমি হাসি মুখে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললাম—বিহার আর ইউ, পি'র খানদানী অভিজাতরা, বিশেষ করে মুসলমান অভিজাতরা কি বলে জান ?
লরা হাসি মুখে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল।
আমি বললাম—আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করতাম—ইয়ে আপকি দৌলতখানা হ্যায় ? তুমি তার জবাবে বিনয় করে বলতে—ইয়ে মেরী গরীবখানা হ্যায় ! বুঝলে বিনয়ের পরিমাণটা ?
লরা বললে—নো, কাণ্ট একজ্যাগটলি ফলো ! না ঠিক বুঝতে পারলাম না।
ওকে বুঝিয়ে দিলাম ব্যাপারটা। খুব খুশী হয়ে তারিফ করতে করতে বললে—আপ তো তব মেরী গরীবখানামে আয়ে হেঁ ! আরাম কিজিয়ে যতটা পারেন ! এ্যাজ মাচ্ এ্যাজ পসিব্ল্।
আমি খুশী হয়ে বললাম—এ কিন্তু তোমার গরীবখানা নয়, এ একেবারে খাঁটি দৌলতখানা। গরীবখানা ছিল, তুমি একে দৌলতখানা বানিয়ে তুলেছ ! তোমার পরিচ্ছন্নতা, রুচি এবং সৌন্দর্যবোধ দিয়ে। দৌলত তো আসলে সিন্ধুকে থাকে না, থাকে দিলে, মনে ! নয় কি ?
লরা আমার প্রশংসায় অভিভূত হয়ে বললে—তুমি বেশী বেশী বলছ মিঃ ব্যানার্জী !
আমি জোর দিয়ে বললাম—না, আমি বেশী বেশী বলিনি।
বলতে বলতে আমি ওর সারা ঘরের সজ্জার দিকে আবার একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। খান তিনেক ভারী ভারী সস্তা কাঠের চেয়ার, মাঝখানে একটি পলকা টেবিল। টেবিলটি সাদা ধবধবে, ফুলতোলা একটি ঢাকনা দিয়ে ঢাকা। একদিকে একটা ছোট আলনা। তাতে লরার কটা জামা-কাপড় সযত্নে রাখা। তার পাশে আর একটি টেবিল। সেটিও টেব্ল্ ক্লথ দিয়ে ঢাকা। তার উপর কয়েকখানি বই, চিঠিপত্র আর চিঠি লেখার সরঞ্জাম যত্ন করে সাজানো। ডুটি জানলা। জানলাগুলিতে দরজার পর্দার রঙেরই পর্দা। যে সাজিয়েছে গুছিয়েছে, ঘরের সর্বত্র যে তার সমান দৃষ্টি ছিল, এবং এই মুহূর্তেও আছে তা বুঝতে পারা যায়।
লরা আমাকে বসিয়ে আমার সামনেই চেয়ারে বসেছিল। সে উঠে দাঁড়িয়ে বললে—ওণ্ট ইউ হ্যাভ এ কাপ অব টি মিঃ ব্যানার্জী ?
আমি হেসে বললাম—না। এখন চা খাব না। তুমি আমাদের সঙ্গে মিশে মিশে অনেকটা আমাদেরই মত হয়ে গিয়েছ !

শি. স্ম

লরা অবাক হয়ে বললে—কেন, তা বলছ কেন ?

আমি বললাম—তোমাদের তো সব খাওয়া-দাওয়া করার নির্দিষ্ট সময় আছে। তোমরা তো বেলা এগারোটার সময় চা খাওনা ?

লরা হেসে বললে—তা খাইনা। তবে তোমাদের দেশে বাস করছি, তোমাদের সঙ্গে অহরহ মেলামেশা করছি আর তোমাদের 'হ্যাবিট্‌স্' কিছু নেব না একি হয় ? আর তা ছাড়া তুমি তো মদও খাওনা, এমন কি ভাঙও খাওনা যে মদ কি ভাঙ দিয়ে 'এন্টারটেন' করব ! কাজেই এক কাপ চা খাও। আমি তোমার সঙ্গে এক কাপ খাই 'টু কিপ কম্পানী' !

লরা উঠে চা করতে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে দু কাপ চা দু হাতে করে নিয়ে এসে আবার টেবিলে বসল। চায়ে চুমুক দিয়ে আমাকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে —তুমি শিবাজীকে কতদিন চেন মিঃ ব্যানার্জী ?

আমি বুঝলাম লরার এই প্রশ্নের আড়ালে কোন পৃথক বক্তব্য আছে। চা করতে করতে প্রশ্নটা মনে উঠেছে তার। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, একটু হেসেই জিজ্ঞাসা করলাম—কেন বলতো ?

লরা মাথা নেড়ে বললে—বল না !

আমি বললাম—সেই কোন্ ছেলেবেলা থেকে। মামার বাড়ী বেড়াতে এসে আলাপ হয়েছিল !

লরা আবার জিজ্ঞাসা করলে—ওকে তোমার কেমন লোক মনে হয় ?

বললাম—দেখ ওকে এত পরিষ্কার বুঝি যে তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আমাকে এক মুহূর্ত কিছু ভাবতে হচ্ছে না। তোমাকে পরিষ্কার এককথায় বলতে পারি—হি ইজ্ এ বিগহার্টেড ফুল। হৃদয়টা খুব উদার, কিন্তু বোকা।

লরা বেশ ভাবিত হয়ে ঘাড় নেড়ে বললে—আমি কিন্তু এত সহজে সোজা করে ওর সম্পর্কে তোমাকে কোন কথা বলতে পারব না ! অনেকদিন আগে কলকাতায় তোমাকে ওর সম্পর্কে কি বলেছিলাম মনে আছে তোমার ? বলেছিলাম—ও ইডিয়ট না রাস্কেল না আর কিছু আমি সঠিক বলতে পারব না। আজও আমি ওকে সঠিক বুঝতে পারি না !

আমি ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। ও ঘাড় নেড়ে বললে—হি ইজ্ এ ষ্ট্রেঞ্জ ম্যান ! ও খুব অদ্ভুত লোক। তুমি যা বলেছ সেটা অবশ্য মোটামুটি ঠিক। এ বিগ হার্টেড ফুল ! বোকাদের বুঝতে তো বেশী সময় লাগে না। কিন্তু ওকে আমি আজও সঠিক বুঝতে পারি না। ওর চরিত্র কিন্তু খুব সরল নয়। ও অনেক জটিল লোক। হি ইজ আইদার এ সোয়াইন অর এ সেইন্ট !

আমার একটু রাগ হল শিবাজী সম্পর্কে এই রকম কড়া কথা শুনে। আমি কঠিন মুখে ওর দিকে চেয়ে রইলাম। প্রতিবাদ করা দরকার এই রকম কড়া কথার। কিন্তু প্রতিবাদ করে ঠিক কি বলব খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

লরা আমার মুখের চেহারা দেখে বললে—আমার কথায় তুমি মনে মনে রুষ্ট হচ্ছ বুঝতে পারছি। আমি আমার কথাটা তোমাকে ভেঙে বলি তা হলে বুঝতে পারবে। আচ্ছা, তুমি সেই ইংরেজী প্রবাদটা জান তো—শূয়োরের সামনে মণিমুক্তো ছড়িয়ে দিলে শূয়োর তার কি বুঝবে? সেই অর্থেই আমি ওকে শূয়োর বলেছি। ওর কোন চরিত্রগত বদঅভ্যাসের জন্যে বলিনি।

আমি লরাকে বললাম—তাই বা বলছ কেন? ও বোকা হতে পারে কিন্তু ও সংসারের কিছুই বোঝে না এতো নয়!

লরা বললে—কিছু কিছু বুঝতে পারে হয়তো। কিন্তু আবার অনেক কিছুই বুঝতে পারে না!

—তা বটে অবশ্য। কথাটা মেনে নিতে হল আমাকে।

লরা বললে—ওকে আমি যত দেখছি তত আমার তাই মনে হচ্ছে।

জিজ্ঞাসা করলাম—কি রকম?

লরা বললে—ওর এই ব্যবসার কথাই ধরনা। ও 'লগ' কাঠ এই সব বিক্রীর ব্যাপারে খুব প্র্যাকটিক্যাল আর 'পার্টিকুলার' হবার চেষ্টা করে। দাম দর নিয়ে খুব দর কষাকষি করে।

আমি বাধা দিয়ে হেসে বললাম—তাতে তো তোমার অসুবিধা হবারই কথা। সেই জন্যেই বলছ বুঝি?

লরা হেসে বললে—আরে না, না! দাম দর ঠিক হয়ে গেলে আর তো ওকে ঠকানোর অসুবিধে নেই। ওখানেই ওর যত নজর। তারপর তুমি মাপে 'ম্যানেজ' করে নাও, ও নজর দিতে আসবে না, নজর দিলেও ধরতে পারবে না! অথচ মুখে বড়াই করবে দশ কুড়ি! কিন্তু গোলমালটা তো সেখানে না।

—তবে কোথায়? স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন করলাম আমি।

—ওর যা জঙ্গল তাতে ওর কোন অভাব হবার কথা নয়! আমি তো এই ব্যবসা করছি কিছু দিন। ভালই করছি। আমি এই ক' বছরে কিছু টাকাও জমিয়েছি ব্যাঙ্কে। কিন্তু আমি শুনেছি ওর এই এত বড় জঙ্গল থাকা সত্ত্বেও ওর এর আয়ে চলছে না। ও নাকি টাকা ধার করেছে বেশী সুদে।

আমি ভয় পেয়ে বললাম—সে কি? কেন টাকা ধার করেছে কেন?

লরা বললে—দাদোজী, মানে তোমার মামা ওর হিসেবপত্র খানিকটা দেখাশোনা করে দিতেন। ও বেশী খরচ করলে সতর্ক করে দিতেন ওকে। একদিকের বেশী খরচ অন্যদিকের খরচ কমিয়ে 'মেক-আপ' করতেন। উনি বার বার বলতেন—এত কুলী কমিয়ে দাও। তোমার এই প্রায় দুশো ঘর কুলী কোন্ কাজে লাগবে তোমার? তা শিবাজী দাদোজীর সব কথা মাথা নীচু করে মানলেও এ কথাটা মানতো না। বলতো—আমি ওদের আশ্রয় দিয়েছি। এখন আমি ওদের কোথায় যেতে বলব? ওদেরই খরচ মেটাবার জন্যে এখানকারই এক ভূমিহার ব্রাহ্মণ তালুকদারের কাছে চড়া সুদের টাকা ধার করেছে শিবাজী। দাদোজী এ খবরটা জানতেন না। দাদোজীকে না জানিয়েই ও টাকাটা ধার করেছে। আমার ভয় হয় কি জান, এই ধারের রাস্তা দিয়েই না জঙ্গলটা ওর হাতছাড়া হয়ে যায়! অথচ ওর ধারণা ও ব্যবসা আর হিসেব দুইই খুব ভালই বুঝতে পারে! আসল গলদটা এইখানে!

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম—আমি এ ব্যাপারে ওকে সতর্ক করে দেব!

লরা হেসে বললে—তা দিও। তবে আমি তোমাকে বলেছি এটা যেন ব'লো না ওকে। আয় কর ব্যাপারে ওকে তুমি সতর্ক করতে পার?

—কেন?

লরা আমার এ কেন'র কোন সোজাসুজি উত্তর দিলে না। বললে—এতদিন তবু দাদোজী ছিলেন, ওর মাথার ওপর শাসন করবার, ভয় করবার একটা মানুষ ছিল। এখন তিনি নেই, এখন কি আর ও ব্যাপারে শিবাজীকে সতর্ক করে কোন ফল পাবে তুমি? তা ছাড়া—

বলে থেমে গেল লরা।

বলাই বাহুল্য তার এই কথা বলতে বলতে মাঝপথে থেমে যাওয়াতে আমার কৌতূহল বেশ বেড়ে গেল। তাই আমি কৌতূহলী হয়ে তার ছাড়া কথাটারই পুনরাবৃত্তি করলাম—তা ছাড়া বল কি বলছিলে?

লরা মুখে একটু প্রচ্ছন্ন হাসি নিয়ে বললে—যা বলতে যাচ্ছিলাম তা তোমাকে ওর সম্বন্ধে বলা উচিত হবে কি না ভাবছিলাম।

চুপ করে গেলাম আমি! আমার বলা উচিত হবে কি না বলে যখন ও ভাবছে তখন আমারই বা শুনে দরকার কি? ও আমার আত্মসম্মানে বড় বাধে। কারও গোপন কথা জোর করে জানতে চাওয়ার প্রবৃত্তি নেই আমার।

আমি চুপ করে গেলাম।

লরা চায়ের কাপ দুটো সরিয়ে রাখতে রাখতে বললে—তোমাকে বলাই বোধহয়

ভাল। তুমি প্রত্যক্ষভাবে না হোক পরোক্ষভাবে এ ব্যাপারে ওকে সাহায্য করলেও করতে পার!

আমি কোন কথা না বলে ওর মুখের দিকেই চেয়ে রইলাম। লরা কি বলবে তা আমি কি করে জানব?

লরা হেসে বললে—একটু আগে তোমাকে ওর সম্বন্ধে বললাম না ও 'সোয়াইন না সেইন্ট' আমি জানি না? সত্যিই ও মণিমুক্তোর রাজ্যে শূকর না এক সাধু মহাত্মা বলা কঠিন।

বলেই সে আমাকে খেলাবার জন্যই যেন প্রশ্ন করলে—আচ্ছা, তুমি ওর জীবনে অস্বাভাবিক, আশ্চর্য কিছু লক্ষ্য করনি?

লরার প্রশ্নের ধরণ দেখে আমারও আশ্চর্য লাগল। শিবাজীর জীবনে অস্বাভাবিক আশ্চর্য কিছু বলে কি বলতে চাইছে লরা? লরা কি বলতে চাইছে লরাই জানে। ও নিয়ে আমার মাথা ঘামানোর কোন প্রয়োজন নেই। তাই আমি চুপ করে রইলাম।

লরা হেসে বললে—ইউ অলসো এ্যাপিয়ার টু বি এ বিগ বেবী লাইক হিম! তুমিও ওরই মত একটি বুড়ো খোকা। কিছুই দেখতে পাও না!

আবার চুপ করে গেল লরা। বললে—অবিশ্যি তুমি ওকে আর কতটুকুই বা দেখেছ। তোমার দেখতে না পাওয়া নিয়ে তোমাকে ঠাট্টা করে আর লাভ কি?

আবার চুপ। তারপর আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে লরা বললে—হ্যাভ'নট্ ইউ মারক্ড্ দ্যাট দি ভেইল্ড্ লেডী ইজ হেডলভ ইন্ লাভ উইথ ইওর শিবাজী? তুমি কি দেখনি ওই ঘোমটা ঢাকা মেয়েটি শিবাজীর প্রেমে আকণ্ঠ ডুবে গিয়েছে?

চমকে উঠলাম লরার কথা শুনে। বলে কি? ওই সুন্দরী, গম্ভীর, অতি-সংযত ফুফাজী শিবাজীর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে? তাই আবার হয় নাকি?

আমি সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করে বললাম—যাঃ, তাই আবার হয় নাকি? শিবাজী ওকে ফুফাজী বলে ডাকে

—কেন হবে না? আমি বলছি তোমাকে। বেশ জোরের সঙ্গে বললে লরা।

আমি বললাম—আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। কারণ বিশ্বাস করা যায় না। আর শিবাজী ওদের আশ্রয়দাতা। ওদের নিজের বাড়ীতে আশ্রয় দিয়ে, রক্ষা করে কি সে এই কাজ করতে পারে?

লরা বিরক্ত হয়ে উঠল। বললে—ওঃ, মাই গড! শিবাজীর কথা কে বলছে

তোমাকে? আমি বলছি ওই 'ইয়ুথফুল ভেইল্ড্' লেডী পার্বতীয়ার কথা। ওই যে ঘোমটা দিয়ে কাপড়ের আড়ালে নিজের যৌবন আর সুন্দর মুখখানা ঢেকে রাখে তার কথা বলছি। শিবাজী ওকে ভালবাসে এমন কথা তো আমি বলিনি তোমাকে। সেই জন্যেই তো বললাম শূকরের সামনে মুক্তা ছড়ানো, শূকর চিনতে পারছে না!

আমি ঘাড় নেড়ে বললাম—এও তুমি ঠিক বলছ না। আমি বিশ্বাস করতে পারলাম না!

লরার কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। বললে—তুমি বিশ্বাস কর কি না কব তাতে কিছু এসে যাচ্ছে না। তবে এইটাই ঘটনা। জান ব্যানার্জী, স্ত্রীলোকের চোখকে স্ত্রীলোক কখনও ফাঁকি দিতে পাবে না। ও ঘোমটায় মুখ ঢেকে সবারই কাছে লুকিয়ে বাখলে কি হবে, আমি মেয়েমানুষ, আমি প্রথম একদিন দু'দিন দেখেই বুঝতে পেরেছি। আমি অবশ্য এ নিয়ে ওকে কোনদিন কিছু বলিনি।

তারপর বললে—তুমি আমার কথা বলছ কি, ওর ওই ন' দশ বছরেব মেয়েটাও এ খবরটা জানে বুঝলে মিঃ ব্যানার্জী। এই নিয়ে ও নানান অছিলায় মায়েব ওপর হুজ্জুত করে।

লরা থামল। তাবপব হেসে বললে—ব্যাপাবটা কিন্তু এইখানেই শেষ নয়। আরও খানিকটা আছে। পার্বতীব ওই ন' দশ বছবেব মেয়েটাও শিবাজীকে মায়েরই মত ভালবাসে। সেও এই ভালবাসায় মায়েবই প্রতিদ্বন্দ্বী—এটা ভাল করে জেনে রাখো।

চৌদ্দ

সাড়ে বারোটা নাগাদ উঠলাম লবার বাড়ী থেকে।

বেলা অনেকটা হয়েছে, তার উপর লরারও বোধহয় লাঞ্চের সময় হয়েছে। আবার ওদিকে আমি না গিয়ে পৌঁছুলে স্বরস্বতিয়া, স্বরস্বতিয়ার মা অভুক্ত হয়ে বসে থাকবে। শিবাজীরও হবিষ্যি করতে দেরী হয়ে যাবে।

সুতরাং লরাব বাড়ী থেকে বেরিয়ে একখানা রিক্সা নিলাম।

রিক্সায় নিরিবিলি আসারও প্রয়োজন ছিল। কারণ লরার কাছে যে খবর শুনলাম তা পরিপাক করবার জন্যে নিরিবিলি আসার প্রয়োজন ছিল।

লরা যা বললে তার সম্ভাব্যতার কথাই ভাবতে ভাবতে আসছিলাম। এ কি

করে সম্ভব ? শিবাজীর প্রতি ওদের স্বাভাবিক আনুগত্যটা সহজেই বুঝতে পারি। চামারিয়ার সঙ্গে স্বরস্বতিয়া আর তার মা পার্বতীর সম্পর্ক কি তাও আমি স্পষ্ট করে জানি না। তবে ওদের দুজনেরই আসল ভর্তা যে শিবাজী এতে আমার কোন সন্দেহ নেই। ওদের ভরনপোষণের সমস্ত দায়দায়িত্ব শিবাজীই বহন করছে। তাই বলে মা মেয়ে দুজনেই শিবাজীকে পুরুষ হিসেবে ভালবাসবে এ কেমন কথা ? আর স্বরস্বতিয়া তো মাত্র ন' দশ বছরের একটা পুচকে মেয়ে, সে আবার ওই ত্রিশোত্তর শিবাজীকে ভালবাসবে এ কি হয় না কি ? ভালবাসবার জন্যেও তো এক ধরনের দৈহিক ও মানসিক পরিপক্কতা দরকার। মেয়েও তো বাপকে ভালবাসে। সে ভালবাসা মনোবিজ্ঞান যেমন ব্যাখ্যাই করুক, তাই নিয়ে চলমান বৃহৎ মানব-সমাজ মাথায় আঘাত করে হায় হায় করে না। এটা অবশ্য হতে পারে যে পার্বতীয়া তার ঘোমটার অন্তরাল থেকে শিবাজীকে ভালবাসে। আর সেই ভালবাসাকে স্ত্রী-বুদ্ধির সাধারণ ধর্মে বুঝে ন' বছরের স্বরস্বতিয়া সেই ভালবাসাকে অনুসরণ ও অনুকরণ করে। যাই হোক, ও মা আর মেয়ে দু' জনেই শিবাজীকে ভালবাসছে এ আমায় ভাবতে ভাল লাগছিল না।

এ ভালবাসা শিবাজীকে স্পর্শ করেনি বলেই মনে করি। এমনও হতে পারে নরার শিবাজী সম্পর্কে কিঞ্চিৎ দুর্বলতা আছে। সে দুর্বলতা শিবাজীর পক্ষ থেকে কোনদিন সমর্থিত হয়নি। এ ঘটনা তো আমার জানাই। তখন আমার মামা বেঁচে। শিবাজী সম্পর্কে আমি কিঞ্চিৎ সংশয় প্রকাশ করলে তিনি একটু রুষ্ট হয়েই আমাকে বলেছিলেন—শিবাজী সম্পর্কে ও সব ধারনাই মনে আসে না আমার। ও সব বিশ্বাসও করি না আমি। আর তোদের গল্প-উপন্যাস পড়তে পড়তে মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। শিবাজীর সম্পর্কে ও সব ভাবিস না।

মামার কথাগুলো আবার স্মরণ করে আমিও ভাবনায় ইতি টানলাম। বিশ্ব-সংসারে কোথায় কি হচ্ছে ও ভেবে আমার কোন প্রয়োজন নেই। আর এরাই বা আমার জীবনে কতটুকু ? আজ দু দিনের জন্যে এসেছি মামার শ্রাদ্ধকে উপলক্ষ্য করে। শ্রাদ্ধ চুকলেই চলে যাব। ফিরে যাব আমার নিজের গ্রামের সেই রিক্ত নির্জন শোভার মধ্যে। আর শিবাজী ফিরে যাবে অরণ্যের মধ্যে। আমি আমার গ্রামে বিষয়-সম্পত্তি দেখব, থিয়েটার করব, নাটক লিখব, পড়াশুনো করব।

তবে হ্যাঁ, মানুষের জীবনে নরনারীর সম্পর্কের সম্বন্ধে মানুষের কৌতুহলের বুঝি অন্ত নেই। নরনারীর পরস্পর সম্পর্কে কামনা জলধারার মত। তটরেখার

সীমা মানে না। ধারার বেগ প্রবল হলে নদীর দু দিকের তটের শাসনকে ক্ষণে ক্ষণে লঙ্ঘন করে তটরেখা ছাপিয়ে নিজের পথ করে নেয়। সামনে কোন বাঁধ কি পাথরের বাধা থাকলে তাকে ঠেলে সরিয়ে কি ভেঙে এগিয়ে চলে। সে আপনার ইচ্ছাকে পরিতৃপ্ত ও চরিতার্থ করবেই। তাকে রোধ করা অসম্ভব। তবে হ্যাঁ, যতক্ষণ সে নিয়মের মধ্যে আছে, সামাজিক শাসনকে মেনে চলছে, ততক্ষণ কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু এ প্রবৃত্তি ও তৃষ্ণা মানব-চৈতন্যের মূলে অবস্থান করছে। একে অস্বীকার করে চলার ক্ষমতা কারও নেই।

বাড়ী ফিরতেই সমস্ত কল্পনা ও চিন্তা এক মুহূর্তে মিলিয়ে গেল।

শিবাজী বাড়ীর দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল। আমাকে দেখে বললে—যাক এসে গিয়েছ তা হলে! আমি খুনি এখনি ভাবছিলাম তোমার কথা!

এপাশের মাঠ তখন জনশূন্য। পরিচ্ছন্ন মাঠে কিছু বাঁশের আর শালের খুঁটি পোঁতা হয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম—তোমার বাহিনী কোথায় গেল?

শিবাজী বললে—তারা সব খেতে গিয়েছে।

বললাম—চল, স্নান করা যাক।

বাড়ীর ভিতর গিয়ে দেখলাম অম্বুজাক্ষবাবু মধ্যাহ্নভোজনে বসেছেন। আজ তাঁর একাদশী। তিনি ভাত খাচ্ছেন না। পরোটা এবং কিছু ফল গ্রহণ করছেন।

আমার কেমন অদ্ভুত লাগল। এখানে আমার মামা, শিবাজী, সুরস্বতিয়া আর তার মাকে নিয়ে যে যৌথ জীবন তার মধ্যে আমার নিজেকেই কেমন বাইরে থেকে আসা প্রক্ষিপ্ত বলে মনে হচ্ছে। আমার চোখে এই মানুষটিকে আরও প্রক্ষিপ্ত মনে হল। উনি কে, কেন, কি জন্যে এদের জীবনে এসে উদিত হলেন তার কোন হদিস নেই। কিন্তু উনি যে উদিত হয়েছেন তাতে তো আর কোন সন্দেহ নেই। করুন, উনি ভয়সা ঘিয়ের পরোটা ও ফল সহযোগে একাদশী করুন। আমি স্নান করতে চলে গেলাম।

সন্ধ্যে নাগাদ শ্রাদ্ধ-বাসরের চেহারাটা সম্পূর্ণ হয়ে উঠল। সমস্ত মাঠটা গোবর মাটি দিয়ে পরিপাটি করে নিকনো হয়েছে। মাঠে সামিয়ানা টাঙানো হয়েছে। দুটো পেট্রোম্যাক্স আলো জ্বলছে সামিয়ানার নীচে। এখন লাল-নীল-হলদে কাগজ কেটে শেকল তৈরী হচ্ছে। অন্যদিকে রাশিকৃত আম আর দেবদারুর পাতা পড়ে আছে। দেবদারুর পাতা বাঁধা হচ্ছে খুঁটিগুলিতে আর আমের পল্লবের মালা তৈরী হচ্ছে টাঙানোর জন্যে।

তার মানে আমার মামার পারলৌকিক ক্রিয়া সামান্যভাবে সংঘটিত হচ্ছে না।

তার সাত্বিক চেহারা কতটা বজায় থাকবে জানি না। সে কাল শ্রাদ্ধবাসরে বুঝতে পারব। কিন্তু সে যে বেশ রাজসিক মূর্তিতে বেশ একটা রাজসূয় যজ্ঞের চেহারা নিয়েছে তাতে কোন সন্দেহ রইল না। এ সমস্তের মূলে কিন্তু শিবাজীর এই বিপুল বাহিনী।

কিন্তু ব্যাপারটা কত বিশাল তা বুঝলাম পরদিন ভোর বেলাতেই।

একটা বিপুল কোলাহলে ঘুম ভেঙে গেল। কম্বলের উপর পাশাপাশি শুয়েছিলাম দুজনে। কোলাহলের শব্দে ঘুম ভেঙে যাওয়ায় শিবাজীকে জিজ্ঞাসা করলাম—এই মামা, এত গোলমাল কিসের ?

একটু খুনি নীচে গিয়ে দেখে এস না ! তা হলেই বুঝতে পারবে। বলে শিবাজী আবার পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল।

আমি নীচে গিয়ে প্রাতঃকৃত্য সারতে সারতেই দেখলাম স্বরস্বতিয়া এবং পার্বতী দুজনেই উঠে পড়েছে। অম্বুজাক্ষ কানে পৈতে জড়িয়ে হাতে জলের লোটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসতেই আমার পাশ দিয়ে গন্তব্য স্থানে চলে গেলেন !

বাড়ীর বাইরে কোলাহল সমানে চলছে। আমি পার্বতীকে জিজ্ঞাসা করলাম—বাইরে অত গোলমাল কিসের ?

একটু হেসে মাথার ঘোমটাটা একটু টেনে দিয়ে পার্বতী বললে—বাহার যা কর দেখিয়ে। দেখনেকা লায়েক হ্যায় ! দরজা খুলে দিয়েছি।

আমি বাইরে বেরিয়ে গেলাম।

বেরিয়ে গিয়ে রাস্তার ওপারে বিপুল কোলাহলের মধ্যে কি ঘটছে তা ঠিক বুঝতে না পারার জন্যে রাস্তা পার হয়ে মণ্ডপে ঢুকলাম। একটা জায়গায় ত্রিপল পাতা হচ্ছে। দু দল লোক খোল, করতাল ও ঢোলক নিয়ে অপেক্ষা করছে বসবার জন্যে। আর মণ্ডপের পিছন দিকে সারি সারি অন্তত বিশজন নাপিত বসেছে। তাদের সামনে বিশজন লোক বসে মস্তক মুণ্ডন করছে। একদফা জনা বিশেকের মস্তক মুণ্ডিত হয়ে গিয়েছে। বিশজন ন্যাড়া মাথা লোক হাসিমুখে মণ্ডপের এখান ওখান ঘুরে বেড়াচ্ছে।

প্রথমটায় ভীষণ অবাক হয়েছিলাম। কি ঘটছে ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। তারপর বুঝলাম ব্যাপারটা। শিবাজীর অরণ্যভূমি থেকে যে শ দুয়েক লোক এসেছে এই শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে তারা সকলে শিবাজীর দাদোজীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনীর জন্য মস্তক মুণ্ডন করছে।

এই সময়ে চামারিয়া এসে আমার সামনে হাত জোড় করে, মুখে এক মুখ হাসি নিয়ে দাঁড়াল। বললে—আপ আয়ে হেঁ হুজুর? দেখতে হেঁ?

বুঝলাম এ ব্যাপারে শিবাজী পার্বতী, সুরস্থতিয়া থেকে চামারিয়া পর্যন্ত সকলেরই আর পরিতৃপ্তির অন্ত নেই। আমি চামারিয়াকে বললাম—হ্যাঁ দেখছি তো! তোমরা সবাই মাথা মুণ্ডন করবে বুঝি?

চামারিয়া সোৎসাহে বললে—জী সরকার! সব কোই। দেখিয়ে না হমারা তো সবসে পহেলেই হো গয়া!

বলে সে নিজের মুণ্ডিত মাথার উপর মস্ত বড় দুখানা পরুষ হাত বুলিয়ে নিয়ে আবার এক মুখ হাসলে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা, তোমরা সবাই মাথা মুণ্ডন করছ কেন?

আবার দুই হাত জোড়। চামারিয়া বললে—দাদোজীকো ইসমে 'অকৃছব' স্বর্গবাস হোগা!

চামারিয়ার কথা তখনও শেষ হয় নাই। সে হাত জোড় করেই বললে—আর হমলোগ সব কোই নিরঞ্জনামে যায়েঙ্গে আস্নান করনেকো লিয়ে। নিরঞ্জনা তো 'সাকসাৎ' গঙ্গামায়ী না? ইসমে গঙ্গাস্নানকি 'পুন্' ভি হোগা হমলোগোকো. আউর দাদোজীকো স্বর্গবাস পাক্কি হো যায়েগী!

ওদিকে তখন তারকব্রহ্ম নাম আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। যাঁরা হরিনাম করছেন তাঁরা বিহারী নন। সব বাঙালী। তাঁরা মৃদঙ্গ আর করতালের সঙ্গে ধরেছেন —হরেকৃষ্ণ হরেরাম, নিতাই গৌর রাধেশ্যাম।

সে এক হৈ হৈ ব্যাপার। আমি কিছুক্ষণ দেখে আবার বাড়ীর ভিতরে চলে এলাম। বাড়ী ঢুকতেই দেখা হল অম্বুজাক্ষবাবুর সঙ্গে। তিনিও স্নান করে তৈরী। আমাকে দেখে হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলেন—সব আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। বললাম—তা বলতে পারব না। তবে কিছু হচ্ছে ওখানে। যান গিয়ে দেখুন না!

অম্বুজাক্ষবাবু ফতুয়া গায়ে দিতে দিতে বললেন—পার্বতী মাঈ, আমি মণ্ডপে গিয়ে বসছি। তুমি শ্রাদ্ধের সব জিনিষপত্র দাও আমাকে। আমি এক এক করে রেখে আসি!

শিবাজী উপর থেকে নেমে এসে মুখ ধুতে গেল। আমাকে বলে গেল—ভাগনা, তুমি খুনি একটু দাঁড়াও। আমি আসছি এখুনি! মাথাটা তো খুনি ন্যাড়া করতে হবে!

অম্বুজাক্ষবাবু একদফা জিনিষপত্র নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সুরস্থতিয়া আমাকে বললে—বাবুজী, আপ আস্নান কর লিজিয়ে না। দের কাহে কর রহে হেঁ? নও বাজে তো পণ্ডিতজী আ যায়েঙ্গে।

সাড়ে দশটা এগারোটায় শ্রাদ্ধ আরম্ভ হল।

মণ্ডপে সে এক বিচিত্র দৃশ্য। মণ্ডপের একদিকে বিপুল রামনাম ও হরিনামের মাঝখানে শিবাজী বিহারী পণ্ডিতজীর নির্দেশনায় আমার মাতুলের শ্রাদ্ধকর্ম আরম্ভ করলে। আর শ্রাদ্ধবাসরে গয়া সহরের সমস্ত বিশিষ্ট ভদ্রজনদের মাঝখানে শ দুয়েক মুণ্ডিত মস্তক মনুষ্য ঘুরে ফিরে বেড়াতে লাগল নানান কাজের সূত্রে।

পণ্ডিতজীর পাশে আমিও গিয়ে বসেছি। আর বসেছেন অম্বুজাক্ষবাবু। একখানি কম্বলের আসন তিনি কোথা থেকে জোগাড় করে এনেছিলেন তিনিই জানেন। তাঁর যে রকম পূজাপাঠের ধুমধাম দেখেছি তাতে এটি তাঁর নিজের সামগ্রী হওয়াও আশ্চর্য নয়। সেই আসনের উপর তিনি আসনপিঁড়ি হয়ে পরিপাটি করে সমস্তক্ষণ বসে রইলেন যতক্ষণ ক্রিয়া হল। হাত জোড় করে বসে রইলেন সমস্তক্ষণ। মুখখানি প্রশান্ত। শান্ত, শীর্ণ, তৈলচিক্কণ মুখে প্রশান্তি এক মুহূর্ত ব্যাহত হল না। ভারী, পুরু, ভুরুর নীচে ছোট ছোট খয়েরী চোখ দুটি সমস্তক্ষণ শ্রাদ্ধ মণ্ডপের মধ্যস্থলে প্রতিষ্ঠিত শালগ্রাম শিলার সিংহাসনের দিকে নিবদ্ধ ছিল। মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট চোখ দুটির দৃষ্টি স্তিমিত হয়ে যাচ্ছিল।

আমি শ্রাদ্ধকর্ম দেখার সঙ্গে তাঁকেও দেখছিলাম। এই প্রক্ষিপ্ত মানুষটি আমার কাছে দুর্বোধ্য মনে হচ্ছে। আমি ওঁকেই বুঝবার ও অনুমান করবার চেষ্টা করছিলাম। যেদিন মধ্যরাত্রি থেকে ভদ্রলোক এখানকার এই বিচিত্র জীবনমঞ্চে আবির্ভূত হয়েছেন তখন থেকে এখন পর্যন্ত তাঁর পূর্বপরিচয়হীন আবির্ভাব, তাঁর স্বল্পবাক ধীরতা, তাঁর অতি ধীর চলাফেরা, তাঁর স্বনিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রা সবকিছু অতি সাধারণ হয়েও আমার কাছে একটা দুর্বোধ্য প্রহেলিকার মত প্রতিভাত হচ্ছে। শিবাজী এমন ধরনের এক প্রাণী যার বুদ্ধিতে কোন সূক্ষ্ম কিছু বিন্দুমাত্র ধাক্কা দেয় না। অম্বুজাক্ষবাবু তার কাছে তার জঙ্গলরাজ্য থেকে আসা দুশো লোকের উপরে গণনায় আর একজন মাত্র। তার বেশী কিছু নন। কিন্তু আমার কাছে তো তা মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে এই লোকটির এখানে আসা এবং এই চলাফেরার আড়ালে যেন কোন একটা উদ্দেশ্য আছে যে উদ্দেশ্যটা আমি কিছুতেই ধরতে পারছি না। অথচ তাঁর সম্পর্কে আমার কৌতূহল মুহূর্তে মুহূর্তে বেড়েই চলেছে।

একটা ধারণা অবশ্য আমি করে রেখেছি। উত্তরাধিকারহীন আমার মামার

সম্পত্তিতে পরিণত বয়সের অম্বুজাক্ষবাবু হয়তো উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে এসেছেন। এ ব্যাপারে আমি শিবাজীকে আগে থেকেই সতর্ক করে রেখেছি। সে ব্যাপারের সময় অবশ্য এখনও আসেনি। আজ শ্রাদ্ধ শান্তি চুকে গেলে হয়তো কাল পরশু এ দাবী উত্থাপিত হতে পারে। তারই জন্য আমি অপেক্ষা করে আছি।

আরও কিছু আছে কি ?

থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে। আমাব অনুমান ও কল্পনায় আর কিছু আসছে না। আমি সমস্তক্ষণ শ্রাদ্ধরত শিবাজী, সম্মুখস্ত নারায়ণ শীলা এবং জোড হস্ত অম্বুজাক্ষবাবুকে পর্যায়ক্রমে দেখে গেলাম। কিন্তু কোন হদিশ মিলল না।

শ্রাদ্ধ শেষ হয়ে গেল। শিবাজী উঠে গেল আসন থেকে। পণ্ডিতজী শালগ্রাম নিয়ে উঠে বাড়ীর ভিতর গেলেন। একটু পরই সুরসুতিয়া এসে আমাকে আর অম্বুজাক্ষবাবুকে ডাকলে। আমার কাঁধে হাত দিয়ে আমাকে ঠেলা দিয়ে বললে—ভিতব চলিয়ে !

সঙ্গে সঙ্গে পাশের অম্বুজাক্ষবাবুকে বললে—দাদাজী, মাতাজী আপকো ভি বুলা বহে হেঁ !

আমরা উঠে ভিতরে গেলাম।

শিবাজী তখন চৌকীর উপর বসে আছে। আর তার একটু তফাতে দাঁড়িয়ে সুরসুতিয়ার মা পার্বতী একখানা পাখা নিয়ে বাতাস করছে।

শিবাজী এই সেবায় যেন বড় বিব্রত। আমাদের দেখে সে আরও খানিকটা বিব্রত হল। হাতের ভিজে গামছায় নিজের মুখ আর ন্যাড়া মাথা একবার মুছে নিয়ে সে বিব্রতভাবে বললে—ফুফাজী যে কি মুস্কিল করে, বলছি খুনি, আমার তাগদ বহত, ইয়ে তাগদ সিল্লীসে বনা হুয়া, আমার খুনি হাওয়া লাগবে না। তা শোনে না কিছুতে।

বলে হাতটা বাড়িয়ে বললে—দাও আমাকে পাখাটা দাও তো। আমি নিজেই বাতাস খাচ্ছি !

পার্বতীর মুখখানি এমন অনাবৃত সম্পূর্ণতায় কখনও আগে দেখিনি। সুঠাম পরিপূর্ণ ভরাট মুখ। পূর্ণ যুবতীর মুখ একখানি। টানা টানা পুরু ভুরু, ভারী চোখের উপর পাতা, চোখের কোল, শুভ্র দেহবর্ণের ঠোঁটের উপরে অস্পষ্ট রোমের উপর, চিবুকে সর্বত্র বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে আছে। দুই কানের কাছে চুলের ঘন গুচ্ছ চুঁইয়ে ঘাম নেমে আসছে। তাকে এক ঝলক দেখেই বুঝলাম সে নিজেও ক্লান্ত। তবু সে শিবাজীর থেকে খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে বাতাস

করছিল। শিবাজী তার হাত থেকে পাখাখানি নেবার জন্ত হাত বাড়াতেই সে রুষ্টভাবে বলে উঠল—নহি ! আপ ঠিকসে বৈঠ রহিয়ে।
তারপর আমাদের দেখে সুরসুতিয়াকে ডেকে বললে—দো গিলাস সরবত বনা হুয়া হ্যায়। দে দো দোনোকো !
তারপর আমাদের দুজনকেই বললে—আভি তো খানেমে থোড়া দের হ্যায়। সরবত খা লিজিয়ে !
তার কথার সুরে একটা আশ্চর্য ব্যাপার অনুভব করলাম। অম্বুজাক্ষবাবু পার্বতীর কাছে আমারই সমান মূল্যবান হয়ে উঠেছেন। এও হতে পারে, আবার এও হতে পারে যে আমার মূল্য কমে গিয়ে অম্বুজাক্ষবাবুর সমান হয়ে দাঁড়িয়েছে। হয় আমার মূল্যের 'ডিভ্যালুয়েশন' হয়েছে, অথবা অম্বুজাক্ষবাবুর দাম বেড়েছে পার্বতীর কাছে।
আমরা সরবত খেতে খেতেই আবার হৈ হৈ শব্দ শুনতে পেলাম। শিবাজী উঠে দাড়িয়ে বললে—চল ভাগনা, এখন ব্রাহ্মণ ভোজন হবে। আসুন অম্বুবাবু !
অম্বুজাক্ষবাবু ধীরে সুস্থে সরবতটুকু খেয়ে আবার সুরসুতিয়ার হাত থেকে জল নিয়ে হাত ধুয়ে আমাদের পিছন পিছন আসতে লাগলেন।
শিবাজীর সঙ্গে এগুতে এগুতে পিছন ফিরে দেখলাম অম্বুজাক্ষবাবু থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁর কাছে পার্বতী এসে দাঁড়িয়ে তাঁকে কি দু একটি কথা বলে আবার চলে গেল।
আমার মনে হল পার্বতী কি বলে গেল অম্বুজাক্ষবাবুকে ! কি এমন কথা থাকতে পারে যা পার্বতীর তাঁকে অমন পৃথকভাবে বলার দরকার হল ! অথচ বলতে গেলে পার্বতী তো চেনেই না অম্বুজাক্ষবাবুকে !
বাইরে তখন হৈ হৈ ব্যাপার !
বিরাট মণ্ডপে ব্রাহ্মণ ভোজনের জায়গা হয়েছে ! পুরি, তরকারী, কচৌরীর সঙ্গে দহি, চুড়া, লাড্ডু, বঁদে সহযোগে বিরাট ভোজন। ব্রাহ্মণরা নিজেদের মর্যাদা রক্ষা করে মুখে কোন শব্দ না করে নিঃশব্দে ভোজন সমাধা করে উঠে গেলেন। বিদায়ের সময় মণ্ডপের প্রান্তে মুণ্ডিত মস্তক শিবাজী হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে রইল। আর তাঁর পাশে অম্বুজাক্ষবাবু তাঁর কাপড়ের কোঁচার প্রান্তে কয়েক সের রেজগী নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। প্রত্যেককে নমস্কার করে তিনি আঁচলের খুঁট থেকে একটি করে সিকি বের করে প্রত্যেক ব্রাহ্মণের হাতে বিদায় হিসেবে বিতরণ করে গেলেন। বিদায় দেবার সময় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে উপবীত জড়িয়ে তিনি দান করলেন, যাতে ব্রাহ্মণরা বুঝতে পারেন তাঁরা

সম্মানীটা উপবীতধারী ব্রাহ্মণের কাছ থেকে, উপযুক্ত হাত থেকেই গ্রহণ করেছেন।

ব্রাহ্মণ ভোজন শেষ হল। সঙ্গে সঙ্গে শিবাজীর সেই বৃহৎ মুণ্ডিতমস্তক-বাহিনী অতি স্বল্পকালের মধ্যে মণ্ডপের উচ্ছিষ্ট পাতা পরিষ্কার করে, আবার গোবরজল ছিটিয়ে মণ্ডপকে পুনরায় ব্যবহারের উপযুক্ত করে তুললে।

তারপর সে এক মহা কাণ্ড!

আমি দূর থেকে দাঁড়িয়ে সমস্ত দৃশ্যটা দেখছিলাম। কোথা থেকে যে সামান্য কয়েক মিনিটের মধ্যে এত দুঃখী মানুষ এসে সমস্ত মণ্ডপটা অধিকার করে ফেললে তা বুঝতেই পারলাম না। কালো রঙ, ময়লা দেহ, মলিন মুখশ্রী, অপরিষ্কৃত অঙ্গে যৎসামান্য পরিচ্ছদ। কিন্তু তাদের প্রতিটি জনের মুখচ্ছবি আনন্দে উদ্ভাসিত। সে উদ্ভাসের কারণ মাত্র একটিই। ভাল খেতে পাবার প্রত্যাশা।

শিবাজী দাঁড়িয়ে ছিল হাত জোড় করে। এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের প্রত্যাশায় আমিও তার পাশে গিয়ে দাড়ালাম।

আজ উনিশ শো তিপান্ন সাল শিবাজীর সঙ্গে পথের মাঝে সাক্ষাতের আধুনিকতম অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত ঘটনাকে যথাযথ সাজিয়ে আনুপূর্বিক স্মরণ করতে করতে আমি একের পর এক সমস্ত খুঁটিনাটিকেই মোটামুটি হাতের কাছে পেয়ে যাচ্ছি। মোদ্দা কথা মোটা ঘটনাগুলো যেন একটা পুরনো, বহুদিন আগে দেখা ফিল্মের ছবির মত মনের মধ্যে আস্তে আস্তে প্রকাশিত হচ্ছে। যে অংশটা ঝাপসা দেখাচ্ছে বা বুঝতে পারছি না সেটা মনের অপর অংশ, যার নাম কল্পনা, সে আপনার স্বভাব ও রীতি অনুযায়ী বাকী ঘটনার সঙ্গে মানানসই করে রচনা করে নিচ্ছে। তাতে আস্বাদের ঘাটতি হচ্ছে না বিন্দুমাত্র।

স্মৃতি আর কল্পনা দুয়ের সম্মিলিত রচনায় যাকে আমি এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি সেই আঠাশ ত্রিশ বছরের আমি, চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবাজীর পাশে দাঁড়িয়ে আছি। শিবাজী হাত জোড় করে দরিদ্র নারায়ণের সেবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। তার দেখাদেখি আমিও কখন হাত জোড় করেছি।

হ্যাঁ, আমি আজও স্পষ্ট স্মরণ করতে পারছি আমিও শিবাজীর পাশে হাত জোড় করে দাঁড়িয়েছিলাম তখন।

আমি তখন স্বদেশী করি। তখন তিরিশ সালের আন্দোলন আসেনি। কিন্তু দেশের আবহাওয়ায় সকলের অলক্ষ্যে বিধাতা জনমানসে তারই বীজ বপন,

করছিলেন। নিজের দেশকে, নিজের দেশের মানুষকে, সর্বোপরি নিজেকে সম্মান করবার জন্য আমার মন যেন সেদিন গোপনে গোপনে প্রস্তুত হচ্ছিল। এর পিছনে অবশ্য আরও দুটো জিনিষ ছিল। বাংলাদেশ তখন ইতিমধ্যেই স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাকে আংশিক গ্রাস করেছে। তারও পিছনে ছিল ভারতবর্ষের চিরকালের সনাতন শিক্ষা। যত জীব তত শিব! সেই সংখ্যাতীত শিব মূর্তি দীন বেশে, মলিন দেহে আনন্দ-উদ্ভাসিত মুখে শিবাজীর জোড় হস্তের ও সশ্রদ্ধ চিত্তের সম্মুখে সেদিন আসন পেতে বসেছে সেবা গ্রহণ করবার জন্য। শিবাজীর পাশে জোড় হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমিও সেই মনটিকে নির্মলভাবে তার সম্পূর্ণ মূর্তিতে খুঁজে পেলাম নিজের কাছে।

শিবাজীর মুণ্ডিতমস্তক বাহিনী তাদের পরিবেশনের ভার গ্রহণ করেছিল। আর ব্রাহ্মণদের সঙ্গে দরিদ্র নারায়ণ ভোজনের ব্যাপারে খাওয়ার বিন্দুমাত্র তারতম্য করেনি শিবাজী। সেই পুরি, তরকারী, কচৌরী, দহি, চূড়া, লাড্ডু সবই যথোচিত পরিমাণে পরিবেশিত হতে লাগল।

তবে একটা ব্যাপারে শিবাজীর নিষেধ ছিল। সেটা আগেই তার বাহিনী শতমুখে চীৎকার করে জারি করে রেখেছিল। যে যত খাবে খাও, পেট ভরে, প্রাণ ভরে খাও কোন বাধা নেই। কিন্তু সঞ্চয় করা চলবে না, ছাঁদা বেঁধে যাওয়া যাবে না।

আমরা হাত জোড় করে দাঁড়াতেই অম্বুজাক্ষবাবু কেমন যেন গুটিয়ে গেলেন। আমাকে তিনি কিছু বললেন না। শিবাজীকে বললেন—বাবা, এইবার আমার ছুটি করে দেন।

শিবাজী একটু অবাক হল। বললে—এদের খাওয়ানোটা শেষ করে যাবেন না?

অম্বুজাক্ষবাবু একটু হাসলেন। আমাকে দেখিয়ে বললেন—এই তো চন্দ্রশেখর বাবু রয়েছেন আপনার পাশে! উনিই সাহায্য করতে পারবেন আপনাকে!

বলে জিজ্ঞাসা করলেন—তা আমি এখন এই রেজগীগুলো নিয়ে কি করব? বাড়ী নিয়ে যাব, না আপনাদিকে দিয়ে যাব?

শিবাজী সঙ্গে সঙ্গে বললে—বাড়ী নিয়ে যাবেন কেন? ওদেরও বিদায় দেব যেমন ব্রাহ্মণদের দিয়েছি! তা আপনি আর যখন থাকতে পারছেন না তখন রেজগীগুলো চন্দ্রশেখরকে দিয়ে যান। ও দিয়ে দেবে এদের খাওয়া হলে!

অম্বুজাক্ষবাবু আর কিছু না বলে আমার কোঁচাটা নিজে থেকে প্রসারিত করে নিয়ে তার কাপড়ের রেজগীগুলি আমার কাপড়ে ঢেলে দিয়ে নিজের কোঁচার খুঁটটা একবার আমাদের সামনে ভাল করে ঝেড়ে নিলেন। হয়তো রেজগীর

সঙ্গের ধুলোময়লা ঝেড়ে ফেলে নিজেকে আবর্জনামুক্ত করলেন ; নয়তো আমাদের দু জনকেই দেখালেন, দেখ ওই প্রচুর পরিমাণ রেজগীর একটিও আমি আত্মসাৎ করিনি।

তারপর যেন প্রয়োজন না থাকলেও হেসে বললেন—আমি তো আর তোমাদের মত জোয়ান মানুষ নই বাবা! আমার ষাট বছর বয়েস হল। তোমরা দরিদ্র নারায়ণ সেবা করাও। আমার কাজ ব্রাহ্মণভোজনের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে গিয়েছে। আমি এখন গিয়ে স্নান করে সন্ধ্যাহ্নিক শেষ করে শুয়ে পড়ব।

তিনি চলে গেলেন।

কিন্তু আমাদের চোখের সামনে তখন এক দীয়তাং ভুজ্যতাম ব্যাপার চলছে। সে না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। শিবাজী আমাকে বলেছিল ব্রাহ্মণদের যেমন ভাবে, যতখানি আদর করে খাওয়ানো হবে, দরিদ্র-নারায়ণদেরও ঠিক ততখানি উপকরণ দিয়ে এবং ততখানি সমাদর করে খাওয়ানো হবে। ওর বাহিনীকেও শিবাজী সেই রকম নির্দেশ দিয়েছিল। এবং আয়োজনও শিবাজী করেছিল সেই অনুযায়ী। এবং সেই আয়োজন নিয়েই দরিদ্র-নারায়ণ সেবা আরম্ভ হয়েছিল।

খাওয়া-দাওয়া আরম্ভ হবার কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই দাও দাও রবে সমগ্র আসর জমে উঠল। শিবাজী এতে খুশীই হয়ে উঠেছিল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই রব এতই উচ্চগ্রামে উঠল যে শিবাজী তার শ্রদ্ধা ও জোড় হাত এক মুহূর্তে পরিত্যাগ করে দাঁত কড়মড় করে উঠে হাতের কাছেই একজন ভিক্ষুকের একখানা লাঠি নিয়ে ছুটে সারিবদ্ধ নারায়ণের সারির মধ্যে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রথমেই সে যার উচ্চকণ্ঠ শুনতে পেলে তার কাছে ছুটে গিয়ে তার পিঠে সজোরে এক ঘা লাঠি বসিয়ে দিলে। লাঠির ঘা-খাওয়া নারায়ণটি অবশ্য শিবাজী মহারাজের লাঠির আঘাত শিরোধার্য করে কালো মলিন মুখের মধ্যে ঝকঝকে বড় বড় দুটো চোখ ও সাদা দাঁতের সারিতে ঝিলিক তুলে হাসতে লাগল।

শিবাজী হাতের লাঠিটা তুলেই রুষ্ট ভাবেই জিজ্ঞাসা করলে—এমন করে হল্লা করছিস কেন? চিলচ্ছিস কেন? কি হয়েছে কি তোর?

প্রহৃত নারায়ণ তার সমস্ত দাঁতগুলি বের করে বললে—আপ পুঁছতে হেঁ কিয়া হুয়া? দেখিয়ে হুজুর, সব কোইকো দো পুরি দিয়া তো হমকো দো পুরি দিয়া! ইসসে হমারা কিয়া হোগা?

—কেন? তুই ওই দুখানা রহড়ের ডাল দিয়ে খা! তোকে আবার দেবে! তুই যত খেতে পারবি তত দেবে!

ভোক্তার চোখ দুটো আরও বড় বড় হয়ে উঠল, আরও ঝকঝক করে উঠল আনন্দে। সে বললে—যেতনা খা শকেগা ওতনাহি দিজিয়ে গা! তো দেখিয়ে! বলেই সে সঙ্গে সঙ্গে অড়হরের ডাল মাখিয়ে পুরি দুখানা একসঙ্গে মুখে পুরে চিবুতে লাগল। বোধহয় এক মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে তার মুখ খালি হয়ে গেল। সে মুখ হাঁ করে খাদ্যকণাসম্পৃক্ত মুখ দেখিয়ে বললে—দেখিয়ে হুজুর, খা লিয়া! আব ফিন দিজিয়ে!

শিবাজীর পাশ দিয়েই তখন পুরির ঝুড়ি নিয়ে চামারিয়া পার হয়ে যাচ্ছিল। শিবাজী তাকে থামিয়ে বললে—এই চামারিয়া, এই বুদ্ধুর পাতে গুনে গুনে এক 'দর্জন' পুরি দিয়ে দে তো! আর ডাল দিতে বল!

সমগ্র মণ্ডপে তখন খাওয়ার প্রথম পর্যায় বেশ জমজমাট হয়ে শুরু হয়ে গিয়েছে। গোলমাল কমে এসেছে। কেবল একসঙ্গে অড়হরের ডাল সহযোগে সরস গ্রাস তোলার একটা সমবেত শব্দ বিচিত্র চেহারা নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছিল।

এখানে তখন ডাল এসে পড়ল।

এক হাতা দু' হাতা করে ডাল দিতে দেখে ভোক্তা হেসে উঠল। সে চোখ তুলে দেখলে বালতিতে ডাল খুব একটা বেশী নেই!

তার হাসি দেখে খানিকটা বিরক্ত হয়ে, আর খানিকটা কৌতুকের বশে শিবাজী বললে—সব ডালটা ঢেলে দেতো রে বুদ্ধুর পাতে!

লোকটা অবাক হয়ে শিবাজীর মুখের দিকে চেয়ে বললে—আপ কিয়া হমে পহচাস্তে হুজুর?

কথাটা বুঝতে পারলে না শিবাজী। বললে—তোকে আমি চিনব কি করে? কেবল তুই খুব খেতে পারিস এইটা বুঝতে পারছি!

পাতের রাশীকৃত ডালকে গুটিয়ে নিতে নিতে সে বললে—আপ হমারা নামসে হমে পুকারা কেইসে? হামারা নাম তো বুদ্ধু হ্যায়!

হা হা করে হেসে উঠল শিবাজী। বললে—তুম বুদ্ধু হ্যায় ইসি লিয়ে!

বুদ্ধুর নাম বুদ্ধু হলেও সে যে আসলে বুদ্ধু নয় তার প্রমাণ দিলে শিবাজীর সঙ্গে সমান তালে হা হা করে হেসে। ঘাড় নেড়ে বললে—আব সমঝ লিয়া হুজুর! বলতে বলতেই সে তার মলিনতা কলঙ্কিত হাতখানা লুচির গায়ে থাবার মত রেখে ছিঁড়তে লাগল।

ব্যস সেই আরম্ভ হল।

একটা খেলা জমে উঠল বুদ্ধুকে কেন্দ্র করে। শিবাজী তো দাঁড়িয়েই ছিল। আমিও কৌতুক দেখবার জন্যে সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। শিবাজীর

মুণ্ডিত-মস্তক বাহিনীর দু-তিন জন পরিবেশক হিসেবে আমাদের কাছে বুদ্ধুর সামনে দাঁড়িয়ে অবিরাম তাকে বিবিধ আহার্য জোগাতে লাগল।

খান পঞ্চাশেক পুরি রহড়ের ডাল ও কুমড়োর তরকারী সহযোগে গ্রহণ করে থামল বুদ্ধু। বললে—ব্যস, আউর নহি।

শিবাজী হেসে বললে—কেয়া? পঁচাশ পুরিসেহি হো গয়া? এহি তাগত তুমহারা?

পাতা থেকে পুরির অবশিষ্ট ছোট ছোট কুচিগুলি ভারী ভারী আঙুলের প্রান্ত দিয়ে এক করে মুখে তুলে তারপর ডাল আর তরকারীর শেষাংশ গভীর তৃপ্তির সঙ্গে আঙুলের মাথা দিয়ে পুঁছে তুলে চাটতে চাটতে বললে—জী হুজুর, পুরিকে কাম তো হো গয়া!

—আওর পুরি নহি চাহিয়ে?

—নহি হুজুর! পুরি কচৌরী, দাল, তরকারী আওর নহি চাহিয়ে। আব তো দহি চুড়া লড্ডু-উড্ডু খানে হোগা না?

আমরা সবাই হেসে উঠলাম। শিবাজী বললে—ব্যাটার নাম বুদ্ধু হলে কি হয় ব্যাটা আসলে মাথায় মহাবুদ্ধি ধরে। আমরা তো দহি-চুড়ার কথা শ্রেফ ভুলেই গিয়েছিলাম।

তারপর শিবাজী গলা তুলে বললে—নিয়ে আয় রে দহি-চুড়া, লাড্ডু নিয়ে আয়।

আঙুল দিয়ে পাতা চেটে চেটে দহি-চুড়া পর্বের জন্য প্রস্তুত করতে করতে বুদ্ধু বললে—হর রোজ তো হুজুর ভিখ মাঙ্‌নে হোতা হ্যায়। এইসা খানা কঁহা মিলতা? ইসি লিয়ে আজকে সব খবর তো হম পহেলেহি লে চুকা সরকার।

ওদিকে এই সময় মণ্ডপের এক কোণে কে সজোরে চীৎকার করে উঠল—এক দফে বলো ভাই রাম নাম সত্‌ হ্যায়!

ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র মণ্ডপ এক কণ্ঠে ধ্বনি দিয়ে উঠল—রাম নাম সত্‌ হ্যায়!

আবার সঙ্গে সঙ্গে একটি উচ্চ কণ্ঠে ধ্বনি উঠল—এক দফে ব'লো ভাই অমৃতলাল —জী কি—

'জী কী' বলে ঘোষক ছেড়ে দিলে। সে জানে এরপর কি উচ্চারিত হবে। সমবেত দরিদ্র-নারায়ণ এক কণ্ঠে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল।

একবারেই সে জয়ধ্বনি শেষ হল না। বার বার তিনবার সে জয়ধ্বনি উঠল।

তারপর আবার ধ্বনি উঠল—এক দফে বলো ভাই অমৃতলাল জী কি অক্ ছর স্বর্গবাস হো যায়—

সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনি উঠল—হো যায়!

আবার ধ্বনি—শেষ বার ব'লো ভাই রাম নাম সত হ্যায় !

সমবেত ভোক্তা আবার সঙ্গে সঙ্গে সেই শুভ নাম সমস্বরে উচ্চারণ করলে—রাম নাম সত্ হ্যায় !

বুদ্ধুও অবশ্য ধ্বনি দিতে ভুললে না।

শিবাজী তাকে প্রথম ধ্বনির পরই বললে—তুই আস্তে আস্তে আওয়াজ দে বাবা বুদ্ধু। না হলে তোর মুখ থেকে দহিচুড়া ছিটকে বেরিয়ে আসবে।

কালো রঙে দইলাগা ঠোঁট আর গাল মুছতে মুছতে বুদ্ধু বললে—হুজুর, হম বুদ্ধু ই তো ঠিক বাত হ্যায়, বাকি হম বেয়াদব নহি হুঁ !

গাল আর ঠোঁট মুছে মুখের ভিতরের খাদ্যপিণ্ড কোঁৎ করে গিলে বুদ্ধুও সমস্বরে জয়ধ্বনি দিলে এবং রামনামের সনাতনত্ব সম্পর্কে নিজের মত উচ্চারণ করলে।

অবশেষে খাওয়া শেষ হল।

শিবাজী বুদ্ধুকে জিজ্ঞাসা করলে—কি রে পেট ভরেছে ?

বুদ্ধু তখন হাঁ করে আছে, আর একজন মুণ্ডিত মস্তক সেবক তখন দন্তবিকাশ করে তার মুখে জল ঢেলে দিতে দিতে আপন মনে বলছে—ওরে বাবা, জল, তাই তুই কত খাচ্ছিস ! তোর পেটে এখনও জায়গা আছে।

জল খাওয়া শেষ হলে বুদ্ধু উচ্ছিষ্ট হাত যতটা জোড় করা যায় করে বললে—বহৎ হুয়া হ্যায় হুজুর ! পুরা জিন্দগীমে এইসা আচ্ছা নহি খায়া !

শিবাজী হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল। সে আমাকে বললে—চল ভাগনা, ওদের এখন পয়সা দিতে হবে। ওই মুখে গিয়ে দাঁড়াও।

তারপর সে প্রতিটি পংক্তির ভিতর গিয়ে হাত জোড় করে জনে জনে জিজ্ঞাসা করলে পেট ভরেছে কি না ! যেতে যেতে এক জায়গায় সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। একজন পাতে খাবার ফেলে রেখেছে। তাকে একদফা গালাগাল দিলে আর যারা পরিবেশন করেছিল তাদেরও গালাগাল দিলে চুটিয়ে।

আবার তাকে থামতে হল আর এক জায়গায়। একজন নারায়ণ নিবেদন করলে তার ক্ষুধা তখনও মেটেনি। সে আরও দুটো লাড্ডু খেতে চায়।

সঙ্গে সঙ্গে হৈ-হৈ ব্যাপার ! লাড্ডু আনার জন্যে হাঁক পাড়তে লাগল শিবাজী চারটা লাড্ডু লে আও।

লাড্ডু পরিবেশিত হলে সে আবার এগুতে লাগল। জনে জনে জিজ্ঞাসা করে সকলের পরিতৃপ্তির সংবাদ সংগ্রহ করে সে নিজেই শেষকালে চীৎকার করে উঠল—আওর একদফে বলো ভাই, রামনাম সত্ হ্যায় !

আবার প্রবল ধ্বনি উঠল—রামনাম সত্ হ্যায়।

আমি হাতে রেজগীর মুঠো নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। পরিতৃপ্ত নারায়ণরা একে একে আমার সামনে দিয়ে পার হতে লাগল। আমি প্রতিটি জনের প্রসারিত বাঁ হাতে একটি করে সিকি দিয়ে চললাম। আজও মনে আছে ক'টা উলঙ্গ ছেলে পেট ভর্তি খেয়েছে, পেটগুলো ফুলে ধামার মত কি পাম্পকরা ফুটবলের মত চেহারা নিয়েছে। মুখে, হাতে, বুকে, পেটে ডাল আর দইয়ের উচ্ছিষ্ট লেগে আছে। তারাও তাদের ছোট ছোট বাঁ হাতগুলো আমার সামনে প্রসারিত করে দিয়েছিল। আমি সযত্নে তাদের প্রতিটি জনের হাতে একটি করে সিকি দিয়েছিলাম। আরও মনে আছে একটা বাচ্চার হাত থেকে তার সিকিটা পড়ে যেতে সে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে তার সিকিটা কুড়োতে গিয়ে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল ধাক্কা খেয়ে। ছেলেটা পিছনের আগ্রহীদের পায়ের চাপে চাপা পড়ে মরে যেত যদি না শিবাজী প্রবল তেজে ছুটে এসে পিছনের লোকদের ধাক্কা দিয়ে হটিয়ে ছেলেটাকে মাটি থেকে টেনে তুলত। পিছনের প্রার্থীদের প্রবল তোড়ে গাল দিতে দিতে সে সেই বছর কয়েকের উলঙ্গ ছেলেটাকে মাটি থেকে তুলে নিলে। সে অবশ্য ইতিমধ্যে নিজের উচ্ছিষ্ট ডান হাত দিয়ে পড়ে-যাওয়া সিকিটা তুলে নিয়েছিল। সেটা আবার তার হাত থেকে পড়ে গেল। শিবাজী সযত্নে সেই এঁটো আর ধুলোয় চটচটে মুদ্রাটি তুলে তার হাতে সযত্নে ধরিয়ে দিয়ে তার হাত ধরে ভীড় পার করে তাকে রাস্তায় তুলে দিলে।

সেই সময়ের কথাগুলো ভাবতে ভাবতে শিবাজীর সেই মুহূর্তের ছবিটা আমি এখন পুরোপুরি খুব স্পষ্ট করে দেখতে পাচ্ছি। ওর ন্যাড়া মাথা, খালি গা, গায়ের উত্তরীয়টা প্রায় অঙ্গচ্যুত হয়ে রাস্তায় গড়িয়ে পড়েছে। ও কি গভীর যত্ন আর মমতার সঙ্গে সেই বছর কয়েকের উলঙ্গ, সর্বাঙ্গে উচ্ছিষ্ট, পেটমোটা ছেলেটার হাত ধরে রাস্তায় তুলে দিয়ে হেসে বললে—যা, চলে যা!

আমি স্বদেশী করি, দরিদ্র নারায়ণকে শ্রদ্ধা করি, সুযোগ পেলে সেবা করি। দরিদ্র ভাণ্ডার করেছি। সেখানে রবিবার রবিবার মুষ্টি ভিক্ষা সংগ্রহ করে গ্রামের দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করি। কিন্তু শিবাজীর সেদিনকার সেই ছবিটি থেকে তার যে অন্তরের যে মমতাকে আমি দেখতে পেয়েছিলাম সে মমতা আমি কোথায় পাব?

আমি তখন প্রতিটি জনের হাতে সিকি দিয়ে চলেছি। শেষ জনটিকে যখন দেওয়া হয়ে গেল, দেখলাম তখনও কিছু রেজগী রয়েছে।

মণ্ডপটা খালি হয়ে গিয়েছে। শিবাজীর বিশ্রাম নেই। সে হাঁক মেরে ডাকছে —চামারিয়া! এ চামারিয়া! আরে এ—

হাত জোড় করে মুখে এক মুখ হাসি নিয়ে চামারিয়া তার পাশ থেকেই মৃদুস্বরে বললে—আপি কা পাশ তো খড়া হ্যায় হুজুর!

তাকে দেখে আর একদফা গালাগালি দিয়ে সে বললে—হমারা পাশ খড়া হ্যায়? বুদ্ধু, কাঁহাকা, ইসব সাফা ক'রো। তুমলোগোকা ভোজন নহি হোগা?

ওদের কথা হতে হতে মুণ্ডিত মস্তক প্রাণীগুলি ততক্ষণে মণ্ডপে কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে। আমি মণ্ডপের প্রান্তে দাঁড়িয়েছিলাম। দেখলাম কয়েক মিনিটের মধ্যে বৃহৎ মণ্ডপের সব পাতা পরিষ্কার হয়ে গেল। তারপর আবার গোবর জলের ছড়া পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যেই খাবার পাতা পড়ে গেল। মুণ্ডিত মস্তক প্রাণীগুলি এবার সারিবদ্ধভাবে বসল পাশাপাশি। হালুইকরদের মধ্যে যারা ব্রাহ্মণ তারা আর এই দুসাদ, মুসহরদের খাওয়াতে এলনা। ব্রাহ্মণেতর বর্ণের যারা সহায়ক ছিল তারা পরিবেশন করতে এগিয়ে এল!

সমস্তক্ষণ শিবাজী দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। শিবাজী প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাদের জনে জনে খাওয়ার তদারক করলে। বিশেষ বিশেষ জনকে খাবার জন্য উৎসাহিত করলে। দু এক জনকে বললে—তুই লাড্ডু খেতে এত ভাল বাসিস তা খাচ্ছিস কই? খা! আরও দু চারটে লাড্ডু নে!

কাউকে পুরি, কাউকে দহি নেবার জন্যে বিশেষ অনুরোধ করলে। সকলেই হাসি মুখে লজ্জিত হয়ে মুখ নামিয়ে খেয়ে চলল। আমিও কাছেই দাঁড়িয়েছিলাম। এক একজন যে পরিমাণ খেলে তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। আমার তো ধারণা, আমি পনরো দিনে যে পরিমাণ খাদ্য খেতে পারি ওরা এক একজন সেই একবার বসেই তা পরমানন্দে গ্রহণ করলে।

শিবাজী শেষে আবার জিজ্ঞাসা করলে—আর কেউ কিছু নিবি না তো? দেখ! সকলেই মুখ নীচু করে বসে রইল। অর্থাৎ আর কারও কিছু লাগবে না!

শিবাজী শেষে আবার বিশেষ করে নিজের লেফ্‌টেন্যাণ্ট চামারিয়াকেই জিজ্ঞাসা করলে।

—কি রে চামারিয়া, আর কিছু লাগবে না তো?

চামারিয়া হাসি মুখে প্রায় হাত জোড় করে ঘাড় নেড়ে জানালে—না, আর কিছু চাই না তার।

ভোজন পর্ব শেষ হয়ে গেল।

শিবাজীর বাহিনী মণ্ডপ পরিষ্কার করতে আরম্ভ করলে।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে তখন। শরৎ কালের শেষ সন্ধ্যার আলো ম্লান হয়ে মিলিয়ে

গিয়েছে। তারই মধ্যে শিবাজী আমাকে ডাকলে—চল, ভাগনা। কাজ তো শেষ!

যাওয়ার আগে সে হেঁট হয়ে মণ্ডপ থেকে একটু মাটি তুলে নিলে। আমি বুঝলাম ব্যাপারটা। যে ভূমিতে তার পরমপ্রিয় দাদোজীর শ্রাদ্ধকর্ম সম্পন্ন হয়েছে, যেখানে ব্রাহ্মণ এবং দরিদ্র-নারায়ণ ভোজন হয়েছে সেখানকার পবিত্র মৃত্তিকাকে স্পর্শ করে পবিত্র হতে হবে বৈ কি!

এগিয়ে যেতে যেতে দেখলাম, সুরসুতিয়া রাস্তার উপর আবছা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। কেন দাঁড়িয়ে আছে তা বুঝতেও আমার ভুল হল না। দাঁড়িয়ে আছে শিবাজীর জন্য।

আমরা রাস্তায় গিয়ে উঠতেই সুরসুতিয়া শিবাজীর একখানা হাত ধরলে। হাত খানা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে শিবাজী বললে—আরে, ছুঁসনা ছুঁসনা এখন। সারা গায়ে 'ঝুটা' লেগে আছে। আগে স্নান করি, তারপর হাত ধরিস।

গোঁয়ার, জেদী মেয়েটা কিছুতেই তার হাত ছাড়লে না। বললে—নহি।

শিবাজী হেসে বললে—তুই জানিস খুনি, মধ্যে মধ্যে মহা মুস্কিল করিস। সারা গায়ে খুনি এখন ঘাম, ধুলো, ঝুটা লেগে আছে, তোর গায়েও লেগে যাবে। তা তুই এলি কেন?

—এলি কেন? আমি আর মা কি আজ না খেয়ে থাকব? খাব না?

শিবাজী অবাক হয়ে পথের উপরেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল। বললে—এ মা তোরা খুনি এখনও খাস নি? কি মুস্কিল বল দেখি!

সুরসুতিয়া তার হাতে ধরা হাতখানার উপর অন্য হাত দিয়ে চাপড় মেরে রেগে ভেঙিয়ে বলল—এ মা, তোরা খুনি 'হেখনো' খা-স' নি?

শিবাজী তার হাত ধরে টান দিয়ে হেসে বললে—চল, চল, আর রাগ করতে হবে না!

রাস্তা পার হয়ে বাড়ীর দরজার কাছাকাছি হতে দেখি দরজার মুখে সুরসুতিয়ার মা পার্বতী দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের দেখে সে মাথার ঘোমটাটা একটু টেনে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ভিতর চলে গেল। আমরা ওর পিছন পিছন বাড়ী ঢুকলাম। ওদের সম্পর্কে লরার কথাটা মনে পড়ে গেল আমার। লরা যা বলেছিল তা মিথ্যা নাও হতে পারে। আবার আমার স্বর্গত মামার কথাটাও একবার মনে হল। গল্প-উপন্যাস পড়ে পড়ে তোদের মাথায় কেবল ওই সব কথাই ঘোরে। তোরা ও ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারিস না!

কি জানি এ ক্ষেত্রে কোনটা সত্যি? এই যে সাগ্রহ প্রতীক্ষা এর অর্থ, সম্পূর্ণ

অর্থপ্রেম হতে পারে। কোন বাধা নেই তাতে। মানুষ মানুষকে কোথায় কখন কেমনভাবে ভালবাসে আমরা তার কতটুকুই বা জানি? আবার এ বিশুদ্ধ কৃতজ্ঞতাও হতে পারে! শিবাজী ওই মাতা-কন্যার রক্ষাকর্তা হয়ে তাদের অন্ন, বস্ত্র এবং আশ্রয় দিয়েছে তার কৃতজ্ঞতায় ওই মেয়েটি যদি তার জন্যে না খেয়ে তার খাবার জন্য প্রতীক্ষা করেই থাকে তবে তাকে প্রেম বলে ব্যাখ্যা কবা কি অসঙ্গত হবে না?

তবে এ সব ভাববার ক্ষণ ছিল না তখন। সারাদিনের অপরিমিত পরিশ্রমে দেহমন ক্লান্ত ছিল। আর এদিকে বাড়ীর ভিতর ঢুকেই শিবাজী হৈ চৈ বাধিয়ে দিলে। সে চীৎকাব করতে লাগল—এ সুরস্থতিয়া খুব তো আমাকে হল্লা তুলে ডেকে নিয়ে এলি? এখন আমাব কাপড়, গামছা, সাবুন সব দিবি তো শুনি? স্নান করতে হবে না?

সুরস্থতিয়ার কাছে এসে ওর মা যেন ওকে ঘোমটার ফাঁক থেকে কিছু বললে। সঙ্গে সঙ্গে সুরস্থতিয়া পাকা গিন্নীর মত বললে—তুমি অমন করে 'শোর মচিও' না তো বাবুজী! সোজা স্নানের ঘরে চলে যাও। দেখ সব দেওয়া আছে।

সুরস্থতিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা কবলে—আপনি 'আস্নান' করবেন না বাবুজী?

আমি হেসে বললাম—না। আমার স্নানের দবকাব নেই।

সুরস্থতিরার মা শিখিয়ে দিলে পিছন থেকে। সে বললে—ওই তো বাইরে চৌবাচ্চার কুয়োর ধারে 'বহত পানি' রয়েছে। আপনি হাত-পা সাবন করে নেন না!

হ্যাঁ, একটা কথার মত কথা বলেছে সুরস্থতিয়া। আমি তার কথা শিরোধার্য করে তোয়ালে নিয়ে হাত-পা ধুতে চলে গেলাম।

হাত-পা ধুয়ে এসে বারান্দার সিঁড়িতে যেখানে অম্বুজাক্ষবাবু চুপচাপ বসেছিলেন তাঁরই কাছে গিয়ে বসলাম। ভদ্রতার খাতিরেই জিজ্ঞাসা করলাম—কি, আপনার স্নান হয়ে গিয়েছে?

ধীর স্থির অম্বুজাক্ষবাবু একটু নড়ে চড়ে বসে একটু হাসলেন। খুব ধীরভাবে বললেন—হ্যাঁ বাবা, স্নান সন্ধ্যাহ্নিক সব হয়ে গিয়েছে। এখন তোমাদের জন্যে বসে আছি।

আমি অনুভব করলাম, ভদ্রলোক এই সময়ের মধ্যে নিজের মনে মনে আমার আর শিবাজীর বেশ খানিকটা কাছে এগিয়ে এসেছেন। উনি এখানে এসে আমাদের দুজনকেই 'আপনি' বলে সম্বোধন করতে করতে এখন এই অল্প সময়ের মধ্যেই 'তুমি' বলে সম্বোধন করতে আরম্ভ করেছেন।

শিবাজী এই সময় স্নান সেরে বেরিয়ে এল। বেরিয়ে আসতে আসতেই সে প্রায় হল্লা লাগিয়ে দিয়েছে। সে চেঁচাচ্ছে—এ স্বরস্বতিয়া, কঁহা রে, খানা কঁহা ?

বারান্দায় ভারী ভাবী পিঁড়ি পেতে তিনটে জায়গা ইতিমধ্যেই করা হয়ে গিয়েছে। আমরা গিয়ে বসলাম। পুবি, ডাল, তরকারী, লাড্ডু ভরে পাতা নামিয়ে দেওয়া হল। দিলে পার্বতীই। সেই সঙ্গেই একটি করে ছোট ছোট লোটা।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—লোটায় কি আছে ?

শিবাজী লোটার পানীয় সর্বাগ্রে গলায় ঢালতে ঢালতে থমকে গিয়ে হা হা করে হেসে বললে—খেয়ে নাও ভাগনা। সরবত। ভাঙের সববত। খিদেও জমবে, রাত্রে ঘুমও হবে খুব ভাল।

আমি লোটা সবিয়ে রেখে দিলাম। বললাম—না, মামাসাহেব, এ চলবে না আমার ! খেলে আমি পাগল হয়ে যাব।

ওদিকে অম্বুজাক্ষবাবু লোটাব পানীয় পুবোপুবি শেষ কবে পুবি আব ডালে হাত দিয়েছেন।

ওরা দুজনেই প্রচণ্ড আহাব কবলেন।

আমি যৎসামান্য খেয়ে উঠে পড়লাম।

পার্বতী আর স্বরস্বতিয়া দাঁডিয়ে ছিল কাছেই। স্বরস্বতিয়া বললে—আপ তো কুছ নহি খায়া বাবুজী।

স্বরস্বতিয়ার মাথায় হাত বুলিয়ে বললাম—আমার হয়ে তুমি খাও স্বরস্বতিয়া। আমার খুব ঘুম পেয়েছে ! আমি শুতে চললাম।

স্বরস্বতিয়া সঙ্গে সঙ্গে লণ্ঠন হাতে বললে—চলিয়ে তব উপর !

মা যেমন ঘুমকাতুরে ছেলেকে বিছানায় শোয়াতে নিয়ে যায় তেমনি করে আলো হাতে আগে আগে চলল দশ বছরের স্বরস্বতিয়া, আর আমি ঘুম ভরা চোখে তার পিছন পিছন সিঁড়ি উঠতে লাগলাম।

মামার শোবার ঘরে পেঁৗছে মামার খাট দেখিয়ে দিয়ে স্বরস্বতিয়া পাকা গিন্নীর মত বললে—আজতো আর 'মিট্টিতে' কম্বল পেতে শুতে হবে না। আজ দাদোজীর খাটেই আপনি আর বাবুজী শোবেন।

দেখলাম মামার খাটে পাশাপাশি দুটি পরিচ্ছন্ন বালিশ। যেন কোন দম্পতির শয্যা রচনা করা হয়েছে পরিপাটি করে। অথচ এই খাটেই আমার অবিবাহিত সন্ন্যাসীকল্প মাতুল তাঁর সারা জীবন একা কাটিয়ে গিয়েছেন। আমার মনে

পড়ল, আমি যখন ছোট ছিলাম তখন মায়ের সঙ্গে মামার বাড়ী এসে কতদিন মামার সঙ্গে মামার পাশে শুয়ে কাটিয়েছি।

ঘুমে আমার চোখ জড়িয়ে আসছিল। আমি দরজার সামনেই যে বালিশটা সেটা শিবাজীর জন্যে ছেড়ে রেখে তার পাশের বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘুম যেন চোখের পাতার উপরেই বসেছিল। শোবার সঙ্গে সঙ্গে চোখ ঘুমে জড়িয়ে এল। সেই ঘুম-জড়ানো আচ্ছন্নতার মধ্যেই শুনতে পেলাম স্বরস্বতিয়া পাকা গিন্নীর মত বকে যাচ্ছে। বলছে এখন গরম আছে। পায়ের কাছের এই জানলাটা খুলে রেখে দিলাম। কিন্তু ভোর রাত্রিতে ঠাণ্ডা লাগবে। দুজনের পায়ের কাছে চাদর রাখা থাকল। 'জাড়া' লাগলে চাদর গায়ে দেবেন। আর বাবুজী যখন শুতে আসবেন তখন দুজনের জন্যে 'পানি' রেখে যাব। আর বাতি কমিয়ে রেখে যাব।

স্বরস্বতিয়ার শেষ কথাগুলো আমি কানে শুনেছিলাম, না আমিই ওর কথার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে নিজে মনে মনে রচনা করে নিয়েছিলাম তা আমার মনে নেই। স্বরস্বতিয়া ঘরে থাকতে থাকতেই আমি বোধহয় গাঢ় ঘুমে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। ওদের সিদ্ধির সরবত আমার দরকার হয়নি। সারাদিনের পরিশ্রম আর ক্লান্তিই আমাকে স্নেহাতুরা জননীর মত ঘিরে ধরেছিল।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। কেন ঘুম ভাঙল তা বলতে পারি না। ঘুম ভাঙতেই শুনলাম কানের পাশে শিবাজীর নাক জয়ঢাকের মত ডেকে চলেছে। এই নাসিকা ধ্বনিতেই ঘুম ভেঙেছে তাহলে! আমি চুপ করে বিছানায় শুয়ে রইলাম। চোখের সামনে পায়ের ওপারে খোলা জানলা দিয়ে নিকষ কালো আকাশের একটা টুকরো দেখা যাচ্ছে। মনে হল কালো ভেলভেটের উপর কে যেন হীরের কুচি বসিয়ে রেখেছে। আমি গরীবের ঘরের ছেলে। কোন সুন্দরীর কণ্ঠের জন্য ভেলভেটের বাক্সে হীরের মালা আমি দেখিনি। তবু ওই উপমাই আমার মনে এল।

শুয়ে শুয়ে বেশ কিছুক্ষণ কয়েকটি তারায় খচিত কালো আকাশের সেই টুকরোটি চেয়ে চেয়ে দেখলাম।

চারিদিক নিস্তব্ধ। তারই মধ্যে বহু বহু দূরের ওই সৌন্দর্য দেখতে দেখতে আমার চোখের সামনে আমার ঘরের জানলার ফ্রেমে ধরা-পড়া ওই তারায় তারায় খচিত কালো আকাশের টুকরোটিকে আমার বড় আপনার জিনিষ মনে হতে লাগল।

অনেকক্ষণ সেই দিকে তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে বিছানা থেকে নেমে কমানো লণ্ঠনের অতি মৃদু আলোয় জলের গ্লাস খুঁজে জল খেলাম। জলের খালি গ্লাসটি নামিয়ে রেখে আবার শুতে যাব মানুষের গলার স্বর শুনতে পেলাম। হঠাৎই। প্রথমটা মনে হল আমার মনের ভুল। তারপর কান পেতে রইলাম কিছুক্ষণ। হ্যাঁ! কারা যেন কথা বলে যাচ্ছে! খুব কাছেই কারা কথা বলছে। হ্যাঁ! কথা বলছে কারা, আর সে কথা ছেদহীন। একজনের কথা থামলেই অন্যজন কথা বলছে!

কিন্তু কোথায়? আমি আরও কান পেতে শুনতে লাগলাম কোথা থেকে শব্দটা সঠিক আসছে আবিষ্কারের চেষ্টায়! শুনতে শুনতে মনে হল শব্দটা আসছে নীচে থেকে।

আমি লণ্ঠনটা আরও একটু কমিয়ে যথাসম্ভব শব্দ না করে আস্তে আস্তে অনেক সময় নিয়ে ঘরেব ভারী খিলটা খুলে প্রায় নিঃশব্দ পদক্ষেপে বাইরের বারান্দায় বেবিয়ে এলাম। বাবান্দায় দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ চুপ করে। কান পেতে রইলাম। হ্যাঁ ঠিকই। নীচের তলায় একজন পুরুষ আর একজন স্ত্রীলোক কথা বলছে। একজন থামলে অন্যজন কথা বলছে।

এ কারা? নীচে তো আছে অম্বুজাক্ষবাবু আর পার্বতী! তাহলে কি অম্বুজাক্ষবাবুব সঙ্গে কথা বলছে পার্বতী? এই বাত্রিব নিঃশব্দ গোপনতার মধ্যে ওই দুইজন অপরিচিত ভিন্ন বয়সেব পুরুষ ও স্ত্রীলোকের কি কথা থাকতে পারে?

যদি ওঁরাই কথা বলছেন তাহলে সে নিশ্চয়ই একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার? এর হেতু কি?

আমি আস্তে আস্তে বারান্দাব রেলিংয়ের ধারে এগিয়ে গিয়ে রেলিংয়ে দু হাতের কনুইয়ের ভর দিয়ে নীচের দিকে ঝুঁকে দেখলাম।

হ্যাঁ, যা ভেবেছিলাম তাই।

নীচের বারান্দা থেকে উঠোনে নামবার জন্যে যে দুটো সিঁড়ি আছে তারই উঁচুটায় বসে আছেন অম্বুজাক্ষবাবু, আর তার নীচের সিঁড়িটায় তাঁব পায়ের কাছে বসে আছে পার্বতী। দুজনে আলাপের মধ্যে মগ্ন।

আমি ঝুঁকে পড়েছিলাম প্রথমটায়। তারপর নিজের মাথাটা বারান্দার ভিতর দিকে টেনে আনলাম। খানিকটা অন্যায় বোধ হতে লাগল। এ যেন আড়ি পেতে পরের কথা শুনছি, যেখানে প্রবেশের আমার বিন্দুমাত্র অধিকার নেই; যে গোপনতার মধ্যে প্রবেশ করার চেষ্টা আমাব পক্ষে অন্যায় এবং অসঙ্গত দুইই।

তবু আমি কৌতূহল সম্বরণ করতে পারলাম না। আমি আড়ি পেতে ওদের কথা শুনতে লাগলাম।

ঠেঁট হিন্দীতে কথা হচ্ছে ওঁদের দুজনের মধ্যে। তবু আমি মোটামুটি বুঝতে পারছিলাম ওঁদের কথাবার্তা। অম্বুজাক্ষবাবু গভীর মমতার ও আবেগের সঙ্গে বলছিলেন—তুই কিছু ভাবিস না বেটি, তুই আমার সঙ্গে চলে চল তোর মেয়েকে নিয়ে। আমি গরীব আদমি। তবু আমি নিজের বেটিকে চারটি খাওয়াতে পারব না?

অম্বুজাক্ষবাবু চুপ করলেন।

আমি অনুমান করলাম এবার পার্বতী কথা বলবে। পার্বতী এর উত্তরে কি বলে শুনবার জন্যে গভীর আগ্রহে আমি আবার ঝুঁকে পড়লাম রেলিংয়ের উপর।

দেখলাম পার্বতীর মাথার ঘোমটাটা খসে পড়ে গিয়েছে। সে দিকে যেন ওর কোন লক্ষ্যই নেই। অম্বুজাক্ষবাবুর পায়ের উপর সে একটি হাত রাখলে। আমার মনে হল নিজের হাতখানি দিয়ে যেন ওই বিশেষত্বহীন অতি সাধারণ এক প্রৌঢ়কে সে তার সব সমাদর ঢেলে দিলে। তাঁর পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বললে—নহি বাবুজী, ওইসা মৎ বোল না! ও কথা বলবেন না! আমি এখানে খুব ভাল আছি। আপনাকে বলছি, আমি এখানে যেমন আছি, পৃথিবীর আর কোথাও এত ভাল থাকব না! আপনি ওই শিব্‌জী বাবুসাহাবকে জানেন না। অমন আদমি হয় না। উ একদম দেওতা! আমি আমার মেয়ে নিয়ে ওঁর আশ্রয় ছেড়ে যাব না। আপনিও বলবেন না আমাকে।

অম্বুজাক্ষবাবু ওর কথার কোন জবাব দিলেন না। তিনি কেবল গভীর যত্নে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে চললেন।

আমার খুব আশ্চর্য লাগল। সেই সঙ্গে সমস্ত ব্যাপারটা আরও দুর্বোধ্য হয়ে উঠল।

পার্বতী অম্বুজাক্ষবাবুর বেটি? মানে কন্যা? কিন্তু তা কি করে হয়? অম্বুজাক্ষবাবু আমার মামা অমৃতলাল গাঙ্গুলীর পিসতুতো ভাই! তিনি তো ব্রাহ্মণ! আর এই তো কাল না পরশু পার্বতী হঠাৎ সুরস্মৃতিয়াকে 'রাজপুতানী' বলে সম্বোধন করেছিল!

তাহলে?

আমি আবার তাকিয়ে দেখলাম নীচের দিকে। পার্বতী অম্বুজাক্ষবাবুর পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে আর অম্বুজাক্ষবাবু তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন।

একেবারে ঠিক পিতা-পুত্রীর সম্পর্ক !

আমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটা যত দুর্বোধ্যই মনে হোক, পিতা-পুত্রীর মত এই গোপন স্নেহ ও সমাদর বিনিময় আমার ভারী ভাল লাগল।

মধ্য রাত্রিতে নারী পুরুষের কাছে বা পুরুষ নারীর কাছে একটি মাত্র প্রয়োজনেই আসে এই এতদিন পর্যন্ত জানা ছিল। আজ একটা নূতন জিনিষ জানলাম। এই বিশ্বসংসারে অন্তত আজ এই একবার তার অন্যথা হতে দেখলাম।

এ গোপন দৃশ্য আর বেশীক্ষণ দেখা উচিত নয় বিবেচনা করে আমি বারান্দা থেকে আবার নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলাম। নিজেদের আলাপের মধ্যে ওঁরা দুজনে এত মগ্ন যে আমি ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে আবার ঘরে ঢুকে গেলাম এ সম্পর্কে ওরা কেউ কোন খেয়ালই করল না।

এর কারণটাও আমি বুঝতে পারলাম। এর কারণ হল বিশ্বাস। শিবাজী পার্বতী আর তার কন্যাকে সেই অরণ্যভূমি থেকে এখান পর্যন্ত, এবং প্রথম আশ্রয় গ্রহণের দিন থেকে আজ পর্যন্ত নিজের আশ্রয়ের মধ্যে স্থাপন করে এমন এক আশ্চর্য বিশ্বাসের পরিমণ্ডল রচনা করে তারই বেষ্টনীতে ওদের রক্ষা করছে যে এখানে ওদের জীবনযাত্রার একটি মুহূর্তকেও ওরা বিন্দুমাত্র সন্দেহ করে না।

আমি আবার বিছানায় নিজের জায়গায় শুয়ে পড়লাম। একটু গা শির শির করছে বলে পায়ের কাছ থেকে চাদরটা গায়ে টেনে নিলাম।

কানের পাশে শিবাজীর নাকের ডাক আরও বেড়েছে। জয়ঢাকের বাদ্য এখন যেন রণ দামামার ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। আমি চোখের সামনে জানলার দিকে আকাশের নিকষ কালো ফ্রেমের মধ্যে বসানো হীরের কুচির দিকে চেয়ে চোখ বন্ধ করলাম।

পনেরো

যে কাজের জন্যে এসেছিলাম সে কাজ শেষ হয়ে গেল।

এবার কুঞ্জভঙ্গের পালা।

সকাল থেকেই শিবাজীর বাহিনী নূতন উদ্যমে যে মণ্ডপ রচনা করেছিল সেই মণ্ডপকে আবার মাঠে পরিণত করবার কাজে লেগে গিয়েছে। তারা সামিয়ানার দড়ি কেটে তেরপল নামাচ্ছে, বাঁশের ও শালের বল্লার খুঁটি-তুলে ফেলছে।

আমার মনে একটা কাজের কথা ঘুরছিল।

শিবাজী একবার বাইরের কাজ কাম দেখে নিয়ে বাড়ীর ভিতর বারান্দায় চৌকিতে অনেক সব 'পূজা' নিয়ে বসেছে চামারিয়ার সঙ্গে। বুঝলাম দুজনে এই মহাসমারোহের শ্রাদ্ধকর্মের হিসেব করতে বসেছে। যেমন শিবাজী, তেমনি তার লেফ্‌টেন্যান্ট চামারিয়া! দুজনেই তো হিসেবের শুভঙ্কর। আমি গিয়ে বসলাম ওর কাছে।

ও কাগজপত্র সরিয়ে চামারিয়াকে একটা ধমক দিয়ে বললে—এ, তুমহারা ইসব পূর্জা-উর্জা কাগোজোয়া হঠাও রে বুদ্ধু!

নিজের পাশ থেকে কাগজপত্র সরাতে সরাতে জায়গা করে দিয়ে আমাকে বললে—বৈঠ্‌ যাও ভাগনা। আরাম করো! হমারা ভি কাম হো গিয়া!

—কি কাজ? হিসেব? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

—হাঁ! ব্যস, পুবাই হিসাব তো হো গয়া।

—কত খরচ হল?

—ঢাই হাজার সে থোড়া উধার!

—থোড়া উধার মানে। কত বেশী?

—সওয়া শও রুপেয়া!

এই সময় চামারিয়া মাথা চুলকে বিনীত হাসি হেসে বললে—থোড়া তো গলত্‌ হো গয়া হুজুর!

ধমকে উঠল শিবাজী-- গলত? কেয়া গলত?

চামারিয়া ওর তিরস্কার মাথা পেতে নিয়ে বললে—হুজুর আওর দো দফে খরচা তো উসকে সাথ জোড়নে হোগা?

আরও চড়ে উঠল শিবাজী—কৌন্ দু দুফে গিধধর?

—বর্তন-উর্তন মোলনা বিশ রুপেয়া, আওর আপকা আওর হামলোগোকো জঙ্গল লৌটনা, উভি সমঝিয়ে করিফ পঁচাশ রুপেয়া! দোনো জোড়কে উ আপকো ঢাই হাজার সে জাস্তি দো শও হো যায়েগা!

শিবাজী বললে—ব্যস, ব্যস, তব তো হো হি গয়া! কেতনা রুপয়া থা? তিন হাজার না? ব্যস তব তো সব কুছকে বাদ তিন শও রহ গিয়া!

আমি একটু হাসলাম। শিবাজীর মানসিকতাকেও চিনতে পারলাম। ওর খরচ খরচা বাদে হাতে তিনশো টাকা রয়ে গেল তাতেই ওর আনন্দ! আনন্দটা বোধহয় উদ্বেগ কেটে গিয়ে স্বস্তি থেকে সঞ্জাত। হিসেব-নিকেশের মানুষ নয় শিবাজী। হৈমহাম, ধুমধাম করে কাজ করে বেড়ানো ওর স্বভাব। এসব

টাকাকড়ির হিসেবে ওর বোধহয় মনে মনে মহা ভয় আছে। তাই এই স্বস্তি আর আনন্দ!

আমার হিসেবে ভুল হয়নি। ও কাগজপত্র সব দু হাত দিয়ে চামারিয়ার দিকে ঠেলে দিয়ে দু হাত তুলে সোৎসাহে চীৎকার করে উঠল—ব্যস হো গয়া!

আমিও তার সঙ্গে হেসে উঠলাম।

শিবাজী আমাকে জিজ্ঞাসা করলে—তুমি হাসছ ভাগনা?

—হাসছি বই কি! হাসছি তোমার হিসেব করার কায়দা দেখে!

—কাহে? কেন তুমি খুনি এমন কথা বলছ?

আমি কোন জবাব দিলাম না, আবার হাসলাম।

শিবাজী আমাকে বুঝিয়ে বললে—দেখ ভাগনা, এই কাজের জন্যে আমি তিন হাজার টাকা ধরে রেখেছিলাম। তাতে তোমার তিন শও রুপেয়া বেঁচে গেল। খুশী হব না?

আমি উৎসাহ দিয়ে তার পিঠে চাপড় মেরে বললাম—জরুর! কিন্তু আমার যে একটা কথা ছিল। কথা কেন, কাজই বলতে পার!

শিবাজী গম্ভীর হয়ে তার সমস্ত মনোযোগ আমাকে দিয়ে বললে—বাতাও ভাগনা!

—তোমার জানাশুনো কোন উকীল আছে?

—ওকীল? ওকীল কিয়া হোগা?

শিবাজীর প্রশ্নের উত্তরে আমি কোন কথা না বলে আমার সম্পত্তি সম্পর্কে যে দানপত্রের মত একটা না-দাবীর চিঠি তৈরী করে রেখেছিলাম সেখানা ওর হাতে তুলে দিলাম।

লেখাপড়া করা, কাগজপত্র নাড়াচাড়া করা এসব ঠিক শিবাজী মহারাজের ধাতে আসে না। ভাঁজকরা কাগজখানা হাতে নিয়ে সেখানা না খুলেই শিবাজী জিজ্ঞাসা করলে—এটা আবার কি ভাগনা?

বললাম—খুলেই একটু চোখ বুলিয়ে দেখ না বাবা!

শিবাজী বাধ্য হল কাগজখানা খুলে পড়তে। পড়তে এবং ব্যাপারটা পড়ে বুঝতে তার বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল। তাতেও সে যে সব ব্যাপারটা বুঝতে পারলে বলে আমার মনে হল না। সে কাগজখানা আবার ভাঁজ করে বন্ধ করে হাতে ধরেই বললে—বেশ তো হল, তুমি লিখে দিলে! লিখে দেব বলছিলে, লিখে আমাকে দিয়ে দিলে! আমি এ কাগজখানা খুনি খুব যত্ন করে রেখে দেব, তা হলেই তো হল?

আমি ঘাড় নেড়ে বললাম—না, তা হলেই হল না !

অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে শিবাজী বললে—তাহলে আবার কি করতে হবে ?

বললাম—ওই এক টুকরো সাদা কাগজে আমি লিখে দিলাম আর তুমি মামার জমি আর সম্পত্তির ওপর দখল পেয়ে গেলে এ আইনের চোখে টিঁকবে না। এ রীতিমত দানপত্র করে রেজেষ্ট্রী করে দিতে হবে।

শিবাজী অন্যদিক থেকে এর বিরোধিতা করে গলা তুলে বললে—টিকবে না মানে ? আমাকে দাদোজীর সম্পত্তি তুমি লিখে দিলে আর আমি তার দখল পাব না ? এ তুমি খুনি কি বলছ ? ঝাপড় মারকে সিধা বনা দেঙ্গে !

আমি রাগ করে ওর হাত থেকে আমার লেখা কাগজখানা কেড়ে নিয়ে বললাম—তাহলে এই 'ফার্সে' দরকার নাই। তুমি যা ভাল বোঝ ক'রো !

শিবাজী আমার রাগ দেখে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে—তোমার গোস্‌সা হল ভাগনা ?

আমি বললাম—তুমি ব্যাপারটা না বুঝলে আমি আর গোস্‌সা না করে কি করব বল ? আর একটা কথা। আমি হয়তো কাল-পরশু চলে যাব। আবার আসব কি না, কি এলে কখন আসব তার কি কোন ঠিক আছে ?

একটু চুপ করে থেকে বললাম—আরও একটা কথা তোমাকে বলি মামা, তুমি শুনে রাখ ! 'ঝাপড়' মেরে অনেক কাজ হয়। ওই সাদা মাটা, লেখাপড়া-না-জানা দেহাতী লোকদের ঝাপড়ের ভয় দেখিয়ে কাজ করিয়ে নিতে পার। কিন্তু আর একদল লোকও যে আছে সংসারে ! যারা ঝাপড়কে 'আকল' মানে বুদ্ধি দিয়ে আটকাতে জানে, হারাতে জানে। তারা তোমার পেছনে লাগলে তো তুমি একেবারে হেবে ভূত হয়ে যাবে !

শিবাজী আমার মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বললে—ঠিক হ্যায়, তবে খুনি চল, উকীলের কাছেই চল !

—তোমার চেনা উকীল আছে ?

আমার কথা শুনে হা হা করে হেসে উঠল শিবাজী। হাসতে হাসতে বললে—এ তুমি খুনি কি একটা কথা বললে ভাগনা ? আমার চেনা ওকীল নেই ? আমার বাবা ত্রৈলোক্যনাথ গয়ার সেরা ওকীল ছিলেন। গয়ার তামাম ওকীল বাবার চেলা। চল, এখুনি তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি 'অওধেশ' বাবুর কাছে !

অচেনা নামটা শুনে ভারী ভাল লাগল। বললাম—ভারী সুন্দর নাম তো !

শুনে খুব খুশী শিবাজী। যেন সেই 'অওধেশ' ভদ্রলোকের 'অওধেশ'. নাম॥

হওয়ার সব গৌরবটাই তার। সে হা হা করে হেসে বললে—ওঃ, সাচ বোলা ভাগনা! উনকে নাম হ্যায় অওধেশ কুমার নারায়ণ সিনহা। বুঝলে খুনি ভাগনা, অওধেশবাবু খুনি বাবার জুনিয়ার ছিলেন। আজকাল খুনি গয়ার সবসে বড়া ওকীল! আভি চলো, তুমকো উনকো পাস লে চলে!

বললাম—তাই চল তা হলে।

শিবাজী সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। বললে—নাও তুমি কুর্তা চড়িয়ে নাও। হম ভি এক কুর্তা চড়া লে!

আমরা দুজনে হাঁটতে হাঁটতে অওধেশবাবুর বাড়ীর গেটে পৌঁছুলাম।

তখন উনিশ শো আঠাশ উনত্রিশ সাল। তখনকার দিনের কেতা আর রীতির মত বড়লোকের বাড়ী। অনেকখানি জমি দেওয়াল দিয়ে ঘেরা, কাঠের গেট। গেটের গায়ে থামের ওপর একদিকে লেটার বক্স, অন্যদিকে কাঠের সাইনবোর্ডে ইংরেজী হরফে লেখা—বাবু অওধেশ কুমার নারায়ণ সিনহা, এম. এ. বি. এল, এডভোকেট।

গেটের গায়ে দারোয়ান বসেছিল। শিবাজীকে দেখে একমুখ হেসে সেলাম করে উঠে দাঁড়াল খইনি ডলতে ডলতে। শিবাজীও একমুখ হেসে তার পিঠে একটা চাপড় মেরে ওখানকার ঠেঁট হিন্দীতে তার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ফেললে।

আমি মনে মনে কেমন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। আমার শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত মন কেমন অস্বস্তি ও বিব্রত বোধ করছিল। এ কেমন ব্যাপার শিবাজীর! সে এসেছে এ বাড়ীর মালিক উকীল সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে। তার পরিবর্তে সে তাঁর দারোয়ানের সঙ্গে বন্ধুর মত সমানে ব্যবহার করে আড্ডা জমিয়ে বসল!

আমার অবাক হওয়ার তখনও কিঞ্চিৎ বাকী ছিল।

শিবাজী দারোয়ানজীর হাতের দিকে চেয়ে হেসে চোখ টিপে বললে—কিয়া, বনা হুয়া হ্যায়?

—জি সরকার। বলে দারোয়ানজী হাত খুলে সযত্নে পিষ্ট খৈনির কিছু অংশ তার হাতে সসম্ভ্রমে তুলে দিলে। শিবাজী সেটুকু সযত্নে নিয়ে নীচের দাঁত আর ঠোঁটের মধ্যে অবলীলাক্রমে পুরে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—ওকীল সাব হ্যায় তো?

দারোয়ান বাকী খৈনীটুকু গালে দিয়ে সসম্ভ্রমে বললে—জী সরকার। আপ চলা যাইয়ে সিধা!

—কাল ভোজন কইসা হুয়া?

—আচ্ছা, বহত আচ্ছাহি হুয়া হুজুর। সাহাবকা সাথ কোই জরুরী কাম হ্যায় তো জলদি যাইয়ে। উ তো থোড়া বাদ উঠ যায়গা!

আমরা তাড়াতাড়ি গেট পার হয়ে, কাঁকরের রাস্তার উপর দিয়ে কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙে ঘরের দরজার কাছে দাঁড়ালাম। দরজার কাছে দাঁড়াতেই ফরাসপাতা চৌকীর মাঝখানে প্রবীণ কাঁচা-পাকা-চুল এক ভদ্রলোক মুখ তুলে চাইলেন। শিবাজীকে দেখে হাস্যোদ্ভাসিত মুখে তিনি ডাকলেন—আরে আও, আও, আ যাও শিউজী মহারাজ! জলদি আও!

শিবাজী হাত জোড় করে নমস্কার করে বললে—নমস্তে দাদাজী!

—আও, আও, বৈঠো! ইয়ে তুমহারা সাথ কোন্ হ্যায়?

আমিও নমস্কার করেছিলাম ইতিমধ্যেই। শিবাজী আমার পরিচয় দিলে—ইয়ে তো মেরা দাদোজী, অমৃতবাবুকা ভাঞ্জা! নাম চন্দ্রশেখর ব্যানার্জী!

প্রতি নমস্কার করে তিনি আমাকেও একটি সদয় হাসি উপহার দিলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন—কাল অমৃতলালজীর শ্রাদ্ধ তো ভাল করে হয়ে গিয়েছে?

শিবাজী আবার হাত জোড় করে হেসে বললে—আপকা কৃপাসে সব তো অচ্ছাহি হি হো গয়া!

আরও কয়েকজন মক্কেল বসেছিল। দেহাতী লোক। তাদের সঙ্গে বোধহয় ওকীল সাহেবের কথা কাজ হয়েই গিয়েছিল। তিনি তাদের ইঙ্গিত করতেই তারা নমস্কার করে উঠে দাঁড়াল। তারা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই তিনি শিবাজীকে জিজ্ঞাসা করলেন—কিয়া খবর বাতাও শিউজী!

শিবাজী তার বক্তব্য বলতে আরম্ভ করল। সে কয়েকটা কথা বলবার পরই আমি অনুভব করলাম, হয় শিবাজীর মাথায় এসব বুঝবার বুদ্ধি-সুদ্ধি একেবারে নেই নয়তো তার চিত্ত একান্তই অবৈষয়িক। বুঝতে পারলাম, ও ঘণ্টা ভোর বকে গেলেও আসল কথাটা অনুক্তই থাকবে। তাই তার হড়বড় করে আবোল-তাবোল কথা বলার মাঝখানে আমি বাধা দিয়ে অওধেশবাবুকে সবিনয়ে বললাম—আপনি অনুমতি দিলে আমি ব্যাপারটা বলি!

কথাটা আমি আমার আশ্চর্য হিন্দীতেই বলেছিলাম। তাতে প্রবীণ অওধেশবাবু হেসে বললেন—আপনি বাঙলাতেই বলুন। আমি বাংলা বেশ ভালই জানি। আমি শিউজীর বাবা ত্রৈলোক্যবাবুর জুনিয়র ছিলাম। আপনার মামা অমৃতবাবুকে দাদার মত খাতির করতাম। আমি বঙ্কিমচন্দর, রবীন্দরনাথ, শরৎবাবুর বই পড়েছি। পড়িও। আপনি আরামসে বাংলায় বলুন! কোই ফিক্‌র্‌ নহি!

আমি গলা ঝেড়ে বললাম—আমি অমৃত্ বাবুর একমাত্র বোনের একমাত্র সন্তান। আমার মামার আর কোন ভাই ছিল না। কাজেই মামার যা কিছু বিষয় সম্পত্তি আছে তার একমাত্র আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারী আমি। ওঁর কি বিষয় সম্পত্তি আছে আমি সঠিক জানি না। তবে ওঁর যা বিষয় সম্পত্তি আছে তার আইনসঙ্গত অধিকারী আমি হলেও আমি তার কোন কিছু নিজে নিতে চাই না। সে সমস্তই আমি শিবাজী মামার নামে লিখে দিতে চাই!

আমাব কথা শুনে বিচিত্র দৃষ্টিতে প্রবীণ অওধেশবাবু আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেযে আস্তে আস্তে প্রশ্ন করলেন —কেন? এ রকম অভিপ্রায় আপনার কেন হল আমাকে বলবেন? আমি উকীল, আমার কাছে পরামর্শের জন্যে এসেছেন বলেই জিজ্ঞাসা করছি।

সে দৃষ্টিতে আমি অবশ্য বিন্দুমাত্র বিব্রত হইনি। তবে দেখলাম শিবাজী কেমন বোকার মত হাসছে। যে শিবাজী অহরহ নায়কের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে হৈ চৈ করে সে এই মুহূর্তে গ্রহীতাব অস্বস্তিকর ভূমিকায় দাঁড়িয়ে কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত বোধ করছে। আমার স্বদেশী-করা স্বভাব, তরুণ বয়স, আমি অকুতোভয়ে বললাম—আমি আমার স্বর্গত মামার ইচ্ছা জানি। তিনি তাঁর সব সম্পত্তি শিবাজীকেই দিতে চেয়েছিলেন!

সঙ্গে সঙ্গে অওধেশবাবু চোখ বড় বড় করে বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন—আচ্ছা! অমৃতবাবু কোন উইল করে গিয়েছেন?

আমি ঘাড় নেড়ে বললাম—না। তবে আমি তাঁর অভিপ্রায়ের কথা জানি। আর—

আমার মুখের কথা প্রায় কেড়ে নিয়ে তিনি বললেন—আর?

আমি হেসে বললাম—আর আমার নিজেরও কিছু বিষয় সম্পত্তি আছে!

উনি আবার আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বিস্মিতভাবে চোখ বড় বড় করে বললেন—আচ্ছা! কোন্ কিসিমকে? কি রকম? তালুকদারী?

বললাম—হাঁ! আমাদের বাংলাদেশে বলে জমিদারী। আমার কিছু জমিদারী সম্পত্তি, কিছু জমি, বাগান, পুকুর এইসব আছে!

—আপনার জমিদারীর আয় কত?

—বছরে হাজার চারেক টাকা! তাছাড়া জমিজমা আছে।

অওধেশবাবু চোখ বড় বড় করে বার কয়েক আচ্ছা, আচ্ছা বলে ঘাড় নাড়তে লাগলেন। তারপর বললেন—ভাল, ভাল। কিন্তু সম্পত্তি কি কারও কখনও বেশী মনে হয়? আপনার আছে বলে আপনি আপনার আইনসঙ্গত অধিকার ছেড়ে দেবেন? এ কেমন কথা?

আমি হেসে বললাম—আমার কিছু বিষয় আছে বলেই আমি বুঝতে পারছি বিষয় রক্ষা করা খুব কঠিন। আমার বাড়ী বীরভূম জেলায়। আমি সেখানে বসবাস করি। সেখান থেকে এসে এই মামার উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পত্তি আমার পক্ষে রক্ষা করাও সম্ভব নয়। আর তাছাড়া মামার এই বিষয় আমি ভোগ করি এও আমার অপুত্রক মামার অভিপ্রায় ছিল না। সুতরাং এ সম্পত্তি আমি কেন নেব ?

বলতে বলতে আমি পকেট থেকে যে কাগজখানায় শিবাজীকে মামার সব সম্পত্তি দিয়ে দিচ্ছি বলে খসড়া করেছিলাম সেখানি তাঁব হাতে তুলে দিলাম। তিনি বাংলা জানেন বলেই আমাব তাঁকে কাগজখানি অসংকোচে দেওয়া সম্ভব হল।

কাগজখানি তাঁর হাতে তুলে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে বসাব অবসর ও মন দুইই পেয়ে গেলাম। আমি এতক্ষণ তাঁর জেবাব মধ্যে কেবল অনুভব করছিলাম যেন আমার এই কাজের অন্তবালে তিনি আমার উদ্দেশ্যকে বেশ সহজভাবে দেখতে পাবছেন না। আমাব এই সৎ ও সহজ উদ্দেশ্যকে সন্দেহ করছেন। তাঁব সন্দেহ কোন্ পথ ধরে চলাফেরা করছিল বলতে পাবি না, তবে সন্দেহ করছেন এটা বার বার আমার মনে হচ্ছিল।

আমি দেখলাম কাগজখানি তিনি তীক্ষ্ণ মনোযোগেব সঙ্গে ভুরু কুঁচকে পড়ছেন। বুঝলাম একবার পড়ে তিনি সেখানি আবাব দ্বিতীয় বার পড়লেন। তারপর বললেন—হুঁ।

তারপর আমার মুখের দিকে মুখ তুলে চাইলেন। তাঁর মুখ প্রসন্ন হৃদ্য হাসিতে তখন ভরে উঠেছে। তিনি আমাকে বললেন—আপনি শুধু দিলদার আদমী নন, কাবিল বিচক্ষণ লোক আপনি। অবিশ্যি আপনি বয়সে তরুন। তবুও বলছি।

আমি এই প্রবীণ মানুষটির কাছ থেকে প্রশংসা পেয়ে মাথা নীচু করলাম।

শিবাজী কিন্তু হৈ হৈ করে উঠল। বললে—আপনি খুনি ঠিক বলেছেন দাদাজী! ভাগনা আমার বহত কাবিল আদমী!

শিবাজীর উচ্ছ্বাস দেখে একটু হাসলেন অওধেশবাবু। আমাকে বললেন—আপনি শিউজীর বাবা ত্রৈলোক্ বাবুকে দেখেছিলেন ?

আমি বললাম—খুব অল্প বয়সে মামার বাড়ী এলে মামা ওঁদের বাড়ী বেড়াতে নিয়ে যেতেন, তখন দেখেছি। কিন্তু তার কিছু মনে নেই।

অওধেশবাবু বললেন—ত্রৈলোক্‌বাবু একাধারে বড় উকীল, বড় পণ্ডিত ছিলেন।

সেই সঙ্গে সাধু-মহাত্মা আদমী ছিলেন। তা ওঁর চার ছেলের মধ্যে কেউ তাঁর সব গুণগুলো পায়নি। কেউ কেউ লেখাপড়া শিখেছে। কিন্তু তাদের দেখে মনে হয় ওদের লেখাপড়া না শিখলেই ভাল ছিল। লেখাপড়ায় ওদের গুণের চেয়ে অব্‌গুণ হয়েছে! তবে হ্যাঁ, ওঁর পুরো চরিত্রটা আমাদের শিউজী পেয়েছে। সেদিকে শিউজী একজন সাধু-মহাত্মা আদমী। তবে বাউরা। জানেন চন্দ্রশেখরবাবু, এই জন্যেই শিউজীকে এত বেশী খাতির করি।

তারপর হাসতে হাসতে বললেন—আজ অবিশ্যি শিউজীর উপযুক্ত এক ভাগনাকেও দেখতে পেলাম। এই ধরনের লোক এখনও সংসারে আছে বলেই এখনও সংসার চলছে। নইলে দুনিয়া এতদিনে শয়তানের আখড়া হয়ে যেত।

বলে তিনি এ কথায় ছেদ টানলেন। নিজের প্রশংসা শুনতে, বিশেষ এমনি ধরনের একজন অভিজ্ঞ, পরিপক্ক ও শিক্ষিত মানুষের মুখ থেকে আস্বাদন করতে খুব একটা খারাপ লাগছিল না। আমি মাথা নীচু করেই সসম্ভ্রমে তাঁর কথা শুনছিলাম। ইতিমধ্যে আড়চোখে দেখেছি শিবাজী একান্ত প্রসন্ন মনে হাসছে।

অওধেশবাবু বললেন—চন্দ্রবাবু, আপনি লিখেছেন তো ভালই, কিন্তু এতে তো চলবে না! প্রথম কথা কোর্ট থেকে আপনার নামজারী করতে হবে, তালুকদারের সেরেস্তায় রায়ত হিসেবে আপনার নামে জমার পত্তন করতে হবে। তারপর আপনার শিউজীর নামে দানপত্রের দলিল করে, রেজেস্ট্রী অফিস থেকে রেজেস্ট্রী করতে হবে। এ সবের জন্যে সময় লাগবে। শিউজীর ব্যাপার যখন তখন আমি সবই করিয়ে দেব। আমি বরং এদিকে কোর্টের কাজগুলো করি, আর সেই সঙ্গে দান-পত্রের দলিলটা তৈরী করে দি। আপনি বরং দিন সাতেক থেকে যান। তার মধ্যে আমি সবটাই করে দেবার চেষ্টা করব।

তারপর হঠাৎ আচমকা তিনি ডাকলেন—শিউজী!

শিবাজী বোধহয় অন্যমনস্ক ছিল। সে চমকে জবাব দিলে—জী!

—অমৃত্‌বাবুর শ্রাদ্ধে কতটাকা খরচ করলে?

চমকেই ছিল শিবাজী। আমতা আমতা করে বললে—ঢাই হাজার সে জাস্তি দোও শো রূপেয়া!

—এতনা রূপেয়া কাঁহাসে মিলা? তুমহারা পাশ থা? না, তুমহারা বিজনেশকি 'ক্যাপিটেল'-সে তোড়কে খরচা কিয়া? না 'উধার' কিয়া?

শিবাজী খানিকটা থমকে গেল।

একটু চুপ করে থেকে বলল—আমার বহত রূপেয়া, করিফ সাত হাজার রূপেয়া

কলিয়ারীতে আটকে রয়েছে দাদাজী! তাড়াতাড়িই পেয়ে যাব বলে ভেবেছিলাম। কিন্তু পেলাম না। তখন তো ধার করতেই হল!

অওধেশবাবু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শিবাজীর মুখের দিকে চেয়ে বললেন—কত ধার করেছ?

—তিন হাজার রূপেয়া!

—কার কাছ থেকে ধার করেছ?

চুপ করে রইল শিবাজী। একটু চুপ করে থেকে বললে—লালা ঢনঢন শা'কে পাশ!

অওধেশবাবু অনেকক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন—সুদ কত করে?

—মাহিনেমে চার পয়সা!

অওধেশবাবু মুখটা বিকৃত করলেন। বললেন—তার মানে বছরে টাকার বারো আনা সুদ! তুমি আমার কাছে এসে বললে না কেন তোমার তিন হাজার টাকা চাই। আমি তোমাকে দিতাম।

একটু চুপ করে থেকে বললেন—এক মাসের মধ্যে যদি তুমি তোমার কোলিয়ারীর পাওনা না পাও তা হলে আমার কাছে এসে তুমি তেত্রিশ শো টাকা নিয়ে লালাজীর ধার মিটিয়ে দেবে। বুঝলে! তারপর তোমার নামে জমি রেজেস্ট্রী হলে এক বিঘে কি দু বিঘে জমি অমৃতলালজীর জমি থেকে বিক্রী করে ধার মিটিয়ে দেবে। সমঝা

—জী! বাধ্য ছেলের মত উত্তর দিলে শিবাজী।

অওধেশবাবু আমার খসড়া করা কাগজখানা হাতে ধরে বললেন—এখানা আমি রাখলাম। শিউজী, তুমি অমৃতলালজীর সম্পত্তির লিস্ট, সেটেলমেণ্ট পরচা সব আমাকে কাল দিয়ে যাবে।

আকাশ থেকে পড়ল শিবাজী! বললে—উ সব কাঁহাসে মিলেগা?

অওধেশবাবু বললেন—উ সব তো জরুর মিলনা চাহিয়ে। অমৃতলালজীকে বক্সা উক্সা দেখো, জরুর মিলহি যায়েগা!

অওধেশবাবু উঠে পড়লেন। বললেন—আমার আদালত আছে। আমি উঠলাম।

আমরাও উঠলাম।

ওঁর বাড়ীর সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মনে হল উনি আমাদের সজ্জন বলে সমাদর করলেন যথেষ্ট। কিন্তু উনি কি আমাদের চেয়ে কম সজ্জন?

আমরা এসে রাস্তায় পড়লাম।

শিবাজীর মাথায় মাথায় ভাবনা। সে যে অনেক কিছু ভাবছে তা তার মুখ দেখেই বুঝতে পারলাম। অথচ অওধেশবাবুর সঙ্গে কথা বলে আমি যেমন শিবাজীর অবস্থাটাও সঠিক বুঝতে পারলাম তেমনি সব মুস্কিলের সহজ আসানের রাস্তাটা স্পষ্ট দেখতে পেয়ে নিশ্চিন্তই হয়েছিলাম। তাই শিবাজীর চিন্তিত মুখ দেখে কৌতুক করে জিজ্ঞাসা করলাম—কি, তোমার আবার এখন কি ভাবনা এসে মাথায় ঢুকল ?

শিবাজী অত্যন্ত বিপন্ন মুখে বললে—আচ্ছা, ভাগনা, তুমিই বল তো, ভাইজী তো ওঁর কাছ থেকে আমাকে টাকা নেবার কথা বলে দিলেন, কিন্তু আমি তা কি করে নেব বলতো ?

আমি অবাক হয়ে বললাম—কেন, বাধাটা কিসের ?

খুব চিন্তিত ও বিপন্নভাবে শিবাজী বললে—উনি টাকা দিয়ে তো সুদ-সয়দা কিছুই নেবেন না ভাগনা ?

আমি এক মুহূর্তে শিবাজীর অন্তরের আর একটি অভিজাত মূর্তি দেখতে পেলাম। যে কারও কাছে কোন কিছু চাইতে চায় না! আমি বললাম—তাতে কি হয়েছে ? তুমি তো আর নিজে থেকে কারও কাছে কিছু চাইতে যাওনি! কিন্তু একটা কথা মামাজী, তোমার হাতে যখন টাকা ছিল না তখন তুমি ধার করে মামার শ্রাদ্ধে এতটাকা খরচ করতে গেলে কেন ?

শিবাজী আবার উৎসাহিত হয়ে যেন প্রায় জ্বলে উঠল। বললে—এ তুমি কি বললে ভাগনা ? দাদোজীর মত মানুষ, তাঁর মৃত্যু হল, তার শ্রাদ্ধে খরচ করব না ? ওঁর মৃত্যু তো আর বার বার হবে না। ওঁর ছেলে নেই বলে ওঁর শ্রাদ্ধ হবে না ভাল করে ? আর তুমি দূরে রয়েছ। তোমার পক্ষেও ঝটপট এখানে এসে কিছু করা মুস্কিল। আর বলতো ওঁর শ্রাদ্ধে আমি কিই বা করেছি। ব্রাহ্মণ ভোজন আর দরিদ্র নারায়ণ সেবা করিয়েছি। আর টাকা তো আমার আছেই। আজ হোক, কাল হোক পেয়েই যাব!

এ পাগলকে বুঝাই কি করে ? ওকে কি করে বুঝাই যে যার হাতে টাকা নেই সে অন্যের কাছে চড়া সুদে টাকা ধার করে হৈ চৈ করতে যায় কেন, যাবে কেন ? তাই বললাম—তা হলেও মামা, কিছু মনে ক'রো না, ধার করে এই খরচ করাটা ঠিক কাজ হয়নি!

শিবাজী খুব ব্যথিত হয়ে বললে—এ তুমি কিন্তু ঠিক কথা বলছ না ভাগনা। তুমি দাদোজীর ভাগনা হয়ে খুনি, এইসা বাত বলবে।

আমি জোর দিয়ে বললাম—হ্যাঁ বলব। এবং বলছি। যাই হোক, টাকাটা অওধেশবাবু যেভাবে বললেন, সেইভাবে শোধ দেবার ব্যবস্থা ক'রো। আর একটা কথা! তুমি বাড়ী গিয়ে এখুনি মামার বাক্স-টাক্স খুলে ওঁর সম্পত্তির কাগজপত্র সব বের কর। সেটেলমেণ্ট রেকর্ডসও খুঁজে বের করতে হবে। এ সব তাড়াতাড়ি করা দরকার। যত দেরী হবে, আমি তত বেশী আটকে যাব।

শিবাজী কাতর হয়ে বললে—ভাগনা, আমি তো খুব একটা লিখিপড়ি আদমি নই। আমি এ সব কিছু বুঝি না, জানিও না। তুমি যা হয় কর!

—চল তো বাড়ী চল!

বাড়ী ফিরেই শিবাজীকে জিজ্ঞাসা করলাম—মামার বাক্সের সব চাবি কোথায়? আমার প্রশ্নে বিব্রত হয়ে পড়ল শিবাজী। তাকে অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই উদ্ধার করলে পার্বতী। ঘোমটা টেনে আমাদের কাছে এসে মেঝের উপর সে এক থোলো চাবি নামিয়ে দিলে।

আমি দেখে বললাম—ওই দেখ চাবি! মামাজী, তোমার ভাগ্যি ভাল তুমি এমন একজন ফুফাজী পেয়েছ!

চাবির থোলো নিয়ে শিবাজীকে বললাম—এস।

আমরা উপরে মামার ঘরে ঢুকলাম। এই ঘরেই তো শুচ্ছি আমরা। আমাদের খাটের এক পাশে দেওয়াল ঘেঁসে সারি সারি তালাবন্ধ বাক্স তোরঙ্গ সাজানো আছে। আমরা বাক্সগুলো টেনে মেঝের মাঝখানে এনে নামিয়ে একটার পর একটা চাবি লাগিয়ে খুলে ফেললাম।

প্রথম বাক্সটায় শুধু জামা-কাপড় খানিকটা তুলে পরখ করেই সেটা বন্ধ করে দিলাম। আমি জানি আমার মামার স্বভাব অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি ছিল। তারই আবার প্রমাণ পেলাম জামা কাপড়গুলি গুছিয়ে রাখার ভঙ্গি থেকে।

দ্বিতীয় ট্রাঙ্কটা খুলতেই যা চাইছিলাম সব পেয়ে গেলাম। টোয়াইন সুতো দিয়ে বেঁধে কাগজ পত্র থরে থরে সাজানো। আর এক একটি প্যাকেটের মাথায় একটি করে কাগজ সাঁটা। প্রথম প্যাকেটের মাথায় লেখা—বাড়ীর জমির দলিল। দ্বিতীয় প্যাকেট ধানের জমির দলিল এবং সেটেলমেণ্ট পরচা।

সেগুলো অমনভাবে দেখে আমার যত ভাল তত আশ্চর্য লাগল। যেন আমার অন্তর্যামী মামা সব আগে থেকে জেনে বুঝে জিনিষগুলো অমনভাবে গুছিয়ে রেখে গিয়েছেন আমাদের জন্যে। প্যাকেট দুটি তুলে শিবাজীর হাতে দিলাম।

দিতেই আরও বিচিত্রতর জিনিষ দৃষ্টিগোচর হল। প্রথমেই একখানি চিঠি। খামে বন্ধ। তার উপরে লেখা—চন্দ্রশেখর ও শিবাজীর জন্য। চিঠিখানি তুলে শিবাজীর হাতে দিয়ে বললাম—ধর।

এ আমরা যেন সমুদ্র মন্থন করছি। একের পর এক রত্ন উঠে আসছে বাক্স থেকে। খামখানি সরে যেতেই একটি খবরের কাগজে জড়ানো, টোয়াইন সুতো দিয়ে বাঁধা মোটা প্যাকেট উঠে এল। উপরে কাগজ সাঁটা। তাতে লেখা শ্রীমান চন্দ্রশেখরের জন্য। একমাত্র শ্রীমান চন্দ্রশেখর ছাড়া ইহা কেহ খোলা দূরে থাকুক স্পর্শ করিবে না। ভিতরে কি জিনিষ আছে তা কিছু বুঝলাম না। কারণ সে সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই। তার নীচে আর চিহ্নিত কোন সামগ্রী নেই। আছে সুতো বাঁধা চিঠির বাণ্ডিল।

প্রথমেই শিবাজীর হাত থেকে আমাদের দুজনের নাম লেখা চিঠিখানা নিয়ে তাকে বললাম—চিঠিখানা খুলছি মামাজী ?

—নিশ্চয়, নিশ্চয়! শিবাজী বললে সঙ্গে সঙ্গে। বুঝলাম তার এ্যাডভেঞ্চার-পিয়াসী মন ভিতরে ভিতরে আমার থেকে অনেক বেশী উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। খামখানা একটা পাতলা চাবির পিছন দিয়ে আস্তে আস্তে যত্ন করে খুলে ফেললাম। তার থেকে একটি গোটা গোটা হস্তাক্ষরের ছোট্ট চিঠি বেরিয়ে এল। মামারই হাতের লেখা। মাথার উপরে লেখা চন্দ্রশেখর ও শিবাজীর জন্য। গভীর কৌতুহলের সঙ্গে পড়তে লাগলাম—বাবা চন্দ্রশেখর, আমার সমস্ত সম্পত্তি আইনসম্মতভাবে তোমারই পাওনা। কিন্তু তোমাকে অনুরোধ করি, তুমি এর ওপর কোন দাবী রেখোনা বা ক'রো না। এ সমস্তই আমি শ্রীমান শিবাজীকে দিয়ে গেলাম। তোমাকে না দেবার কারণ দুটি। তোমার নিজেরই যথেষ্ট আছে। আর সুদূর বীরভুম জেলা থেকে এসে এখানকার ভূসম্পত্তির উপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত রাখা কঠিন হবে তোমার পক্ষে। শেষ পর্যন্ত তুমি এ সম্পত্তি পেলেও বিক্রী করে দিতে বাধ্য হবে। অথচ তা আমি চাই না। দ্বিতীয় কারণ হল, তোমার মন আমি জানি। বোধহয় ভাল করেই জানি। সে মনের ছায়া আমার নিজের মনেই দেখতে পাই। তোমার এ বিষয়ের উপর কোন লোভ নেই বলেই আমার ধারনা। আর তোমার নির্লোভ মনের পক্ষে এ সম্পত্তি দায়স্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে।

তাই এ সম্পত্তি তোমার স্থলে শিবাজীকেই দিয়ে গেলাম। শিবাজীকে দেবার কারণও দুটি। প্রথম কারণ তোমার পরিবর্তে শিবাজী এ সম্পত্তি ভাল করেই রক্ষা করতে পারবে। এ সম্পত্তির উপর তার মমতাও থাকবে। একান্ত বাধ্য

না হলে এ সম্পত্তি সে বিক্রয় করবে না বা নষ্ট করবে না। দ্বিতীয় কারণ হল পার্বতী ও স্বরস্বতিয়া। আমি তাদের জন্যই আরও বিশেষভাবে এই সম্পত্তি শিবাজীর হাতে দিয়ে গেলাম। আমি আমার দুই ভগিনীর বিবাহ ও তারপর পিতামাতার পর সারাজীবন একাকী ও নিঃসঙ্গভাবে কাটিয়ে এসেছি। বিবাহ করি নাই। কিন্তু জীবনে কোন অনাচার করি নাই। জীবনে কোনদিন অবশ্য স্নেহ-মমতার আস্বাদও পাই নাই। আজ দুই বৎসর পূর্বে শিবাজী স্বরস্বতিয়ার ইংরেজী স্কুলে পড়ার সূত্রে শিবাজী পার্বতী ও স্বরস্বতিয়াকে আমার বাড়ীতে রাখার প্রস্তাব করে। তখন আমি উপরোধে ঢেঁকি গেলার মত শিবাজীর অনুরোধ না ফেলতে পেরে ওদের আমার বাড়ীতে রাখতে সম্মত হই। আমার বাড়ীতে ওদের রাখার পর আমার ওদের সম্পর্কে এবং পুরো জীবন সম্পর্কে ধারণা সম্পূর্ণ বদলে গেল। চন্দ্রশেখর, তুমি কিছু কিছু লিখবার চেষ্টা কর আমি জানি। তাই তোমাকেই বিশেষভাবে বলছি, ওদের দুজনকে পেয়ে তুমি এবং শিবাজী আমার কাছে নিষ্প্রভ হয়ে গেলে। ওদের স্নেহে ও মমতায়, সেবায় ও শ্রদ্ধায় আমার নিঃসঙ্গ, শুষ্ক জীবন সরস ও সঞ্জীবিত হয়ে উঠল। তাই ওদের কথাই সবচেয়ে বেশী করে চিন্তা করে আমার সম্পত্তি ও ওদের দুজনের ভার শিবাজীর হাতে দিয়ে গেলাম। তোমরা দুজনে সর্বান্তকরণে আমার প্রস্তাব সমর্থন ক'রো।

আমি চিঠিখানা জোরেই পড়েছিলাম। শিবাজীও সবটা শুনেছিল। পড়া হয়ে গেলে খামের মধ্যে আবার চিঠিখানি পুরে খামটি শিবাজীর হাতে দিলাম। বললাম—দেখলে মামাজী, আমি কেমন আমার মামার মনের কথা জানতাম। চিঠিখানা কিন্তু যত্ন করে রেখো। এইটাই মামা অমৃতবাবুর উইল।

শিবাজী অদ্ভুত মানুষ। সে বললে—এটা ভাগনা, তুমিই রেখে দাও। আমি কোথায় হারিয়ে-টারিয়ে ফেলব।

আমি গম্ভীর ভাবে বললাম—আচ্ছা, এটা আজ আমিই রাখলাম। কাল অওধেশবাবুকে অন্য কাগজপত্রের সঙ্গে এই কাগজখানাও দিতে হবে।

তারপর একবার করে অন্য প্যাকেট দুটো খুলে তার মধ্যে কি কাগজপত্র আছে তা ভাল করে দেখে নিয়ে আবার সুতো বেঁধে বন্ধ করলাম। শিবাজীকে বললাম—আর কোন ভাবনা নেই। যা যা কাগজপত্র লাগবার তা সবই এই সঙ্গে রইল। দেখা যাচ্ছে মামার নগদ টাকা-কড়ি কিছু ছিল না।

হঠাৎ আমার কি খেয়াল হল আমি শিবাজীকে বললাম—একবার ফুফাজী পার্বতীকে ডাক তো মামাজী!

শিবাজী উপরের বারান্দার রেলিং থেকে গলা তুলে ডাকলে—ফুফাজী, একদফে উপর আইয়েগা ?

হাতের হলুদ আর জল কাপড়ে মুছতে মুছতে পার্বতী উপরে উঠে এল। স্বরস্বতিয়াও উঠে এল তার পিছনে পিছনে।

শিবাজীর অনুমতি নিয়ে আমি পার্বতীকে প্রশ্ন করলাম—আচ্ছা ফুফাজী, আমার কোন দোষ নেবেন না। আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করব আপনাকে ?

আঁচলে হাত মুছতে মুছতে পার্বতী আমার মুখের দিকে পরিষ্কার করে চেয়ে বললে—বাতাইয়ে !

জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা, ফুফাজী, আমার মামা অমৃতবাবু আপনাকে কোন টাকাকড়ি দিয়ে যাননি কখনও ?

পরিষ্কার দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে পার্বতী বললে—নহি তো !

আমি একটু লজ্জিত হাসি হেসে বললাম—ঠিক আছে ফুফাজী ! আপনি যান !

মাথার ঘোমটাটা একটু টেনে দিয়ে পার্বতী সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল। স্বরস্বতিয়া উঠে এসেছিল মায়েব সঙ্গে। সে কিন্তু গেল না। দাঁড়িয়েই রইল। পার্বতীর পদশব্দ সম্পূর্ণ মিলিয়ে যেতে স্বরস্বতিয়া মুচকি হেসে জিজ্ঞাসা করলে—মাকে কি জিজ্ঞেস করছিলেন ? দাদোজী মাকে টাকা দিয়েছে কি না !

এই বাচ্চা মেয়েটা মধ্যে মধ্যে অত্যন্ত পরিপক্কের মত কথা বলে ও ব্যবহার করে। সেটা আমার সব সময় ভাল লাগে না। আমি কিঞ্চিৎ বিরক্ত দৃষ্টিতে ওর দিকে চাইতেই আমার দৃষ্টির ইংগিতটা বুঝে নিয়ে স্বরস্বতিয়াকে মৃদু ধমক দিলে—তুই বাচ্চা, তোর এসব কথায় কি দরকার রে স্বরস্বতিয়া ?

স্বরস্বতিয়া আমাদেব কথায় ও বিরক্তিতে ঠোঁট উলটে আতুরীর মত হাসল। তারপব বললে—ঠিক হ্যায় ! আমি আর কিছু বলছি না ! জানলেও না !

শিবাজী বললে—কি জানিস তুই ?

মেয়েটা আবার পাকা বুড়ীর মত বললে—আপনিই তো এখুনি কথা বলতে বারণ করলেন ! তাহলে ? তাহলে আপনি আবার বলতে বলছেন কেন ?

জেদী, তেজী মেয়েটাকে বশ করা খুব কঠিন। শিবাজী হাত বাড়িয়ে খপ করে তার হাতটা ধরে কোলের কাছে টেনে এনে তাকে দু-হাতে বেড়ে ধরে আদর করে বললে—তুই তো লক্ষ্মী মেয়ে ! তুই অমন করছিস কেন ? বল না যদি কিছু জানিস !

তার কোলের বেষ্টনীর মধ্য থেকে স্বরস্বতিয়া বললে—মা কি করে জানবে ? মা কিছুই জানে না ! দাদোজী আমার হাতে একটা থলে দিয়েছিল লুকিয়ে।

বলেছিল, মাকে বলিসনি; বাবুজীকেও বলবি না। এইটা তোকে দিলাম। তুই এটা লুকিয়ে রেখে দিস। যদি তোর বাবুজী সাহেব কি তোর মা কখনও খুব বিপদে পড়ে তখন দিস!

বলতে বলতে শিবাজীর কোল থেকে ছুটে সে তড়বড় করে নীচে নেমে গেল। আমি আর শিবাজী দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে রইলাম। বুঝতে পারলাম না ব্যাপারটা। কি দিয়েছিল দাদোজী? আর ছুটতে ছুটতে গেলই বা কোথায়? যেমন ছুটতে ছুটতে গিয়েছিল তেমনি ধুপধাপ করে পা ফেলে আবার নীচে থেকে ছুটতে ছুটতে উঠে এল স্বরস্বতিয়া। ছুটে এসে হাঁফাতে হাঁফাতে শিবাজীর হাতে একটা থলি ধরিয়ে দিলে।

একটা থলে!

শিবাজী থলেটা হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—কি আছে এতে?

মেয়েটা দু-হাত চিৎ করে ঠোঁট উলটে বললে—কি করে জানব? বাবুজী তো আমাকে খুলে দেখতে বারণ করেছিল। আমি কখনও খুলে দেখিনি। আপনি খুলে দেখুন!

শিবাজীর হাত থেকে থলিটা নিয়ে আমি তার গিঁটটা খুলবার চেষ্টা করলাম। পারলাম না। আমি টেনে খুলবার চেষ্টা করতেই মেয়েটা হাঁ হাঁ করে উঠল। বললে—ছিঁড়ে যাবে! ছিঁড়ে যাবে। আমাকে দাও, আমি খুলে দিচ্ছি। দাদোজী বলেছিল, এ গিঁট খোলা কঠিন। আমাকে শিখিয়ে দিয়েছিল খুলতে।

—তুই কখনও গিঁটটা খুলিসনি?

—কতবার খুলেছি, খুলে আবার বন্ধ করে দিয়েছি।

—খুলেছিলি যখন তখন দেখিসনি ওর ভেতর কি আছে?

—না। দাদোজী তো আমাকে ভেতরে দেখতে বারণ করেছিলেন। আমি দেখব কেন?

আমি আশ্চর্য হলাম! মেয়েটা কত সহজে এই কথাটা বললে! আশ্চর্য হবার কথাই। ও বার বার থলেটা খুলেছে আর বন্ধ করেছে অথচ একবার ভেতরে দেখেনি কি আছে!

মেয়েটা তখন মেঝের উপর বসে খুব যত্ন করে আস্তে আস্তে থলিটার এঁটে বসে যাওয়া রেশমি দড়ির ফাঁসটা খুলবার চেষ্টা করছে। অনেকক্ষণ চেষ্টা করে সে গিঁঠটা খুলে থলিটা শিবাজীর হাতে তুলে দিলে। কি মজার কথা, মেয়েটা আমাকে দিলে না থলিটা।

আমি থলিটা শিবাজীব হাত থেকে নিযে থলির মুখটা বড কবে খুলে ধরে তাব মুখটা বড কবে খুলে উলটে দিলাম।

ভিতবে কোন মুদ্রা ছিল না। থাকলে তার নিজেব ওজনে আপনিই মাটিতে পড়ত। আমি ভিতবে হাত পুরে দিলাম। তাবপব মুঠোব মধ্যে ভিতবে যা ছিল টেনে বেব কবে নিযে এলাম।

এক টুকবো ছোট্ট কাগজ আর একগোছা নোট।

কাগজের টুকবোটিতে লেখা পার্বতী আব সবস্বতীব জন্য। দু'হাজাব দু'শো টাকা। টাকাটা গুনে টাকাটা এবং কাগজেব টুকবোটি আমি আবাব থলেব মধ্যে পুবে শিবাজীব হাতে তুলে দিলাম। শিবাজী থলেটা নির্বিবাদে সুবসুতিযাব হাতে দিযে বললে—বন্ধ কব।

থলেটা বন্ধ কবে থলেটা সে আবাব শিবাজীর দিকে এগিযে দিলে। শিবাজী হেসে বললে—তোব—জিনিষ আমি নেব কেন?

সুবসুতিযা মুখ ভাব কবে বল্লে—ই আউব হম না বাখব মেবা পাশ। ই আপহি বাখ দিজিযে।

বলে সে থলিটা শিবাজীব গাযে ছুঁডে ফেলে, দিযে ঘব থেকে ছুটে বেবিযে গেল।

আমাব খুব বিবক্ত লাগছিল এবং সে বিবক্তি আমি গোপন বাখবাব বিন্দুমাত্র চেষ্টা করিনি, যাব ফলে আমাব মুখেব চেহাবায তা বেশ স্পষ্টভাবেই ফুটে উঠেছিল। ওই বাচ্চা মেযেব এক পবিণত বযস্কাব মত ব্যবহাব, আব শিবাজীব সে সমস্তটা সস্নেহে সহ্য করাটা আমার আবও তিক্ত লাগছিল। সেটা বুঝে শিবাজী হেসে যেন খানিকটা কৈফিযৎ দেবার মতই বললে—মেযেটা বড্ড জেদী আর বেবাগা হযে উঠেছে। তাব ওপবে গত দু বছবে দাদোজী ওকে আদব দিয়ে একেবাবে মাথায় তুলে দিযে গিযেছেন।

আমি চুপ কবে রইলাম।

শিবাজী ঘবের মেঝেতে বসেই ডাকতে লাগল—ফুফাজী, এ ফুফাজী! আব একবাব মেহেরবানী করে উপবে আসবেন?

কিছুক্ষণের মধ্যেই ফুফাজী নিঃশব্দে উপবে উঠে এলেন। শিবাজী হেসে বললে—আপনাকে আবার 'তকলিফ' দিলাম!

বলে তাঁর হাতে থলিটা দিয়ে শিবাজী বললে—এর মধ্যে বাইশ শো টাকা, মানে ঢাই হাজারসে তিন শও কম রূপেয়া আছে। এ দাদোজী আপনার আর সুরসুতিয়ার জন্যে দিয়ে গিয়েছেন। এটা আপনি রেখে দিন।

থলিটা হাতে নিয়ে ভদ্রমহিলা আধঘোমটার আড়াল থেকে বললেন—এ আমি নিয়ে কি করব ?

—কেন ? আপনাদের দুজনের জিনিষ আপনারা রেখে দেবেন ! এ টাকা সুরসুতিয়ার সাদীতে খরচ হবে !

পার্বতী এবার আরও স্পষ্ট করে বললে—আমরা মা-বেটি দুজনেই তো আপনার আশ্রয়েই আছি। আমাদের আবার টাকার কি দরকার ? এ টাকা আমাদের হয়ে আপনিই রেখে দিন।

শিবাজী বেশ জোরে ঘাড় নেড়ে বললেন—দাদোজী ও টাকা তো আপনাদের জন্যে আমাকেও দিয়ে যেতে পারতেন। তাতো তিনি দেননি। এ আপনিই রেখে দিন।

ফুফাজী আর কিছু বললেন না। শুধু বললেন—ঠিক হায় ! তারপর মাথার ঘোমটাটা টেনে লম্বা করে দিয়ে থলিটা হাতে নেমে চলে গেলেন।

আমি আর ও প্রসঙ্গের দিকে না গিয়ে শিবাজীকে বললাম—মামাজী, যা যা কাগজপত্র দরকার সবই তো পাওয়া গেল। তা হলে আর কাল সকালের জন্যে অপেক্ষা করার কি দরকার ? চল না, সব কাগজপত্র আজ সন্ধ্যেতেই অওধেশবাবুর হাতে দিয়ে আসি।

শিবাজী রাজী সঙ্গে সঙ্গে। সে বললে—ইয়ে তো আচ্ছাহি বাত হায় ! তা হলে আমরা খুনি কাল ভোরেই জঙ্গলে ফিরে যেতে পারব।

এ আবার কি কথা ? কালকেই জঙ্গলে ফিরব কেন ? তাই তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—আমরা মানে ? তুমি ছাড়া আর কে ফিরবে জঙ্গলে ?

—আমার দলবল আর চেলারা সব চলে গিয়েছে। আমরা বলতে আমি আর তুমি !

আমি অবাক হয়ে বললাম—আমি আবার কেন যাব ?

শিবাজী আমাকে আরও অবাক করে দিয়ে বললে—তুমি তো আর খুনি এক্ষুনি যেতে পারছ না ! তোমাকে তো ক'দিন এখানেই থাকতে হচ্ছে ! তুমিই তো বললে ওই রেজেষ্ট্রীর কাজ শেষ করে তবে যাবে !

বললাম—তাতো বলেছি। আর সে জন্যে থাকবও। কিন্তু তোমার সঙ্গে জঙ্গলে যাব কেন ?

শিবাজী অবাক হয়ে বললে—তবে থাকবে কোথায় ?

আমি ততোধিক অবাক হয়ে বললাম—কেন ? এখানে, এই বাড়ীতে !

শিবাজী সঙ্গে সঙ্গে বললে—আরে তাই হয় নাকি ?

—কেন? তাতে অসুবিধা কি?

শিবাজী পরিষ্কার মাথা নেড়ে বললে—আরে না, না, সে হয় না।

শিবাজীর এই পরিষ্কার আপত্তি আমার মনের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ সূচের মত বিধে গেল। শিবাজীর আপত্তির কারণটা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। ওকি আমাকে একা এই বাড়ীতে পার্বতীর কাছে রেখে যেতে সঙ্কোচ ও সন্দেহ করছে? আমার আত্মসম্মানে বড্ড লাগল। নিজেকে অপমানিত বোধ করতে লাগলাম।

শিবাজী বললে—আহা ভাগনা, আমি এখান থেকে চলে যাব, আর তোমার ওই চামারিয়া পার্বতী আর সুবস্তুতিয়ার হাতে পড়ে অযত্ন হবে, সে তো আমি হতে দিতে পারব না।

শিবাজীর মনটা যেন খানিকটা বুঝতে পারলাম।

শিবাজী বললে—ভাগনা, তুমি মাত্র দু চার দিনের জন্যে এসেছ আর আমি তোমাকে যত দেহাতীর হাতে ফেলে দিয়ে যাব, একি হয়?

সবটাই প্রায় বোঝা গেল। শিবাজীকে যা জানি তাতে নিজের মনের ভাব গোপন করার বা সেই অনুযায়ী মিথ্যা তৈরী করে বলার ক্ষমতা তার নেই। তার কথা বিশ্বাস করে নিলাম। বললাম—বেশ, যাব তোমার সঙ্গে। ক'দিন ঘুরেই আসি তোমার অরণ্য আবাসে।

শিবাজী হা হা করে হাসল। বললে—বাঃ, বাঃ, বেশ বলেছ! অরণ্য আবাস! হাজার হোক তুমি একটা খুনি কবি লোক তো।

আমি মনে মনে আমার নাম লেখা মামার কাগজগুলো খুলে পড়বার উদগ্র ইচ্ছা অনুভব করছিলাম। আমি শিবাজীকে বললাম—তুমি তা হলে আমাদের যাবার ব্যবস্থা কর। আমি বরং ততক্ষণে স্নান করে একটু শুই। কাল রাত্রিতে আমার ভাল ঘুম হয়নি। একটু ঘুমোব। তুমি ইতিমধ্যে তোমার কাজকর্ম শেষ করে স্নান করে আমাকে ডেকো। এক সঙ্গে খাব।

শিবাজী উঠে দাঁড়াল।

বললাম—যাও কোথায়? বাক্সগুলো ঠিকঠাক করে রেখে যাও।

সব ঠিকঠাক করে কাগজগুলো আবার বাক্সে যথাস্থানে রেখে আমরা নীচে নেমে গেলাম। চাবির থোলোটা আমিই রেখে দিলাম। শিবাজীর এসব দিকে কোন হুঁস নেই।

নীচে নেমে শিবাজী প্রথমেই ডাকল—ফুফাজী! এ ফুফাজী!

পার্বতী এসে দাঁড়াল সামনে।

শিবাজী জিজ্ঞাসা করলে—কাল লরা মেমসাবকে খাবার পাঠিয়েছিলে ?

একটু হেসে পার্বতী বললে—জী হাঁ!

পার্বতীকে আমি কখনও হাসতে দেখিনি শিবাজীর সামনে। দেখে একটু অবাকই লাগল।

শিবাজী অবশ্য ভ্রূক্ষেপহীন। সে জিজ্ঞাসা করলে—কে দিয়ে এসেছে ?

পার্বতী আঙুল দেখিয়ে দিলে চামারিয়ার দিকে।

পার্বতী কি চামারিয়ার নাম করে না ?

এই ছোট্ট একটুকু জায়গায় সামান্য ক'টা মানুষকে ঘিরে কত রহস্যই যে রয়েছে! চামারিয়ার দিকে পার্বতী আঙুল দেখালে যেমন করে একমাত্র শুধু স্বামীকে লজ্জায় বাইরের মানুষের কাছে স্ত্রীলোক চিহ্নিত করে। চামারিয়া জাতে দুসাদ কি মুসহর। অথচ আমারই সামনে পার্বতী একদিন নিজের কন্যা সুরসুতিয়াকে রাজপুতানী বলে উল্লেখ করেছিল। সুরসুতিয়া যে চামারিয়ার কন্যা নয় সেটা এমনিতেই মনে হয়। তার উপর আবার সেদিন রাত্রিতে আর এক রহস্যকে আমি আবিষ্কার করেছি যার সন্ধান শিবাজীও জানে না। তিনি ব্রাহ্মণ অম্বুজাক্ষবাবু। দুসাদ মুসহর, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ সব এক বিচিত্র রহস্যের সুতোয় গাঁথা।

তারপর আবার পার্বতীর লরার উল্লেখে এই হাসি আমার কাছে আরও এক বিচিত্র রহস্যকে যোগ করে দিয়ে গেল। যে যুবতী নারী নিজের সুন্দর মুখখানি শুধু ঘোমটাতেই অবিরাম ঢেকে রাখে না, যে নিজের অনুপম সৌন্দর্য নিয়ে নিজের অস্তিত্বের সকল রহস্য বাক্যহীনতার মধ্যে আবদ্ধ করে রাখে তার মুখের হাসি, বিশেষ করে শিবাজীর মুখের দিকে চেয়ে হাসি যেন আরও কোন বিশেষ এক রহস্যকে আমার কাছে এক দু মুহূর্তের জন্য উন্মোচিত ও উদ্ভাসিত করে দিয়ে গেল।

এ সবই আমার কাছে অজানা রয়ে যাবে। আমি এখানকার জীবন থেকে বহুযোজন দূরের আর এক জীবন থেকে, ভিন্ন এক সংস্কৃতি, রুচি, চিন্তা ও অভ্যাসের রাজত্ব থেকে এখানে এসে পড়েছি সামান্য কিছুক্ষণের জন্য। আবার এখান থেকে ফিরে চলে যাব। সবই অজানা থেকে যাবে।

ভাবতে ভাবতে একটা উপমা মাথায় এসে গেল আপনা-আপনি। এ যেন ট্রেনে যেতে যেতে পথের পাশে কোথাও একটা সুন্দর বাড়ী দেখলাম কি সুন্দরী নারীর মুখ দেখলাম চকিতের জন্য। জানলা দিয়ে মুখ বের করে ভাল করে দেখবার চেষ্টা করতে করতেই সেই বাড়ী, সেই মুখ আমার চোখের সামনে থেকে-

চিরকালের জন্য পার হয়ে গেল। সে আর কখনই দেখা যাবে না। সে চিরকালের জন্য অজানাই থেকে গেল।

এক তরুণ কবি ইদানীং এমনি একটি ভাব নিয়ে ভারী সুন্দর একটি কবিতা লিখেছেন। ট্রেনে যেতে যেতে ট্রেন দাঁড়িয়েছে এক অজানা স্টেশনে। বিকেল-বেলার পড়ন্ত রোদে স্টেশনের কাছেই একটা ছোট্ট বাড়ী থেকে একজন কে একটি মেয়ে বুঝি ছুটে বেরিয়ে গেল। তারপরই তার পিছন পিছন ছুটে বেরিয়ে এল একজন পুরুষ বুক ফাটানো আর্ত চীৎকার করতে করতে—বাতাসী, বাতাসী! ঠিক এই সময় ট্রেনটা ছেড়ে দিলে। ট্রেনের কামরা থেকে মুখ বাড়িয়েও আর কিছু দেখা হল না! কি যে ঘটল ব্যাপারটা তাও জানা হল না।

এখানকার সমস্ত অভিজ্ঞতাটুকুও আমার কাছে ঠিক তেমনিটিই হয়ে রইল। আমার মামা, শিবাজী, পার্বতী, সুরসুতিয়া তার সঙ্গে এই অম্বুজাক্ষ সকলে মিলে যে রহস্যের গুটি তৈরী করেছেন তার রেশমের সুতো কোনদিন আর আমার খোলা হবে না এটা আমি মনে মনে বুঝতে পারলাম।

আমি স্নান করতে বাথরুমে ঢুকলাম। সেখান থেকেই শুনতে পাচ্ছি শিবাজী মহারাজ তার সাম্রাজ্য শাসন করছে। চামারিয়াকে হুকুম করছে শুনতে পাচ্ছি রফিক ট্রাকওয়ালার কাছে যাবার জন্যে। কাল ভোর পাঁচটার সময় সে যেন এই বাড়ীর দরজায় ট্রাক নিয়ে এসে হাজির হয়।

তারপরই সে আরও কার সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করলে ঠিক বুঝতে পারলাম না। কথা হয়ে গেলে কিছুক্ষণ নীরবতা। তারপব আবার তার গলা শুনতে পেলাম। সে কথা বলছে পার্বতীর সঙ্গে।

আমি স্নান করে গা মুছতে মুছতে থমকে গেলাম। কৌতুহলই থামিয়ে দিলে আমায়।

কান পেতে ওদের দুজনের কথা শুনতে লাগলাম।

শিবাজী যে ফুফাজী বলে ডেকেছে আর পার্বতীও যে টুকরো কথা আর হাসি ছিটিয়ে তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে সেটা আগেই টের পেয়েছি।

শুনলাম শিবাজী জিজ্ঞাসা করছে—লরা মেমসাবকে কতগুলো পুরি, কচৌরী আর লাড্ডু পাঠিয়েছ ফুফাজী?

—বহত! এতনা! সঙ্গে সঙ্গে হাসি!

বুঝলাম দু হাত এক করে পরিমাণের প্রচুরত্ব সে দেখিয়ে দিলে। কিন্তু সঙ্গের এই হাসির অর্থ কি?

আবার শিবাজীর প্রশ্ন শুনলাম—লরা মেমসাব খুসী হুয়েছে?

এবার কথার বদলে আরও জোরে খিল খিল হাসি শুনতে পেলাম। অনেক হাসির পর শুনলাম—উ মেমসাব বহুতই খুস হুয়ি! চামারিয়াকো দোঠো রূপয়া বকশিস দিহিস্।

আরে এই তো পার্বতী শিবাজীর সামনে দিব্যি চামারিয়ার নাম অসঙ্কোচে উচ্চারণ করছে।

শিবাজীর উচ্চকণ্ঠ হাস্য এবার পার্বতীর খিল খিল হাসির তরঙ্গের উপর যেন ঝাপিয়ে পড়ল। সে হাসতে হাসতে বললে—আরে বাপ, এতনা খুস? বখশিস দে দিয়া চামারিয়াকো?

শিবাজীর হাসিকে চাপা দিয়ে আরও তীক্ষ্ণকণ্ঠ হাসি হেসে পার্বতী বললে—উ বখশিস লরা মেমসাব থোড়াই দিয়া চামারিয়াকো!

—তব? তব কিসকো দিয়া?

—সমঝা নহি? আপনে কো দিয়া! বলে আবার খিল খিল হাসি।

তার গায়ে গায়ে আবার শিবাজীর হা হা অট্টহাস্য।

অকস্মাৎ এই মধুর আলাপে ব্যাঘাত ঘটল। কোথা থেকে সুরস্থতিয়া এসে আবির্ভূত হল এর মধ্যে। সে খুন খুন করে ডেকে উঠল—মা! এ মা!

শিবাজীর ভারী গলার দরাজ হাসি একবার থমকে গেল। কিন্তু পার্বতীয়ার হাসি থেমে গেল একেবারে। সে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে উঠল—কিয়া, ইস্কুল নহি যা কর ঘরমে বৈঠকে দিল্লগি লাগায়া কেয়া? কিয়া জরুরৎ রে তেরা?

সুরস্থতিয়া সমান তরঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল—কিয়া, হম কিয়া আজ নহি খায়েঙ্গে? নহি খা কর রহনে হোগা?

পার্বতী কিছু বলতো হয়তো, কিন্তু তার আগেই শিবাজী বললে—যাইয়ে যাইয়ে ফুফাজী। সুরস্থতি কো খানে দিজিয়ে!

হঠাৎ সুরস্থতিয়া ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

আমি সেই মুহূর্তে স্নানের ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। আমাকে দেখেই পার্বতী লম্বা ঘোমটা টেনে রান্নাঘরে ঢুকে গেল। আমি চোখের সামনে দেখলাম শিবাজী সুরস্থতিয়াকে দু হাতে বেষ্টন করে আছে আর সুরস্থাতয়া কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

যেন কিছুই জানি না, যেন কোন নাটকের মধ্যভাগে দর্শক হয়ে আবির্ভূত হলে মানুষ যেমন ব্যবহার করে তেমনি করে বললাম—কি, কি হল? আমাদের সুরস্থতিয়া কাঁদছে কেন?

সুরস্থতিয়ার কান্না তাতে বেড়ে গেল। তাকে সজোরে চেপে ধরে তার চোখ মুছিয়ে দিতে দিতে শিবাজী হেসে বললে—সুরস্থতিয়ার খুব খিদে পেয়েছে। তাই কাঁদছে।

ঠিক এই সময়ে আসরে ভগ্নদূতের মত আবির্ভূত হলেন অম্বুজাক্ষবাবু। কপালে শ্বেত চন্দনের প্রলেপ! আমাদের দুজনেরই ওঁর কথা মনেই ছিল না। আমি অবাক হয়ে বললাম—একি, কোথায় ছিলেন সকাল থেকে?

অম্বুজাক্ষবাবু শান্ত হাসি হেসে বললেন—বিষ্ণু পাদপদ্মে পিতৃপুরুষকে পিণ্ড দিয়ে এলাম।

শিবাজী সঙ্গে সঙ্গে বললেন—তা হলে তো আপনার এখনও খুনি, জলটল খাওয়া কিছুই হয়নি?

অম্বুজাক্ষবাবু একটু হাসলেন। তারপর বললেন—এখন তো মধ্যাহ্ন হয়ে গিয়েছে। একেবারে মধ্যাহ্ন ভোজন করা যাবে আপনাদের সঙ্গে।

অম্বুজাক্ষবাবু কেন এসেছেন, ক'দিন থাকবেন, কবে যাবেন এ সব নিয়ে দেখলাম শিবাজীর বিন্দুমাত্র মাথা ব্যথা নেই। অথচ এ প্রশ্নটা এবার ফয়সালা হয়ে যাওয়া দরকার। তাই আমি তাঁকে কথাটা বলবার ভূমিকা রচনা করবার জন্যে সুরস্থতিয়াকে বললাম—এ সুরস্থতিয়া, ই ভি তো এক দাদোজী হ্যায়! উনকে লিয়ে থোড়া কুছ বৈঠনেকে লিয়ে দিয়া যায়।

সুরস্থতিয়া ছুটে গিয়ে একখানা কম্বলের আসন এনে পেতে দিলে। আমি অম্বুজাক্ষবাবুকে বললাম—রোদে এসেছেন, একটু বসে জিরিয়ে নিন!

আমার দিকে একবার স্নিগ্ধ একটি সকৃতজ্ঞ দৃষ্টি প্রক্ষেপ করে অম্বুজাক্ষবাবু আসনে বসলেন, সুরস্থতিয়া ছুটে গিয়ে ততক্ষণে একখানা পাখা নিয়ে এসে তাঁকে বাতাস করতে লেগেছে।

একটু চুপ করে থেকে তাঁকে জিরিয়ে নেবার খানিকটা সময় দিয়ে আমি অম্বুজাক্ষবাবুকে বললাম—আমরা তো কাল চলে যাচ্ছি!

একটু চমকে উঠলেন অম্বুজাক্ষবাবু। আমার মুখের দিকে একটু চেয়ে থেকে বললেন—আপনারা সবাই? মানে শিবাজীবাবু, আপনি, এই এরা সব?

শিবাজী হেসে বললে—না, না, এঁরা মানে এই সুরস্থতিয়া, আর ফুফাজী এরা তো খুনি এখন এ বাড়ীর 'পারমানেণ্ট' লোক। এরা কোথায় যাবে খুনি? এরা থাকছে। আমি আর আমার ভাগনা কাল ভোরে চলে যাচ্ছি!

—কোথায়?

শিবাজী হেসে বললে—কোথায় খুনি আবার? আমার নিজের আস্তানায়! জঙ্গলে! আমি জংলী আদমী। জঙ্গলেই থাকি। ভাল থাকি।

এই কথাবার্তার অন্তরালে যে ইংগিতটি ছিল সেটি ঠিকই বুঝেছিলেন অম্বুজাক্ষ-বাবু। শিবাজীর কথা শুনে তার মুখেব দিকে তিনি একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন। তারপর এতদিনের উপস্থিতির অন্তবালে যাকে লুকিয়ে রেখেছিলেন তাকে প্রকাশ করলেন। বললেন—কিন্তু আপনাব সঙ্গে আমার যে কিছু কথা ছিল শিবাজীবাবু!

দরাজদিল শিবাজী তার ভরাট, হৈ-চৈ-করা গলায় বললে—তার আর কি; বলে ফেলুন না! ওতে খুনি আব কি আছে?

অম্বুজাক্ষবাবু একবার গলা ঝেড়ে নিলেন। তাবপব বললেন-এখানে বলার অসুবিধা আছে।

শিবাজী ভাবলে আমার উপস্থিতির জন্যেই বোধহয় আটকাচ্ছে, অম্বুজাক্ষবাবু আমার সামনে কিছু বলতে চাইছেন না। সে হা হা করে হেসে বললেন—আরে, আপনি ভাগনার কথা বলছেন? ভাগনার সামনে আমার কিছু খুনি লুকনো-টুকনো নেই! যা বলবার ওর সামনেই বলুন আপনি। দিল খুলে বলুন। আপনার খুনি কোন অসুবিধা হবে না।

অম্বুজাক্ষ নিম্নকণ্ঠে বললেন—কথাটা ঠিক তা নয়। ওঁর সামনে বলতেও আমার কোন আপত্তি নেই। তবে এই বাড়ীতে বসে বলতে পারব না আপনাকে।

তারপব একটু থেমে নিজেই আবার বললেন—তার চেয়ে আমি যদি আপনার সঙ্গে যাই।

শিবাজী অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপর বললে—আপনি আমার সঙ্গে জঙ্গলে যাবেন?

অম্বুজাক্ষবাবু বললেন—হ্যাঁ! আপনার কি তাতে আপত্তি আছে?

—আপত্তি? না, না! আপত্তি কিসের? হা হা করে হেসে উঠল শিবাজী। হাসতে হাসতে বললে—আমার খুনি আপত্তি কিসের? আপনার কথা ভেবেই বলছিলাম! আপনি তো দেখছি খুনি শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ মানুষ। সেখানে আমি দুসাদ মুসহরদের হাতে খাই! আপনার তো অসুবিধে হবে!

আবার গলা ঝেড়ে নিলেন অম্বুজাক্ষবাবু। বললেন—আর আমার শুদ্ধাচারী হওয়ার কপাল! ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম বটে, কিন্তু আসলে আমি চণ্ডাল বাবা! তবে এখন কোনক্রমে নিজের জাতটা বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করি। তা তুমি তোমার সঙ্গে যাবার অনুমতি দিলে, জঙ্গলে গিয়ে নিজেই চাট্টি করে চাল ডাল ফুটিয়ে নেব।

শিবাজী দরাজ গলায় বললে—তা হলে আর কথা কি? চলুন আমাদের সঙ্গে! চাল, ডাল, নিমক মিরচাই সব পাবেন। লাগবে খুনি শুধু হাঁড়ি!

সঙ্গে সঙ্গে শিবাজী হাঁক দিলেন—এ চামারিয়া!

অম্বুজাক্ষবাবুকে বাতাস করতে করতে খিল খিল করে হেসে উঠল সুরসুতিয়া। বললে—আভি তো উনকে রফিক 'টিয়াকবালাকে' পাশ ভেজে হেঁ না! আভি ভুল গয়ে?

সুরসুতিয়ার মুখের দিকে চেয়ে তার হাসি দেখে তার হাসির সঙ্গে হাসতে লাগল শিবাজী। গমকে গমকে হাসি। নিজের স্মৃতিহীনতা ও স্থূলবুদ্ধিকে উপলক্ষ্য করে হাসি। গমকে গমকে হাসিতে বাড়ীর খালি উঠোনটা যেন ভরে উঠল।

আমার হঠাৎ মনে হল—শিবাজীর মাথায় পাগলামির ছিট নেই তো?

রান্নাঘরের শিকল নড়ে উঠল। সেদিকে তাকিয়ে দেখলাম দরজার কাছেই পার্বতীর কাপড়ের একটা অংশ দেখা যাচ্ছে।

শিকলের শব্দ পেয়েই ছুটে গেল সুরসুতিয়া। মায়ের কথা শুনে আবার ছুটে বেরিয়ে এসে শিবাজীকে কাঁধে ঠেলা দিয়ে বললে—সবাই 'আস্নান' করে আপনার জন্যে বসে আছে। আপ নাহনে যাইয়ে! জলদি!

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর ভেবেছিলাম মামার আমার নামে চিহ্নিত করে রেখে যাওয়া সেই প্যাকেটটা নিয়ে বসব। কিন্তু তা আর হল না। একসঙ্গে খাওয়ার পর একসঙ্গেই একই খাটে দিবানিদ্রা দিতে হল।

বিকেলবেলা অওধেশবাবুকে কাগজগুলো দিয়ে এলাম দুজনে। পথে লন্নার সঙ্গেও একবার দেখা করে এলাম।

তারপর রাত্রিতে নিজের নিজের জিনিষপত্র গোছগাছ করে নিলাম। মামার কাগজগুলো নিজের স্যুটকেশে তুলে নিতে ভুললাম না। রাত্রিতে খাবার পর শিবাজী এবং চামারিয়া বেশ এক এক পাত্র ভাঙের সরবত খেলে। অম্বুজাক্ষবাবুও বাদ গেলেন না দেখলাম।

শুয়ে পড়লাম। কিন্তু মাথার মধ্যে একটা কথা রয়েই গিয়েছিল। অম্বুজাক্ষবাবু আর পার্বতীর সাক্ষাতের কথা।

মধ্য রাত্রিতে যখন শিবাজীর নাসিকাধ্বনি প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠল, যখন আমার চোখের সামনের জানলার ওপারে আকাশের কালো ভেলভেট ক্রেমে তারাগুলো উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠল, যখন সারা পৃথিবী নিস্তব্ধ ও নীরব, তখন আমি আবার আগের রাত্রির মত বিছানা ছেড়ে উঠে গেলাম।

গিয়ে দাঁড়ালাম রেলিংয়ে হাত রেখে। দেখলাম দুজনেই আজ উঠোনে কথা না বলে চুপ করে বসে আছে আকাশের দিকে চেয়ে। দুজনেই যেন আকাশ-পাতাল ভাবছে। কি ভাবছে ওরাই জানে!

ষোলো

পরদিন সন্ধ্যার সময় আমরা গয়া থেকে পঞ্চাশ মাইল পূর্ব-দক্ষিণে শিবাজীর অরণ্যরাজ্যে তার বাংলোর সামনে মাঠে বসেছিলাম।

গয়ার সেই অরণ্য, সেই সন্ধ্যা সবই যেন আজ আমার কাছে কোন বিস্মৃত জন্মান্তরের স্মৃতিমাত্র। কিন্তু সেই ভুলে-যাওয়া, পুরনো স্মৃতির কোন একটি প্রান্তে একটি চেনা সুতোয় টান পড়তেই দেখতে পাচ্ছি সেই বিগত অভিজ্ঞতার প্রায় সম্পূর্ণ স্মৃতির ছবি মস্তিষ্কের কোন গোপন কোসে যেন একেবারে 'নিগেটিভ' থেকে 'প্রিণ্ট' করে 'ভল্টের' মধ্যে রাখা ছিল। আজ সে ঠিক আবার নিজেকে ফিরিয়ে মনের পর্দায় ধরিয়ে দিচ্ছে। কেবল পুরনো ছবির মত তার কোথাও কোথাও ঝাপসা হয়েছে। তাতেও আমার বিন্দুমাত্র অসুবিধা ঘটছে না। মনই আমার নিজের কল্পনা দিয়ে সেই ঝাপসা জায়গাগুলোকে ভরাট করে দিচ্ছে।

মনে পড়ছে সকালবেলা রওনা হয়ে মেঠো পথ ভেঙে সেই অরণ্যের হৃদয় ভূমিতে গিয়ে পৌঁছুতে আমাদের বিকেল হয়ে গিয়েছিল। আশ্বিনের মাঝামাঝি, সারা পথ চড়া রোদ্দুর পেয়েছি। আমি, শিবাজী আর অমুল্যাক্ষবাবু রফিক ড্রাইভারের পাশে কোনক্রমে গায়ে গায়ে ঘেঁষে বসে এসেছি সারাটা পথ। আমরা রোদ্দুর পাইনি, কিন্তু তাত আর ধুলো পেয়েছি। আর সমস্তক্ষণ ভেবেছি বাইরে খালি ট্রাকের মধ্যে বসে-থাকা চামারিয়া আর তার দু তিনজন সঙ্গীর কথা। আমি আমার দুশ্চিন্তার কথা দু একবার পথে বলেওছিলাম শিবাজীকে। কিন্তু শিবাজী যেন শুনেও শোনেনি। একবার শুধু বলেছিল—ওরা গরীব দুঃখী লোক ভাগনা! ওদের এর চেয়েও অনেক বেশী কষ্ট সহ্য করা অভ্যেস আছে, বুঝলে খুনি।

শিবাজী কিন্তু সারা রাস্তা নানা রকম গল্প বলে, নিজে হেসে, আমাকে হাসিয়ে, খানিকটা মাতিয়ে, খানিকটা ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

আমরা যখন বনের ভিতরে অনেকটা ঢুকে গিয়েছি তখন দেখলাম রোদ্দুরের সাদা ঝকঝকে রঙে আবছা হলদে আভা লেগেছে। আমাদের ট্রাক যখন গিয়ে

পৌঁছুল ওর বাংলোর সামনে তখন নিস্তব্ধ বনভূমিতে আগে থেকেই গাড়ীর রেসিংয়ের শব্দ শুনে কয়েকজন ইতিমধ্যেই আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।

শিবাজী তো নেমেই আমাকে দেখে হি হি হো হো করে হাসতে লাগল আঙুল দেখিয়ে। শিবাজীর চেহারা দেখে আমি সঙ্গে সঙ্গে তার হাসির কারণটা বুঝতে পেরেছিলাম। সারা রাস্তার ধুলো আমার কালো চুলে আর ভুরুতে লেগে একটা অদ্ভুত সাদাটে রঙ ধরিয়ে দিয়েছে। আমি কোঁচার খুঁট দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে হাসতে লাগলাম। শিবাজী বললে—ও ধুলো এমনি যাবে না ভাগনা। স্নান না করলে খুনি ও গর্দা যাবে না।

বলেই সে চীৎকার করতে লাগল—এ চামারিয়া, বিওয়া, সাগারিয়া! এ—

চামারিয়ার অবস্থা আমাদের চেয়ে অনেক খারাপ। সে এমনিতে শুকনো মানুষ। তার ওপর সারাদিনের রোদটা খেয়ে সে যেন আমলে গিয়েছে। সে শিবাজীর পাশেই দাঁড়িয়েছিল। সে হেসে হাত জোড় করে নীচু গলায় বললে —গরম পানি চঢ়ানেকো লিয়ে বোল দিয়া হুজুর! দশ মিনট্ মে পানি গরম হো যায়গা! আভি এক দফে চা পিলা দেঙ্গে?

—চা পিয়েগা? তো ঠিক হ্যায়! চা হি বনাও। আওর এক দফে হরিয়াকো বোলা দো!

—জী! বলে ওরা চলে গেল।

একদফা চা খেয়ে, স্নান করে যখন আমরা বারান্দায় এসে বসলাম দুজনে তখন অম্বুজাক্ষবাবু স্নান করতে ঢুকলেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে। আমাদের বাংলো আর তার চারিধারে অন্ধকার যেন আরও ঘন হয়ে উঠেছে। আমি এখানে আগেও এসেছি। এর কারণ আমি জানি। বাংলোর চারিপাশে অতি প্রাচীন বড় বড় শিরীষগাছ আছে অনেকগুলো।

গয়াতে বেশ গরমই পেয়েছিলাম। এখানে এই সন্ধ্যের মুখেই গা সির সির করছে। শিবাজীর অবশ্য ভ্রূক্ষেপ নেই। আমি বারান্দা থেকে উঠে গিয়ে ঘরের ভিতরে আমার স্যুটকেশ থেকে গরম চাদর বের করে গায়ে জড়িয়ে এসে বসলাম।

খালি চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখতে রাখতে শিবাজী বললে—কি ভাগনা, তোমার শীত লেগে গেল খুনি? এইটুকুতেই গায়ে চাদর দিতে হল?

আমি হেসে বললাম—আমার তো আর তোমার মত ভাঙের সরবত সহায় নেই মামাজী! তার ওপর আমার রক্ত একটু এমনিই ঠাণ্ডা বেশী!

শিবাজী হেসে বললে—খুব মনে পড়িয়েছ তো! সরবত তো বানাতে হবে!

সঙ্গে সঙ্গে শিবাজী খুশী হয়ে হাতে তালি বাজিয়ে বললে—ওই, ওই আমার সরবত—বানানে-বালা এসে গিয়েছে খুনি।

সামনের গাঢ় স্তব্ধতা আর অন্ধকারের মধ্যে একটা খট্‌খট্ শব্দ শুনতে পেলাম। তারপরই ঘন অন্ধকার সত্ত্বেও চোখের সামনে একটা সাদাটে কিছুকে নড়তে দেখলাম।

এ শব্দ তো আমি চিনি! এখানেই শুনেছি! ভাবছি কিসের শব্দ এমন সময় কারণটি চোখের সামনে আপনিই স্পষ্ট হয়ে উঠল।

ল্যাংড়া হরিয়া!

সেই তামাটে চেহারা, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ, খাটো খুঁটি খুঁটি কাঁচা পাকা চুল, নরম নরম মুখ, চোখের ছবিটি একই সঙ্গে তীক্ষ্ণ এবং স্নিগ্ধ। তার চলাফেরায় বিন্দুমাত্র ব্যস্ততা নেই। সে ধীরে সুস্থে তার ঠেঙোর উপর ভর দিয়ে বারান্দায় উঠে ঠেঙোটা নামিয়ে রেখে শিবাজীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে শুধু যেন চোখ দিয়েই হেসে বললে—আচ্ছা হ্যায় না হুজুর মহারাজ?

দু হাত কেমন একভাবে মেলে, যা আমরা বাঙালীরা জানি না, পারি না, করিনা, অনেকটা অভয় দেওয়ার ভঙ্গিতে মেলে, শিবাজী বললে—হাঁ, হাঁ, সব তো অচ্ছাহি হ্যায়! হিঁয়াকা খবর সব অচ্ছা?

হরিয়া এখন আসতে আমার এতক্ষণে মনে হল তাইতো, এত লোক, বলতে গেলে শিবাজীর সম্পূর্ণ আরণ্য বাহিনীই তো মামার শ্রাদ্ধে গয়া গিয়েছিল, কিন্তু হরিয়া তো যায়নি! আমি ওকে সে কথা জিজ্ঞাসা করলাম। বললাম—এখান থেকে সবাই গেল, কিন্তু কই তুমি তো গেলে না হরিয়া।

নিজের কাঁচা পাকা খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাড়িতে হাত বুলিয়ে সলজ্জ হাসি হেসে হরিয়া যা বললে তার মর্মার্থ হল—না, সে যায়নি। ঘর ছেড়ে সবারই চলে গেলে কি চলে? তারপর হেসে বললে—বাড়ীর সবারই 'নেওতা' থাকলে সবাইকে 'নেওতা' খেতে পাঠিয়ে দিয়ে মা ঘরে রয়ে যায়, বাড়ী আগলাবার জন্যে! এও সেই রকম আর কি!

তারপর বিনয় করে বললে—তা ছাড়া আমি হুজুর, ল্যাংড়া মানুষ। আমার নানান অসুবিধে। সেই জন্যে হুজুর যেতে বললেও আমি যাইনি!

শিবাজী জিজ্ঞাসা করলে—কিয়া রে, খবর সব অচ্ছা না?

—জী সরকার। সবহি অচ্ছা হ্যায়! এক রোজ শুনা কি হামারা জঙ্গলকি পচ্ছিম তরফ এক ভল্লু আয়া হ্যায়। তো বহত চিন্তা হুয়া। কোই মরদানা নাহি

হ্যায় জঙ্গলমে, হিঁয়া বস্তীমে খালি জেনানা আর বচ্চা। হম তো সবেরেহি চুড় কে দেখা! কুছ পতা নহি চলা! ব্যস, সব তো ঠিকই হ্যায়।

শিবাজী বললে—তব তো ঠিকই হ্যায়! আভি এক কাম করো। সরবত বনাকে লাও। পাঁচ ছও আদমীকে লিয়ে।

—জী সরকার! বলে সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ল হরিয়া। সে সরবত বানাতে গেল। শিবাজী আমাকে বললে—ওর মত সরবত বানাবার হাত এখানে কারও নেই। শিবাজী পিছন থেকে গলা তুলে বললে—হরিয়া, চামারিয়াকে বল মাঠে খানিকটা আগুন করতে। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা আছে। আগুনের ধারে বসে গপ্ করা যাবে।

সেদিন শিবাজীর পাল্লায় পড়ে আমিও খানিকটা ভাঙের সরবত খেয়েছিলাম। খেয়ে চোখে একটু নেশাও ধরেছিল। সেই ঝিল্লীঝংকৃত নিস্তব্ধ অরণ্য ভূমিতে তারায় তারায় খচিত খণ্ড, টুকরো টুকরো আকাশের নীচে অতি প্রাচীন ও অতিকায়, বহুদর্শী বনস্পতিদের পদতলে সামান্য কীটের মত বসে খুব অদ্ভুত লেগেছিল। সামনে শালের আর পাইনের শুকনো টুকরো থেকে আগুন নিভে গিয়েছে। কেবল জীবন্ত মৃত্তিকার ও অরণ্যের প্রদীপ্ত চক্ষুর মত জ্বলন্ত অংগার তাপ ও রক্তাভ একটা দীপ্তি বিকীরণ করছিল। নেশায় দোলায়িত মনে তার—তার চোখ নিয়ে সেই দিয়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ও উষ্ণ তাপের স্বাদ গ্রহণ করতে করতে নিজেকে বড় একাকী ও দুঃখী মনে হচ্ছিল।

মাঝখানে আমি আর শিবাজী। আমার একপাশে হরিয়া, শিবাজীর পাশে অম্বুজাক্ষবাবু, তার ওপাশে চামারিয়া। শিবাজী হঠাৎ বললে—হরিয়া, একটু তুলসীদাসজীর রামায়ণ গান কর্তো রে।

সেই আশ্চর্য রাত্রিটির স্মৃতি এই সমস্ত কাহিনী নিরপেক্ষ হয়ে আমার মনে বহুকাল জীবন্ত ছিল। বহুবার এই স্মৃতিকে আমি বহু ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে আস্বাদ করেছি। সে স্মৃতির মধ্যে অনেক বেদনা, অনেক কোমলতা, কিছু কৌতুক এবং অনেকখানি বিস্ময় মেশানো ছিল। আমার প্রায়-পূর্বপরিচয়হীন সেই অরণ্য, সেই খোলার চালের ছোট্ট বাংলো বাড়ী, পরিপাশের অনন্তঝিল্লী ঝংকার, আশে বড় বড় বনস্পতি তাদের অতিকায় ও অতি প্রাচীন অস্তিত্বের আড়ালে আমাদিকে যেন গভীর করুণা আর স্নেহের সঙ্গে আশ্রয় দিয়েছে। আর তারই মধ্যে আমরা পাঁচ ছ'টি মানুষ আমাদের বুক ভরা আর্তি ও আনন্দ নিয়ে বসে আছি। নেশার প্রভাব ছিল খানিকটা নিশ্চয়ই।

হঠাৎ ল্যাংড়া হরিয়া গেয়ে উঠল—আগে আগে রাম চলতুঁ হ্যায়, পিছে লছমন ভাই, ভাই!

গানের এ কলিটি ঠিক কি বেঠিক তা আজ আমার মনে নাই। ল্যাংড়া হরিয়ার মৃদু ভাঙা-ভাঙা কম্পিত কণ্ঠস্বর উত্তরাখণ্ডের অতি পরিচিত গানকে যেন সেই অরণ্যের মধ্যেই আমাদের চোখের সামনে আমাদের একটা অতি পরিচিত দৃশ্যের চেহারা দিয়ে নামিয়ে দিলে। সেই অর্ধনেশাগ্রস্থ মনে ও চোখে যেন দেখতে পেলাম রামচন্দ্র সীতা আর লক্ষ্মণকে নিয়ে বনবাসে চলেছেন।

গাইতে গাইতে হরিয়ার ভাঙা-ভাঙা কাঁপা গলা আপনার জোর খুঁজে পেলে, তার সবল কণ্ঠস্বর চারিপাশে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। তার সঙ্গে হাতে তালি দিতে দিতে প্রথমে যোগ দিলে শিবাজী। তারপর চামারিয়া। শ্রীরামচন্দ্র সীতা আর লক্ষ্মণকে নিয়ে আমাদের সামনে দিয়েই পার হয়ে চলে গেলেন। ওই তো চলে যাচ্ছেন তাঁরা!

হরিয়া গাইছিল: সজি বন সাজু সমাজু সবু বণিতা বংধু সমেত।
বংদি বিপ্র গুরু চরণ প্রভু চলে করি সবহি অচেত॥

গান চমৎকার জমে উঠল। হরিয়া, শিবাজী আর চামারিয়া মহা উৎসাহে গেয়ে চলেছে। আমি আর শিবাজীর ওপাশে অম্বুজাক্ষ শুধু চুপ করে শুনে যাচ্ছি। শুনতে শুনতে আমার নেশাগ্রস্থ মনের ভিতর একটা আকুলতা যেন ঠেলে ঠেলে উঠতে লাগল। আমি প্রায় স্তম্ভিত হয়ে চুপ করে বসে গানের সঙ্গে সঙ্গে দুলছিলাম। হঠাৎ দেখলাম প্রবীণ, বর্ষীয়ান, প্রায়-নির্বাক, অতি-মিতভাষী অম্বুজাক্ষ শিবাজীর পাশে চুপ করে আমারই মত বসে থাকতে থাকতে দু হাতে মুখ ঢেকে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলেন।

গান থেমে গেল। শিবাজী দু এক মুহূর্ত দেখে তার শক্ত একখানা থাবার মত হাত দিয়ে অম্বুজাক্ষকে তাঁর কাঁধ ধরে গোটা দুয়েক ঝাঁকি দিয়ে বলে উঠল—এই, এই, অম্বুবাবু আপনি কাহে রোণে লগা? কিয়া হুয়া?

গান থামিয়ে হরিয়া বললে—এঃ, একদম মাতোয়ালা হো গয়া!

শিবাজী বললে—আরে হরিয়া, তুই কি খুব কড়া সরবত বানিয়েছিলি নাকি?

হাত জোড় করে হরিয়া বললে—নহি হুজুর, বহত নরম করকে বনায়া! আপ আপনেহে তো খাঁয়ে হে! আপহি বোলিয়ে না! হম তো জানতে কি ভাগনাবাবু ভি পিয়েঙ্গে! উনকে তো ই ভাঙকা সরবত পিনে কা অভ্যাস নহি হ্যায়!

ওদিকে দু হাতে মুখ ঢেকে অম্বুজাক্ষ অবিরলধারে কেঁদে যাচ্ছেন আর সেই সঙ্গে

ঘাড় নাড়ছেন! শিবাজী আবার একটা ঝাঁকি দিলে তাঁকে—কি হল খুনি অম্বুবাবু?

মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে অম্বুজাক্ষ ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন—কিছু হয়নি শিবাজী বাবু। নেশাও আমার হয়নি। আমি শুধু ভাবছি আমি কী পাপী! কী ঘোর পাপী!

—এ কি বলছেন মশাই আপনি? শিবাজী একটু বিরক্ত হয়েই বললে।

অম্বুজাক্ষ তাতে সান্ত্বনা পেলেন না। কাঁদতে কাঁদতে বললে—আমি ঠিকই বলছি শিবাজী বাবু! আমি মহাপাপী! আর আমার পাপের কথা আপনাকে বলবার জন্যেই আমি এতদূর এসেছি আপনার সঙ্গে। আপনাকে না বললে আমার প্রাণও শান্তি পাবে না। আমার কোন সুখসুবিধাও হবে না। আমার ইহলোক পরলোক এখন দুইই আপনার হাতে! এখন আপনি যা করেন!

শিবাজী হকচকিয়ে গেল। একে তার সোজা সরল বুদ্ধি। আর সে বুদ্ধি এমন যা তাকে সতত জীবনের গভীরে, বিশেষ জীবনের কোন গভীর বেদনার মধ্যে প্রবেশে বাধা দেয়। শিবাজী বললে—এতো আপনি আমাকে মহা মুস্কিলে ফেললেন খুনি!

আমার দিকে ফিরে শিবাজী বললে—দেখছ ভাগনা, ভদ্রলোক খুনি কি মুস্কিলে ফেললেন আমাকে? এখন আমি কি করি খুনি বলতো?

আমি বললাম—উনি তো তোমাকে কিছু বলব বলেই এসেছিলেন। উনি ওঁর কথাগুলো এখন বলুন না তোমাকে! এই তো চমৎকার সময়!

চোখের জল মুছতে মুছতে অম্বুজাক্ষ বললেন—আমার সব কথা বলব বলেই তো এসেছি আপনার সঙ্গে। আপনি এখন যদি দয়া করে শোনেন!

শিবাজীরও মনে নেশার ঘোরে কিঞ্চিৎ আবেগ জেগেছিল। সে বেশ গাঢ়স্বরে বললে—আপনি খুনি, কথা বলবার জন্যে আমার সঙ্গে খুনি এতদূর এলেন কষ্ট করে, আর আমি খুনি, আপনার কথা শুনব না, এ কি হয়? বলুন, বলুন, আপনার কথা বলুন, আমি শুনছি খুনি। পুরা ধেয়ান লাগিয়ে শুনছি! বলুন আপনি!

অম্বুজাক্ষ এদিক-ওদিক চাইছিলেন। আমার যৎকিঞ্চিৎ নেশা সত্ত্বেও ব্যাপারটা বুঝলাম। আমার সামনে বললেও আমাদের এপাশে-ওপাশে হরিয়া আর চামারিয়া বসেছিল। তাঁদের সামনে বলতে নিশ্চয়ই অম্বুজাক্ষের আপত্তি হবে। ব্যাপারটা বুজে আমি শিবাজীকে বললাম—অম্বুজবাবু যা বলবেন তা হয় তো হরিয়া-চামারিয়ার সামনে বলতে ওঁর অসুবিধা হবে। ওরা বরং এখন রান্না-বান্না হল কি না দেখুক!

শিবাজী বললে—ভাগনা, তোমার মত একজন 'আকলবন্দ' আদমি আমার সঙ্গে থাকলে আমার কত স্থবিধে! বুঝলে ভাগনা, আমার আকল খুনি জরুর কম আছে!

তারপর হরিয়া আর চামারিয়াকে বললে—তোরা এখন যা! আমাদের অম্বুবাবু আমাদের কি 'বাত' বলবেন! শুনি! বুঝলি! তোরা যা এখন!

ওরা হাসতে হাসতে উঠে চলে গেল।

অম্বুজাক্ষ ওঁর কথা বলতে লাগলেন।

উনি সেদিন নিজের যে কাহিনী বলেছিলেন তা কোন প্রবীণ ব্রাহ্মণের তপস্যার কাহিনী নয়। তা একজন রক্তমাংসের মানুষ সম্বলন ও ভ্রষ্টতার কাহিনী। যার বিষফলের বিষ আর অন্তর্দাহ তিনি সেদিন পর্যন্ত বহন করে চলেছিলেন।

হরিয়া আর চামারিয়া চলে যেতেই অম্বুজাক্ষ হাতজোড় করে শিবাজীকে বললেন —বাবা শিবাজীবাবু, আমি আপনাকে যা বলতে যাচ্ছি তা হাতজোড় করে ছাড়া আপনাকে বলা চলে না। আমি বাবা, গয়াতে সেই প্রথম দিন সারা রাত্রিতে এসেই আপনাকে মিথ্যে কথা বলেছিলাম। আমি আপনাকে বলেছিলাম, আমি অমৃতবাবুর পিসতুতো ভাই, আমি আসলে তাঁর কেউ নই। আমি আসলে এসেছিলাম পার্বতীর খোঁজ করতে করতে অমৃতবাবুর কাছে। অমৃতবাবুকে আমি এই আজ যেমন আপনাকে বলতে বসেছি, তেমনি করে সব বলেছিলাম। তা অমৃতবাবু কৃপা করে আমাকে বলেছিলেন, আপনি মাঝে মাঝে আসবেন আমার কাছে, ওদের দেখে যাবেন। আপনি বাঙালী ব্রাহ্মণ! কেউ আপনার পরিচয় চাইলে আপনি সোজাসুজি বলে দেবেন আপনি আমার পিসতুতো ভাই! সেই পরিচয়েই আমি গয়ায় অমৃতবাবু থাকতে গত দু বছরের মধ্যে দু-তিন বার এসেছি। আমি আসলে দেখতে আসতাম পার্বতীকে আর তার মেয়ে সুরস্থতিয়াকে।

আমি অসীম আগ্রহ নিয়ে অম্বুজাক্ষবাবুর কথা শুনছিলাম। যে অকথিত নাটককে আমার মামার গয়ার বাড়ীতে পর পর দু রাত্রি আমার চোখের সামনে বাক্যহীনভাবে উদ্ঘাটিত হতে দেখেছি তারই এখন প্রকাশ ঘটছে আমার সামনে।

কিন্তু শিবাজীর মাথায় কিছুই ঢোকেনি এতক্ষণ পর্যন্ত। সে অম্বুজাক্ষের কোন কথা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলে—আপনি বাঙালী ব্রাহ্মণ হয়ে পার্বতী আর স্থরস্থতিয়াকে দেখতে আসতেন কেন? ওরা আপনার কে?

শিবাজীর প্রশ্নে অতি বিষণ্ণ, অতি তিক্ত হাসি হাসলেন অম্বুজাক্ষ। শিবাজীর

প্রশ্ন শুনে বললেন—ওরা আমার কে ? ওরা আসলে আমার কেউ নয় ! কিন্তু আমি বলি আমার মেয়ে আর নাতনী।

তারপর অম্বুজাক্ষ নিজের জীবনটা আমাদের সামনে খুলে ধরলেন। সে জীবন নানান পরুষ, কর্কশ, আর একান্ত অবহেলায় নাড়াচাড়া করা একখানা বহু কলঙ্কে কলঙ্কিত পুঁথির মত। যা শ্রদ্ধাশীল পাঠকের পাঠযোগ্য নয়। তবু কেউ যদি সেই পুঁথি কিঞ্চিৎ মমতার সঙ্গে উল্টে যায় তবে ব্যথিত না হয়ে পারবে না।

অম্বুজাক্ষের আসল নাম অম্বুজাক্ষ নয়। ওটা তার ছদ্মনাম। তার আসল নাম হারাধন। মা-বাপের কয়েকটি সন্তান গিয়ে ওইটিই শেষ সম্বল হিসেবে তাঁরা পেয়েছিলেন বলে তার নাম হয়েছিল হারাধন। আহা, কি ধনই যে তাঁরা লাভ করেছিলেন !

হারাধনের জন্ম বর্ধমান জেলার কোন গ্রামে। তখন উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ। উনবিংশ শতাব্দী শেষ হবার সময় হারাধন পরিপূর্ণ যুবা পুরুষ। যজমান-সেবী ব্রাহ্মণের একমাত্র ছেলে। ওই একমাত্র সন্তান হবার গৌরবে ও দুর্ভাগ্যে হারাধনের বাবার যেটুকু বা লেখাপড়া হয়েছিল হারাধনের সেটুকুও হয়নি। তার ওপর হারাধনের প্রাণে বাবার যজমানী বৃত্তির ওপর ঘৃণা আর তাচ্ছিল্য দুইই ছিল। তার মনে ছিল যথেষ্ট পরিমাণ উচ্চাশা। ছেলের অনেকটা বয়স পর্যন্ত যখন লেখাপড়া কিছুই হল না তখন বাবা আদর করে পরামর্শ দিলে—লেখাপড়ার আর দরকার নাই। তুই পুজো করাটা শিখে নে। তুই তো আমার দেখাদেখি সবই জানিস। কেবল হাতে-কলমে করে অভ্যেস করে ফেল। হারাধন উচ্চাকাঙ্ক্ষী লোক। সে বেমালুম তাচ্ছিল্য দেখিয়ে বললে—ওই নোড়ার মত ঠুঁটো দেবতাকে মিথ্যে অং বং বলে পূজো করা আমার আসবে না। দেবতার দৌড় আমি জানি !

তারপর নিষ্ঠুর কথা শুনে বাপের মুখখানা যে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল তা দেখেও সেদিন ভ্রূক্ষেপ করেনি হারাধন। কিন্তু এই পরিণত বয়সে যখন তার নিজের মন বিষণ্ণ থাকে তখন বাবার সেই বিষণ্ণ মুখের ছবি অম্বুজাক্ষরূপী হারাধনকে বার বার যন্ত্রণা দিয়ে যায়।

সেদিন তরুণ হারাধনের মনে তখন অনেক টাকা রোজগারের স্বপ্ন ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাড়ীতে মা থাকলে হয়তো সংসারের বন্ধনটা কিঞ্চিৎ শক্ত হত। কিন্তু মা গত হয়েছে। শুধু বাপ আর তখন তাকে পিতৃস্নেহ দিয়ে ধরে রাখতে পারছে না। সেটা অনুভব ও অনুমান-করেই বাপ তার বিয়ে দেবার কথা

তুললে। বুদ্ধিমান হারাধনের কল্পনায় তখন অনেক টাকা রোজগারের কথা ঘুরছে। সে বিয়ের কথা হেসে উড়িয়ে দিলে। বললে—বলে নিজে পেটে খেতে পাই না, আবার আর একজনা নিয়ে আসব সংসারে! কি যে বল!

কিন্তু বাপের তো এই বলার কারণ ঘটেছিল। তরুণ যুবা হারাধন তখন বয়োধর্মে গ্রামে নিজের সঙ্গিনী সন্ধানের জন্য মনে মনে ব্যস্ত ছিল। এ দিক দিয়ে হারাধনের ধূর্ততার অন্ত ছিল না। সে কখনও কুমারী মেয়েদের দিকে চোখ দিত না। কারণ তারা তো সব শিশু। আট, নয়, দশ, বড় জোর এগারো, বারো বছর বয়স হলেই তাদের বিয়ে হয়ে যায়। তারা যায় শ্বশুর ঘর করতে। সেদিনের পল্লীগ্রামে দরিদ্র কুমারী কন্যার শ্বশুর ঘর করতে যাওয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যমালয় গমনের সমতুল্য ছিল। কারও কারও যদি বা সেখানে চিরস্থায়ী আবাসের ব্যবস্থা হত দারিদ্র ও বহু সন্তানরূপী যমের সঙ্গে বসবাসের, অনেক কুমারী কন্যা কুমারী নাম ঘুচিয়ে তার কিছু দিনের মধ্যেই কৌলিন্যগর্বী বৃদ্ধ স্বামীকে যমের হাতে দক্ষিণা দিয়ে বিধবা হয়ে সগৌরবে আবার বাপ কি ভাইয়ের ভিটেতে ফিরে আসত। কারও কোলে সন্তান থাকত, অধিকাংশেরই থাকত না। এদের সঙ্গে সেদিন সমাজে আরও এক শ্রেণীর নারী ছিল! যাদেব বিবাহ হত, কিন্তু তারা চিরকাল বাস করত বাপের বাড়ীতে। মাথায় সিঁদুর থাকত, কুমারী নামটা খণ্ডন হয়ে আরতীর গৌরব লাভ করে মাছ খেত। কিন্তু বিয়ের সময় সেই একবার স্বামী সন্দর্শনের পর স্বামীকে দেখার সৌভাগ্য আর হত না তাদের। এই দুই শ্রেণীর যুবতী স্ত্রীলোক সেদিন পল্লী-সমাজের নারী-জীবনের একটা বৃহৎ অংশ ছিল। এরাই সেদিনের পল্লীর জীবনকে কলরবে মুখর করে রাখত। নিজেদের জীবনের আনন্দ দিয়ে নয়, নিজের জীবনের বিষ দিয়ে। তাদের তো আর কিছু দেবার ছিল না। তাদের জীবনের কোনখানেই তো এক বিন্দু অমৃতের স্পর্শ ছিল না।

হারাধনবাবু যখন সেকাল ও নিজের তরুণ কালের রাঢ়-বাংলার সমাজের কথা বলছিলেন তখন আমিও, শুনতে শুনতে, তাঁর প্রতিটি কথা মনে মনে সমর্থন করেছি। আমিও তো এদের দেখেছি আমার বাল্যকালে। আজও এই ১৯৩২।৩৩ সালে তাই দেখছি। তবে কিছু অদল-বদল হচ্ছে!

এই স্ত্রীলোকদের জীবনে সত্যই এক বিন্দু অমৃতের স্পর্শ ছিল না কোথাও। হারাধনও তাই বললেন। সামাজিক নীতিতে, অনুশাসনে ও প্রচলিত ধারায় এরা যৌবনের যা শ্রেষ্ঠতম সম্পদ, পুরুষসঙ্গ, তা থেকে বঞ্চিত। অতি স্বাভাবিক কাম থেকে বঞ্চিত হয়ে এই কাম এদের অধিকাংশের মধ্যে মূর্তি লাভ করে.

ক্রোধে ও ক্ষোভে! জীবনের সমস্ত কিছুর উপর এদের একাংশের স্বাভাবিক বিরাগ। সেই বিরাগ প্রকাশ পায় অপরের ছিদ্রান্বেষণে, ত্রুটি আবিষ্কারে।

স্বামীসঙ্গহীন এই নারী-সমাজের দিকে ধূর্ত গোপন দৃষ্টি ছিল হারাধনের। কিন্তু ধূর্ততায় সে তখনও বিশেষ পটু হয়ে ওঠেনি বলে তার এই আসক্তির সংবাদ গোপন রইল না। শশী বলে তারই সমবয়সী এক স্বামী-পরিত্যক্তা কন্যার দিকে তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল। এ সংবাদ সর্বাগ্রে নজরে এল শশীর চেয়ে দু বছরের বড় তার বিধবা দিদি দেবীর। দেবী কনিষ্ঠা ভগ্নীকে শাসন করতে গেলে শশী ফোঁস করে উঠেছিল। বলেছিল—ওই হারাধন আমার সঙ্গে হেসে দুটো কথা বলেছে বলে তোর হিংসে হচ্ছে বুঝি? বলিস যদি, আমি তোর সঙ্গে ওর আলাপ করিয়ে দিই! তা হলে তো ভাল লাগবে তোর?

আর যায় কোথা? দিদি দেবী রাক্ষসীর মত আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কনিষ্ঠা ভগ্নীর কলঙ্কের কথা বিপুল গর্জনে গোটা গ্রামকে ঢাক বাজিয়ে জানিয়ে দিতে তার বিলম্ব ঘটেনি।

এই থেকেই হারাধনের নিরীহ যজমান-সেবী পিতা-পুত্রের চারিত্রিক প্রবণতার কথা জেনে পুত্রের কাছে তার বিবাহের প্রস্তাব করেছিলেন।

কিন্তু গোটা গ্রাম তখন তার সেই দুটো হেসে-কথা বলার অন্যায়ের উপর চরমতম অপরাধের কাল্পনিক অন্যায় চাপিয়ে তার বিচার করবার ও তাকে শাস্তি দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। সুতরাং এর থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে তার না পালিয়ে আর উপায় ছিল না।

সুতরাং হারাধন গৃহত্যাগ করলে। একদিকে অর্থ উপার্জনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে নারীসঙ্গলাভের কামনা। কোন পথে সহজে নারীর কাছে পৌঁছনো যায়, বিশেষ করে যুবতী স্বামী পরিত্যক্তা বা বিধবা নারীর কাছে সে সম্বন্ধে মনে একটা ধারনা তার তখন হয়ে গিয়েছে। সে বুঝেছে অর্থ-উপার্জনের জন্য যে কোন পথ গ্রহণ করা যায়। আর স্ত্রীলোকের কাছে পৌঁছুতে হলে আরও চতুরতা ও ধৈর্যের প্রয়োজন। এই দুইকে মেনে নিয়ে সে গৃহত্যাগ করলে।

এই সঙ্গে সে আরও একটা ব্যাপার বুঝেছিল। নারীকে আকর্ষণ করার আগে অর্থ উপার্জন করাটা প্রথম প্রয়োজন। গৃহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে সেইটাই তখন আদি এবং সব চেয়ে জরুরী প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। গৃহত্যাগ করে সে হেঁটে এসে উঠল এক স্টেশনে। সেখানে থেকে ট্রেন যেখানে যায় সেইখানে যাবার মতলব নিয়ে বিনা টিকিটে ট্রেনে উঠে পড়ল।

ট্রেনে যেতে যেতে দেখলে রেল লাইনের এক জায়গায় অনেক লোক রেলের

লাইনেই কাজ করছে। সঙ্গে সঙ্গে তার মাথায় খেলে গেল, এই তো এইখানেই উপার্জনের রাস্তা আছে। এত লোক তো এইখানেই পরিত্যাগ করে অর্থোপার্জন করছে। দুজন হাফপ্যান্ট পরা, শোলার টুপি মাথায় ভদ্রলোক তাদের কাজের তদারক করছেন।

নিজের কথা বলতে বলতে হারাধনবাবু একবার মুখ বিকৃত করলেন। সেই ঘন অন্ধকারের মধ্যেও সামনেব আগুনের অংগারের রক্তাভ আভায় তাঁর মুখের সে বিকৃতি আমার অন্তত দৃষ্টি এড়ালো না। শিবাজীর অবশ্য এ সব সূক্ষ্ম জিনিষ চোখেই পড়ে না।

মুখটা বিকৃত করে হারাধনবাবু বললেন—অর্থ উপার্জন নিশ্চয়ই কোন অন্যায় বা খারাপ কাজ নয়। কিন্তু আজ যখনই প্রথম জীবনের কৃত কর্মের কথা ভাবি, মনটা তেতো হয়ে যায়। কেবল মনে হয়, ওঃ, আমি কি ভীষণ ফন্দীবাজ ছিলাম।

একটু থেমে, একটা নিঃশ্বাস ফেলে হারাধনবাবু বললেন—যাক বাবা, যা বলছিলাম তাই বলি। মানুষের খেদ, মানুষের দীর্ঘ নিঃশ্বাস, এসব প্রকাশও করতে নেই; প্রকাশ করলেও মানুষ শুনতে চায় না বাবা। এমনিতেই তো একজনের কথা আর একজন শুনতে চায় না। তার ওপর দুঃখের কথা হলে, কি মনের জ্বালা-পোড়ার কথা হলে তো কথাই নাই!

যখন হারাধনবাবু এই কথাগুলি বলছিলেন, তখন আমি তাঁর পাশে বসে অনুভব করছিলাম আমরা যে অম্বুজাক্ষবাবুকে দেখেছি, এ সে লোক নয়! আমরা যে স্বল্পবাক, নিজেকে নিয়েই সর্বদা মগ্ন, এক চতুর মানুষকে দেখেছি, ও তাই থেকে তার এক আত্মমগ্ন, চতুর চেহারা কল্পনা করে নিয়েছি তারই হাল্কা, পলকা আবরণের অন্তরাল থেকে একজন বেশ ভারী ওজনের মানুষ আত্মপ্রকাশ করছে। তার মধ্যে যে এত দুঃখ, এত যন্ত্রণা, এত আত্ম-নির্যাতন প্রচ্ছন্ন রয়েছে তা কল্পনাও করতে পারিনি। আর অনুভব করছি ওঁর এই যন্ত্রণাই ওঁকে মুহূর্তে মুহূর্তে ভারী করে তুলছে আমার কাছে। আমি কিঞ্চিৎ গাঢ় ভাবেই বললাম—না, না, আপনি বলুন, আমরা আপনার সব কথা মন দিয়ে শুনছি। আর আপনি তো শিবাজীকে জানেনই, দেখছেনও, ওর মত অমন দিলদরিয়া, দরাজদিল মানুষ সংসারে কমই হয়!

হারাধনবাবুর মুখের তিক্ততা সরে গিয়ে মুখখানিতে গাঢ় বিষণ্ণতা এসে চেপে বসল। রক্তাভ অংগারের উপর ছাইয়ের একটা পাতলা আস্তরণ পড়েছিল। শিবাজী একটা শুকনো ডাল দিয়ে আগুনটা খুঁচিয়ে দিলে। আগুনটা গন গন

করে উঠল আবার। শিরশিরানি ভাবটাও ঘন হয়ে উঠছে। ঠাণ্ডা পড়ছে যেন।

হারাধনবাবু মুখ নীচু করে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে আগুনের দিকে চেয়ে আছেন। তাঁর ছোট ছোট পিঙ্গল চোখে রক্তাভ আগুনের ছায়া নেচে নেচে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি। উনি হঠাৎ বললেন—এই কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম না, আমার কেবল মনে হয় আমি কি ভীষণ ফন্দীবাজ! এখন আবার তাই মনে হচ্ছে! মনে হচ্ছে এই যে গয়াতে চার-পাঁচদিন এসে তোমাদের গায়ে এঁটুলীর মত লেগে থেকে নিজের কথা শোনাতে এই এতদূর পর্যন্ত এসেছি এও আমার সেই ফন্দীবাজীর খেলা!

শুনতে শুনতে শিবাজী হঠাৎ নড়ে-চড়ে বসল। উদারভাবে বললে—আপনি খুনি, এমন কাঁদো কাঁদো হয়ে কথা বললে তো মুস্কিল। গল্প শুনতে আমার খুনি ভালই লাগে। বেশ লাগছিলও আপনার কথা। এখন এ সব বলছেন কেন আবার? সত্যি বলছি খুনি, এ সব শুনতে আমার খুব ভাল লাগছে না।

আমি হারাধনবাবুকে বললাম—আপনি আপনার অল্প বয়সের কথা যেখানে ছেড়েছিলেন সেইখানে ধরুন আবার। শুনতে তো ভালই লাগছিল।

হারাধনবাবুর বিষণ্ণ মুখে একটু হাসি ফুটে উঠল। বললেন—তাই বলি। আমার পোড়া জীবনের কথাই বলি তাহলে। সেই রেলের লাইনের কাজ দেখতে দেখতে পরের স্টেশনে গাড়ী থামতেই গাড়ী থেকে নেমে পড়লাম। তারপর রেল লাইনের ধার বরাবর উলটো হেঁটে যেখানে কাজ হচ্ছিল সেখানে এসে হাজির হলাম। চুপ করে দাঁড়ালাম সেই দুজন সায়েবের কাছে।

দাঁড়িয়েই আছি, দাঁড়িয়েই আছি। ওই যে বলছিলাম ধান্দা! সেই ধান্দা নিয়েই দাঁড়িয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল দেখিই না, কতক্ষণ আমাকে না দেখে থাকে। তা এক সময় ওই দুই সাহেবের একজনের নজর পড়ল ঠিক। সাহেব আমাকে একটু ভুরু কুঁচকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—কি চাই?

সঙ্গে সঙ্গে হাত জোড় করে গিয়ে দাঁড়ালাম সামনে।

আবার থেমে গেলেন হারাধনবাবু। একটু তিক্তভাবে হেসে বললেন—সংসারে এইটা সার বুঝেছি বাবা, যার কেড়ে নেবার ক্ষমতা আছে সে কেড়েই নেয়। কখনও না বলে, কখনও বলে। আর যে জানে যে তার কেড়ে নেবার শক্তি নেই সে ভিক্ষে পাবার জন্যে হাত জোড় করে। আমার কেড়ে নেবার শক্তি কোনদিনই হয়নি। তাই হাত জোড় করেই কাটালাম সারাজীবন। সেদিন প্রথমে আমার হাত জোড় করার হাতে খড়ি। হাত জোড় করে বললাম—বাবু মশাই, একটা চাকরী দিন।

আমাকে আবার একবার দু' চোখ দিয়ে আপাদমস্তক দেখে জরিপ করে নিয়ে সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন—কি চাকরী করবে ?

আরও ভাল করে হাত জোড় করে বললাম—যে চাকরী দেবেন !

জিজ্ঞাসা করলেন—কি নাম ?

এক মুহূর্তের মধ্যে মনে নানান ধান্দার কথা এসে গেল। মনে হ'ল, কি জানি বাবা, আসল নাম বলে কোন্ গোলমালে পড়ব ! তার চেয়ে একটা নাম বানিয়ে বলে দি। যা মনে এল তাই বলে দিলাম। বললাম—অম্বুজাক্ষ মুখোপাধ্যায়।

সাহেব নাম শুনে হেসে বললেন—ওরে বাবা, নাম তো জব্বর ! অম্বুজাক্ষ ! তাতেই শেষ নয়। তার ওপরে পরম কুলীন পিতা মুখ্যবংশখ্যাত ! মুখুজ্জে ! তা বাবা ব্রাহ্মণ-সন্তান, তোমাকে কি চাকরী দেব ?

আমি বুঝতে পারলাম আমার চাকরী হয়ে গিয়েছে। সেটা সায়েবের ওই মেজাজ দেখেই বুঝতে পারলাম। আমার যে মনটা ফন্দী আঁটে, তার অহরহ ফন্দী আঁটার গুণে তার বুদ্ধিতে দেবতাদের কপালের তিন নম্বর চোখের মতো একটা জ্ঞানচক্ষু আছে। সেই জ্ঞানচক্ষু দিয়ে সে সবারই মনের ভেতরটা দেখতে পায়। সেদিনও আমি তাই পেয়েছিলাম। তাই চাকরীকে পাকা করবার জন্যে আরও করুণ করে বললাম—হুজুর, যা হোক একটা চাকরী দেন, না হলে না খেয়ে মরে যাব !

ভদ্রলোক বললেন—এখানে তো সব কুলি-কাবাড়ির চাকরী বাবা। কিন্তু তুমি ব্রাহ্মণ-সন্তান, তোমাকে এখানে কোন্ কাজ দেব ?

তারপর তিনি দু' নম্বর সাহেবকে বললেন—ও মল্লিক মশাই, শুনছেন ? সব শুনলেন ?

মল্লিক মশাই মাথার টুপিটা একবার তুলে আবার নামিয়ে কাছে এলেন। বলতে বলতেই এলেন—কানে তো আর কালা নই, শুনতে তো সবই পেলাম। তা বামুনের ছেলেকে কি মাটি কাটার কাজ দেব ? দেবই বা কি করে আর পারবেই বা কেন ?

আমি বুঝতে পারছি চাকরী আমার পাকা হচ্ছে। আমি আরও মিনতি করে মিথ্যে কথাই বললাম। বললাম—তাই মাটি কাটার কাজই দেন। তাই করব ! না খেয়ে মরার চেয়ে তো সে ভাল হবে !

মল্লিক মশাই বললেন—হ্যাঁ, তোমাকে মাটি কাটতে দিই, তারপর তোমার রক্ত আমাশয় হয়ে তুমি মর, আর আমি ব্রহ্মহত্যার পাপী হই।

বলে হারাধন একটু হাসলেন। এবারের হাসিটা কৌতুকের। বললেন—

কালটার কথা একবার মনে কর বাবা। আজ থেকে আরও ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগের কথা। তখন বৃত্তি-অনুসারী সমাজ প্রায় ভেঙে গেলেও, বিভিন্ন বৃত্তিধারীর বৃত্তির কথা সমাজ একেবারে ভুলে যায়নি। তখনও ব্রাহ্মণের কাজ যজন-যাজন আর অধ্যয়ন এই বলেই ধরা হ'ত। ব্রাহ্মণেরও খাতির ছিল সমাজে। তাই ব্রাহ্মণেতর মল্লিক মশাই ওকথা বললেন।

আমি প্রায় কাঁদ-কাঁদ হবার ভান করে বললাম—আপনি একটু দয়া না করলে যে আমি এদিকে না খেতে পেয়ে মরে যাব!

টুপি-পরা মল্লিক মশাই বললেন—এই তো মুশকিলে ফেললে হে বামুনের পো! তোমাকে কি কাজ দিই বলতো বাবা!

আরও কাতর হবার ভান করে বললাম—যা হয় কিছু!

মল্লিক মশাই বললেন—বেশ, থাকতো আমার সঙ্গে। দেখি তোমাকে ক'দিন। কি রকম কি এলেম আছে তোমার দেখি। তারপর যা হয় করা যাবে।

আমি মল্লিক মশাইয়ের কাছেই সুতরাং রয়ে গেলাম।

মল্লিক মশাই রেলের কুলী-কনট্রাকটার। রেলের কাজের জন্যে কুলী সরবরাহ করেন। এবং তাদের দিয়ে রেলের ইঞ্জিনিয়ারদের তত্ত্বাবধানে রেলের লাইন তৈরী ও মেরামতির কাজ করান। থাকেন এক এক সময় এক এক জায়গায়। যেখানে রেললাইনে কাজ হয় তারই নিকটতম স্টেশনের কাছাকাছি ফাঁকা মাঠে তাঁবুর মধ্যে বাস করেন। একটা তাঁবুতে তিনি থাকেন আর থাকে তাঁর টাকা-পয়সা। অন্য একটা তাঁবুতে তাঁর চাকর-বাকররা থাকে। একটায় জিনিসপত্র থাকে, রান্নাবান্না হয়। আমার উপর করুণা-পরবশ হয়ে উনি আমাকে ওঁর নিজের তাঁবুতেই আশ্রয় দিলেন। আমার বয়স তখন আঠারো-উনিশ আর মল্লিক মশাইয়ের বয়স বছর চল্লিশ-বিয়াল্লিশ। আমাকে নিয়ে এসে বললেন—তুমি আর চাকর-বাকরদের সঙ্গে কোথায় থাকবে? আমার তাঁবুতেই থাক। তবে বাপু, একটা কথা জেনে নিই। তোমার হাতটান নেই তো? থাকলে কিন্তু বিপদে পড়বে। থানা পুলিশ, রেলের সরকারী বাবুরা সবাই আমার হাতধরা। তুমি অন্যায় করে পালালেও আমি লম্বা হাত বাড়িয়ে ঠিক ধরে ফেলব। তখন বিপদে পড়বে তুমি।

আমি আত্মপক্ষ সমর্থনে হাত জোড় করে বলেছিলাম—আমাকে সাতদিন কাছে রাখুন, তা হলেই বুঝতে পারবেন আমার গুণ বেশী না অব্‌গুণ বেশী! তাঁবুর দরজা তো আপনার বাতাসে সব সময় পত্‌ পত্‌ করে উড়ছেই। তখন যদি মনে করেন তখন আমাকে শুকনো পাতার মতো ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে দিতে পারবেন।

শোলার টুপিটা হুকে ঝুলিয়ে রেখে, গায়ের জামার বোতাম খুলতে খুলতে মল্লিক মশাই বললেন—কথাটা তো বেশ ভালই বলেছ হে! আর বেশ ভাল করেই বলেছ! তা লেখাপড়া কিছু জান না একেবারে 'ক-অক্ষর গোমাংস'?

আমার তখন মানুষটাকে মোটামুটি বোঝা হয়েছে। মানুষটাকে আমার তখন আর ভয়ও লাগছিল না। বেশ সরসভাবে হাত জোড় করেই বললাম—না বাবু, লেখাপড়া কিছুই জানি না। ভাল কথা কিছুই শিখি নাই। তবে ওই ভাল করে বলার যে কথা বললেন সেটা আপনার বামুনের ছেলে বলেই হয়ে যায়!

মল্লিক মশাই সাহেবি পোশাক ছেড়ে ধুতি পরতে পরতে বললেন—তাই তো বলছিলাম হে, তুমি বামুনের ছেলে, তোমাকে দিয়ে ছোট কাজ করাই কি করে! আচ্ছা দেখি সাত দশ দিন।

তা সাত দশ দিন দেখতে হ'ল না। চার পাঁচ দিনের মাথায় আলাপ বেশ গাঢ় হয়ে জমে উঠল। প্রথম দু'দিন যেতেই একদিন দেখলাম মল্লিক মশাই সন্ধ্যেবেলা একটু দেরি করেই একটু রঙীন হয়ে ফিরলেন। চোখ রাঙা, পা টলছে, হাত কাঁপছে, মুখখানাও থমথমে। তাঁবুতে ঢুকতেই আমাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। আমার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন—তুমি? তুমি কে হে?

আমি কেমন ভয় পেয়ে গেলাম। বললাম—কেন বাবু, আমাকে আপনি চিনতে পারছেন না? আমি অম্বুজাক্ষ। আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন আপনি!

আরও খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে মল্লিক মশাই বললেন—আমি তোমাকে তা হলে আশ্রয় দিয়েছি। এ তাঁবু তা হলে আমার? তোমার নয়?

বেশ মজা লাগল, ভয়ও লাগল। হাত জোড় করে বললাম—না বাবু, এ তাঁবু আমার হতে যাবে কেন? এ তো আপনার!

হেসে মল্লিক মশাই বললেন—আমারই তো! তা আমি মদ খেয়ে এলাম। ভাবলাম তোমার তাঁবু, তুমি যদি ঢুকতে না দাও! তা আমারই তাঁবু যখন তখন তো ঢুকতে কোনো হুকুম লাগবে না। কি বল?

—কি যে বলেন বাবুমশাই! আপনি বসুন আপনার খাটে, আমি আপনাকে বাতাস করি!

—বসব খাটে?

—হ্যাঁ, বসুন।

আমি তাঁকে সাহস করে ধরে খাটে বসিয়ে দিলাম। তারপর হাতপাখা নিয়ে বাতাস করতে লাগলাম। তারপর বললাম—বাবু, একটু জল খাবেন? জল খান।

তারপর তাঁকে জল খাওয়ালাম, গায়ের জামা খুলে দিলাম। তারপর জোরে জোরে বাতাস করতে লাগলাম। উনি জামা খুলে আমার হাতে তুলে দিতে দিতে জড়ানো গলায় বললেন—দেখো হে মুখুজ্জে, পকেটে অনেক টাকা-পয়সা আছে। যেন খোওয়া না যায়।

আমি জামাটি ভাল করে তুলে রাখতে রাখতে বললাম—কাল সকালে উঠে সব গুণে-গেঁথে নেবেন বাবু!

বাতাস করতে করতেই দেখলাম উনি শুয়ে পড়লেন, তারপর আস্তে আস্তে নাক ডাকতে লাগল। আমি ওঁকে যত্ন করে শুইয়ে নিজের বিছানায় গিয়ে বসলাম। মাঝখানে একবার গায়ে ঠেলা দিয়ে ডাকবার চেষ্টা করলাম। বললাম—বাবুমশাই, রাত হ'ল। এইবার উঠে খান।

উনি বিড় বিড় করে কি বলে পাশ ফিরে শুলেন।

আমি ওঁর মাথার কাছে উঠে এসে বসলাম। বসে বসে ঢুললাম।

সকালে উনি কখন উঠেছেন জানি না। এক সময় আমাকে ধাক্কা দিয়ে ডেকে তুলে বললেন—হ্যাঁ হে, কাল রাত্তিরে তুমি খাওনি?

—আজ্ঞে না বাবু, আপনি খাননি। আমি খাই কি করে?

আমার মুখের দিকে কটমট করে চেয়ে মল্লিক মশাই বললেন—কি ক'রে খাই! তাই তো!

তারপর অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম।

তারপর বললেন—চল, রাত্তিরে খাওনি যখন তখন খাওয়া যাক।

আমার দরটা আরও খানিকটা বাড়িয়ে নিলাম। আমার ফন্দীবাজ মনই আমাকে পরামর্শটা দিলে। হাত জোড় করে বললাম—বাবুমশাই, আমি তো এখনও স্নান-আহ্নিক কিছুই করিনি। বামুনের ছেলে তো! কিছুই জানি না। তবে ওইটুকু করি!

মল্লিক মশাই নিজেকেই তিরস্কার করলেন—দেখ তো কাণ্ড! বামুনের ছেলেকে আশ্রয় দিয়ে তাকে সারারাত না খাইয়ে রেখেছি!

আমাকে বললেন—বেশ, যাও, চানটান যা করবার করে এসো। আমিও চান করে নি।

মল্লিক মশাই স্টেশনের কুয়োতলায় চান করতেন, আমি চান করতাম কখনও কাছেই একটা পুকুরে, কোনোদিন কুয়োতে।

আমি মল্লিক মশাইয়ের কাপড়, গামছা, ফতুয়া সব ঠিক করে তাঁর কাছে নামিয়ে দিলাম। তিনি বললেন—তুমি আসবে না?

আমি বললাম—আজ্ঞে, আমি পুকুর থেকে চান করে পুকুরঘাটেই জপতপ সেরে আসি।

—তাই যাও। তাড়াতাড়ি এসো।

কাছেই পুকুর। যত লম্বা চওড়া, তেমনি কাজল-কালো জল, তেমনি নিঝিবিলি। কাছের গ্রামের লোকেরা চান করতে আসে। তারা নামে এক ঘাটে। তার উল্টো দিকের এ পাড়ের ঘাটে নামে স্টেশনের আর স্টেশনে আউতি-যাউতি লোকেরা। আমি সেই স্টেশনের লোকের ঘাটে নামলাম।

স্নান করছি আর পুকুরের ও-পাড়ের ঘাটের দিকে চেয়ে বুকের রক্ত থলবল করছে। ক'টা অল্প-বয়সী মেয়ে স্নান করছে ও-ঘাটে। কোনো পুরুষ মানুষ নেই। শুধু ক'টা মেয়ে। তাদের ঘড়া নামানো রয়েছে ঘাটে। তার গায়ে সকালের রোদ পড়ে চক-চক করছে। কোমর পর্যন্ত জলে নেমে গামছা দিয়ে গা রগড়াতে গিয়ে একটু মুখ ফিরলেই চোখে সেই আলোর ছটা বাজছে। আমার বার বার বুকটা ধ্বক-ধ্বক করে উঠেছিল চোখে ছটা লাগলেই। মনে হচ্ছিল ওই ছটায় যেন কোন ইশারা লুকনো আছে! ও-দিকের ঘাট থেকে মেয়েদের টুকরো কথা, হাসি সব ওই ছটার সঙ্গে মিশে গিয়ে একটা প্রকাণ্ড হাতছানির মতো মনে হচ্ছিল আমার কাছে।

বাবা, তোমরা কিছু মনে ক'রো না আমার কথা শুনে। আমি বুড়ো হয়েছি। আজ বাদে কাল মরার ডাক আসবে। আজ তোমাদিকে নিজের কথা, দরকারে পড়ে শোনাতে এসে, অল্প-বয়সের কাম আর কামনার দাগধরা কথা শুনতে তোমাদের অবাক লাগবে, হয়তো খারাপও লাগবে। কিন্তু সেদিনের কথা ঠিক ঠিক মত না বললে আজকের আমাকে, আর সেই সঙ্গে আমার মনের কথাও তো তোমাদের বুঝাতে পারব না। তাই বলছি, শোন একটু ক্ষমা-ঘেন্না করে।

কি বলব বাবা, সেই ইশারাকেই যেন জোরদার করবার জন্যে একটা অল্প-বয়সী মেয়ে সাঁতার দিয়ে জল তোলপাড় করতে লাগল ও-দিকের ঘাটে। গামছায় গা ঘষতে ঘষতে তার হাঁটু পর্যন্ত জলে-ভেজা পা দু'খানা দেখতে পাচ্ছি। সে দু'খানাও রোদে যেন দু'খানা দায়ের মতো ঝক-ঝক করছে! আর সেই সঙ্গে হাসি! মিথ্যে মিথ্যে, অকারণ হাসি।

আমার মনে হতে লাগল আমাকেই লক্ষ্য করে যেন মেয়েটা সাঁতার কাটছে। আর সহ্য হ'ল না। আমি জলে ডুব দিলাম। বার বার কতকগুলো ডুব দিয়ে জলে দাঁড়িয়ে পৈতে ধরে জপ করতে লাগলাম। জপ না ছাই! জপের ভান

করে ওদের যতক্ষণ দেখা যায় দেখে জল থেকে উঠে এলাম। ওরা ও-ঘাট থেকে বোধহয় ভাবলে কি একজন ধার্মিক লোক জপতপ করছে। আমি তো জানি আমি কি করছিলাম! আমি যখন জল থেকে ভিজে কাপড়ে উঠে এলাম তখন আমার বুকে গলা পর্যন্ত বোঝাই টইটুম্বুর নেশা। তখন ভুলেই গিয়েছিলাম আমি কোথায় আছি, কোথা থেকে কোথায় স্নান করতে এসেছি, স্নানের পর আমার কি কাজ আছে!

স্নান করার পর সেটা খেয়াল হ'ল। মনে হ'ল, এঃ, এ তো বড্ড দেরি হয়ে গেল! মল্লিক মশাই স্নান করে আমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকবেন। আমি হন হন করে আমার আস্তানার পথ ধরলাম। অর্ধেক পথ এসেছি, এমন সময় দেখলাম একজন কুলী আমাকে খুঁজতে আসছে। সে আমাকে লম্বা লম্বা পা ফেলে আসতে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। আমি কাছে আসতে সে বললে—বাবু আপনাকে খুঁজতে পাঠালেন।

তাঁবুর কাছে এসে দেখি মল্লিক মশাই রোদের মধ্যে তাঁবুর সামনে পায়চারি করছেন। আমাকে দেখে তিনি চটে উঠলেন। বললেন—তুমি তো আচ্ছা বামুন হে, তুমি সেই যে গেলে আর তোমার পাত্তা নাই! আমি তো ভাবলাম তুমি অজানা পুকুরের জলে ডুবে মলে! তা আমার ভাগ্যি ভাল, তুমি ডুবে মর নাই!

আমার মনে তখন সেই ঘড়ায় আলোর ছটা, টুকরো হাসি, জলে-ভেজা আলো লাগা দু'খানা পায়ের ছবি আমার মনকে নেশায় টইটুম্বুর করে রেখেছে। তবু কি অবলীলাক্রমেই মিথ্যে কথা বলে ফেললাম। খুব বিনয় করে বললাম—দোষ নেবেন না বাবু। স্নান করে ঘাটে জপ করতে করতে ভুলে গিয়েছিলাম।

বলেই বুঝলাম এই বোকা লোকটার কাছে আমার দর আরও খানিকটা বেড়ে গেল। মল্লিক মশাই বললেন—তা বেশ করেছিলে। এখন এস, খিদে লেগেছে, খাই। আর এখন এই অল্প-বয়েস, এত জপতপ করা কেন?

আবার অবলীলাক্রমে মিথ্যে কথা বললাম—আজ্ঞে, বামুনের ছেলে, লেখা-পড়া করি নাই। থাকবার মধ্যে ওই জপতপটুকুই আছে বাবু! ওটুকু গেলে আর কি নিয়ে থাকব বাবু?

মল্লিক মশাই আমার দিকে চেয়ে শুধু বললেন—আমার তো মহাভাগ্যি হে, যে, তোমার মতো মানুষকে কাছে পেয়েছি। এখন এস, খাবে এস।

খেতে বসলাম দু'জনে। সে খাওয়া আজও মনে আছে বাবা! ভারী আদর আপ্যায়ন করে সেদিন মল্লিক মশাই গ্রাম দেবতাকে ভোগ দেবার মতো করে

আমাকে খাইয়েছিলেন। পাকা কলা, গরম দুধ, ভাল সুগন্ধী ধানের চিঁড়ে বালিগুড় সহযোগ এক পেট ভর্তি করে খেয়ে, এক এক ঘটি জল খেয়ে ঢেকুর তুলে মুখ ধুয়ে এলেন মল্লিক মশাই।

তারপর আমাকে বললেন—চল এবার।

আমাকে একটা ছাতা দিয়ে বললেন—মাথায় দাও।

উনিও শোলার টুপির উপর ছাতা মাথায় দিলেন।

পথে বেরিয়ে বললেন—টাকা-পয়সা তুমি ঠিক ঠিক রেখেছ। তুমি আজ থেকে আমার টাকাকড়ি সব রাখবে। আর সারাদিনের হিসেব রাখবে। বুঝলে?

তারপর পথে যেতে যেতে বললেন—মা মনসার গল্প জান?

হেসে বললাম—আজ্ঞে তা জানি। অনেক গল্পই তো জানি। আপনি কোন গল্প বলছেন তা তো জানি না।

মল্লিক মশাই বললেন—এক বেনের মেয়েকে আশ্রয় দিয়ে মা মনসা বলেছিলেন—দেখ বেনের মেয়ে, সব দিক পানে চাইবি দক্ষিণ দিক পানে চাইবি না। তা আমি তোমাকে বাবা, একটা কথা বলে রাখছি। যেদিন সন্ধ্যে বেলা আমি তাঁবুতে থাকব সেদিন তুমি সন্ধ্যে বেলাটা তাঁবুর ধারে-কাছে আসবে না। আমি তোমাকে ডাকলে তবে আসবে তুমি।

আমি বোকা সেজে বললাম—আমি তা হলে কোথায় যাব তখন?

মল্লিক মশাই বললেন—তুমি তখন বরং রান্নার তাঁবুতে থেকো। হিসেবপত্র লিখো। নয়তো যদি প্রাণ চায়, বাইরে বেড়িয়ে বেড়িও।

আমি অবাক হয়ে ওঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। উনি আমার মুখের সরল, গোবেচারা ভাব দেখে বললেন—ও সময়টা বাবা, আমি মা মনসার বিষ গিলি আর বিষ ওগলাই! বুঝলে? ও সময় আমার সামনে তোমার মতো মানুষের না আসাই ভাল।

আমার সাহস হয়ে গেল বাবু কেমন। হেসে বললাম—সে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনি ঘরে এসে বসবেন, আর আমি হাওয়া হয়ে যাব!

সেই দিনই সন্ধ্যে বেলা।

সারা দিনের তাতের পর ঝিরঝিরে বাতাস মেলেছে। আকাশের পূব দিকে চাঁদ উঠছে একখানা পুরো থালার মতো লালি দিয়ে। মল্লিক মশাই কাজের জায়গা থেকে আমাকে আগেই ছুটি দিয়ে বলেছিলেন—তাঁবুর ভেতরটা একটু সাফ- সুতরো করে রেখো।

ওঁর কথা থেকে বুঝেছিলাম, উনি আজ রেলের বাবুদের সঙ্গে মদ খেতে যাবেন না, তাঁবুতেই ফিরে আসবেন।

উনি ফিরে এলেনও। উনি তাঁবুতে ঢুকলেন, আমি ওঁর জামা-কাপড় ছাড়িয়ে, বাতাস করে ঠাণ্ডা করে, ওঁর জামা টাকা-পয়সা গুছিয়ে রেখে বললাম—বাবু, আজকের খরচটা বলুন। তহবিল মিলিয়ে রাখি।

আমি কাগজ-কলম নিয়ে বসলাম, উনি হিসেব দিতে লাগলেন। আমার লেখা শেষ করে, টাকা মিলিয়ে বেরিয়ে গেলাম।

বাইরে তখন চাঁদের আলো ফুটেছে।

আমি হাওয়া হয়ে গেলাম।

সারাদিন ধরে সেই পুকুর-ঘাটের কথাই ভেবেছি। হাওয়া হয়ে যদি আমাকে মিলিয়ে যেতেই হয় ওই পুকুরের ধারে গিয়েই বসি।

মল্লিকবাবু আমাকে মুখে আর কিছু বললেন না যখন তখন আমি পায়ে পায়ে ওই পুকুরের দিকেই চললাম।

আপনার বাড়ী তো বাবা বর্ধমান-বীরভূমের দিকে। আপনি বললেই বুঝতে পারবেন। মস্ত উঁচু পাড়ওয়ালা শাহী পুকুর, পাড়ের মাটি শক্ত পাথুরে। গাছপালা বিশেষ নাই, ঝোপ-জঙ্গল তো নাইই। থাকবার মধ্যে এখানে-ওখানে এক-আধটা প্রকাণ্ড বট কি অশ্বত্থের গাছ, আর মেলা তালগাছ।

আমি আস্তে আস্তে চাঁদের নরম আলো ছড়ানো আলো-আঁধারির মধ্যে পায়ে পায়ে চলতে চলতে পুকুরের পাড়ে গিয়ে পৌঁছুলাম।

পুকুরের ধার, চারিপাড় নিস্তব্ধ। ঝিরঝিরে বাতাসে পুকুরের জলে ছোট ছোট ঢেউ উঠছে, চাঁদের আলোর নরম ছটা তাতে ধরা পড়ছে। একটা অশ্বত্থ গাছের পাতা বাতাসে কাঁপছে ঝিরঝির করে। পুকুরের চারিপাড় চাঁদের আলোয় আবছা ফিকে ফিকে চেনা যায়। কিন্তু অশ্বত্থ গাছের তলাটা অন্ধকার। আমি পুকুরের গাঁয়ের দিকের যে ঘাট সেই ঘাটে পা ধুয়ে অশ্বত্থ গাছের তলায় গিয়ে বসলাম। বসলাম সাধু সেজে। মনে মনে ভেবেও রাখলাম যদি কেউ এদিকে দৈবাৎ এসে আমাকে কিছু জিজ্ঞাসাই করে তাহলে বলব, দেখ বাবা, ব্রাহ্মণের ছেলে, হাত-মুখ ধুয়ে এই নারায়ণরূপী অশ্বত্থ গাছের নীচে সন্ধ্যাজপ করতে বসেছি। এই দেখ হাতের আঙুলে পৈতে জড়ানো।

কিন্তু কে আর আমাকে এই ঝিমঝিমে নির্জন সন্ধ্যায় কোনো কথা জিজ্ঞাসা করতে আসছে?

অশ্বত্থতলায় বসলাম বটে আঙুলে পৈতে জড়িয়ে, কিন্তু মন পড়ে থাকল ঘাটের দিকে।

ঘণ্টা দুয়েক বসে থেকে উঠলাম। সন্ধ্যে সাতটার ডাক-গাড়ীখানা গুমগুম করে চলে গেল। আমি পায়ে পায়ে ফিরে এলাম আমার আস্তানায়।

আমি পুকুর, মাঠ পার হয়ে স্টেশনের সীমানায় পা দিয়ে আমাদের তাঁবুর কাছাকাছি পৌঁচেছি এমন সময় দেখলাম আমাদের তাঁবুর পরদা ঠেলে কে একজন বেরিয়ে এল। তারপর মাথায় ঘোমটা টেনে আমার দিকেই হন হন করে এগিয়ে আসতে গিয়ে আমাকে হঠাৎ সামনে দেখে ঘোমটাটা আরও খানিকটা লম্বা করে দিয়ে আমাকে পাশ কাটিয়ে সাদা ছায়ার মতো পাশ দিয়ে যেন উড়ে চলে গেল।

বুকটা ধ্বক করে উঠল আমার!

মল্লিক মশাই তাহলে এই জন্যে আমাকে সন্ধ্যে বেলা তাঁবু থেকে হাওয়া হয়ে যেতে বলেছিলেন?

আমি আর তাঁবুর ভেতর গেলাম না।

তাঁবুর বাইরে জ্যোৎস্নায় বালি চিক চিক করছে চারদিকে। কোথাও ঘাস, কোথাও বালি। আমি সেইখানে গিয়ে চুপ করে বসলাম। চোখের সামনে যতদূর নজর যায় ততদূর জ্যোৎস্না ধু-ধু করছে।

আমার বুকের ভেতরটা কেমন করতে লাগল। গলা পর্যন্ত শুকিয়ে উঠল আমার। যার জন্যে মল্লিক মশাই আমাকে তাঁবুতে ঢুকতে বারণ করেছিলেন, তারই জন্যে আমার নিজের বুকের ভেতরটাও যে শুকিয়ে আছে। হা হা করছে।

এমন সময় ডাক শুনলাম তাঁবুর ভেতর থেকে—ও হে অম্বুবাবু, আছ নাকি ধারেকাছে? থাক তো এস তাঁবুর মধ্যে।

বুকের কষ্ট বুকের ভেতর চেপে তাঁবুর ভেতর ঢুকলাম—ডাকছিলেন বাবু?

—হ্যাঁ, ডাকছিলাম তো! আজ খাওয়া-দাওয়া হবে না?

দেখলাম মল্লিক মশাইয়ের মুখে আর ঘরের মধ্যে মদের গন্ধ উঠছে। কিন্তু মল্লিকবাবুর নেশা হয়নি। তার মানে বেশী মদ খাননি তিনি। মনে মনে ভাবলাম, আজ আর ওঁর মদের নেশার দরকার হয়নি। পুরুষ মানুষের জীবনের সব চেয়ে বড় নেশাতেই তো উনি আজ মেতেছিলেন। বললাম—আপনি হুকুম করলেই হবে। খাবার দিতে বলব?

—বল। আজ তো মাংস রান্না করতে বলেছিলাম।

এক সঙ্গে সামনা-সামনি বসে খেলাম দু'জনে। আমি কিন্তু ভাল করে খেতে পারলাম না সেদিন। কি করে খাব? একজন নিজের মনের আর দেহের সব নেশা মিটিয়ে তোফা আরামে বিছানায় শুয়ে পড়ল, আর আমি সব জ্বালা বুকে চেপে খাব কি করে?

মল্লিক মশাই শুয়ে পড়লেন। আমি মশারি টাঙিয়ে ওঁকে শুইয়ে দিলাম। তারপর বাইরের ফিনকি ফোটা জ্যোৎস্নার মধ্যে মাঠে বসে রইলাম।

কি আর করব?

আমি জানি না, কিন্তু এমনি কষ্ট কি সবারই হয়? অল্প-বয়সে?

তখন আমি জানতাম না। পরে বুঝেছি—না, সবারই তা হয় না। ও আমার একটা রোগ ছিল। না, ঠিক রোগও নয়। আমার ভাগ্যই আমার মনে ওই রকম চেহারা নিয়ে ক্ষ্যাপাত আমাকে।

শিবাজী হঠাৎ বললে—ই সব কিস্‌সা খুনি আমাদের শুনে কি হবে? আপনি বুঢ্‌ঢা আদমি, আমাদেরও খুনি বয়েস হয়েছে। ই সব 'গপ্‌' ছোকরাদের আচ্ছা লাগবে। আপনি বলছেনই খুনি কেন, আমরা শুনছিই খুনি কেন বুঝতে পারছি না।

আমার মনও সেই কথাই অন্যভাবে বলছিল। আমার মনে হচ্ছিল, বয়স হলেও লোকটির মনে কামের সম্পর্কে একটি বিকৃত ও অপবিতৃপ্ত তৃষ্ণা রয়ে গিয়েছে। তাই একদিকে একই সঙ্গে এক ধরনের অপরিতৃপ্ত কামবোধে ও তজ্জনিত অপরাধবোধে পীড়িত হয় এবং সেই পীড়ন থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য যত্রতত্র শ্রোতা খুঁজে বেড়ায়। তবে আজি শুনতে ভাল না লাগলেও ভদ্রতা-বোধেই চুপ করে ছিলাম।

হারাধবাবু পরোক্ষভাবে তিরস্কৃত হয়ে মাথা নীচু করে চুপ করে রইলেন। তাঁব মুখের আনত ভঙ্গি দেখে মায়াও হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল বলি—তারপর?

হারাধনবাবু বললেন—আমি দেখেছি বাবা, আমার কথা কেউ শুনতে চায় না।

আরও অনেক কিছু বোধ হয় বলতে যাচ্ছিলেন হারাধনবাবু। তার আগে শিবাজী বলে উঠল—আরে, আপনি খুনি এত দুখ্‌ পাচ্ছেন কেন? আপনি যা বলতে এসেছেন তা জরুর শুনব খুনি। পারলে আপনার 'কোই জরুরৎ' থাকলে উভি খুনি ঠিক করে দোব, মদত দিয়ে দোব। আপনি কোই চিন্তা করবেন না।

ঠিক এই সময়েই চামারিয়া এসে ডাকলে—বাবুজী সাহাব, খানা তো তৈয়ার হো গয়া!

শিবাজী হৈ হৈ করে উঠল—কি বানিয়েছিস রে ?

আমি লক্ষ্য করেছিলাম চামারিয়া বেশ কিছুক্ষণ আগে থেকে আমাদের পিছনে এসে দাঁড়িয়ে আছে।

চামারিয়া হাসিমুখে এগিয়ে এসে বললে—খিচ্ড়ী আওর মোর্গা !

—ব্যস, ব্যস, বহত খুব ! চলুন হারাধনবাবু।

হারাধনবাবু বললেন—আমি তো ওসব খাই না বাবা।

—ওঃ, তাই তো ! তা হলে ?

চামারিয়া আরও একটু এগিয়ে এসে বললে—বাবুজী সাহাব ভুলে গিয়েছেন। গয়া থেকে আসবার সময় বলে দিয়েছিলেন। পণ্ডিতজীর জন্যে ফল মিঠাই লায়ে হেঁ।

তাঁর হাত ধরে টেনে শিবাজী বললে—ব্যস, ব্যস, চলিয়ে।

চামারিয়া বললে—ওঁর জন্যে কলা মিষ্টি এনেছি। তা ছাড়া আমাদের এখানে পেঁপে, বাতাবী লেবু যোগাড় করে রেখেছি। পণ্ডিতজীর খাওয়ার কোনো অসুবিধা হবে না।

বলে সে ডাকলে—আসুন পণ্ডিতজী।

হারাধনবাবু চামারিয়ার সঙ্গে উঠে চলে গেলেন মাথা নীচু করে।

আমি উঠলাম শিবাজীর সঙ্গে। হারাধনবাবু চলে গেলে শিবাজী বললে—জান ভাগনা, লোকটার মনে খুনি বহত 'দর্দ' আছে। কিন্তু লোকটা এমন সব কথা বলছিল যা ভাল লাগছিল না শুনতে। লোকটার মাথার স্ক্রু ভি থোড়া বহত ঢিলা হ্যায়।

আমরা বাংলোয় উঠে গিয়ে খেতে বসলাম। একটু শীত শীত তো লাগছিলই। এখন আগুনের তাত থেকে উঠে এসে ঠাণ্ডাটা আরও বেশী বেশী লাগতে লাগল, তাতে খিচুড়ী আর মুর্গীর ঝোল গরম গরম খেতে ভালই লাগছিল। আরাম করেই খাচ্ছিলাম কিন্তু মনটা বেশী করে পড়েছিল মামার ডাইরীতে !

সতেরো

খেয়ে গিয়ে শুয়ে পড়লাম।

কতকাল আগে আর একবার ক'দিন কাটিয়ে গিয়েছিলাম এই ঘরেই। স্যুটকেশ থেকে মামার প্যাকেটটা বের করে খাটে বসলাম। কেরোসিনের বাতিটা টেবিলের ওপর রেখে টেবিলটা মশারির কাছে মাথার দিকে টেনে আনলাম।

খুলে ফেললাম প্যাকেটটা।

প্যাকেটের মধ্যে দু'খানি সরু সরু রুলটানা খাতা। খাতার মলাটে কিছু লেখা নেই। প্রথম খাতাখানা খুলে ফেললাম। প্রথমেই পেলাম একখানি ভাঁজ-করা কাগজ। খুললাম কাগজখানি। মামা আমাকেই চিঠি লিখেছেন। লিখেছেন—শ্রীমান চাঁদু, আমি দুইখানি খাতায় তোমার জন্য কিছু লিখিয়া রাখিয়া গেলাম। এ লেখা শুধু তোমারই জন্য। তুমি বুদ্ধিমান। অনেকদিন পূর্বে তুমি যখন তোমার শ্বশুরের অফিসে চাকরী করিতে তখন একবার ব্যবসা সূত্রে তোমাদের অফিসের এক মহিলা টাইপিষ্ট সহ তুমি এখানে আসিয়া শিবাজীর গয়ার জঙ্গলে কয়েকদিন ছিলে। তখন ঘটনাচক্রে শিবাজীকে কয়েক-দিন ওই অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মহিলাটি সহ জঙ্গলে থাকিতে হইয়াছিল। তুমি সে সময় শিবাজী সম্পর্কে ওই মহিলাটির কোনো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ঘটিতে পারে তাহা সন্দেহ করিয়া আমার কাছে ইঙ্গিত করিয়াছিলে। তাহাতে আমি কিঞ্চিৎ বিরক্তি সহকারেই বোধহয় বলিয়াছিলাম—অতিরিক্ত গল্প-উপন্যাস পড়িয়া তোমাদের মাথায় নানা বিচিত্র কল্পনা ঢুকিয়াছে। শিবাজী সম্পর্কে তোমার ধারণা ঠিক নয়। আমি তোমাকে ঠিকই বলিয়াছিলাম। পরে আমি নিজের মনে নিঃসংশয় হইলেও বিষয়টি নিজে যাচাই করিয়া দেখিয়াছি। ওই নোংরা মেয়েটি এখন তোমার শ্বশুরের চাকরী ছাড়িয়া শিবাজীর সহিত ও এখানকার একজন এস. পি.র সহিত পূর্বপরিচয়ের সূত্রে এখন এই গয়া সহরেই কাঠের ব্যবসা করিতেছে। তাহাব সহিত আমাব ঘনিষ্ঠ পবিচয়ও হইয়াছে। তাহার নিকট এ সম্পর্কে যতটা সম্ভব অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি। যাহা মনে হইয়াছে তাহাতে আমার ধারণাই সত্য বলিয়া মনে হইয়াছে। শিবাজীর সম্পর্কে ইঙ্গিতে একবার আসল কথাটাও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তাহাতে লরা লজ্জার হাসি হাসিয়া সারা হইয়াছিল। এবং শেষে লজ্জা সত্ত্বেও অসংকোচে অতি পরিতৃপ্তির সঙ্গে বলিয়াছিল, দাদোজী, শিবাজী ইজ্ জেম অব এ ম্যান। বাট হি ইজ জাষ্ট এ বিগ বেবী! শিবাজীর 'জেম' হওয়ার চেয়ে 'বিগ বেবী' হওয়াতেই আমি আশ্বস্ত হইয়াছিলাম।

কিন্তু এ পত্র আমি লরার সহিত শিবাজীর সম্পর্কে লিখিতেছি না। উহা আমার জানা কথা। এ পত্র আমি ভিন্ন কারণে লিখিতেছি। যাহা লিখিতেছি তাহা ভিন্ন কারণে। এই দুইখানি খাতায় কিছু বিচিত্র কথা তোমার জন্য লিখিয়া রাখিয়া গেলাম। তুমি তাহা যত্ন সহকারে পড়িও। তারপর প্রয়োজন বোধ করিলে কাছে রাখিও। নয়তো নষ্ট করিয়া ফেলিও।

শিবাজীকে আমি বড় ভালবাসি। আমার পুত্র নাই। তুমি আমার ভাগিনেয়। কিন্তু শিবাজীকে আমি পুত্রের ন্যায় গণনা করি ও ভালবাসি। ইহা হইতে তুমি শিবাজীকে ভাল করিয়া চিনিতে পারিবে।

পত্র শেষ।

ডাইরীর প্রথম পৃষ্ঠায় চোখ রাখলাম।

"শিবাজীর সহিত আমার পরিচয় তাহার বাল্যকাল হইতেই। তাহার পিতা ত্রৈলোক্যবাবু গয়া সহরে একজন বহুমানভাজন পুরুষ ছিলেন। তাঁহার উকীল হিসাবে খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা ও বিত্তশালিতার জন্যই যে, তাঁহার প্রধান খ্যাতি ছিল তাঁহার দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কি বলিতে পারি, তাঁহার চারটি পুত্রের কেহই তাঁহার মতো হয় নাই। প্রথম তিন পুত্র কিছু কিছু লেখাপড়া শিখিয়াছে বটে, কিন্তু চরিত্রের দিক দিয়া অতি অপকৃষ্ট মানুষ।

ব্যতিক্রম কেবল এই শিবাজী।

শিবাজী তাহার অন্য ভাইদের মতো লেখাপড়া শেখে নাই। কিন্তু পিতার চরিত্রের সমস্ত পবিত্রতা, সারল্য ও মহিমাটি যেন লাভ করিয়াছে। মধ্যে মধ্যে আমার মনে হয় যেন ঈশ্বর ত্রৈলোক্যনাথের চরিত্রের পবিত্রতা ও সারল্যকে সম্পূর্ণ করিবার জন্যই তাঁহাকে শিবাজীর মতো পুত্র দিয়াছিলেন। আর সেই-জন্যই বোধহয় তাহার লেখাপড়া হয় নাই। তাহার চরিত্র এত নির্মল ও এত সরল যে আধুনিক পার্থিব বিদ্যার সামান্যতম জটিলতা ও কৃত্রিমতা তাহার সহ্য হয় নাই। শিবাজীকে সময় সময় আমার নিষ্কলুষ, অকলঙ্ক ঋষ্যশৃঙ্গের মতো মনে হয়। এমন কি সময় সময় তাঁহাকে ওই পৌরাণিক ঋষির মতো অধিক পবিত্র মনে হয়। কারণ ঋষি পৃথিবীর ছলাকলা কিছুই জানিতেন না। কিন্তু শিবাজী সংসারের সমস্ত ছলনারই সংবাদ রাখে। কিন্তু তাহাকে অতিক্রম করিবার শক্তি রাখে।

শিবাজী সম্পর্কে আমার এ ধারণা ভ্রান্ত কি না তাহা লইয়া আমি মধ্যে মধ্যে বেশ ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিয়াছি। মধ্যে মধ্যে আমার মনে হইয়াছে আমি কি অতিরিক্ত স্নেহাসক্ত হইয়া তাহার সম্পর্কে এই সব আজগুবী, অপার্থিব, অবাস্তব ধারণা পোষণ করিতেছি? কিন্তু বার বার চিন্তা করিয়াও আমি আমার চিন্তায় ভুল দেখিতে পাই নাই। তাহার সম্পর্কে আমার স্নেহ অতি প্রবল ইহা সত্য। আবার তাহার চরিত্র যে দেবতাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর ইহাতেও কোনো ভুল নাই।

তাহার ওই স্বভাবের জন্যই আধুনিক কালের নগর-সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্রস্থল

এই গয়া সহর তাহার জন্মস্থান ও পিতৃভূমি হওয়া সত্ত্বেও সেখানে তাহার স্থান হইল না। তাহাকে কার্যকারণে বাস করিবার জন্য যাইতে হইল অরণ্যের মধ্যে। যে অরণ্যে আমাদের ঋষিরা আশ্রমিক জীবন যাপন করিতেন, জনপদ হইতে দূরে অরণ্যের ছায়ায় থাকিয়া নিজেদের দেহ ও মন অমলিন ও পবিত্র রাখিতেন, ঈশ্বর শিবাজীর জন্য সেই অরণ্যভূমিই নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন। অরণ্যেই শিবাজীর বাস উপযুক্ত হইয়াছে।

কিন্তু তাহার জীবনযাপন নিশ্চয় ঋষিদের মতো নয়। হইলেই আশ্চর্যের কারণ হইত। শিবাজী জন্মসূত্রেই প্রায় অকলঙ্ক চরিত্র, জন্মশুদ্ধ। যে যদি অরণ্যে বাস না করিত তাহা হইলে ওই দেড় দুই শত দরিদ্র পরিবারকে কে প্রতিপালন করিত?

শিবাজী অরণ্যমধ্যেই বাস করে। মাসে একদিন কি দুইদিন এক দুর্দান্ত কিশোরের মতো হা হা করিয়া একমুখ হাসি লইয়া এক বুক আনন্দ লইয়া আমাব ঘরে, আমার কোলে আসিয়া ঝাঁপাইয়া পড়ে। আমি মাসের মধ্যে এই একটি কি দুটি দিনের জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিয়া থাকি। ও অরণ্যের সমস্ত সৌন্দর্য, সকল অকপটতা লইয়া আমার ঘর মাতাইয়া তোলে। আমি তাহার সাহচর্যে সে সময়টা বড়ই আনন্দে কাটাইয়া থাকি।

সেবার আসিয়া শিবাজী আমার নিকট বিচিত্র প্রস্তাব করিল। তাহার জঙ্গলেব অধিবাসী যাহারা তাহারা সেখানে সপরিবারে বাস করে। চন্দ্রশেখরের মুখে একবার এই লইয়া শিবাজীকে ঠাট্টা করিতে শুনিয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল শিবাজীর মাউলী সৈন্যবাহিনী। সেই সৈন্যবাহিনীর দলপতির নাম চামারিয়া। চামারিয়া একাধারে শিবাজীর বাহিনীর সেনাপতি এবং অমাত্য। শিবাজীর সেনাবাহিনী অবশ্য যুদ্ধ করে না, তাহারা জঙ্গলে শিবাজীর অধীনে কাঠ-কাটার কাজ করে, গাছ পোঁতে, জঙ্গল রক্ষণা-বেক্ষণ করে। শিবাজী প্রস্তাব করিল এই চামারিয়ার স্ত্রী ও কন্যাকে সে আমার বাড়ীতে রাখিতে চায়। রাখার প্রধান উদ্দেশ্য চামারিয়ার কন্যা সুরসতিয়াকে গয়ার ইংরাজী ইস্কুলে ভর্তি করিয়া পড়াইতে চায়।

আমি শিবাজীকে সঙ্গে সঙ্গে সম্মতি দিতে পারি নাই। বলিয়াছিলাম, ভাবিয়া দেখি। তাহাতে শিবাজী বোধ হয় মনে মনে কিঞ্চিৎ দুঃখিত হইয়াছিল। অবশ্য সে মুখে আমাকে কিছু বলে নাই। শুধু বলিয়াছিল, আপনি সম্মতি না দিলে আমাকে আবার কোনো পৃথক ব্যবস্থার কথা ভাবিতে হইবে।

অন্য কেহ হইলে আমি সঙ্গে সঙ্গে সম্মতি জানাইতাম। সুরসতিয়া ও তাহার

মাকে আমি দেখিয়াছি! শিবাজীর সহিত আমার বহুবার তাহার জঙ্গলে অরণ্যবাসের কারণ ঘটিয়াছে। সেই সময়ই ওই দুই মাতা-কন্যাকে ভাল করিয়া দেখিয়াছি। শিবাজীর বাহিনী এবং তাহাদের পরিবারে যাহারা বাস করে এই মাতা-কন্যাকে আমার সব সময়েই তাহাদের হইতে পৃথক বলিয়া মনে হইয়াছে। মাতা এবং কন্যা উভয়েই বেশ সুন্দরী। চামারিয়ার সহিত অমন সুন্দরী কন্যার কি করিয়া বিবাহ হইল তাহাও বার বার ভাবিয়াছি। তাহা ছাড়া সুরসতিয়া মাকে চামারিয়ার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট মনে হইয়াছে। দেখিয়া শুনিয়া বার বার আমার মনে হইয়াছে ইহার মধ্যে কোনো রহস্য আছে।

তাই যদি ইহার মধ্যে কোনো রহস্য থাকে উহাদের আশ্রয় দিবার পূর্বে আমার তাহা বিশদ জানা প্রয়োজন। তাহা ছাড়া আরও কথা আছে। আমি নিজে অকৃতদার ব্যক্তি। আমি প্রৌঢ় হইলেও পুরুষ মানুষ, এবং সাধু-সন্ন্যাসীও নহি। এই অল্প-বয়সী যুবতী স্ত্রীলোক লইয়া একাকী বাস করিব ইহাতে দুই দিক হইতেই বাধা আছে। আমার মনের মধ্যে আমারই দ্বিধা, এবং দ্বিতীয়ত সামাজিক নিন্দা। লোকে কি বলিবে? লোকে কোন দৃষ্টিতে দেখিবে? আমি শিবাজীর মতো এদিক দিয়া নিস্পৃহ লোক নহি। শিবাজী নিজে সাধু-সন্ন্যাসী না হইয়াও স্ত্রীলোকের লোভকে অবলীলাক্রমে এড়াইয়া যাইতে পারে। সে শক্তি তাহার আছে, আমার নাই।

শিবাজীকে ফিরাইয়া দিয়া মনটা খারাপ হইয়া গেল; অথচ তাহাকে যে পরিষ্কার সম্মতি জানাইয়া বলিব, উহাদের লইয়া আইস, তাহাও পারিতেছি না। মনের দ্বিধা কিছুতেই যাইতেছে না।

প্রায় একপক্ষ কাটিয়া গেল, শিবাজীর দেখা নাই। মনে মনে তাহার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছিলাম। এমন সময় আর একটি নূতন ঘটনা ঘটিয়া গেল। একদিন সন্ধ্যায় বেড়াইয়া বাড়ী ফিরিতেছি, দেখি আমার বাড়ীর বাহিরের বারান্দায় একজন লোক বসিয়া আছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে যথাসম্ভব ভাল করিয়া দেখিয়াও তাহাকে চিনিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনি কে? কোথা হইতে আসিতেছেন?

ভদ্রলোক বারান্দা হইতে নামিয়া আসিয়া আমাকে হাত জোড় করিয়া নমস্কার করিয়া বলিলেন—আপনি আমাকে চিনিবেন না। আমার নাম অম্বুজাক্ষ মুখোপাধ্যায়। আমাকে অনেকে হারাধন মুখোপাধ্যায় বলিয়াও জানে।

আমি বলিলাম—কিন্তু আমি তো আপনাকে চিনি না!

আগন্তুক হাসিমুখে বলিল—আপনি আমাকে চেনেন না। তবে আমি আপনার নাম শুনিয়া আপনার কাছে আসিয়াছি।

আমি হাসিয়া বলিলাম—আমি যে একজন এত খ্যাতিমান ব্যক্তি তাহা তো আমার জানা ছিল না!

তাহাতে অম্বুজাক্ষ বা হারাধন নামীয় আগন্তুক বিন্দুমাত্র দমিত হইল না। খুব বিনয়ের সঙ্গে হাত জোড় করিয়া জানাইল—আপনার জানা না থাকিলেও আমি অবগত আছি। এবং আপনার দয়া ভিক্ষা করিবার জন্যই আসিয়াছি।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—কি ধরনের দয়া করিতে হইবে জানিতে পারিলে বলিতে পারি, দয়া করার সাধ্য ও সামর্থ্য আমার আছে কি না।

ভদ্রলোক বলিলেন—আপাততঃ আজ রাত্রির মতো আমাকে আশ্রয় দিন। তারপর আমার বক্তব্য শুনিয়া যেরূপ অভিরুচি হয় করিবেন।

ভদ্রলোককে আশ্রয় দিলাম। রাত্রিতে আমার আহার্যের অংশ দিলাম। তাঁহার ও আমার জন্য শয্যাও রচনা করিলাম। বাঙালী ব্রাহ্মণ যখন তখন আর তাঁহাকে ফেলিয়া দিই বা অনাদর করি কি করিয়া?

শুইবার পূর্বে ভদ্রলোক আবার হাত জোড় করিয়া বলিলেন—এইবার যদি একটু সময় করিয়া আমার কাহিনী ও প্রার্থনা শুনেন?

বলিলাম—বলুন।

ভদ্রলোক বলিতে আরম্ভ করিলেন। দেখিলাম, ভদ্রলোক বেশ গুছাইয়া কথা বলিতে পারেন। আরম্ভটা বেশ ভালই হইয়াছিল। কিভাবে নারী ও অর্থের লোভে বৃদ্ধ পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া আঠারো বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করেন সেই বলিয়া নিজের কাহিনী বর্ণনা শুরু করিলেন।

শুনিতে লাগিলাম।

প্রায় ঘণ্টাখানেক শুনিবার পর আমার নিদ্রাকর্ষণ হইল। আমার মনে হইল, ভদ্রলোক অনর্থক বকিয়া মরিতেছেন। উনি ঠিক কি বলিতে চান তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না। পুরা একঘণ্টা বকার পরও বুঝিতে পারিলাম না। তদুপরি তাঁহার আঠারো বৎসর বয়সের নারীলোলুপতার কাহিনী শুনিয়া আমার কি লাভ? উহা শুনিতেও অশুচি লাগিতেছে। যদিও তিনি ক্ষণে অনুশোচনা ও অনুতাপ প্রকাশ করিতেছেন তবু শুনিতে ভাল লাগিতেছে না। ভদ্রলোককে কটু কথা বলিতে ইচ্ছা হইতেছিল, অথচ তাহা মুখে উচ্চারণ করিতে ভদ্রতায় বাধিতেছিল।

তাই অন্য পথ ধরিলাম। কোমলভাবেই বলিলাম—মুখুজ্জে মহাশয়, এখন আপনার বয়স কত?

বলিলেন—এই একষট্টি পার হইয়া বাষট্টি চলিতেছে।

শুনিয়া হাসিয়া বলিলাম—এই তো এক ঘণ্টা কথা বলিলেন, অথচ ইহার মধ্যে আপনার জীবনের এক বৎসরের কাহিনীও সম্পূর্ণ হইল না। তাহা হইলে আপনার বর্তমান জীবনের কাহিনীতে পৌঁছিতে বেশ কয়েক রাত্রি পার হইয়া যাইবে। আর আপনার কাহিনী এমন কিছু মুখশ্রাব্য নয় যে উহা আরব্য রজনীর উপাদেয় কাহিনীর মতো রাত্রির পর রাত্রি জাগরণ করিয়া শুনিতে হইবে।

বলার সঙ্গে সঙ্গে দেখিলাম, ভদ্রলোকের মুখখানি পাংশু ও বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি অধোবদনে নীরব রহিলেন।

আমার বলিয়া খুব অনুশোচনা হইল। মনে হইল কথাগুলা না বলিলেই পারিতাম।

ভদ্রলোক ব্যথিতভাবে বলিলেন—অমৃতবাবু, আমি সংক্ষেপে অন্যভাবে বলিতে চাই, কিন্তু বলা হয় না। আমার মধ্যে যে দুষ্কৃতকারী আছে সে আমার দুষ্কর্মের স্তূপের উপর বানরের মতো বসিয়া আমাকে সবিস্তারে নিজের দুষ্কর্ম বর্ণনা করিতে প্রবুদ্ধ করে। জানেন অমৃতবাবু, আমার এই অপকর্মের মধ্যেই ভাগ্য আমার জন্য শাস্তিস্বরূপ বিষের পাত্র রাখিয়া গিয়াছে। নিজের বিষকে নিজের অন্তরেই বহন করিয়া ফিরিতেছি।

আমি তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়া বলিলাম—বলুন, বলুন। তবে সংক্ষেপে বলুন।

ভদ্রলোক ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন—সংক্ষেপেই বলিতেছি। শুনুন।

আমার দ্বারা কিঞ্চিৎ তিরস্কৃত হইয়া ভদ্রলোক সংক্ষেপেই আত্মকাহিনী বর্ণনা করিতে লাগিলেন। সেই রেললাইনের কনট্রাকটার, নাম বোধহয় কি এক মল্লিক, তাঁহার বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়া তিনি সেই এক জায়গাতেই তাঁবুতে সেই মল্লিক মহাশয়ের কাছে দুই-আড়াই বৎসর কাটাইলেন। এই দুই আড়াই বৎসরে তিনি বেশ কিছু টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। আর সেই সঙ্গে সঞ্চয় করিয়াছিলেন একটি স্থানীয় পল্লীকন্যার প্রীতি। প্রেম বলিলেই বোধহয় ঠিক বলা হয়।

কোনো যুবক যৌবনে কোনো স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্ত হইবে ইহাতে হয়তো দোষের কিছু নাই। কারণ যৌবনের ধর্মই ওইরূপ। উহাকে নিন্দা করিয়া কোনো লাভ হয় না। কিন্তু তাহার একটা সামাজিক পটভূমি থাকে, ও সেই অনুযায়ী রুচি-অরুচি এবং ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন একই সঙ্গে থাকিয়া যায়। এক্ষেত্রে

ওহে হারাধনবাবু যদি স্বজাতির ও স্ববর্ণের কোনো কুমারী কন্যার প্রতি মুগ্ধতা পোষণ করিতেন তাহা হইলে তাঁহার কোনো ত্রুটি বা অসুবিধা কোনোটাই হয়তো ঘটিত না। কিন্তু কি বলিব! কোনো কুমারী কন্যার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িত না। তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইত তাঁহার নিজের সমবয়সী স্ত্রীলোকের উপর। তাহারা হয় বিধবা, কিম্বা স্বামী-পরিত্যক্তা কন্যা। স্বামীগৃহ হইতে তাড়িত হইয়া পিতা কি ভ্রাতার গৃহে স্থান পাইয়াছে।

এসব কথা লিখিতে তো লজ্জা বটেই। শুনিতেও আমার লজ্জা ও ক্লেশবোধ হইতেছিল। হারাধনবাবুর এই বিকৃত রুচিই তাঁহার সকল দুর্ভাগ্যের কারণ। এই কারণেই তিনি নিকটস্থ গ্রামে এক স্বামীপরিত্যক্তা স্বচ্ছন্দবিহারিণীর সহিত দিনে দিনে ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠেন। সমস্তটাই বলা বাহুল্য, লোকচক্ষুর অগোচরেই ঘটিয়াছিল। স্ত্রীলোকটি প্রায় হারাধনবাবুরই সমবয়সী। তাহার উপর রঙ্গিনী। রঙ্গিনী বলিয়াই এই পূর্ণযৌবনা নারীর সহিত তাঁহাব দ্রুত ঘনিষ্ঠতা হওয়া সম্ভব হইয়াছিল।

এই ঘনিষ্ঠতার কথা কতকাল আর গোপন থাকিবে? সহস্রচক্ষু ঈশ্বরের সর্বব্যাপী দৃষ্টির একটা অংশ তো সমাজের দৃষ্টির মধ্য দিয়াই প্রতিভাত হয়! সমাজের মধ্যে কোনো কিছু যতই গোপনে সংঘটিত হোক তাহা একদিন-না-একদিন সমাজের দৃষ্টিতে ধরা পড়িবেই।

মেয়েটির নাম বুঝি উর্মিলা। এইসব নামকরণ শুনিয়া মধ্যে মধ্যে হাসি আসে। কুচরিত্রের সম্বলিত চরিত্রেব মানুষকে কত পবিত্র নামে ভূষিত করা হয়! এই কন্যাটির উর্মিলা নামকরণও খানিকটা সেই রকম। যাই হোক, উর্মিলার আত্মীয়-স্বজন এই ঘনিষ্ঠতার কথা জানিতে পারিয়া একদিকে তাহাকে গৃহের সীমার মধ্যে লাঞ্ছিত করিতে থাকিল, অন্যদিকে উর্মিলার ভাই ও গ্রামের ছেলেরা হারাধনকে সুযোগমতো পাইলে প্রহার করিবার কথাও চিন্তা করিতে লাগিল। গৃহের অভ্যন্তরে ক্রমাগত আবদ্ধ থাকিয়া একদিন সন্ধ্যার অবকাশে উর্মিলা প্রায় ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া তাঁবুর কাছে আসিয়া নিঃশব্দে পাথরের টুকরা ছুঁড়িয়া হারাধনের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে সমস্ত অবস্থা জ্ঞাত করিল। হারাধনও তুখোড় বুদ্ধিমান ও অতি সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন পুরুষ। তিনি বোধহয় অবস্থাটা পূর্বাহ্নেই অনুমান করিয়া সতর্ক হইয়াছিলেন। অতঃপর অদূর ভবিষ্যতে গ্রামের যুবকদের হাতে নিদারুণ প্রহারের আশঙ্কা আছে জ্ঞাত হইয়া তিনি সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিলেন। পলায়ন করিতে হইবে। এখান হইতে পলায়ন করিতে হইবে।

কিন্তু চিন্তা করিতেই প্রায়ান্ধকারের মধ্যে উর্মিলার দীর্ঘাঙ্গ, পরিপূর্ণ দেহ ও কামনা-বিচ্ছুরিত দুই চক্ষু দেখিয়া হারাধনের বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়া উঠিল। দীর্ঘদিনের অসামান্য চেষ্টায় যে মন ও দেহ তাঁহার এত কাছে আসিয়া প্রায় তাঁহার সম্পূর্ণ আয়ত্তে আসিয়াছে সেই বহু সাধনায় করায়ত্ত ধনকে ফেলিয়া যাইতে তাঁহার মন সরিতেছিল না। তিনি আবেগ-কম্পিত গাঢ় নিম্ন কণ্ঠে উর্মিলাকে হাত ধরিয়া প্রশ্ন করিলেন—উর্মিলা, আমাকে এ স্থান হইতে চলিয়া যাইতে হইবে। তুমি আমার সঙ্গে যাইতে রাজী আছ?

উর্মিলা এক মুহূর্ত চিন্তা না করিয়া তাঁহার অন্য হাতখানি ধরিয়া বলিল—যাইব। কিন্তু তুমি আমাকে কোনোদিন পরিত্যাগ করিবে না তো?

এক্ষেত্রে পুরুষ যাহা বলে যুবক হারাধনও তাহাই বলিলেন। বলিলেন—যদি আমার মধ্যে কোনোদিন সে প্রবৃত্তি ও ইচ্ছা প্রত্যক্ষ কর, তবে তোমাকে আমার আজ এই মুহূর্ত হইতে নির্দেশ দেওয়া থাকিল, তুমি সেইদিনই আমার অন্নে আমার অজ্ঞাতে বিষ মিশ্রিত করিয়া দিও।

ইহার পর আর কি বলার আছে?

উর্মিলার সহিত হারাধনের গৃহত্যাগ নির্দিষ্ট হইয়া গেল। স্থির হইল, পরদিন মধ্য রাত্রিতে যে প্যাসেঞ্জার ট্রেন আসে তাহাতে তাহারা দুইজনে এ স্থান ত্যাগ করিয়া পশ্চিমে চলিয়া যাইবে। এবং মধ্যরাত্রির কিছু পূর্বে উর্মিলা ঠিক এইখানে আসিয়াই তাহার জন্য অপেক্ষা করিবে।

পরদিন সকাল হইতেই তাঁহার প্রভু মল্লিকবাবুর অগোচরে সে আপনার জিনিসপত্র গুছাইয়া ঠিক করিয়া রাখিল। নিজের টাকাকড়ি তাহার নিজের কাছেই থাকিত। টাকাও তাহার হাতে কম জমে নাই। নিজের মাহিনার টাকা সে কুলীদের মধ্যে ধার দিয়া সুদে খাটাইত। সব মিলিয়া তাহার হাতে প্রায় আট-নয়শো টাকা মজুত। সুতরাং অর্থের কোনো চিন্তা নাই।

সুন্দরী যুবতী নারী ও থলেভর্তি টাকা লইয়া তিনি যাত্রার জন্য প্রস্তুত। সারাদিন তিনি নিজের প্রভু মল্লিকবাবুকে নানাভাবে সেবা করিলেন। প্রথম রাত্রিতেই ভাল করিয়া আহার করিয়া মল্লিকবাবুকে দেখাইয়া শয্যাও গ্রহণ করিলেন। তাহার পর মল্লিকবাবুর নাসিকাধ্বনি প্রবল হইলে টাকার থলি কোমরে বাঁধিয়া, নিজের ছোট টিনের বাক্সটি লইয়া সংকেতস্থলে উপস্থিত হইলেন। ওদিকে সিগন্যালের সবুজ আলো যেন তাঁহাকে নির্ভয় করিয়া আহ্বান করিতেছিল।

বুকের ভিতরটা দুরু দুরু করিতেছে। উর্মিলা যদি না আসে! হারাধনবাবু

সে সিদ্ধান্তও করিয়া রাখিলেন। যদি নাই আসে তবু তিনি এ স্থান আজই এই ট্রেনেই পরিত্যাগ করিবেন।

রাত্রি কতটা আন্দাজ করা কঠিন। তবে এখনও বোধহয় মধ্যরাত্রি হয় নাই। কিন্তু ওকি! স্টেশনে টিকিটের ঘণ্টা পড়িতেছে! সিগন্যালের সবুজ আলো লাল হইয়া গেল যে!

তাহা হইলে তিনি কি করিবেন? দারুণ দ্বিধার মধ্যে হারাধন অস্থির হইয়া পড়িলেন। না, আর নয়। আর দেরি করা চলে না। তিনি নিজের বাক্স-হাতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর একবার উর্মিলা যে দিক হইতে আসিবে সে দিকে চাহিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। না পাইয়াও তিনি আর অপেক্ষা করিলেন না। তিনি স্টেশনের দিকে হাঁটিতে লাগিলেন। কয়েক পা অগ্রসর হইয়া আবার থমকিয়া দাঁড়াইয়া পিছন ফিরিয়া দেখিলেন। নাঃ, কেহ নাই। পিছনে যতদূর দেখা যায়, কেহ নাই। তিনি হাঁটিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ চলিবার পর অনুভব করিলেন কেহ যেন পিছনে আসিতেছে। তিনি আবার দাঁড়াইলেন। এই সময় আবছা চাঁদ উঠিতেছিল। তাহারই অস্পষ্ট আলোয় দেখিলেন কে খুব দ্রুত আসিতেছে। উর্মিলা? না, কোনো আততায়ী? মনে খুব ভয় পাইলেও হারাধন দাঁড়াইলেন। হ্যাঁ, উর্মিলাই। সে ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া তাঁহার হাত ধরিল। এবং হাঁফাইতে লাগিল।

হারাধন দেখিলেন উর্মিলার সমস্ত দেহখানা দ্রুত আসায় দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে। তাঁহার বুকের রক্ত দ্রুততালে চলিতে লাগিল। কিন্তু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার হৃদ্‌স্পন্দন থামিয়া যাইবার মতো হইল। মুখের জায়গা জায়গা কাটিয়া গিয়াছে। ভুরু ও ঠোঁট ফুলিয়া আছে। নির্যাতনের চিহ্ন। সে হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিল—বাঃ, তুমি বেশ খাসা পুরুষ মানুষ! তোমার উপর নির্ভর করিয়া, বহু প্রহার ও নির্যাতন ভোগ করিয়া আমি সমাজ, সংসার সব ত্যাগ করিয়া তোমারই ভরসায় পলাইয়া আসিলাম, আর তুমিই আমাকে ফেলিয়া চলিয়া যাইতেছিলে?

এসব কথার উত্তর না দিয়া হারাধন তাহার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিলেন—তাড়াতাড়ি চলিয়া এস, ট্রেনের সিগন্যাল দিয়াছে। ওই দেখ দূরে ট্রেনের আলো দেখা যাইতেছে। এসব কথার উত্তর ট্রেনে উঠিয়া দিব।

বলিয়া হারাধন তাহার হাত হইতে পোঁটলাটা লইয়া জোরে হাঁটিতে লাগিলেন এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই স্টেশনে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারই পিছন পিছন তাঁহার জামার প্রান্ত ধরিয়া উর্মিলা হাঁফাইতে হাঁফাইতে আসিতেছে। তাহার

উষ্ণ নিঃশ্বাস বার বার তাঁহার ঘাড়ে ও পিঠে তিনি অনুভব করিতেছেন। এক সময় জামার প্রান্ত ছাড়িয়া দিয়া উর্মিলা তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিল ও হাঁটিতে থাকিল। এই উষ্ণ নিঃশ্বাস, এই ঘামে-ভেজা হাতের স্পর্শে প্রতি মুহূর্তে জীবনের অর্থ যেন বদল হইয়া যাইতেছে।

তাঁহারা স্টেশনের উল্টাদিকের প্লাটফর্মে দাঁড়াইলেন। ট্রেন আসিল, তিনি প্রথমে উর্মিলাকে তুলিয়া পরে নিজে উঠিলেন। ট্রেন ছাড়িয়া দিল।

উর্মিলা ও তিনি সেই মুহূর্তে একসঙ্গে নিজের বিগত জীবন ও ভবিষ্যৎ জীবন ও ভাগ্য তিনকেই এক অগ্নিশিখায় সমর্পণ করিলেন।

ট্রেনে খুব একটা ভিড় ছিল না। ট্রেনের কামরার আলোতে উর্মিলার আহত সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহাব চোখে জল আসিল। আকস্মিক কেমন একটা কষ্টে বুকের ভিতরটায় কেমন একটা আবেগ জাগিয়া উঠিল। তাহারই স্পর্শে তাঁহার ঠোঁটে ও চোখে বোধহয় সেই বেদনার আভাস জাগিয়া উঠিল।

হারাধন আমাকে বলিয়াছিলেন—সেই একবার, মাত্র একবারই আমি উর্মিলার জন্য গভীর বেদনা অনুভব করিয়াছিলাম। আবও দুই-একবার তাহার জন্য কাঁদিয়াছি। কিন্তু সে ভিন্ন কথা।

হারাধনের ব্যথিত মুখ ও সজল চোখ দেখিয়া অত নির্যাতন সত্বেও গভীর তৃপ্তি অনুভব করিয়াছিল উর্মিলা। সে হাসিয়া মৃদুস্বরে হারাধনকে বলিয়াছিল—ছি, পুরুষ মানুষের চোখে জল দেখিলে লোকে কি বলিবে?

তাঁহাবা দুইজনে জায়গা করিয়া লইয়া গল্প করিতে করিতে আনন্দের সঙ্গে যাত্রা করিলেন। তখন কি দুইজনেব একজনও জানিতেন তাঁহাদের ভাগ্যে কি আছে!

ট্রেনেই তাঁহারা আলোচনা করিয়া স্থির করিলেন তাঁহারা বিহারের কোনো স্টেশনে নামিবেন। এবং দেখিয়া বুঝিয়া সেইখানেই থাকার ব্যবস্থা করিবেন। হারাধনবাবু বিচক্ষণ মানুষ। পরের একটা জংসন স্টেশনে নিজেই চেকারের খোঁজ করিয়া দুইখানা আরা পর্যন্ত টিকিট কাটিয়া লইলেন। এবং আরাতেই দুইজনে ট্রেন হইতে নামিলেন।

অপরিচিত স্থান। কোথায় যাইবেন কি করিবেন ভাবিয়া একজন কুলিকেই হারাধন নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। এমন সময় দেখিলেন তাঁহারই পাশ দিয়া একজন দীর্ঘাকৃতি বিশালকায় গৌরবর্ণ পুরুষ নানাজন পরিবৃত হইয়া তাঁহাদের পার হইয়া যাইতেছেন।

তিনিও এই ট্রেনেই নামিয়াছেন। হারাধন তাঁহাদের বড় জিনিসপত্র ও অনেক

মানুষের মাঝখানে কিছুক্ষণ-আগেই ট্রেনের কামরার সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছিলেন। তাঁহার আশ্চর্য লাগিয়াছিল মানুষটার চেহারা দেখিয়া। কি লম্বা লোকটা! সকলের মাথা ছাড়াইয়া তাঁহার মাথা উঠিয়াচে। অনেক লোকজনের মাথার উপর দিয়া তিনি তাঁহাদের দুইজনকে একবার লক্ষ্য করিতেও দেখিয়াছেন।

তাঁহাদের পাশ দিয়া যাইতে যাইতে ভদ্রলোক একবার থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন। হারাধনবাবুর দিকে চাহিয়া হিন্দীতে বলিলেন—আপনারা কোথায় যাইবেন?

হারাধন হিন্দী জানেন না। তিনি বিব্রত হইয়া পড়িলেন। উর্মিলাও ঘোমটা দিয়া মুখ ঢাকিল। ভদ্রলোক উর্মিলার দিকে চাহিয়াই বলিতেছিলেন। ভদ্রলোকের অল্প বয়স। কিন্তু সামনের কিছু চুল পাকা। তাহাতে আরও সুন্দর দেখাইতেছিল ভদ্রলোককে। এ ধরনের সৌন্দর্য হারাধন কখনও দেখেন নাই।

হারাধনকে বিব্রত দেখিয়া তিনি বলিলেন—আপনারা বাঙালী? আমি বাংলা জানি। পাটনায় আমার অনেক বাঙালী দোস্ত আছেন।

তিনি ভাঙা ভাঙা বাংলায় কথা বলিতে লাগিলেন। কুলিদের সঙ্গে কাজ করিতে গিয়া হারাধনের যেটুকু হিন্দী জ্ঞান জন্মিয়াছিল সেই ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে তিনি জবাব দিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। তাহাতে ভদ্রলোক হারাধনকে হাসিয়া বলিলেন—আপনি বাংলাতেই উত্তর দিন। আমি বাংলা বুঝিতেও পারি।

কয়েকটি কথা বলিয়াই তিনি প্রকৃত অবস্থাটা জ্ঞাত হইয়াছিলেন। সব শুনিয়া তিনি হারাধনকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনাদের সঙ্গে জিনিসপত্র কি আছে? হারাধন তাঁহার টিনের স্যুটকেশ ও উর্মিলার পোঁটলা দেখাইয়া দিতে তিনি হাসিয়া বলিলেন—এহি ব্যস?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। দরিদ্র লোক। আর মাত্র তো দুইজন স্বামী স্ত্রী।

ভদ্রলোক শুনিয়া একটু হাস্য করিলেন মাত্র। তারপর পাশের একজনকে ইঙ্গিত করিলেন জিনিস দুইটি উঠাইবার জন্য। সঙ্গে সঙ্গে একজন একহাতে স্যুটকেশ ও অন্যহাতে পোঁটলাটি তুলিয়া লইল।

হারাধন অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কিন্তু আমি তো কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। আপনিই বা কে, আমার জিনিস লইয়া আমরাই বা কোথায় যাইব, কিছু বুঝিতেছি না তো!

ভদ্রলোক ততক্ষণে চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যাইতে যাইতেই তিনি ঈষৎ

হাসিয়া বলিলেন—দেখিতেছি এই অপরিচিত স্থানে আপনাদের আশ্রয় নাই। সেইজন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিতেছি। আর নাম জানিতে চাহিতেছেন? আমার নাম সুরিন্দর নারায়ণ সিং! বিহারের সকলেই আমাকে চেনে।

ইহার অধিক কিছু না জানিয়াই হারাধন ও উর্মিলা সেই শোভাযাত্রার অংশ হইয়া গেল।

স্টেশনের বাহিরে আসিয়া বাবু সুরিন্দর নারায়ণ তাঁহার দলের লোকদের বিবিধ আদেশ দিয়া এক টমটম গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। ও চলিয়া গেলেন হারাধনেরই চোখের সামনে দিয়া।

একজন লোক তাঁহাকে বলিল—আসুন আমার সঙ্গে।

—কোথায়?

লোকটা হারাধনবাবুর প্রশ্ন শুনিয়া অবাক হইয়া বলিল—হুজুর বাহাদুর হুকুম করিয়া গেলেন আর তুমি প্রশ্ন করিতেছ? তিনি তোমাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তোমার চাকরীরও ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া গেলেন।

লোকটি তাঁহাদের দুইজনকে লইয়া বেশ কিছুদূর হাঁটিয়া শহরের একটি নির্জন নিরিবিলি অঞ্চলে একটি ছোট্ট খোলার বাড়ীতে প্রবেশ করিল।

বেশ নির্জন নিরিবিলি বাড়ী। দুইখানি ঘর, খানিকটা বারান্দা। সামনে পিছনে ঘেরা। সামনে বেশ খানিকটা নানান গাছে ঘেরা জায়গা, পিছনেও তাই। এই নির্জন নিরিবিলি বাড়ীখানি হারাধন এবং উর্মিলা দু'জনেরই বড় ভাল লাগিল।

যে লোকটি তাহাদের লইয়া আসিয়াছিল সে অতঃপর প্রচুর ছুটাছুটি করিয়া পরিষ্কার বাড়ী আবার ঝাড়ু দিয়া পরিষ্কার করিয়া, জল তুলিয়া, ঠিক ঠিক জানলার কাছে শুইবার জন্য চৌকি রাখিয়া তাঁহাদের দুইজনের থাকিবার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করিয়া দিয়া বলিল—তোমরা আরাম কর, আমি তোমাদের জন্য খাবার লইয়া আসি। হুজুর বাহাদুর বলিয়াছেন, আজ রান্না করিতে হইবে না। আজ বাজার হইতে কিনিয়া খাইবার ব্যবস্থা কর। কাল হইতে রান্না করিবে।

লোকটি চলিয়া গেলে উর্মিলার সহিত প্রথম একা হইয়া দুইজনে দুইজনের দিকে চাহিয়া আনন্দে মশগুল হইয়া গেলেন। দুইজনেরই যত আনন্দ, তত বিস্ময়।

হারাধন বিস্ময়ে অবাক হইয়া উর্মিলাকে বলিলেন—ঈশ্বরের কি অদ্ভুত করুণা বলতো? এই অজানা, অপরিচিত বিদেশে কেমনভাবে তিনি আমাদিগকে রক্ষা করিলেন এবং আশ্রয় দিলেন!

উর্মিলা বোধহয় তত বিস্মিত হয় নাই, তবে খুশী বোধহয় সে হারাধনের চাইতে

বেশী পরিমাণেই হইয়াছিল। সে তো হাসিয়া কুটোকুটি। সে হাসিয়া বলিল—আমারই ভাগ্য বলিতে হইবে। স্বামীর ঘর তো পাইয়াও পাই নাই। এতদিনে ঘর পাইলাম বটে। দেখিবার মতো ঘরও বটে। তবে আমার ভাগ্যে এ ঘর এখন টিকিলে হয়।

তাহার হাসির অর্থ হারাধন সেদিন ধরিতে পারেন নাই। কিন্তু তাহার কথাতে তিনি কিঞ্চিৎ ভয় পাইয়া বলিয়াছিলেন—কেন, এমন কথা বলিতেছ কেন ?

উর্মিলা নিজের হাসি সংযত করিয়া বলিয়াছিল—না, বিশেষ কোনো কারণে বলি নাই। নিজের ভাগ্যকে তো জানি! এত সুখ আমার ভাগ্যে সহিবে কি না তাই ভাবিতেছি। সেই জন্যই বলিলাম।

গভীর প্রেমে গদগদ হইয়া হারাধন উর্মিলাকে দুই হাতে আলিঙ্গন করিয়া ধরিলেন। উর্মিলা সে আলিঙ্গনে আত্মসমর্পণ করিল বটে, কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সংযত হইয়া হারাধনকে বলিল—এখন ছাড়িয়া দাও। আমি তো এখন সারাজীবনই তোমার থাকিলাম। তবে আর ব্যস্ততা কিসের ?

হারাধন তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। অতি বুদ্ধিমান মানুষ তিনি। তিনি অনুভব করিতে লাগিলেন যেন উর্মিলা কত পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে।

উর্মিলা তাঁহাকে হাসিয়া বলিল—যাও, স্নান করিয়া এস। স্নানাহার করিয়া এখন খানিকটা ঘুম দরকার।

দিবানিদ্রা তখন প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময় দরজায় করাঘাত হইল। খালি চৌকিতে শুইয়াই তাঁহারা দুইজনেই যথেষ্ট বিশ্রামসুখ উপভোগ করিয়াছেন। দরজা খুলিয়া দিতেই দেখা গেল সকালের সেই লোকটি মাথায় একটা মস্ত বিছানার বোঝা লইয়া দরজার মুখে দাঁড়াইয়া আছে।

হারাধন তো অবাক। তিনি দেখিয়া বুঝিয়াও প্রশ্ন করিলেন—এসব কি ?

লোকটি ঘরে চৌকির উপর বিছানার বাণ্ডিলটি নামাইয়া দিয়া বলিল—বিস্তারা। বিছানা। খালি চৌকিতে আপনাদিকে শুইতে হইতেছে বিবেচনা করিয়া হুজুর বাহাদুর পাঠাইয়া দিলেন। থোড়া বাদ আপনাদের বাসনপত্র ও বাজার আসিবে। সন্ধ্যায় হুজুর বাহাদুর নিজেও একবার দেখিতে আসিতে পারেন।

সন্ধ্যার পূর্বে সমস্ত কিছুই, এমন কি লড়কি পর্যন্ত আসিয়া গেল। কোথা হইতে কেমন করিয়া সবকিছু নির্বিবাদে যে সম্পন্ন হইল তাহা বুদ্ধিমান হারাধনও বুঝিতে পারিলেন না। এমন কি না-চাহিতেই স্নানের ঘরের শূন্য চৌবাচ্চা যখন আবার ভরিয়া উঠিল, এবং উনানে আগুন জ্বলিয়া উঠিল তখন হারাধন অবাক। তিনি উর্মিলাকে বলিলেন—হয়তো সিংহ মহাশয় আসিবেন। তাহার পূর্বে গা

ধুইয়া ফেল। উর্মিলা তাঁহার পরামর্শ শুনিয়া গা ধুইতে চলিয়া গেল। এ ঘরে বসিয়া হারাধন সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিলেন, উর্মিলা স্নানের ঘরের ভিতরে গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতেছে। তাঁহার মনে হইল, উর্মিলার গানের গলাটি বড় মিষ্ট। যে লোকটি সমস্ত যোগাড় করিতে সারাদিন ব্যয় করিয়াছে সেই লোকটি এখন কোথা হইতে একটি ভারী চেয়ার লইয়া আসিল। চেয়ারটি বারান্দায় রাখিয়া বলিল—যদি হুজুর বাহাদুর আসেন তাঁহার বসিবার জন্য।

অতঃপর সে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া হুজুর বাহাদুরের কথা বলিতে লাগিল। বাবু সুরিন্দর নারায়ণ সিং আরা জেলার এক বিখ্যাত তালুকদার। বিখ্যাত এক খানদাজী বংশের বংশধর তিনি। এ জেলায় তাঁর বহু তালুক, দেহাতে বহুত জমি। তাঁহার চেহারা দেখিয়াই তিনি কত অভিজাত তাহা এক দৃষ্টিতে বুঝিতে পারা যায়। তিনি লেখাপড়া শিখিয়াছেন, আবার শিকার খেলায়ও বহুত মজবুত। বাহাদুর আদমি। যত সাহস তত জেদ। সংসারে যদি কিছু তিনি চান তবে তাহা তিনি পাইবেনই।

এখন নতুন বাঙালী বাবুকে তিনি যখন দয়া করিয়াছেন তখন আর বাঙালী বাবুর চিন্তার কোনো কারণ নাই। বাঙালী বাবু নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন।

কথা বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল, এমন সময় নির্জন অঞ্চলে ঘুঙুরের টুং টুং শব্দ উঠিতেই সেই বক্তা সেবকটি লাফাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল এবং ব্যস্ত-সমস্তভাবে বলিল—হুজুর বাহাদুর আসিতেছেন।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বাবু সুরিন্দর নারায়ণের টমটম আসিয়া থামিল হারাধনবাবুর গৃহের সম্মুখে। টমটমের লাগাম ও চাবুক সহিসের হাতে দিয়া লালপ্রাংশু দীর্ঘদেহ সিংহ মহাশয় টমটম হইতে রেকাব ব্যবহার না করিয়াই লাফাইয়া নামিয়া পড়িলেন ও গৃহের ছোট্ট কাঠের ফটক খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। সেবক ছুটিয়া গিয়া পূর্বেই কাঠের ফটকের দরজা তাঁহার সম্মানার্থে খুলিয়া ধরিয়াছিল। এবং হারাধনও এই সসম্ভ্রম শ্রদ্ধা প্রদর্শনের চাপে কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধায় কিঞ্চিৎ ভয়ে হাত জোড় করিয়া তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

সিংহ মহাশয় হারাধনের পিঠে হাত রাখিয়া ও সামান্য হাসিয়া হারাধনকে যেন না চাহিতেই অভয় বিতরণ করিলেন। তারপর তাঁহাকে আরও ভয়মুক্ত করিবার জন্যই হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন—সব ঠিক হ্যায় না?

হারাধন অতি কৃতজ্ঞ চিত্তে হাত জোড় করিয়া বলিলেন—আপনার দয়ায় আমার কোনো অসুবিধা নাই। সবই ঠিক আছে।

—এই বাড়ী পছন্দ হয়েছে? তাঁর বাংলায় কিঞ্চিৎ টান লক্ষ্য করিলেন হারাধন। তবে টান সত্ত্বেও বাংলা বেশ পরিষ্কার।

হারাধন উত্তর করিলেন—জী হাঁ।

সিংহ মহাশয় হাসিয়া বলিলেন—এখানে এই রকম বাড়ী আমার আছে ছয়খানা। সবই ভাড়ায়। তাহার মধ্যে আরও একখানি এখন খালি পড়িয়া আছে। আপনার অসুবিধা হইলে সে বাড়ীখানিও আপনি দেখিতে পারেন।

হারাধন হাত জোড় করিয়া বলিলেন—আপনার অনেক দয়া। এ বাড়ী ভাল, খুবই ভাল। আমাদের মতো গরীবের পক্ষে এ তো রাজপ্রাসাদের সমতুল্য।

সিংহ মহাশয় হাসিয়া বলিলেন—আপনার মত তো শুনিলাম। আপনার স্ত্রীকে ডাকুন। তাঁহার মুখ হইতেই তাঁহার মতামত শুনি।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি হারাধন মনে মনে এই ভয়ই করিতেছিলেন। তিনি আরা স্টেশনে সিংহ মহাশয়ের সহিত প্রথম সাক্ষাতের সময় হইতেই যে উত্তাপকে অনুভব করিতেছিলেন, অথচ তাহার উৎপত্তিস্থলকে আবিষ্কার করিতে পারিতেছিলেন না তাহাকেই যেন অকস্মাৎ আবিষ্কার করিতে পারিলেন। তাঁহার বুদ্ধি তাঁহার কান ধরিয়া যেন তাঁহাকে শাসন করিয়া কহিল—মূর্খ, এখন বুঝিতে পারিলে, এই অযাচিত ও অকারণ দয়ার অর্থ কি?

হারাধন মনে মনে বিপদাপন্ন ও অসহায় বোধ করিতে লাগিলেন। তবু তিনি লড়াইয়ে অবতীর্ণ হইলেন। হাত জোড় করিয়া বলিলেন—হুজুর বাহাদুব, একে স্ত্রীলোক, তার উপর গ্রামের মেয়ে। অন্য পুরুষেব সামনে তো বাহির হওয়া অভ্যাস নাই। সামান্য কোনো পুরুষ হইলে কথা ছিল। কিন্তু আপমার মতো জবরদস্ত ও মহামান্য পুরুষের সামনে কি ও গ্রাম্য স্ত্রীলোক বাহির হইতে পারে? জোর করিয়া বাহিরে আনিতে গেলে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যাইবে।

বাবু সুরিন্দর নারায়ণ কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া কৃপা-পরবশ হইয়া বলিলেন—আচ্ছা, আচ্ছা, আসিতে হইবে না।

তাহার পর তিনি ভিন্ন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সেবককে জিজ্ঞাসা করিলেন—চায়ের সব সরঞ্জাম আনিয়াছিস?

—জী হুজুর।

—যা, অন্দর মহল হইতে চা করিয়া লইয়া আয়।

হারাধন অবাক। চায়ের সরঞ্জামও আসিয়াছে। তবু তিনি আবার মৃদু প্রতিবাদ করিলেন। বলিলেন—চা আমি দু' চার বার খাইয়া থাকিলেও আমার স্ত্রী তো উহার আস্বাদ জানেন না। গ্রাম্য স্ত্রীলোক তো।

এইবার হুজুর বাহাদুর জোরে হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন—আপনি কেমন বাঙ্গালী, চা খান না! তা বেশ ভালই হইয়াছে। আমিই আপনাদের চা খাওয়া অভ্যাস করাইয়া দিই। আজই তাহা হইলে আরম্ভ হোক। যা রে, চা করিয়া লইয়া আয়।

হারাধন নির্বাক। সেবক ভিতরে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই চায়ের পেয়ালার টুংটাং শব্দ উঠিতে লাগিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সেবক চা তৈয়ারী করিয়া আনিয়া উপস্থিত করিল। একটি দামী পেয়ালায় সিংহ মহাশয়কে প্রথম চা দিয়া অন্য একটি সাধারণ পেয়ালায় সে হারাধনকে চা দিয়া বলিল—চায়ে, পিলিজিয়ে।

পাশের ঘব হইতে একটি টেবিল সে ইতিপূর্বেই আনিয়া সিংহ মহাশয়ের সম্মুখে রাখিয়াছিল। আরও এক কাপ চা আনিয়া সে টেবিলের উপর রাখিল। নিজের চায়ের কাপে চুমুক দিবার পূর্বে সিংহ মহাশয় বলিলেন—আপনি এই চায়ের পেয়ালা আপনাব স্ত্রীকে দিয়া আসুন। খাইতে বলুন। আশা করি, খাইতে আপত্তি হইবে না। যদি আপত্তি করেন, আমার নাম করিয়া বলিবেন, আমি তাঁহাকে খাইতে অনুরোধ করিয়াছি।

হারাধন মনে মনে কেমন ভীত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মনে হইল, এই লোকটি তাঁহাদের জোর করিয়া আশ্রয় দিয়া তাঁহাদের ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছে এবং তাহাদেরই ঘরে বসিয়া তাহাদের আদেশ দিতেছে।

চা দিয়া বাহিরে আসিলে কিঞ্চিৎ হাসিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন—কি, আপনাব স্ত্রী চা পান করিতেছেন তো?

হারাধনের সাহস যেন আস্তে আস্তে লোপ পাইতেছে। তিনি কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন—জী হুজুর।

তিনি হাসিয়া বলিলেন—এবার আপনিও খান। আপনারা আমার অতিথি। মেহ্‌মান। আগে না খাইলে আমি খাই কি করিয়া?

হারাধনের এতক্ষণে মনে হইল, না, না, ইনি ভয় দেখাইবেন কেন? অতিথিকে আগে আপ্যায়িত করিবার জন্যই তিনি অমনটি বলিলেন। হারাধন চায়ে চুমুক দিলেন। তাঁহাকে চা পান করিতে দেখিয়া সিংহ মহাশয় ঠোঁটের কাছে চায়ের পেয়ালা তুলিয়া চুমুক দিয়া কিঞ্চিৎ হাস্য করিলেন। তারপর প্রশ্ন করিলেন—দেখুন, আপনারা আমার মেহ্‌মান, অতিথি। আপনারা মনে কোনো ভয় বা দ্বিধা রাখিবেন না। আমি আপনাদের আশ্রয় দিয়াছি। আপনাদের ক্ষতি করে এমন সাধ্য কাহারও নাই। কিন্তু আমি আপনার কোনো পরিচয়

জানি না। না জানিয়াই আশ্রয় দিয়াছি। এখন আপনি আমাকে আপনাদের পরিচয় দিন। আপনার নাম কি?

হারাধন মনে মনে ঠিক করিয়া লইলেন তিনি নিজের সত্য পরিচয় দিবেন না। উর্মিলাকেও এ সম্পর্কে পরে সতর্ক করিয়া দিবেন। আর নিজের সত্য পরিচয় দিবার বিপদও আছে। তিনি মনে মনে নিজের স্বনাম ছাড়িয়া সেই মুহূর্তেই ভিন্ন নামের পুরানো পোশাকটি গায়ে চড়াইয়া লইয়া বলিলেন—হুজুর, এ অধমের নাম অম্বুজাক্ষ মুখোপাধ্যায়।

—মুখোপাধ্যায়? মানে ব্রাহ্মন?

—জী হাঁ।

—দেশ কোথায়?

—বর্ধমান জেলা।

—বারদোয়ান? মানে কলকাতা যাবার পথে যে জংসন স্টেশনে গাড়ী দাঁড়ায়? সেখানে?

—সেখানে নয়? সেখান থেকে দূরে, একটি গ্রামে।

—অচ্ছা। তা আপনার জেনানার নাম কি?

আবার ভেবে নিলেন হারাধন। এক মুহূর্তে উর্মিলার নামও বদলে দিয়ে বললেন—জী, সুশীলা।

—সুশীলা? বহুত অচ্ছা নাম। বঙ্গালী লোক বহুত অচ্ছা নাম রাখে।

হারাধন চুপ করিয়া থাকিয়া হাসিবার চেষ্টা করিলেন।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সিংহ মহাশয় প্রশ্ন করিলেন—আপনার উমর কত?

—বাইশ বছর।—দুই বছর বয়স বাড়াইয়াই বলিলেন বুদ্ধিমান হারাধন।

—অচ্ছা। কেতনা দিন সাদী করেছেন?

মুহূর্তের মধ্যে বহু জটিল চিন্তা তাঁহার মস্তিষ্কের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া গেল। পরমুহূর্তের অনর্গল মিথ্যা অপরূপ এবং অতি বিশ্বাস্য সত্যের মূর্তি লইয়া তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিতে লাগিল। তিনি বলিতে লাগিলেন—আমাদের দেশের নিয়ম অনুযায়ী আমার বয়স যখন দশ তখন আমার বিবাহ হইয়াছিল। তখন আমার স্ত্রীর বয়স ছিল আট। বিবাহের পর আমার স্ত্রী তাঁহার পিত্রালয়েই ছিলেন। মাত্র গত বৎসর তিনি শ্বশুরবাড়ীতে দ্বিরাগমনে আসিয়াছিলেন শ্বশুরঘর করিতে।

গভীর কৌতুহলের সঙ্গে শুনিতে শুনিতে সিংহজী প্রশ্ন করিলেন—কি? কেয়া বোলা? দ্বিরা?

—দ্বিরাগমন। বিবাহের সময় কন্যা খুব শিশু থাকে বলিয়া কন্যার বয়স হইলে তবে কন্যা শ্বশুরবাড়ী আসে।

—ও, অচ্ছা, অচ্ছা। সমঝা, আভি সমঝা। গাওনা। হমারা হিয়া গাওনা বোলা যাতা হ্যায়। বাকি—

বলিয়াই তিনি সকৌতুকে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিলেন—বাকি, আপকা জেনানা এতনা উমরমে, করিক বিশ বরিষ উমরমে গাওনামে আয়া? ই কেয়া বাত? এ কি রকম ব্যাপার?

সিংহজী তাহাকে জেরায় ধরিয়াছেন। কিন্তু তিনিও অতি বুদ্ধিমান হারাধন, বর্তমানে অম্বুজাক্ষ সাজিয়াছেন। তিনি হাত জোড় করিয়া বলিলেন—হুজুর, গরীবের ঘর। বাড়ীতে অন্নের অভাব। সেই কারণেই যথা সময়ে স্ত্রীকে আনিতে পারি নাই। বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। আর সেই কারণেই বাড়ীতে স্ত্রীর জন্য অন্নসংস্থান করিতে না পারিয়া গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছি।

এবার যেন সিংহজী বুঝিলেন। বলিলেন—তা আপনি এখন কি করিতে মনস্থ করিয়াছেন?

—চাকরী বা ব্যবসা কিছু একটা কবিব।

—বেওসা? 'বেওসা' করিতে হইলে তো রূপেয়ার দরকার। আপনার রূপেয়া আছে?

হারাধন বুঝিলেন রাশি রাশি মিথ্যা বলিতে গিয়া একটা ভুল বলা হইয়া গিয়াছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সংশোধন করিয়া লইয়া বলিলেন—না হুজুর, আমি দরিদ্র ব্যক্তি, আমি কোথায় ব্যবসার মূলধন পাইব? তবে এখন আপনার মতো মানুষের আশ্রয় পাইয়াছি, তাই ওইরূপ বলিতে সাহসী হইয়াছিলাম।

সিংহজী হাসিলেন। বলিলেন—বেশ তো, তোমাকে যখন আশ্রয় দিয়াছি তখন তুমি আমার অধীনে 'নোকরি' করিতে চাও করিতে পার। আবার তোমার 'বেওসা' করিবার ইচ্ছা থাকিলে তাহাও করিতে পার। আমি তোমাকে মূলধন দিব।

এ কি আশ্চর্য বদান্যতা! সিংহজী তাঁহাকে ব্যবসা করিবার মূলধন পর্যন্ত দিতে রাজী আছেন? বুদ্ধিমান হারাধনের সব বুদ্ধি হারাইয়া গেল। তিনি কৃতজ্ঞতায় কাঁদিতে লাগিলেন। মনের সমস্ত সন্দেহ, সমস্ত অবিশ্বাস নিঃশেষে মুছিয়া গিয়া তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—আপনাকে কি বলিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব জানি না!

সিংহজী কুরসী ছাড়িয়া উঠিলেন। দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন—কোনো চিন্তা নাই। সব ব্যবস্থা হইয়া যাইবে। আমি তোমাকে মূলধন দিব। তুমি চিন্তা করিয়া দেখ কিসের ব্যবসা করিবে। মাসখানেক বাজার বুঝিয়া দেখ।

তাহার পর সেবকের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—চায়ের পেয়ালাটা ধুইয়া রাখ।

লোকটি উচ্ছিষ্ট পেয়ালা লইয়া চলিয়া গেল। তাহার পর ফিরিয়া আসিয়া সে বলিল—আমি আপনার চা খাইবার কাপ বহুজীকে দিয়া বলিয়া আসিলাম—এ কাপ যত্ন করিয়া রাখিয়া দিন। হুজুর বাহাদুর আসিলে তিনি এই কাপে চা খাইবেন। এ কাপে যেন অন্য কেহ চা না খায়।

সেইদিন রাত্রিতে শয্যায় প্রথম পাশাপাশি শুইয়া উর্মিলা হারাধনকে প্রথম কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—আমরা কোথায় আসিলাম ?

হারাধন প্রশ্ন করিয়াছিলেন—কেন ? এ প্রশ্নের অর্থ কি ?

উর্মিলা বলিয়াছিল—এ ভদ্রলোক কে ? তুমি তো পূর্বে ইহাকে চিনিতেও না। তবে উনি কেন, কোন সুবাদে তোমাকে এত সাহায্য করিতেছেন ?

হারাধনের নিজের মনেও এ সংশয় থাকিলেও সাময়িকভাবে তাহা আচ্ছন্ন হইয়াছিল, অথবা উর্মিলার কাছে তাহা স্বীকার করিতে তাঁহার বাধিতেছিল। তাই তিনি বলিলেন—তুমি উহাকে অমনভাবে সন্দেহ করিতেছ কেন ? সংসারে বহু সৎ, সদাশয় লোক এখনও আছেন। তাঁহাদেরই একজনের সঙ্গে সৌভাগ্য-ক্রমে আমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছে।

উর্মিলা এ লইয়া আর কোনো কথা বলিল না। কিন্তু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে আবার বলিল—আমাদের অন্য লোকের কাছ হইতে এত দয়া লইয়া থাকিবার দরকার কি ? চল, আমরা এখান হইতে চলিয়া যাই।

বুদ্ধিমান হারাধনের বুদ্ধি ফিরিয়া আসিল যেন। তিনি উভয় কূল রক্ষা করিয়া বলিলেন—বেশ তো, কিছুদিন এখানে ভাগ্য-পরীক্ষা করিয়া দেখি। সঙ্গে সঙ্গে সিংহজীকেও পরীক্ষা করিয়া দেখা হইবে। যদি তেমন কিছু দেখি, তোমার হাত ধরিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইব।

উর্মিলা আপন মনে একটু হাসিল। হ্যারিকেন লণ্ঠনটা কমাইয়া চৌকির তলায় রাখিবার মুহূর্তে হারাধন সে হাসিটুকু দেখিলেন। কিন্তু তাহার সঠিক অর্থ তিনি বুঝিতে পারিলেন না।

এমনি করিয়াই মাসখানেক কাটিয়া গেল। এই মাসখানেকের মধ্যে বুদ্ধিমান হারাধন এখানকার বাজারটা বুঝিয়াছেন। ততোধিক বুঝিয়াছেন সিংহজীকে।

সিংহজী অবশ্য এই এক মাসের মধ্যে তাঁহার বাড়ীতে দুই-তিন বারের বেশী আসেন নাই। কিন্তু আসিয়াছেন ঠিক সেই সব সময় যখন হারাধন বাড়ীতে থাকেন না। আসিয়াছেন এবং সুনীলার হাতে চা খাইয়াছেন এবং কিছুক্ষণ গল্পও করিয়া গিয়াছেন। হারাধন বাড়ী আসিয়া উর্মিলার কাছে শুনিয়াছেন কিন্তু মুখে কোনো কথা বলেন নাই বা তাহা লইয়া আলোচনা করেন নাই। শেষবার আসার সংবাদটা আর উর্মিলা তাঁহাকে দেয় নাই। তিনি খবরটা জানিতে পারিয়াছিলেন সিংহজীর দেওয়া সেবকের মুখ হইতে। সে-ই বাড়ীর সব কাজকর্ম করে। সে-ই তাঁহাকে কথাটা বলিয়াছিল। বলিয়াছিল—হুজুর বাহাদুর আজ দুপহরে আসিয়াছিলেন। কাল আপনাকে বাড়ীতে থাকিতে বলিয়া গিয়াছেন। কি জরুরী কথা আছে।

রাত্রিতে এই লইয়া তিনি উর্মিলাকে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন—আজ যে সিংহজী এ বাড়ী আসিয়াছিলেন তাহা তো তুমি আমাকে বল নাই? কেন? শুনিয়া উর্মিলা কোনো জবাব দেয় নাই। কেবল মুখ বাঁকাইয়া একটু হাসিয়াছিল। তাহাতে হারাধন আরও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। ক্রুদ্ধভাবে আবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—ইহা তো হাসির বিষয় নয় তবে হাসিতেছ কেন? অন্যায় করিয়া আবার হাসিতেছ কোন মুখে?

উর্মিলা আরও বক্রভাবে হাসিয়া বলিয়াছিল—তোমাকে বলিয়া কোনো লাভ হইত? পূর্বে তো তোমাকে দুই-তিনবার এ সংবাদ দিয়াছি, তুমি কি করিয়াছ? কাজেই তোমাকে বলিয়া লাভ হইত না বলিয়াই তোমাকে জানাই নাই।

হারাধন আবার চুপ করিয়া গিয়াছিলেন। কথাগুলা তিক্ত বিষের মতো, তিনি গলাধঃকরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি সেই সঙ্গে অনুভব করিতেছেন তাঁহার কিছু করিবার ক্ষমতা নাই। এখানে আসিয়া সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টা করিলে হয়তো কিছু করিতে পারিতেন, কিন্তু আজ এই মাসখানেক পর আর কিছু যেন তাঁহার করার নাই।

এই এক মাসে তিনি যেন সেই অতি পরিচিত উপমার বিষয় হইয়া পড়িয়াছেন। হরিণ যেমন অজগরের দৃষ্টির সামনে পড়িয়া সম্মোহিত হইয়া পড়ে, তারপর ধীরে ধীরে তাহার কবলিত হইয়া তাহার পেষণে ক্রমে ক্রমে মরিয়া যায়, হারাধনের তেমনি অবস্থা হইয়াছে। এই এক মাসে এই সুরিন্দর নারায়ণ সিংহ মহাশয়ের প্রবল প্রতাপ, কুটিল ও জটিল পদক্ষেপ দেখিয়া, শার্দূল বিক্রীড়িত ছন্দে তাঁহার জীবনযাত্রায় গতি অনুভব করিয়া হারাধন দিনে দিনে নিজের শক্তি ও বুদ্ধি দুই-ই হারাইয়া ফেলিয়াছেন।

হারাধনকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া উর্মিলা অন্ধকারের মধ্যেই হারাধনের বাহুতে চাপ দিয়া ফিসফিস করিয়া বলিল—দেখ, আমি দেখিতেছি তুমি ওই দুর্ধর্ষ লোকটার কবলে পড়িয়াছ। উহাকে তোমার যত বিশ্বাস তত ভয় এক সঙ্গে। তাহার চেয়ে এক কাজ কর। এখান হইতে পলাইয়া চল।

হারাধন অসহায়ের মতো বলিলেন—তাই বা কি করিয়া সম্ভব? পলাইব কেমন করিয়া? ওই যে যাদুবর নোকর হিসাবে কাজ করিতেছে, ও তো কাজ করাব চেয়ে বেশী করিয়া আমাদের পাহারা দেয়। উহার চোখ এড়াইয়া যাইব কেমন করিয়া? আর তা ছাড়া আমি যে সিংহজীর কাছে হ্যাণ্ড নোট করিয়া পাঁচশত টাকা ধার করিয়াছি।

শুনিয়া তাহার আলিঙ্গনেব মধ্যেও উর্মিলা চমকিয়া উঠিয়াছিল। সে প্রশ্ন করিল—অত টাকা তুমি ওই লোকটার কাছে কেন লইতে গেলে? তুমি লইয়াছ লইয়াছ, কাল উহার টাকা উহাকে ফেরৎ দিয়া দাও। তারপর চল, উহার চোখের সামনে দিয়া চলিয়া যাই।

হারাধন চুপ করিয়া রহিলেন। তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া উর্মিলা বলিল—দেখ, তুমি যদি এ সবেব আশু প্রতিকার না কর তবে তুমি বিপদে পড়িয়া যাইবে।

অন্ধকারের মধ্যে হারাধন শিহরিয়া উঠিলেন। কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—বিপদ, কি বিপদেব কথা বলিতেছ?

উর্মিলা শুধু বলিল—আমি জানি না।

সে রাত্রিতে উর্মিলা আর একটিও কথা কহিল না।

পরদিন প্রভাতে এক প্রহর বেলায় বাবু সুরিন্দর নাবায়ণ পূর্ব দিনের কথামত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নোকব যাদুবব চেয়ার পাতিল। কিছুক্ষণ পব উর্মিলাই ঘোমটা টানিয়া তাঁহাব জন্য নির্দিষ্ট চায়ের কাপে সিংহজীর জন্য চা দিয়া গেল। হারাধন অবাক হইয়া শুধু দেখিল মাত্র, কিছু বলিল না।

চা খাইতে খাইতে সিংহজী হারাধনকে বলিলেন—অম্বুবাবু, তোমার জন্য ডিহরিতে ধান বায়না দিয়া রাখিয়াছি। ডিহরি গিয়া সে সব ধান কিনিয়া এখানে পাঠাইবার ব্যবস্থা কর। দেরি করা ঠিক হইবে না।

হারাধন জিজ্ঞাসা করিল—কবে যাইতে হইবে?

সিংহজী বলিলেন—আপনার যে দিন সুবিধা—আজ কাল যে দিনই হউক। তবে তাড়াতাড়ি যাওয়াই ভাল। যত তাড়াতাড়ি যাইবেন তত তাড়াতাড়ি ফিরিতে পারিবেন। ওখানে মনে হয় দিন দুই তিন লাগিবে।

হারাধন হাত জোড় করিয়া কিছু বলিবার চেষ্টা করিতেই তিনি বলিলেন—তাহা হইলে আজই চলিয়া যান। আমার কাছারীতে গিয়া আমার মুনিসের কাছে খত ও থোড়া রূপেয়া লইয়া চলিয়া যান।

একটু থামিয়া হাসিয়া বলিলেন—আপনি বহুজীর জন্য মনে কোনো চিন্তা রাখিবেন না। যাদ্দুবর ও দরকার হইলে আমি দেখ ভাল্ করিতে পারিব।

তাহার পর তিনি যাদ্দুকে বলিলেন—ওরে, চায়ের পেয়ালাটা ধুইয়া তুলিয়া রাখ। বহুজীকে যত্ন করিয়া রাখিতে বল্।

হারাধনবাবু সেইদিনই ডিহরি চলিয়া গেলেন।

ভাবিয়াছিলেন দুই দিনের মধ্যে ফিরিয়া আসিবেন। কিন্তু সেখানে কার্য-গতিকে আট দিন হইয়া গেল। আরায় ধান কিনিয়া, সব সংগ্রহ করিয়া পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেই অত বিলম্ব হইল।

ফিরিয়া সোজা ষ্টেশন হইতে বাসায় ফিরিয়া বাসার দরজায় দাঁড়াইয়াই বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। উর্মিলা, যাদ্দুবর, কেহ নাই, বাসা তালা বন্ধ। বুকের ভিতরটা তাঁহার নিদারুণ এক ভয়ে দ্রুত ছুটিতে আরম্ভ করিল।

তিনি পাশের বাসায় খবর লইয়া জানিলেন বহুজীর ইহার মধ্যে বহুত্ বোখার হইয়াছিল বলিয়া তাঁহাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। তবে যাদ্দুবর এখানেই থাকিয়া গৃহরক্ষা করিতেছে। সে কাছে-পিঠেই কোথাও আছে। এখনি আসিয়া যাইবে। নয়তো হাসপাতাল গিয়া থাকিবে বহুজীকে দেখিতে।

কথা বলিতে বলিতেই যাদ্দুবর আসিয়া গেল। সে বাড়ীর চাবি খুলিতে খুলিতে বলিল—বাবুজী, আরাম করুন। বহুজীর বহুত বুখার হইয়াছিল। সেইজন্য হুজুর বাহাদুর তাঁহাকে ঠিকমত 'এলাজের' জন্য নিজের বাড়ীতে লইয়া গিয়াছেন। সেখানে বহুজীর বুখার আজ দিন তিনেক আরাম হইয়াছে।

হারাধন আর উর্মিলাহীন গৃহের মধ্যে ঢুকিলেন না। তিনি সোজা সিংহ মহাশয়ের কাছারীতে গিয়া হাজির হইলেন।

কিন্তু কাছারীতে সিংহ মহাশয় অনুপস্থিত। সেরেস্তার মধ্যে পরিচিত মুনিসজীকে প্রশ্ন করায় তিনি সখেদে বলিলেন—বহুজী আজ দিন তিনেক আরাম হইয়াছিলেন। হকিম দেখিয়া বলিয়াছে তিনি বহুত দুবলা হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার স্থান পরিবর্তন দরকার। সেইজন্য হুজুর বাহাদুর বাড়ীর জেনানাদের সহিত তাঁহাকে তাঁহার দেশের বাড়ীতে দেহাতে লইয়া গিয়াছেন।

হারাধন জিজ্ঞাসা করিলেন—দেহাতের সে গাঁও আরা হইতে কত দূর ?
মুনিসজী তো অবাক। তবু তাঁহার কাছ হইতে ঠিকানা-পত্র আদায়ের জন্য হারাধন বার বার পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন এবং পরিশেষে 'পতা' সংগ্রহ করিয়া সেই গাঁওয়ে গিয়া হাজিব হইলেন।
বাইশ ক্রোশ রাস্তা। তিন দিনে হাঁটিয়া সেখানে গিয়া পৌঁছিলেন। সর্বাঙ্গ ধূলায় ধূসর, ক্লান্ত অবসন্ন শরীর। পতায় পৌঁছিয়া দেখিলেন গাঁওযেব মুখেই পথের ধারে বুড়া নিমগাছের নীচে বাঁধানো চবুতরায় সিংহজী সটকা টানিতেছেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র হারাধন বিপুল ক্রোধে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—বদমাশ! আমাব স্ত্রীকে ফেরৎ দাও। তাহাব পরই অজ্ঞান।

আঠারো

জ্ঞান হইলে হারাধন দেখিলেন তিনি চতুরায় শুইয়া আছেন আর সিংহজী তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া মিট মিট করিয়া হাসিতেছেন। সে হাসি বিশুদ্ধ কৌতুকের, তাহাব মধ্যে বিন্দুমাত্র তিক্ততার আভাষ নাই। ভূপতিত হারাধনের দিকে চাহিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন—আরে এখন তো তোমাকে দেখিয়া লঙ্কা পোড়াইবার সময় রাবণের সম্মুখে আনীত মহাবীরজীর মতো বোধ হইতেছে। তুমি সত্যই বাহাদুর। আমাকে আজও পর্যন্ত সামনা-সামনি দাঁড়াইয়া কেহ বদমাশ বলিয়া সম্বোধন করিতে পাবে নাই। তুমি সত্যিই বাহাদুর।
হারাধন সাপেব মতো বিষদৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিযাছিলেন। সাপের মতো ছাড়া আর কি বলা যায়? যেখানে মানুষ প্রাণের জ্বালায় বিপুল বিত্রাসে বাঘের মতো লাফাইযা পড়িতে চায়, অথচ সাহস ও শক্তির অভাবে তাহা পারে না, তখন তাহার সাপের মতো চাহিয়া থাকা ছাড়া আব কোনো পথ থাকে ? তবু হারাধন দৃষ্টি দিয়াই বিষ বর্ষণ করার সঙ্গে মুখেও বলিলেন—উপায়টা আপনি ভালই দিয়াছেন। আমাকে মারীচ-রূপী ধানের সন্ধানে প্রেবণ করিয়া আপনি দিব্য আমার শূন্য গৃহ হইতে সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া আসিয়াছেন।
হারাধনের কথায় সিংহজী বিন্দুমাত্র বিরক্ত, ক্রুদ্ধ বা বিচলিত হইলেন না। তিনি বেশ কোতুক সহকারে হাসিতে লাগিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন—তুই ঠিকই বলিয়াছিস। তবে এ রামায়ণ ভিন্ন ধরনের। ইহাকে উলটা-রামায়ণ

বলিতে পারিস। এ রামায়ণে রাবণ যুদ্ধে জেতে, রাম ও মহাবীর যুদ্ধে হারিয়া যায়। তবে তুই রামও নহিস, এমনকি হনুমানজীও নহিস। আর তোর বহুজীও সীতা মাইয়া নয়।

হারাধন উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন—আমার স্ত্রীকে ফেরৎ দিয়া দিন। আমি তাহাকে লইয়া চলিয়া যাইতেছি।

সিংহজী হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন—শোন্, এ রামায়ণ মাফিক তুই তোর জেনানাকে উদ্ধার করিতে পারিবি না। সে আমার ঘরেই থাকিবে। আর তুই এ লইয়া মিথ্যা ঝামেলা করিতেছিস? ও তো তোরও বিবাহিত স্ত্রী নয়। তুইও তো আর একজনের কুলে কলঙ্ক দিয়া তাহার স্ত্রী লইয়া চোরের মতো পলাইয়া আসিয়াছিস। আমার তাগদ তোর হইতে অনেক বেশী। আমি যদি গায়ের জোরে তোর জেনানাকে কাড়িয়া লইয়া থাকি তাহাতে তোর এতো রাগ কেন?

হারাধন বলিলেন—ঠিক আছে, আমি পুলিশের কাছে গিয়া এজাহার দিব। দেখি আপনার তাগদ কতখানি। আর এসব কথা যে আপনি বলিতেছেন তাহা তো সব আপনার বানানো কথা।

সিংহজী হাসিয়া বলিলেন—আমার বানানো কথা? বেশ, তাহা হইলে একবার অন্দর হইতে উর্মিলাকে 'বুলাইয়া' আনি? তাহা হইলেই কি সত্য আর কি মিথ্যা তাহা প্রমাণিত হইবে। কি বলিস, রাজী?

হারাধন যেন মার খাইয়া চুপ করিয়া গেলেন। তবু মুখে সাহস দেখাইয়া বলিলেন—বেশ, তাহাই করুন। উর্মিলাকে ডাকুন। আমার সামনে সে বলুক এই কথা!

সিংহজী অকুতোভয়। তিনি হাসিয়া বলিলেন—না, তাহাও হইবে না। কারণ, আমি তোর পূর্বেই উর্মিলাকে দিয়া থানায় এজাহার দেওয়াইয়াছি। সে থানায় বলিয়াছে, তুই তাহাকে লইয়া তোর দেশ হইতে পলাইয়া আসিয়াছিস। ভাগ্যগুণে আমার আশ্রয় পাইয়া সে বাঁচিয়া গিয়াছে।

বলিয়া সিংহজী হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন—যা, এইবার থানায় যা।

সব শুনিয়া হারাধন শুধু পরাজিত নয়, নিজেকে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র বোধ করিতে লাগিলেন। তিনি সেই চবুতরায় সিংহজীর সম্মুখে নত মস্তকে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া সিংহজীর বোধহয় দয়া হইল। তিনি বলিলেন—দুঃখ করিও না। আমি তোমার কিছু লইয়াছি। তাহা তোমাকে সুদ সমেত ফেরৎ দিব। আমি দুষ্ট লোক নহি। তবে আমি একদিক দিয়া একেবারে রাবণের

মতো। কোনো দুর্লভ সামগ্রী চোখে পড়িলে তাহা যতক্ষণ আয়ত্ত করিতে না পারি আমার স্বস্তি থাকে না। তাহা পাইলে তবে স্বস্তি ফিরিয়া পাই। মূল্য দিয়া বিনিময়ে না পাইলে ছলে বলে ও কৌশলে কাড়িয়া লই। তারপর কৃতজ্ঞচিত্তে তাহার মূল্য পরিশোধ করি। তুমি চিন্তা করিও না, এ ক্ষেত্রেও আমি তাহাই করিব। এখন ক্রোধ পরিত্যাগ কর। তুমি পথশ্রমে ক্লান্ত, ক্ষুৎপিপাসায় কাতর, বিশ্রাম কর, তারপর স্নানাহার সম্পন্ন করিয়া নিদ্রা যাও। দেখিবে বর্তমান অবস্থায় তোমার কি কর্তব্য ও করণীয় তাহা তোমার নিকট আপনিই পরিষ্কার হইয়া উঠিবে। আর তুমি কি আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া পারিয়া উঠিতে সক্ষম হও? আমার অনেক অর্থ, অনেক প্রতিষ্ঠা, অনেক লোকবল। তদুপরি অনেক বুদ্ধি। সে বুদ্ধির বেশ অনেকখানি ভাগ দুর্বুদ্ধিই। তাহা দ্বারা আমি স্বার্থসাধন করি। আমরা রাজা ছিলাম, এখন তালুকদার। বংশানুক্রমিকভাবে নারী লইয়া আনন্দ করিয়াছি ও সেই সঙ্গে দুর্বুদ্ধির চর্চা করিয়াছি। তাহার সঙ্গে সাহসের চর্চা। কাজেই তুমি তো কোনোক্রমেই আমার সমকক্ষ হইতে পার না। কাজেই অবস্থাটা তোমার পক্ষে মানিয়া লওয়াই ভাল।

তিনি সঙ্গে সঙ্গে একজন 'নোকরকে' ডাকিয়া হারাধনের থাকা, খাওয়া ও বিশ্রামের বন্দোবস্ত করিতে বলিলেন। 'নোকর' আসিলে তাহার পশ্চাত পশ্চাত হারাধন পরাজিত, বিধ্বস্ত ও দলিত হইয়া নত মস্তকে চলিয়া গেলেন।

তিনি যেখানে গিয়া উঠিলেন সে যেন এক ইন্দ্রপুরী। প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ী, সামনে সুন্দর বাগিচা। ফুল আর ফলের। মস্ত বড় পাকাবাড়ীর পিছনে বিরাট তালাও। নীল জল বাতাসে অল্প অল্প নাচিতেছে। এই নির্জনতা ও সৌন্দর্য হারাধন অনেকক্ষণ মূঢের মতো স্তব্ধ হইয়া দেখিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার বুকের ভিতর হইতে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ঝরিয়া পড়িল। তাহার পর তিনি দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

তিনি একাই বসিয়াছিলেন। 'নোকর' তাহাকে প্রাসাদের দোতলায় একখানি ঘরে বসাইয়া একবস্ত্রে সমাগত হারাধনের জন্য কাপড় ও গামছা আনিতে গিয়াছিল। সেই অবসরে হারাধন অনেকক্ষণ কাঁদিয়া লইলেন। তারপর পিছনে পদশব্দ শুনিয়া চোখ মুখ মুছিয়া স্থির হইয়া বসিলেন।

লোকটি তাঁহাকে নূতন কাপড় ও গামছা দিয়া বলিল—স্নান করিয়া লউন। আপনি এখানে স্নান না করিলে উপরেও জল দিতে পারি।

হারাধন তো বিস্মিত। উপরে স্নান করার ব্যবস্থা! এত বড় বাড়ী সে তো শোওয়া-বসার জন্যই। এখানে স্নানেরও ব্যবস্থা আছে? আশ্চর্য তো!

নোকরটি বলিল—ইহা বড়লোকের দৌলতখানা। এখানে বড় বড় রইস-আদমী, সরকারী বড় বড় সাহেবরা পর্যন্ত আসিয়া থাকিয়া যান। তাঁহাদের আরামের জন্য এখানে সমস্ত ব্যবস্থাই আছে। কাজেই তাঁহারও কোনো অসুবিধা হইবে না।

হারাধন নিজেকে সংযত ও শান্ত করিয়া বলিলেন—তোমাদের অসুবিধা না থাকিলে আমি ওই তালাওয়েই স্নান করিব।

তালাওয়ে স্নান করিয়া যেন শুধু তাঁহার শরীর নয়, মনও শান্ত হইয়া আসিল। স্নানের পর নববস্ত্র পরিধান করিয়া তিনি ফিরিতেই 'নোকর' বলিল—আপনার আহার প্রস্তুত। খাইবেন আসুন।

খাওয়া-দাওয়ার পর বিশ্রাম ও নিদ্রা। তাঁহার ঘুম যখন ভাঙিল তখন বিকাল হইয়া আসিয়াছে। ডিহরি যাওয়ার দিন হইতে সিংহজীর এই দেহাতের গ্রামে আসা পর্যন্ত যত ভয়, উদ্বেগ, মনোকষ্ট, শারীরিক শ্রম, অবসাদ ও দৈহিক ক্লেশ হইয়াছিল তাহা সব অপগত। শুধু দীর্ঘ রোগভোগের পর পরমাত্মীয়ের মৃত্যুতে যে নিশ্চিন্ত অবসাদ ও হাহাকার বুকের মধ্যে সঞ্চিত থাকিয়া মধ্যে মধ্যে ঝরিয়া পড়ে, সেই রকম একটা বিষণ্ণতায় তিনি মুহ্যমান ছিলেন। এমন সময় নোকর আসিয়া সংবাদ দিল—হুজুর বাহাদুর তাঁহাকে সেলাম জানাইয়াছেন এবং তাঁহারই জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।

সেই চবুতরায় সিংহজী মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইতেই তিনি সমাদর করিয়া তাঁহাকে আহ্বান জানাইলেন—আইয়ে, আইয়ে অম্বুবাবু, আইয়ে!

গ্রীষ্মকালের দিন। মস্ত নিমগাছের নীচে বাঁধানো চবুতরায় গালিচা বিছানো হইয়াছে। তাহার উপর বাবু সুরিন্দর নারায়ণ সিংহ তাকিয়ায় ঠেস দিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার পাশে একজন সাহেবী পোশাক-পরা ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। দু'জনেরই হাতে ঠাণ্ডাই শরবতের গেলাস। দুইজনেই অল্প অল্প চুমুক দিয়া পান করিতে করিতে কথা কহিতেছেন। হারাধনকে দেখিয়া আবার এক দফা আপ্যায়ন করিয়া, গালিচায় তাঁহার পাশের জায়গায় হাত রাখিয়া, আবার বলিলেন—আইয়ে, বৈঠিয়ে অম্বুবাবু। হিঁয়া বৈঠ যাইয়ে। এই, অম্বুবাবুকো ঠাণ্ডাই বোলাও।

শেষ কথাটা তিনি বলিলেন নোকরকে।

হারাধনবাবু অবাক হইয়া গেলেন। প্রাতঃকালে যাঁহাকে পায়ের তলায় তুচ্ছাতিতুচ্ছভাবে পতিত থাকিতে দেখিয়াছেন, যাঁহাকে বার বার 'তুই' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, অপমান করিয়াছেন, ভয় দেখাইয়াছেন, মাত্র কয়েক ঘণ্টা

পরেই তাঁহাকেই 'আপনি' বলিয়া এত সমাদরের সঙ্গে আপ্যায়ন ও সম্ভাষণ করিবার কি কারণ ঘটিল তাহা হারাধন খুঁজিয়া পাইলেন না। তিনি মনে মনে গভীর বিস্ময় বোধ করিয়া, সিংহজীর দেখানো জায়গায় সসম্ভ্রমে বসিয়া চাকরের হাত হইতে ঠাণ্ডাইয়ের গ্লাস গ্রহণ করিলেন। এবং সকলের দেখাদেখি গ্লাসে অল্প অল্প চুমুক দিতে লাগিলেন।

সাহেবী পোশাকপরা ভদ্রলোকের ঠাণ্ডাই পান শেষ হইবামাত্র তিনি উঠিয়া পড়িলেন। বলিলেন—আব্ হম্ চল রহে হেঁ সিংজী। ফিন্ আরামে মোলাকাত হোগা।

সামনেই সিংহজীর টমটম দাঁড়াইয়াছিল। সাহেব সেই দিকে অগ্রসর হইয়া চলিলেন। সিংহজীও তাঁহার পিছন পিছন গিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া টমটমে উঠিতে তাঁহাকে সাহায্য করিলেন।

টমটম চলিয়া গেল। টমটম চলিয়া যাইতেই সিংহজী আবার আপনার আসনে ফিরিয়া আসিয়া বসিলেন। তারপর মৃদু হাস্য সহকারে হারাধনকে বলিলেন—উ কৌন্ হ্যায় জানতে হেঁ অম্বুবাবু?

হারাধন ঘাড় নাড়িয়া সুবোধ বালকের মতো জানাইলেন—না।

সিংহজী বলিলেন—উনি আরা সাবডিভিসনের এস. ডি. ও।

তারপর হাসিয়া আবার বলিলেন—দেখাইবার সামান্য প্রয়োজন ছিল। না দেখাইলেও চলিত। তবে দেখাইয়া রাখা ভাল বিবেচনায় আপনাকে দেখাইয়া রাখিলাম।

তারপর বলিলেন—তোমাকে দোস্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। তুমি আজ হইতে আমার দোস্ত হইলে। তুমি আমার কাছেই থাক। তোমার কোনো চিন্তা নাই। তুমি কাল আবার ফিরিয়া চল আমার সঙ্গে। আমি তোমার সমস্ত ব্যবস্থাই করিব। আর স্ত্রীলোক? উহার জন্য চিন্তা করিও না। আমি তোমার কাছ হইতে যেমন একটি কাড়িয়া লইয়াছি তেমনি তোমাকে ফেরৎ দিব।

পরদিন হারাধন সিংহজীর সহিত তাঁহারই টমটমে তাঁহার পাশে বসিয়া তাঁহার দোস্তের মতোই আরায় ফিরিয়া আসিলেন।

হারাধনকে তিনি তাঁহার প্রবর্তিত ধান-চালের ব্যবসায় ভাল করিয়াই প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিলেন। এবং তাঁহাকে নিজের ইয়ারবক্সি হিসাবেই গণনা করিতে লাগিলেন। তিনি হারাধনকে বলিলেন—আমি তোমার আসল নাম জানি।

কিন্তু তোমার আসল নাম ধরিয়া পুলিশ যদি কোনোদিন অনুসন্ধান করিতে করিতে তোমার খোঁজে আমার সীমানা পর্যন্ত আসিতেও পারে তবু তোমাকে ধরিতে ও ছুঁইতে পারিবে না। তুমি তোমার ছদ্মনাম অম্বুজাক্ষের অন্তরালে দিব্য লুকাইয়া থাকিবে। আর তোমার গৃহও শূন্য। তোমাকে সে দিক দিয়াও কেহ সন্দেহ করিতে পারিবে না। আর তুমি আমার দোস্ত হিসাবে এখানকার সমাজে চলাফেরা করিবে। তোমার গায়ে এক যম ছাড়া পৃথিবীতে কাহারও হাত দিতে সাহস হইবে না।

হাবাধন তাহাই মানিয়া লইলেন। সেই মানিতে গিয়াই তাঁহার সর্বনাশ হইয়া গেল। হৃদয় হইতে প্রথমেই মরিল প্রেম ও সেই সঙ্গে আত্মসম্মান-বোধ। যেদিন তিনি দেহাতে গিয়া সুরিন্দর নারায়ণের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া নিজের আত্মসম্মানের শেষ পরিচয় দিয়াও আত্মসমর্পণ করিলেন সেই দিনই তাঁহার নিজের অগোচরে তাঁহার ব্যক্তিত্ব পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল।

একথা হাবাধন একদিনে বুঝিতে পারেন নাই। দিনে দিনে ধীরে ধীরে বুঝিয়াছেন। সারাদিন কাজকর্মের পর যখন সিংহজীর সহিত তাঁহার মহফিলে সিদ্ধির নেশা করিয়া ফিরিতেন তখন পুরানো নোকর যাদ্দব বাত্রির আহার্য আনিয়া সামনে ধরিত। তখন নারীহীন গৃহের নিভৃতির মধ্যে একা বসিয়া বুকের ভিতরটা হু হু করিয়া উঠিত। মাত্র যে একটি মাস একটি নারীর সঙ্গে আনন্দে এই গৃহে কাটাইযাছেন তাহারই স্মৃতি মনের মধ্যে জল জল করিতে থাকিত। তাহাতে নেশাগ্রস্ত মনের ভিতর পালাক্রমে একবার নিষ্ফল ক্রোধ ও অন্তহীন হতাশা ও অবসাদ মনকে ক্লিষ্ট করিয়া যাইত।

সে সময় এক-একবার মনে হইত তিনি এখান হইতে পলাইয়া গেলেই বোধ হয় ভাল করিতেন। তাহাতে আর কিছু না হউক, মৃত পৌরুষকে মৃত আত্মীয়ের শবদেহের মতো কোলে লইয়া বিলাপ করিতে পারিতেন। এক-একবার মনে হইত পুলিশের কাছে সব খুলিয়া বলিয়া দিয়া জেল, ফাঁসি যাহাই হউক তাহাই বরণ করিয়া লইবেন।

কিন্তু কোনোটাই করা হয় নাই। একটা অকারণ নিদারুণ ভয় আর এক আত্মসুখসর্বস্বতা তাঁহাকে এক পাশবদ্ধ পশুর মতো ওই সুরিন্দর নারায়ণ সিংহের সঙ্গে বাঁধিয়া দিয়াছে। তিনি যেন ওই দুই বোধে পাকানো এক কঠিন রজ্জুতে সিংহজীর পায়ের খোঁটায় বাঁধা পড়িয়া গিয়াছেন। এবং পরিণামে তাঁহার এক স্তাবকে পরিণত হইয়াছেন।

তবে তাঁহার মগজে বাঁচিয়া থাকার বুদ্ধি ছিল। সে বুদ্ধি তাঁহার ব্যবসাকে

দিনে দিনে ফলাও করিয়া দিয়াছে। তাঁহাকে আস্তে আস্তে বেশ কিছু পয়সার মালিক করিয়া দিয়া গিয়াছে।

বেশ কিছুকাল কাটিয়া যাওয়ার পর সিংহজী তাঁহাকে একদিন একা পাইয়া শরবত খাইতে খাইতে বলিলেন—অম্বুবাবু, তোমাব মতলব কি? তুমি কি শেষ পর্যন্ত সাধু বনিয়া যাইবে?

হারাধনও শরবত খাইয়াছিলেন। নেশায় আরক্ত চোখে বলিলেন—কেন হুজুর, এরূপ বলিতেছেন?

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সিংহজী বলিলেন—অম্বুবাবু, তোমাব জন্য মধ্যে মধ্যে মনে কষ্ট হয়। মনে হয় আমিই তোমাব এই কষ্টের জন্য দায়ী।

হারাধন চুপ করিয়া রহিলেন। তিনি তো ভাল কবিয়াই জানেন তাঁহার এ দুঃখের জন্য দায়ী সিংহজীই কিন্তু তাহাব জন্য আব রাগ হয় না হারাধনেব। তাঁহার রাগ করিবার সব তেজটাই চলিয়া গিয়াছে। তিনি এখন এক বিষহীন ঢোঁড়া সাপে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছেন। অথচ আশ্চর্য, তাঁহার বিষদাঁত সিংহজী ভাঙেন নাই। তাঁহাব বিষদাঁত যেন আপনা-আপনি তাঁহার মাড়ির আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। তিনি এক ভীরু স্তাবকে পরিণত হইয়াছেন। তাঁহার মধ্যেকার সেই চতুর স্তাবকই উচ্চাবণ করিল—এই কথা যদি আপনি বলিলেন, তাহা হইলে বলি, যদি আমার দুঃখের জন্য আপনি নিজেকে দায়ী মনে করেন, তাহা হইলে আমার সব সুখের দায়ও তো আপনার।

সিংহজী আর কোনো কথা বলিলেন না। চুপচাপ ভাঙেব গ্লাসে চুমুক দিতে থাকিলেন।

তাহার পরদিনই হারাধনের এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হইল।

সেদিন সন্ধ্যায় যথারীতি সিংহজীর সহিত কাটাইয়া, ভাঙের শরবত খাইয়া নেশা করিয়া হারাধন বাসায় ফিরিলেন। যাদ্দুবর তাঁহার খাবার লইয়া বসিয়াছিল। তাঁহার খাওয়া হইয়া গেলে যাদ্দুবর উচ্ছিষ্ট তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল। এঁটো জায়গাটা পরিষ্কার করিয়া লণ্ঠন কমাইয়া রাখিয়া যাদ্দুবর বলিয়া গেল—বাবুজী, 'কেওয়ারী বন্ধ' করিয়া শুইয়া পড়ুন।

হারাধন শুইয়া পড়িলেন। সামান্য তন্দ্রা আসিয়াছে, এমন সময় মশার বিনবিনানির মতো কানের পাশে কে খুন খুন করিয়া ডাকিল—বাবুজী!

তন্দ্রার ঘোরে মশকের গুঞ্জন ভাবিয়া হাত নাড়াইয়া মশাকে তাড়াইয়া আপন মনেই তিনি বলিলেন—উঁহু!

আবার ডাক উঠিল—এ বাবুজী! সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার গায়ে কিসের মৃদু স্পর্শ

লাগিল। তাঁহার তন্দ্রা ভাঙিয়া গেল। তিনি চোখ চাহিয়া কিছু বুঝিতে পারিলেন না। বিছানায় উঠিয়া বসিয়া মশারির একটা দিক তুলিয়া দিলেন। দিতেই তিনি ঘরের যৎসামান্য আলোয় যে দৃশ্য দেখিলেন তাহাতে বুকের স্পন্দন বন্ধ হইয়া যাইবার অবস্থা। তিনি ভয়ে বু বু করিয়া চাপা চীৎকার করিয়া উঠিলেন—ভূত! ভূত! না, ভূত তো নয়, পেত্নী!

কিন্তু পেত্নী সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মতো হাসিয়া উঠিয়া তাঁহার কাঁধ ধরিয়া ঝাঁকি দিল। তখন হারাধন খানিকটা স্বস্তি বোধ করিলেন। না, ভূত পেত্নী কিছু নয়, মানুষই। মেয়েমানুষ। তিনি অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কে? জিজ্ঞাসা করিলেন বটে, কিন্তু জিজ্ঞাসা কবিবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। তিনি তো সম্পূর্ণ দেখিতেই পাইতেছেন সে কে। একটা যুবতী স্ত্রীলোক। কাল রঙ, গায়ে লাল রঙের ছিটেব খাটো চেলি, ভারী অথচ লম্বা শরীর। একটা হলদে বঙের শাড়ী ঘাগরার মতো পরা। মেয়েটি মাথার ঘোমটাটি একটু টানিয়া নামাইয়া লইয়া হাসিয়া বলিল—আমি কে তাহা জানিয়া কি হইবে? কিন্তু আমি কি, তাহা বুঝিতে পারিতেছ না?

বলিতে বলিতে মেয়েটি লণ্ঠনটি তুলিয়া তাহাব অতি স্বল্প আলো ফুঁ দিয়া নিভাইয়া দিয়া চৌকীর উপর উঠিয়া বসিল।

রাত্রি শেষ হইবার পূর্বে মেয়েটি শয্যায় তাঁহার পাশে জাগিয়া বসিয়া তাঁহাকেও জাগাইয়া দিয়া বলিল—বাবুজী, আমি এখন চলিলাম।

হারাধন তাহার হাত চাপিয়া ধরিলেন। বলিলেন—তোমার নাম কি বলিয়া যাও।

মেয়েটি হাসিয়া বলিল—বলিলাম তো, আমার নাম জানিয়া আপনার কি লাভ হইবে? আমার নাম লইয়া আর কে মাথা ঘামায়? আমি নিজেই ভাবি না। আমি কেবল জানি আমি এক আওরৎ।

—কিন্তু তুমি হঠাৎ আমার এখানে আসিলে কেন? তুমি কি নিজের ইচ্ছায় আসিয়াছিলে?

মেয়েটি হাসিল। বলিল—আমার হাতের এই রূপার 'কাঙনী' দেখিতেছেন। ইহার ওজন পনরো ভরি। ইহা দিয়া আপনার মুখে মারিলে আপনার মুখ ফাটিয়া যাইবে। আপনি যাহা বলিলেন তাহার জন্য আপনাকে মারাই আমার উচিত ছিল। কিন্তু আপনি স্রেফ বুদ্ধু! সেইজন্য মারিলাম না। মেয়েরা কখনও পুরুষের কাছে নিজের ইচ্ছায় আসে? তাহাদিকে আদর করিয়া ডাকিতে হয়।

কথাবার্তার ধারা দেখিয়া হারাধন তো অবাক। তিনি প্রশ্ন করিলেন—তবে তুমি আসিলে কেন? আমি তো তোমাকে কোনোদিন ডাকি নাই। তোমাকে তো আমি চিনিই না, দেখিও নাই কোনোদিন?

মেয়েটি হাসিয়া বলিল—আমি কি আর তেমন মেয়ে আছি? থাকিলে আসিতাম না। আমি খানিকটা রূপেয়ার জন্য, আবার খানিকটা ভয়েও আসিয়াছি।

হারাধন জিজ্ঞাসা করিলেন—টাকাই বা তোমাকে কে দেবে আর ভয়ই বা তোমার কাহাকে?

মেয়েটি মাথার ঘোমটাটি ভাল করিয়া টানিয়া দিয়া আবার হাসিল। বলিল—যাহাকে ভয় কবি আর যে টাকা দিবে তাহার নাম করিতে বাধা আছে।

হারাধন তাহার হাতটি ধরিয়া আদর করিতে করিতে বলিল—আমি তাহার নাম বলিয়া দিতেছি। তোমাকে বাবু সুবিন্দর সিংহজী পাঠাইয়াছেন।

মেয়েটি জিজ্ঞাসা করিল—আবার কবে আসিব?

—তোমার যে দিন খুশি।

মেয়েটি এবার হাসিয়া তাঁহার হাতের মধ্য হইতে নিজের হাত ছাড়াইয়া লইয়া মস্ত ভাবী, রূপার কাঙনী পরা হাতখানা তুলিয়া মারিবার ভঙ্গি করিয়া বলিল—আবার ওই কথা? মেয়েরা খুশী হইয়া পুরুষের কাছে আসে, না আসিবে? তোমার খুশীর কথা বল। বলিলে আসিব, না বলিলে আসিব না।

আবার তাহার হাতখানি ধরিয়া হারাধন বলিল—তোমার অসুবিধা না হইলে কাল আসিও। কিন্তু তুমি আমাকে একটা কথা বলিতে পার?

—বল, দেখি বলিতে পার কি না।

—সিংহজী তোমাকে আমার কাছে পাঠাইলেন কেন? আমি তো এতদিন এখানে আছি, কিন্তু ইহার পূর্বে তো কোনোদিন তাঁহার এ খেয়াল হয় নাই।

মেয়েটি এবার বেশ জোরে হাসিয়া উঠিল। বলিল—তুমি সত্য-সত্যই বুদ্ধু! তুমি কি কিছুই জান না, বা অনুমানও করতে পার না?

হারাধন অবাক হইয়া বলিলেন—কি জানিব, কিই বা অনুমান করিব?

মেয়েটি বলিল—দিন তিনেক আগে সিংহজীর বাঙালী বহুর এক লেড়কী হইয়াছে। লেড়কী পাইয়া তোমার মতো বুদ্ধুর জন্য তাঁহার দিল দুখাইয়া উঠিয়াছে।

সিংহজীর এই বাঙালী বহুর কন্যাই পার্বতী।

উনিশ

হারাধন পার্বতীর নামটাই সেদিন শুনেছিলেন। তাহার অতিরিক্ত কোনো সংবাদ পান নাই।

সেই পার্বতীকে তিনি দেখিতে পাইলেন বেশ কিছু কাল পর। বেশ মাস কয়েকই হইবে।

বাবু সুরিন্দর নারায়ণ সিংহ সেবার শীত পড়িতেই আরা ছাড়িয়া দেহাতে নিজের গাঁওয়ে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় হারাধনকে বলিয়া গেলেন—অম্বুবাবু, দিন সাতেক পর তুমি দেহাতে চলে এস। ওখানে ধানও কেনা হবে, আবার আমার সঙ্গে ক'দিন কাটিয়েও আসা হবে।

সেই অনুযায়ী হারাধন দেহাতে বাবু সুরিন্দর নারায়ণ সিংহের গ্রাম রনৌরায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। এবার অবশ্য হাঁটিয়া নয়, এবার গেলেন বয়েলগাড়ীতে। শীতের সময়, বর্ষার সব কাদা শুকাইয়া গিয়াছে। রাস্তার শুকনো জমাট মাটি চাকার চাপে ভাঙিয়া, যথেষ্ট ধূলা উড়াইয়া ঘুটঘুট খুটখুট করিতে করিতে গিয়া হাজির হইলেন।

গ্রামের বাহিরে সেই চবুতরাতেই নিমগাছের নীচে সতরঞ্চি পাতিয়া, গায়ে দামী শাল জড়াইয়া সুরিন্দর সিংজী পাত্র মিত্র সহ বসিয়াছিলেন। তাঁহাকে বয়েল গাড়ী হইতে নামিতে দেখিয়া মহা সমারোহে সম্বর্দ্ধনা জানাইয়া দুই হাত প্রসারিত করিয়া বলিলেন—আরে আইয়ে আইয়ে অম্বুবাবু। দেখিয়ে আপকো লিয়ে হম তো সব কোইকো হিঁয়া আটক রাখ্‌খা হ্যায়। আ যাইয়ে।

কাছে গিয়া বসিতেই একজনকে আদেশ দিলেন শরবত আনিবার জন্য। তারপর ধান কেনার প্রাথমিক কথাবার্তার পর তাঁহাকে লইয়া সিংহজী উঠিয়া পড়িলেন। বলিলেন—সব কোই সবেরে আ যাইয়ে। বহত মজাক্ হোগা!

পাশাপাশি যাইতে যাইতে হারাধন জিজ্ঞাসা করিলেন—কাল সকালে কি মজা হইবে?

তাঁহার পিঠে পৃষ্ঠপোষকতার চাপড় মারিয়া সিংহজী হাসিয়া বলিলেন—কাল সবেরে দেখিয়েগা।

তাঁহাকে লইয়া গিয়া হাজির করিলেন সেই প্রাসাদোপম অতিথি-ভবনে। তিনি উপস্থিত হইতেই মালিক হুজুরকে দেখিয়া চাকর-বাকর ও ঠাকুর আসিয়া হাজির হইয়া গেল। তিনি হাসিয়া বলিলেন—মেহ্‌মান আসিয়াছেন। ভাল করিয়া

আদর-যত্ন কর। আভি উনকে লিয়ে গরম পানি দে দো। উ বাঙালী বাবু. হিঁয়াকা জাড়া তো উনকে পাশ বহত কড়া মালুম হোগা।

তারপর হারাধনকে আবার একদফা সমাদর করিয়া বলিয়া গেলেন, আপকো লিয়ে তো হাম দুসরা কুছ রাখ্‌খে হেঁ। কাল দেখলায়েঙ্গে। আজ তো রাত মে আরাম কিজিয়ে।

হ্যাঁ, আরাম বটে! গবম পানি হইতে শুইবার সময় উৎকৃষ্ট বিছানা, ভাল মশারি, মায় গরম রাগ পর্যন্ত বিছানায় হাজির। খাওয়ার পর গেস্ট হাউসের ম্যানেজার তাঁহাকে শয়ন করাইবার জন্য ঘরে আনিয়া সসম্ভ্রমে বলিলেন—সব কুছ এক দফে মেহেরবানী করকে দেখ লিজিয়ে সব ঠিক হ্যায় কি নহি।

সব ঠিক আছে বলিয়া কথা শেষ করিলেও ম্যানেজার মহাশয় গেলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন—আর কিছু লাগিবে কি না।

—নাঃ। আবার কি লাগিবে? এ তো অতি সুন্দর ব্যবস্থা। তবে খাটটা মস্ত বড়। আমি ছোট চৌকিতে শুই। একটু অসুবিধা হবে, এই যা।

ম্যানেজার হাসিয়া বলিলেন—আমিও ওই কথাই বলিতেছিলাম। একা অত বড় পালংকে শুইতে অসুবিধা হইবে বলিয়াই জিজ্ঞাসা করিতেছি, কিয়া, কই আওরৎ কি জরুরৎ হোগা?

আকাশ হইতে যেন পতিত হইলেন হারাধন। শশব্যস্ত হইয়া বলিলেন—আরে না না, ওসব কিছু লাগিবে না। আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া যান। আমি এখনই শুইয়া পড়িব।

তাঁহার কথা শুনিয়া আরও একটু ইতস্ততঃ করিলেন ম্যানেজার মহাশয়। তারপর হারাধন সত্য সত্যই যখন দরজা বন্ধ করিবার উপক্রম করিলেন তখন তিনি নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

তিনি বাহির হইয়া গেলে দরজা বন্ধ করিয়া হারাধন রাজশয্যায় শয়ন করিলেন। শুইতে শুইতে ভাবিলেন, এই মজার জন্যই কি সিংহজী তাহাকে ইঙ্গিত করিতেছিলেন? পরক্ষণেই মনে হইল, না, সিংহজী পরদিন সকালের কথা বলিয়াছেন। দেখা যাক, কোন মজা তিনি দেখান।

পরদিন খুব ভোরে, তাঁহাকে বিস্মিত করিয়া স্বয়ং সিংহজীই তাঁহাকে ঘুম হইতে উঠাইলেন। ঘর হইতে বাহির হইতেই তিনি বলিলেন—ওই গরম পানি তোমার জন্য রাখা আছে। তুমি মুখ ধুইয়া আমার সঙ্গে এস। তোমাকে এক নম্বর মজা দেখাই। আজ সকলের জন্য একটা মজা, কিন্তু অম্বুবাবু, তোমার জন্য আলাদা একটা মজা রাখা আছে।

আমাকে সঙ্গে লইয়া তিনি চবুতরার দিকে চলিলেন। হারাধন দেখিলেন, ইতিমধ্যেই সেখানে বেশ কিছু লোক জমিয়াছে। আর চবুতরার মাঝখানে অনেক হাঁড়ি নামানো রহিয়াছে। সিংহজী সেখানে উপস্থিত হইতেই সমস্ত লোক হর্ষপ্রকাশ করিল। প্রবল শীতের জন্য সকলেরই মাথা, কান ও গলায় কাপড় কি গামছা জড়ানো। একজন সর্বপ্রথম হাঁড়ি হইতে পানীয় ঢালিয়া সিংহজীর হাতে দিল। তিনি গেলাস হাতে লইয়া বলিলেন, অম্বুবাবুকে দাও। দ্বিতীয় গ্লাস অম্বুবাবুর হাতে উঠিতেই সিংহজী হাসিয়া বলিলেন—পিয়ো অম্বুবাবু।

হারাধন পান করিলেন। রস!

দ্বিতীয় গ্লাসের জন্য হাত বাড়াইয়া সিংহজী বলিলেন—কেয়া? অচ্ছা না?

স্বীকার করিতেই হইল।

তাহাকে রস খাওয়াইয়া তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন—আব্ চলো, তুমবে চিজ তুমকো দেখলায়েঙ্গে।

অন্য সকলকে ঢালাও রস খাইবার অনুমতি দিয়া হারাধনকে লইয়া তিনি আবার ফিরিলেন। আসিলেন গেস্ট হাউসে। বলিলেন—তুমি প্রাতঃকৃত্য স্নান পূজা সারিয়া প্রস্তুত হইয়া থাক, আমি আসিতেছি।

কি ব্যাপার হারাধন কিছুই বুঝিলেন না। মজার ব্যাপার তিনি সবই বুঝিয়াছেন। মজা যাহাই হোক, সে সম্পর্কে তাঁহার বিন্দুমাত্র ঔৎসুক্য বা উৎসাহ নাই। ও মজা সবই সিংহজীর। সিংহজী জীবনে মজা লুটিতে আসিয়াছেন, তিনি মজা লুটুন, তাহাতে তাঁহার কি? এ মজা তো তাঁহার নয়। তিনি এ মজার ভোক্তা নন, তিনি তো দর্শক মাত্র। কেবল তাঁহার মজার আস্বাদের তীব্রতা বাড়াইয়া দেওয়াই তাঁহার কাজ। তাহার অধিক কিছু নয়।

তিনি নিস্পৃহ চিত্তে প্রাতঃকৃত্য, স্নান ও পূজা শেষ করিয়া দোতলার ঘর হইতে নামিয়া আসিয়া প্রাসাদের সামনে যে মস্ত বাগিচা তাহারই মধ্যে একটা বেঞ্চে বসিলেন। শীতের প্রভাত, এই ঘরে সূর্যের আলো কুয়াশার ভিতর দিয়া শিশির-ভেজা বাগিচার গাছগাছালিতে ও ঘাসে আসিয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। এমন সময় সোৎসাহ আহ্বান আসিল—অম্বুবাবু, এ অম্বুবাবু, আপ কাঁহা হ্যায়?

ব্যস্ত হইয়া বাগিচার মুখে দাঁড়াইয়া হারাধন বলিলেন—আপকো লিয়ে তো হিঁয়েই হাজির হ্যায় সরকার।

হাসিতে হাসিতে তাঁহার সম্মুখে সিংহজী আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার পিছনে

একটি দশ-বারো বছরের মেয়ে। তাহার হাতে একটি পোঁটলার মতো কিছু। সেটি সে বুকের সহিত আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে।

হারাধনকে সামনে দেখিয়াই তিনি সোৎসাহে বলিলেন—আব্ দেখো তো!

বলিয়া সেই বালিকার কোল হইতে কাপড়ে জড়ানো সামগ্রীটি সযত্নে তুলিয়া লইয়া হারাধনের প্রসারিত হাতের উপর সন্তর্পণে রাখিয়া হাসিমুখে বলিলেন—যত্ন করিয়া ধরো, তারপর দেখ।

কাপড়ে-জড়ানো সামগ্রীটি কোলে লইয়া হারাধন আবার ফিরিয়া গিয়া বাগিচার মধ্যে বাঁধানো বেঞ্চিতে বসিয়া কাপড়ে জড়ানো জিনিসটি দেখিতে লাগিলেন।

সুরিন্দর নারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন—কি বল তো?

বলিয়া নিজেই আস্তে গরম কাপড়ের স্তূপ একটু ফাঁক করিয়া হাসিমুখে বলিলেন—এইবার দেখ।

হারাধন দেখিলেন। একটি শিশুর মুখ। ফর্সা রঙ। এ দেশে যাহাকে বলে পাকা গেঁহু, মানে গমের মতো, তেমনি রঙ, নধর নিটোল চেহারা, গোলগাল। ভরাভর্তি মুখে ফোলা ফোলা চোখ দুটি বন্ধ করিয়া গরম কাপড়ের ওমের মধ্যে ঘুমে এলাইয়া আছে।

তাহার মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন হারাধন। তিনি দেখিলেন সিংহজীও তাহার মুখের দিকে বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন। তাঁহার চোখে চোখ পড়িতেই সিংহজী হাসিয়া বলিলেন—কেমন, খুব সুন্দর নয়?

হারাধন শিশুটির মুখের দিকে চাহিয়া বলিতে গেলেন—জী হাঁ।

কিন্তু বলিতে পারিলেন না, গলা বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আটকাইয়া গেল। কেমন একটা অজ্ঞাত আবেগ তাঁহার বুক হইতে গলা পর্যন্ত রুদ্ধ হইয়া আসিল। পরক্ষণেই তাঁহার চোখ ধীরে ধীরে জলে পূর্ণ হইয়া উঠিয়া চোখের জল তাঁহার গাল বাহিয়া গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তিনি গভীর আবেগের সঙ্গে সেই নিদ্রিত অপরূপ সৌন্দর্যময় মাংসপিণ্ডটিকে বুকের সহিত চাপিয়া ধরিলেন। পরমুহূর্তেই তাহার আঘাত লাগিতে পাবে এই কল্পনায় বুক হইতে কোলে নামাইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

সুরিন্দর সিংহজী তো ব্যাপার-স্যাপার দেখিয়া অবাক। শুধু অবাক নয়, শশব্যস্ত। তিনি হারাধনের পৃষ্ঠদেশে হাত রাখিয়া বার বার বলিতে লাগিলেন—আরে অম্বুবাবু, তুম রোতে কেঁউ? মৎ রোনা! নহি, নহি!

কিন্তু হারাধন সান্ত্বনাহীনের মতো কাঁদিয়াই চলিলেন। কেন যে তিনি কাঁদিতেছেন তাহা তিনি নিজেই জানেন না, অথচ কাঁদিয়াই চলিয়াছেন। অনেকক্ষণ কাঁদিয়া,

চেষ্টা করিয়া নিজেকে শান্ত করিয়া একহাতে শিশুটিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া অন্য হাতে চোখ মুছিতে লাগিলেন।

সিংহজী তাঁহার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে প্রশ্ন করিলেন—কিয়া হুয়া অম্বরবাবু?

চোখের জল মুছিতে মুছিতে হারাধন ঘাড় নাড়িলেন। যাহার অর্থ তিনি জানেন না।

সিংহজী তাঁহার পিঠে হাত বুলাইতে লাগিলেন। বার বার সস্নেহে বলিতে লাগিলেন—মাৎ রোনা!

কিছুক্ষণ পর শান্ত হইয়া তিনি শিশুটিকে আবার দেখিতে লাগিলেন। তিনি শান্ত হইলে সুরিন্দর সিংহজী বলিলেন—কাহে এতনা ঘাবড়া গয়া?

হারাধন হাসিয়া বলিলেন—আমি ঘাবড়াইনি সরকার। ঘাবড়াবার ব্যাপার কিছু হয়নি। এই বাচ্চাকে দেখে কি রকম কান্না পেয়ে গেল তাই কাঁদলাম। তবে এ কান্না দুঃখের কিছু ব্যাপার নয়। তবে সুখের কিছু কি না তাও জানি না হুজুর সরকার।

শিশুটির ততক্ষণে ঘুম ভাঙিয়াছে। সে হারাধনের মুখের দিকে চাহিয়া মধ্যে মধ্যে হাসিতেছে। তাহাকে খানিকটা আদর করিয়া হারাধন বাচ্চাটিকে সেই মেয়েটির হাতে ফিরাইয়া দিলেন। সিংহজী ইঙ্গিত করিলে মেয়েটি শিশুটিকে লইয়া চলিয়া গেল।

মেয়েটি বাচ্চাটিকে লইয়া যাইবার কিছুক্ষণ পর পর্যন্ত সুরিন্দর সিংহজী চুপ করিয়া থাকিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে বলিলেন—আমার সব কথা তুমি আমার খুব কাছে থাকিয়াও জান না অম্বুবাবু। আমার যেসব কর্মচারী, মুনিস ও তহশীলদারদের সহিত তুমি মেলামেশা কর তাহারাও তোমাকে আমার সম্পর্কে নিশ্চয়ই বিশেষ কিছু বলে না। বলিতে ভয় পায়। আমি অবশ্য ভয় পাইবার মতো মানুষই। কারণ যাহাদের সহিত আমার পরিচয় আছে তাহারা কেহই আমাকে সঠিক জানেও না, বুঝিতেও পারে না। তাহারও আবার কারণ আছে। আমি একাধারে জঙ্গলের শের ও সাপ দুইয়েরই মতো। আমি কোন চেহারা লইয়া কখন কাহাকে আক্রমণ করিব তাহা তাহারা অনুমান করিতে পারে না। অনুমান করিতে পারে না বলিয়াই ভয় পায়। কিন্তু আমি তো জানি, আমাকে সত্যসত্যই ভয় পাইবার মতো কিছু আমার মধ্যে নাই। লোকে জানে আমি অতি মাত্রায় লম্পট। কথাটা বাহির হইতে দেখিলে সত্য মনে হইতে পারে, কিন্তু আসলে ব্যাপার তাহা নয়। দেখ অম্বুবাবু, আমি পুরানা

জমানার আদমি, হাল জমানার সঙ্গে আমার মিল নাই। হাল আমলকে আমি সঠিক চিনিও না। আমরা আজ বহু পুরুষের জায়গীরদার। কোম্পানীর আমলেও আমরা এখনকার চেয়ে রইস আদমি ছিলাম। মিউটিনির সময় আমার দাদো আবার কুঁওয়র সিংহজীর সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন। আমার দাদো সে সময় কোম্পানীর সঙ্গে লড়াইয়ে মারাও যান। আমার বাবা কোম্পানীর সঙ্গে, ইংরেজ সরকারের সঙ্গে বহুত লড়াই করিয়া সম্পত্তি রক্ষা করিয়াছিলেন। আমার বাবা সে সময় নাবালক ছিলেন এবং মায়ের সঙ্গে আমার মামার বাড়ীতে ছিলেন। আমার মামারা আবার মিউটিনির সময় কোম্পানী সরকারকে সাহায্য করিয়াছিলেন। সেই সুবাদে, আমার মামাদের সহায়তায় আমাদের সম্পত্তি বাঁচিয়া যায়। কিছুটা কাড়িয়া লইয়া কিছুটা আমার বাবাকে দেওয়া হয়। আমি সেই সম্পত্তিকে আমার সাহস ও বুদ্ধি দিয়া বাড়াইয়া তুলিয়াছি। আমরা পুরানা জমানার মানুষ। কিন্তু আমার বাবা আমার সম্পর্কে একটি ভুল করিয়াছিলেন। আমার সাদী দিলেন এক নয়া জমানার রইস আদমির লেড়কির সঙ্গে। আমার সাদী হইল। স্ত্রী রইস ঘরের কন্যা, কিন্তু হালচাল নয়া জমানার। আমার এত সম্পত্তি, এতবড় রইসের একমাত্র লেড়কা আমি, আমি নিজের স্ত্রী ছাড়া যদি আর কোনো স্ত্রীলোকের সঙ্গ করি সে কি খুব দোষের হইবে? আমি তো তাহা মনে করি না, মনে করিতেও পারি না। আজও সেইরূপই ভাবি। আমার স্ত্রীর আজ দশ বৎসর হইল একটি পুত্র হইয়াছে। সন্তান জন্মের পরই তিনি আমার চরিত্রের জন্য আমার সহিত কলহ করিয়া তাঁহার পিত্রালয় পাটনায় চলিয়া গিয়াছেন। সেইখানেই বাস করিতেছেন। আমি তাঁহাকে আনিবার চেষ্টা করিয়াছি। তিনি আসেন নাই। বলিয়াছেন, আমি আমার চরিত্র সংশোধন না করিলে তিনি আসিবেন না। আমি তখন তাঁহাকে বাদ দিয়া আমার পুত্রকে আমাকে দিয়া দিতে বলিলাম। তাহাতে আরও ঘোরতর আপত্তি। আমার শ্বশুর অদ্যাবধি জীবিত। পাটনায় তাঁহার প্রচণ্ড প্রতাপ। তদুপরি আমার বড় শ্যালক ব্যারিস্টার। তিনি বিলায়েত গিয়া ব্যারিস্টার সাহাব বনিয়া আসিয়াছেন। তিনি আমার দাম্ভিক শ্বশুরের প্ররোচনায় আমাকে পরিষ্কার বলিয়া দিলেন—তোমার লেড়কা তোমাকে দিব না। সে তোমার কাছে গেলে তোমারই মতো চরিত্রহীন বনিয়া যাইবে। আমাকে অপমানিত হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইল। আমি বাবু হরিহর প্রসাদ নারায়ণ সিংহের একমাত্র বেটা, আমি সুরিন্দর নারায়ণ সিংহ, আমি এইভাবে অপমানিত হইয়া থাকিব? আমিও আইনের রাস্তা ধরিলাম। কিন্তু আইনের

রাস্তায় কিছু করিতে পারিলাম না। তারপর আমার বেটাকে চুরি করিয়া আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। তাহাতেও কিছু করিতে পারিলাম না। কারণ আমি চুরি করিতে পারি এ ধারণা করিয়াই আমার বেটাকে ওই বদলোকগুলা সব সময় পাহারায় রাখে। তাহাদের কাছে নাকি পিস্তল থাকে। কোনো কিছু ঘটিবার ভয় থাকিলে তাহাদের উপর পিস্তল চালাইবারও হুকুম আছে। সুতরাং আমি আমার একমাত্র লেড়কাকে পাইবার আশা ছাড়িয়া দিলাম। ছাড়িয়া দিতে হইল।

এতক্ষণ একসঙ্গে অনেক কথা বলিয়া বাবু সুরিন্দর সিংহজী একবার চুপ করিলেন। যাহা বলিতেছেন তাহার সহিত চোখের সামনের জীবনের বিন্দুমাত্র মিল নাই। চোখের সামনে জাড়ার দিনের সূর্যের মিঠা আলো কুয়াশার ভিতর দিয়া চুঁইয়া বাগিচার গাছ-গাছালির উপর, শিশিরে ভেজা ঘাসের ও ধুলার উপর আস্তে আস্তে সকলের অগোচরে মুহূর্তে মুহূর্তে ছড়াইয়া পড়িতেছে। পাখী নাচিয়া নাচিয়া, নানান আওয়াজ তুলিয়া এদিক ওদিক করিতেছে। সেই দিকে চাহিয়াই হারাধন সিংহজীর কথা শুনিতেছিলেন। শুনিতেছিলেন আর চোখের সামনে পৃথিবীর শান্ত, স্নিগ্ধ চেহারা দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছিলেন। সুরিন্দর সিংহজী থামিলেও তিনি চুপ করিয়াই সামনের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সুরিন্দর সিংহজী আবার বলিতে লাগিলেন—বুঝিলে অম্বুবাবু, ও রাস্তা ছাড়িয়া আমি তখন অন্য রাস্তা ধরিলাম। আমাকে যেমন অপমান করিয়াছে আমার স্ত্রী, শ্বশুর ও শ্যালক আমিও ঠিক তেমনি কায়দায় অপমান করিব। আমি এতদিন স্ত্রীলোক লইয়া যাহা কিছু করিতাম, তাহা গোপনেই করিতাম। কানাঘুষা হইলেও তাহা গোপন থাকিত। আমি সর্বপ্রথম গোপনতা পরিত্যাগ করিলাম। এবং প্রথমেই আমার স্ত্রীকে যথেষ্ট অপমান করিবার জন্যই আবার একটি বিবাহ করিলাম। আমি চাহিতেছিলাম সন্তান। বিশেষ করিয়া পুত্র সন্তান। আমার বিবাহে আমি খুব ঘটাও করিয়াছিলাম, আমার প্রথম শ্বশুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণও করিয়াছিলাম। অবশ্য তাহার কোনো উত্তর পাই নাই। কিছুদিন পর আমি একখানা পাল্টা নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়াছিলাম। আমার পুত্র যেন আমার মৃত্যুতে পাটনায় পিতৃশ্রাদ্ধ করিতেছে। ইহাতে আমার ক্রোধ আরও বাড়িয়া গেল। আমি সদাসর্বদা সন্তান কামনা করিতে লাগিলাম। একটি নয়, অনেক। পুত্র কন্যা যত হয় হোক। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে চার পাঁচ বৎসরের মধ্যেও, এখনও পর্যন্ত কোনো সন্তান হইল না। কি করি? আবার বিবাহ করিব? নাঃ, আর বিবাহ নয়। আমি একের পর এক আমার

গৃহেই স্বাস্থ্যবতী নারী সংগ্রহ করিয়া সন্তানের কামনায় সঙ্গ করিয়াছি। কিন্তু আমার কপালই হোক আর মন্দ ভাগ্যই হোক, সন্তান আর হইল না। শেষ তোমার সঙ্গে উর্মিলাকে আরা স্টেশনে অবগুণ্ঠনের মধ্যে দেখিয়া হঠাৎ মনে হইল, ইহার গর্ভে হয়তো আমার সন্তান হইলেও হইতে পারে। তুমি কিছু মনে করিও না অম্বুবাবু, আমার সন্তান-কামনার সহিত যে আমার লালসাও যুক্ত ছিল না তাহা বলিব না। সে লোভও ছিল। দেখ, তাহাকে আমার কাছে পাইয়া আমি কি অমূল্য রত্ন লাভ করিয়াছি। আমার এক পুত্র। তা সে আমার এমন পুত্র যে আমার শ্রাদ্ধ করিয়াছে। তাহার পর এই আমার প্রথম সন্তান। ইহাকে বলিতে গেলে, তোমারই জন্য পাইয়াছি। সেইজন্যই তোমাকে এত আদর করি। আমি বহুদিন ভাবিয়াছি আমার এ সন্তানের কথা তোমাকে বলিব কি না। শেষে স্থির বুঝিয়াছি, এ কন্যা আমার কোলে আসিয়াছে বটে, কিন্তু এ তোমার আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা ভিন্ন বাঁচিবে না। তাই উহাকে তোমার কোলে দিয়া তোমার আশীর্বাদ প্রার্থনা করিতেছি।

বলিয়া সুরিন্দর সিংহজী চুপ করিলেন।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—জানিলে অম্বুবাবু, আমি এ লেড়কীকে বহত লিখাপড়ি শিখাইব। তাহার পর বড় হইলে এক খপসুরৎ ব্যারিস্টার লেড়কার সঙ্গে ইহার সাদী দিব। তুমি সব সময় আমার কাছে কাছে থাকিয়া আমার মেয়েকে দেখিবে। উহাকে তোমার আপন কন্যার মতই মনে করিবে।

হারাধন বলিলেন—নিশ্চয়। তাহাতে আর কথা কি?

তারপর আবার সুরিন্দর সিংহজী জিজ্ঞাসা করিলেন—আচ্ছা অম্বুবাবু, তোমার কত বয়স হইল?

হারাধন হাসিলেন। বলিলেন—বয়সের হিসাব তো রাখি না হুজুর সরকার। তবে বোধহয় পঁচিশ-ছাব্বিশ হইবে। বয়স তো অনেকই হইয়া গেল।

সিংহজী বলিলেন—পঁচিশ-ছাব্বিশ কি একটা বয়স! তুমি ফিন সাদী করিয়া ফেল।

হারাধন হাসিতে লাগিলেন।

সিংহজী অপ্রস্তত হইয়া বলিলেন—তুমি অমন করিয়া হাসিতেছ কেন? তুমি কি ভাবিতেছ, তুমি বিবাহ করিয়া আনিলে আমি আবার তোমার স্ত্রী কাড়িয়া লইব? না, না, সেরূপ ভাবিও না। আমি ততখানি পাষণ্ড নহি।

হারাধন হাসি কমাইয়া বিষণ্ণভাবে বলিয়াছিলেন—না, হুজুর সরকার, আমি সে-কথা ভাবি নাই। আমি সামান্য লোক। আমার অমন কথা ভাবিবার সাহস

কোথায়? তবে কথা কি জানেন? আমার মনের ভিতর হইতে স্ত্রীলোককে ভালবাসিবার প্রবৃত্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তবে মধ্যে মধ্যে যে স্ত্রী সংসর্গ করি সে আমার মনের জন্য নহে, এই দেহটার জন্য। তবে আপনাকে বলি, এজন্য আমি আমার ভাগ্যকে আর ধিক্কার দিই না। যেদিন হইতে শুনিয়াছি উর্মিলার সন্তান হইয়াছে সেদিন হইতে তাহাকে না দেখিয়াই ভালবাসিয়াছি। আমি আমার ভালবাসার পাত্র পাইয়া গিয়াছি। আপনার দৌরাত্ম্যেই আমার ভালবাসার পাত্র চলিয়া গিয়াছিল। আবার আপনার দয়াতেই আমার ভালবাসার পাত্র ফিরিয়া পাইলাম। আপনার কাছে কেবল এক প্রার্থনা, আমাকে মধ্যে মধ্যে কন্যাকে দেখিতে দিবেন. কিছু আদর করিতে দিবেন। আমি আর কিছু চাই না।

সুবিনয় নারায়ণ সিংহ হারাধনের এ অনুরোধ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন। তাঁহার কন্যার নাম ছিল পার্বতী। সে যখন দেহাত হইতে সিংহজীর সঙ্গে আরা শহরে আসিত তখন দেহাত বর্ণোরা হইতে আরায় পোঁছিয়াই সিংহজী হারাধনকে খবর পাঠাইতেন পার্বতী আরায় আসিয়াছে। খবর পাইবামাত্র হারাধন হাতের সমস্ত কাজ ফেলিয়া সিংহজীর আরা শহরের বাড়ীতে ছুটিতেন। তখন তাঁহার হাতে কিছু-না-কিছু থাকিতই। হয় কোনো সস্তা খেলনা, নয় কিছু খাদ্যসামগ্রী, নয় কোনো ফল, নিদেন পক্ষে ফুল।

মনের ভালবাসা আর সেই সঙ্গে তুচ্ছ সামগ্রী দিয়া প্রথম হইতেই হারাধন পার্বতীর ক্ষুদ্র হৃদয়খানি একেবারে জয় করিয়া লইয়াছিলেন। ছোট্ট পার্বতীকে কোলে করিয়া লইয়া তাহার হাতে ওই তুচ্ছ সামগ্রী উপহার দিয়া, তিনি অবিরত তাহার সহিত গল্প করিতেন। সে গল্পের আরম্ভও নাই, শেষও নাই। আবার তাহার কোনো অর্থও নাই। তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছোট্ট পার্বতীর মনোরঞ্জন করা।

প্রথম সেরেস্তায় কাজের ফাঁকে ফাঁকে সিংহজী সেসব শুনিয়া হাসিতেন। বলিতেন—তোমাদের দুইজনের কথা শুনিলে মনে হয় দুইটা পাগল কথা বলিতেছে।

হারাধন হাসিয়া বলিতেন—হুজুর সরকার আমাকে পাগল ভাবেন ভাবুন, তাহাতে আমার বিন্দুমাত্র যায় আসিবে না। তবে এ বিষয়ে আপনি একবার পার্বতীর মতামত লইয়া দেখিতে পারেন। দেখিবেন তাহার মতে আমার মতো সুস্থ-মস্তিষ্ক লোক বোধ হয় পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই।

শুনিয়া সিংহজী হাসিতেন। পরে আর তাহা লইয়া কোনো কথাই বলিতেন না। তিনি উপহার সম্পর্কেও একবার দুইবার মৃদু আপত্তি করিয়াছিলেন। তাহাতে হারাধন প্রথমটায় হাসিয়া বলিয়াছিলেন—হুজুর সরকার, আমি দরিদ্র লোক, আমি আপনার কন্যাকে কি দিতে পারি? যাহা দিই তাহার তো কোনোই দাম নাই। তবে যাহাকে দিই তাহার মতামত লইবেন, সে কি বলে দেখিবেন। আপনার দেওয়া বহু মূল্যবান সামগ্রীর চেয়ে আমার দেওয়া তুচ্ছ জিনিসগুলির মূল্য যে অধিক তাহা জিজ্ঞাসা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। আর একটা কথা কি জানেন হুজুর সরকার? আমাদের শাস্ত্রে দেবতা, সন্ন্যাসী, রাজা ইহাদের কাছে রিক্ত হস্তে গিয়া দর্শন প্রার্থনা অশাস্ত্রীয় ব্যাপার।

শুনিয়া সিংহজী হাসিয়া বলিয়াছিলেন—পার্বতী তো ও তিনের এক শ্রেণীতেও পড়ে না। তবে?

শুনিয়া হারাধন কপট বিলাপ করিয়া বলিয়াছিলেন—হায় হায় হুজুর সরকার, আপনার এখনও এ বিষয়ে কোনো জ্ঞান হইল না। পার্বতী সন্ন্যাসী নয়, তবে ও যে একসঙ্গে দেবতা ও সাম্রাজ্ঞীর যুক্ত মূর্তি। উহাকে দর্শন করিতে কি রিক্ত হস্তে আসিতে পারা যায়?

পর মুহূর্তেই বিষণ্ণভাবে বলিয়াছিলেন—আর সরকার বাহাদুর, আমার সংসারে যে দিবার কেহ নাই। আপনার দিবার বহুজন আছে, তাই আপনি বুঝিতে পারেন না। আমার সংসারে ওই পার্বতী ছাড়া যে আর কেহ নাই।

ইহার পর হইতে সিংহজী হারাধনকে আর পার্বতী সম্পর্কে কোনো কথা বলিতেন না। পার্বতীর বৎসর তিনেক বয়স হইতেই সে দেহাতের গাঁও রনৌরা হইতে আরা শহরে আসিলেই হারাধন আসিয়া তাহাকে কোলে করিয়া নিজের বাড়ী লইয়া যাইতেন। পার্বতী সারাদিন তাঁহার বাড়ীতে থাকিত। তাঁহার সহিত খেলা করিত। হারাধনও সব ভুলিয়া ওই ছোট্ট কন্যাটির সহিত মাতিয়া থাকিতেন। তাহাকে স্নান করাইতেন, খাওয়াইতেন, ঘুম পাড়াইতেন। যতক্ষণ সে জাগিয়া থাকিত তাহার সহিত অনর্গল কথা বলিয়া যাইতেন। ছোট্ট পার্বতীর সম্ভব অসম্ভব প্রতিটি অনুরোধ ও আবদার আদেশের মতো শিরোধার্য করিয়া পালন করিবার চেষ্টা করিতেন।

কেহ জানিত না, এমন কি সিংহজীও জানিতেন না হারাধনের আনন্দহীন, আশ্রয়হীন নিঃসঙ্গ জীবনে পার্বতীই তাঁহার একমাত্র সঙ্গী ছিল। এবং পার্বতীর সেবা ও সঙ্গই তাঁহার একমাত্র মুক্তির ক্ষেত্র ছিল। ইহা অবশ্য হারাধন এক দিনেই

বুঝিতে পারেন নাই। দিনে দিনে এ চেতনা ও বোধটি তাঁহার মধ্যে উন্মেষলাভ করিয়াছিল। অবশ্য ইহার সূক্ষ্ম আস্বাদ তিনি প্রথম লাভ করিয়াছিলেন সিংহজীর আমন্ত্রণে সেই সেবার শীতের সময় সিংহজীর স্বগ্রাম রণৌরাতে গিয়া। সেখানে প্রথম দিন পার্বতীকে কোলে করিয়াই অপ্রত্যাশিতভাবে চোখের জল ফেলিয়া যে আনন্দ আস্বাদ করিয়াছিলেন তাহা হইতেই ইহাব সূত্রপাত। সেদিন সিংহজীর প্রশ্নে তিনি এই আনন্দের কথাটা এড়াইয়া গিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন তিনি দুঃখে কাঁদিতেছেন না, সুখেও কাঁদিতেছেন না। কেন কাঁদিতেছেন তাহা তিনি নিজেও জ্ঞাত নহেন। সেদিন হয়তো সঠিক বুঝিতে পাবেন নাই। কিন্তু পরে বুঝিয়াছিলেন এ চোখের জল বিশুদ্ধ আনন্দসঞ্জাত।

হাবাধন ধানচালের ব্যবসা করিতেন। কাজেই তাঁহার কাজেব নির্দিষ্ট কোনো সময় ছিল না। সেই কারণে তাঁহাব পার্বতীকে লইয়া সমস্তক্ষণ মাতিয়া থাকিতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হইত না। সেই সঙ্গে তাঁহাব এক আশ্চর্য সহকর্মী ও সহযোগী জুটিয়াছিল। তাহার নাম চামাবিয়া। সে জাতিতে দুসাদ। বছর পনবো বয়সের এক লম্বা হিলহিলে তরুণ। এই বছব কয়েকের মধ্যে তাঁহার পূর্বতন সেবক যাদ্দুবরের মৃত্যুর পর তিনি নিজেই এই ছোকরাকে বহাল করিয়াছেন। বহাল করিবাব সময় তিনি সিংহজীর পরামর্শ লন নাই। একদিন জানিতে পারিয়া সিংহজী বিশেষ বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন নিম্নশ্রেণীর লোক বাখিবার জন্য। তিনি এতদিনেব মধ্যে প্রথম বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন—তোমরা বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ! তোমবা ব্রাহ্মণ হইসে কি হয়; তোমাদের নির্দিষ্ট কোনো জাতি নাই। তোমবা ভাল কবিয়া জাতি মান না, যার তাব হাতে জল খাও। তাহার উপব মছলি খাও।

শুনিয়া কিন্তু হারাধন বিরক্ত হন নাই। হাসিয়াই বলিয়াছিলেন—হুজুর সরকার, শাস্ত্রে একটা কথা আছে—যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ! যেথানে আচার যেমন সেখানে তেমনি আচার পালন করি। একথা ঠিক, বাংলা দেশে এত প্রখর জাতি-বিচার নাই। তবে জাতি-বিচার আছে বৈকি। এখানে জাতি-বিচার বাংলাদেশের চেয়ে অনেক তীব্র। সেইজন্য আমি এখানে নিজে রান্না করিয়া খাই, পাছে আমাকে এখানে এই লইয়া কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। অথচ আমি নিজে এ সবে বিশেষ বিশ্বাস করি না।

তাই যেদিন প্রথম পার্বতীকে কোলে করিয়া নিজের বাসায় হারাধন লইয়া গিয়াছিলেন সেদিন সিংহজী কিছু বলিবার পূর্বেই তিনিই হাসিয়া সিংহজীকে আশ্বস্ত করিয়া বলিয়াছিলেন—হুজুর সরকার, আপনি ভাবিবেন না। আমি

পার্বতীকে আমার হাতের রান্না জিনিসই খাওয়াইব। অন্য কাহারও পাক-করা কিছু খাওয়াইব না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন।

চামারিয়া ছেলেটাও তেমনি। রোগা হিলহিলে চেহারা, মুখে সব সময় এক মুখ হাসি। চোখে চোখ পড়িলে সে হাসি আরও প্রস্ফুট, আর বিনীত হইয়া দাঁড়ায়। সে তাঁহাদের এক খেলার সাথী হইয়া পড়িল।

তখন পার্বতীর বয়স বছর পাঁচেক। সেবার হারাধন তাহাকে একদিন সকালে লইয়া গিয়া বিকালে যখন তাহাকে সিংহজীর কাছে ফিরাইয়া দিয়া গেলেন তখন তাহার হাতে এক জোড়া বেশ ভারী সোনার বালা। প্রায় রূপার কাঁকনির ধরনে তৈরী। মেয়েকে হারাধনের কোল হইতে নিজের কোলে লইতে গিয়া দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন—একি অম্বুবাবু, তুমি পার্বতীকে সোনার কাঁকনি দিয়াছ?

—জী সরকার।

তিনি বিব্রত হইয়া বলিলেন—এ তুমি কি করিলে বল তো? এত দামী জিনিস দিতে গেলে কেন?

হারাধন হাত জোড় করিয়া বলিলেন—আমার তো আর কেহ নাই সরকার। আমার কেবল ওই পার্বতী আছে। তাই দিয়াছি। মন অনেক দিন হইতে চাহিতেছিল পার্বতীকে একটা কিছু গহনা দিই। তাই গড়াইয়া রাখিয়াছিলাম। উহার হাতে পরাইয়া দিয়াছি।

সিংহজী চুপ করিয়া গেলেন। এ বিষয়ে আর কোনো কথা বলিলেন না।

হারাধন বলিলেন—কিন্তু আমার যে একটা কথা ছিল সরকার।

—বল।

—সাহস দেন তো বলি।

—নিশ্চয়, নিশ্চয়। বল, বলিয়া ফেল। তবে নিশ্চয় পার্বতী সম্পর্কে কিছু বলিতে চাও?

হারাধন হাসিয়া বলিলেন—হ্যাঁ। আমার আপনার জীবন তো ওই একটি সোনার সূতা দিয়া বাঁধা সরকার। কাজেই পার্বতী ছাড়া আর কাহার কথা বলিব?

সিংহজী হাসিলেন। হাসিয়া বলিলেন—অম্বুবাবু, তুমি মানুষটা যখন আসিয়াছিলে তখন যেমনটি ছিলে তুমি তাহার চেয়ে এই কয় বৎসরে অনেক সুন্দর হইয়াছ।

সিংহজীর কথাটা বুঝিয়াও হারাধন না বুঝিবার ভান করিয়া হাসিয়া বলিলেন—

হুজুর সরকার যে কি বলেন ! তাই যদি হইবে তবে কোনো ঔরৎ আমার দিকে ফিরিয়া চাহে না কেন ?

সিংহজী বিরক্ত হইয়া বলিলেন—আঃ, তুমি যে কি বুদ্ধুর মতো কথা বল সময় সময় ! আরে, আমি তোমার দেহের রূপের কথা বলিতেছি না। আমি বলিতেছি যে তোমার মন অনেক সুন্দর হইয়াছে। তা এখন কি বলিতেছিলে বল।

হারাধন হাত জোড় করিয়া বলিলেন—হুজুর সরকার, পার্বতী যখন খুব ছোট, তখন আপনি আমার কাছে বলিয়াছিলেন, আমি পার্বতীকে অনেক লেখাপড়া শিখাইব এবং ব্যারিস্টার ছেলের সঙ্গে তাহার বিবাহ দিব। তা পার্বতীর তো পাঁচ বৎসব বয়স হইল, উহাকে লেখাপডা শিখাইবার তো আপনার কোনো ইচ্ছা দেখি না। সেইজন্য সেই পুরানো কথাটা আপনাব মনে পডাইয়া দিলাম। এখন আপনার ইচ্ছা।

সিংহজী একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—কথাটা যে আমার মনে নাই, ভুলিয়া গিয়াছি, ইহা আসল ব্যাপার নয়। আসল ব্যাপার কি জান ? বাড়ীতে স্ত্রীলোকদের কাহারও ইচ্ছা নহে যে পার্বতী লেখাপড়া শেখে। আমার স্ত্রী ইহাতে সব চাইতে বিরোধিতা ও আপত্তি কবিতেছেন। তিনি পার্বতীকে নিজের সন্তানের মতোই ভালবাসেন। তিনি বলিতেছেন, লেখাপড়া আমাদেব ঘবে কোনো মেয়েকে শিখিতে নাই। শিখিলেই কন্যা বিধবা হইয়া যাইবে। তিনি তো ইহারই মধ্যে পার্বতীর বিবাহেব জন্য আমাকে তাগিদ দিতে আবম্ভ করিয়াছেন।

হাবাধন শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন—হুজুর বাহাদুর, এ কোন সর্বনাশা কথা ! ইহাতে আপনি কোনোমতেই সম্মতি দিবেন না। আব আপনি অনুমতি দিলে আমি পার্বতীকে লেখাপডা শিখাইতে পারি। অবশ্য গোপনেই শিখাইব। কেহ জানিতে পারিবে না। তবে সেজন্য পার্বতীব সব সময় আরাতেই থাকা দরকার। উহাকে রনৌরাতে পাঠাইলে চলিবে না।

সিংহজী বলিলেন—সে আমি পারি। উহারা বনৌরাব পরিবর্তে বরাবর আরাতেই থাকিবে না হয়। কিন্তু তুমি কি প্রকারে গোপনে লেখাপড়া শিখাইবে ?

হারাধন হাসিয়া বলিলেন—সে আপনি দেখিবেন আমি কেমন করিয়া পার্বতীকে লেখাপড়া শিখাইব।

সিংহজী বলিলেন—লেখাপড়া শিখাইবে অথচ তাহা গোপন থাকিবে কি প্রকারে ?

হারাধন হাসিয়া বলিলেন—সে আপনি দেখিবেন আমি কেমন করিয়া পার্বতীকে লেখাপড়া শিখাইব।

সিংহজী বলিলেন—লেখাপড়া শিখাইবে অথচ তাহা গোপন থাকিবে কি প্রকারে?

হারাধন হাসিয়া বলিলেন—দেখিবেন, পার্বতী লেখাপড়া শিখিবে অথচ তিল মাত্র বুঝিতে পারিবে না যে সে লেখাপড়া শিখিতেছে। কাজেই বাড়ীতে কিছু বলিতে তো পারিব না, বা অন্দরমহলে কোনো মহিলাও তাহা বুঝিবেন না। তবে কাজটা কঠিন হইবে এবং সময়ও বেশী লাগিবে।

সিংহজী বলিলেন—ঠিক আছে, আমি সম্মত হইলাম। তুমি চেষ্টা করিয়া দেখ। সময় লাগুক না, তাহাতে কি আসে যায়?

পার্বতী ও চামারিয়াকে লইয়া হারাধন নিজের নির্জন গৃহে এক বিচিত্র খেলা আরম্ভ করিলেন। লেখাপড়ার খেলা। পার্বতীকে শিখাইবার জন্য সে-খেলায় চামারিয়াও আসিয়া গেল। তবে পনরো-ষোলো বছরের চামারিয়ার তুলনায় পাঁচ-ছয় বছরের পার্বতীর বুদ্ধি অনেক তীক্ষ্ণ। সে অনেক দ্রুত শিখিতে পারে। এ খেলায় সব কিছু শিক্ষা মুখে মুখে।

তবে হারাধনের সঞ্চয় সামান্যই। তিনি নিজে সামান্যই লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। সেই লেখাপড়ার সঙ্গে যেটুকু বংশানুক্রমিক সংস্কৃত শিক্ষা ছিল তাহার যতটা সম্ভব ততখানি, এবং বাস্তব পৃথিবী হইতে যে জ্ঞান সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহার কিছু কিছু, এই দিয়া পার্বতী, ও সেই সঙ্গে চামারিয়াকে জ্ঞানী করিয়া তুলিলেন। তবে তাঁহার নিজের কাছেই আরও একটা অমূল্য সঞ্চয় ছিল। তাহার সংবাদ তিনি নিজেও রাখিতেন না। সে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের কথা। কোনো বিস্মৃতকালে এসব তিনি তাঁহার পিতার কাছে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আজ নিজের সঞ্চয়ের পেটিকার ধুলা ঝাড়িয়া তাহার মুখ খুলিয়া নিজের সঞ্চয় খুঁজিতে গিয়া তিনি সেগুলিকে আবিষ্কার করিলেন। যেমন করিয়া একদা পার্বতীকে ভালবাসার মধ্য দিয়া নিজের প্রাণের মুক্তি ও আনন্দকে আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তেমনিভাবেই নিজের এ শক্তিকেও তিনি আবিষ্কার করিলেন।

আবিষ্কার করিয়া তাঁহার আনন্দের আর সীমা রহিল না। তিনি দেখিলেন সে-ভাণ্ডারে সঞ্চয় যেন অফুরন্ত। আর তাহাতেই পার্বতীর সর্বাধিক আনন্দ। তিনি মনের আনন্দে সেই ভাণ্ডার দিনে দিনে তাহার কাছে উজাড় করিয়া দিতে থাকিলেন।

এমনি করিয়া দুইটি বৎসর নিরুপদ্রবে কাটিয়া গেল। তাহার পরই এক নূতন

বিপদের সূত্রপাত হইল। একদা পার্বতীর মুখেই তিনি এক বিচিত্র সংবাদ শুনিলেন। পার্বতীই তাঁহাকে বলিল—চাচাজী, আমি আর কাল হইতে তোমার বাড়ী আসিব না। যথাসম্ভব গম্ভীর মুখেই কথাটা বলিয়া সে তাঁহার গলাটা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

হারাধনের বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল। তিনি পার্বতীর মুখখানি নিজের মুখের সামনে জোর করিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা কবিলেন—কেন রে, কি হইয়াছে যে আসিবি না? কে নিষেধ করিয়াছে?

পার্বতী বলিল—মা।

হারাধন জানেন পার্বতী সিংহজীর দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহিতা স্ত্রীকেই মা বলিয়া থাকে। এবং সাধারণে পার্বতীকে তাঁহারই কন্যা বলিয়া জানে। খুব অন্তরঙ্গ জন ছাড়া সে যে উর্মিলার কন্যা, এ সংবাদ কেহ জানে না। তিনি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—কেন, আসিবি না কেন?

সাত বৎসরের পার্বতী তাহাব বড় বড চোখ দুটি মেলিয়া বলিল—আমার সাদীর কথা হইতেছে, এ সময় আর আমার অন্দর মহলের বাহির হওয়া ঠিক হইবে না।

হারাধন যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। বলিলেন—তোব সাদী হইবে? তোর এখন সাদী হইবে কি বে?

বলিয়াই দেখিলেন গভীর লজ্জায় সাত বৎসরের পার্বতীর চোখের পাতা দুইটি ভারী হইয়া নামিয়া আসিয়া চোখ দুইটি বন্ধ হইয়া গেল। হারাধন অবাক হইয়া অনুভব করিলেন তাঁহার কোলে কোলে মানুষ এই সেদিনের ছোট্ট মেয়েটা সাদীর কথায় লজ্জা পাইয়া চোখ বন্ধ কবিল। কিন্তু কেমন ভয়ে তাঁহার বুকের ভিতরটা যেন শুকাইয়া আসিল। এ তো ঠিক কথা নয়। এখন এই সাত বৎসর বয়সে বিবাহ হইবে কি? আর একটু বয়স বাড়ুক, ওর দেহটা ও সেই সঙ্গে মনটা বিবাহের উপযুক্ত হউক, তবে তো!

এ বিবাহ যেমন করিয়াই হউক বন্ধ করিতে হইবে। তিনি পার্বতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুই এখন সাদী করিতে চাস?

তিনি ভাবিয়াছিলেন পার্বতী সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নাড়িয়া বলিবে—না, না, কখনই না।

কিন্তু তাঁহাকে অবাক করিয়া পার্বতী লজ্জায় তাহার দুই চোখ নত করিল।

হারাধন সম্পূর্ণ অবস্থাটা অনুমান করিতে পারিলেন। মেয়েটা এই সাত বৎসরে যতটা পরিপক্ক হইতে পারিত, যতটা পরিপক্ক হওয়া উচিত ছিল, সেটুকুও পরিপক্ক হয় নাই। বিবাহ কি সে সম্পর্কে উহার বিন্দুমাত্র ধারণা নাই। উহার

মনে এখন বিশুদ্ধ গাড়ী, গহনা, বিবাহের জলুস ও একটি ঝকঝকে বর রূপকথার মতো উঁকি মারিয়া যাইতেছে ক্ষণে ক্ষণে। যে রূপকথায় ও চিরকালের রানী হইয়া সিংহাসনে বসিয়া আছে। মেয়েটার মন এখনও রূপকথার রাজ্যসীমা পার হইয়া বাস্তব সংসারের বিন্দুমাত্র সম্পর্কে আসে নাই।

পার্বতীকে সঙ্গে লইয়া তাহাকে বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিয়া তিনি সোজা সিংহজীর দরবারে গিয়া হাজির হইলেন। খুব ব্যথিত হইয়া তিনি সিংহজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হুজুর সরকার, আপনি নাকি পার্বতীর বিবাহের কথা ভাবিতেছেন?

সিংহজী মনে মনে অপ্রস্তুত বোধ করিলেও মুখে হাসিয়াই প্রশ্ন করিলেন—তোমাকে কে বলিল?

হারাধন বলিলেন—যাহার বিবাহ তাহারই মুখ হইতে শুনিলাম।

সিংহজী হাসিয়া বলিলেন—পার্বতীয়া তোমাকে নিজে বলিয়াছে? মেয়েটা সত্য সত্যই এখনও বড় শিশু আছে।

হারাধন বলিলেন—হুজুর বাহাদুর, যে এখনও বিবাহ কি তাহার কল্পনামাত্র কবিতে পারে না, বিবাহ যাহার কাছে এখনও রূপকথার গল্পের মতো, তাহার কি এত তাড়াতাড়ি বিবাহ দেয়?

সিংহজী গম্ভীর হইয়া কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন। তারপর গম্ভীরভাবে বলিলেন—তোমার কথা এক দিক দিয়া যে বিশেষ সত্য তাহা আমি অবগত আছি ও সম্পূর্ণ অনুভব করিতে পারি। কিন্তু এই সঙ্গে একাধিক সামাজিক ও পারিবারিক প্রশ্ন আছে। তোমার কাছে তো সেগুলি প্রকাশ করিয়া বলিতে আপত্তি নাই। তুমি সব শুনিয়া বিবেচনা করিয়া দেখ। তাহার পর তোমার মতামত প্রকাশ করিও।

হারাধন ম্লান হাসিয়া বলিলেন—হুজুর বাহাদুর, আপনি একথা বলিয়া আমাকে বিশেষ সম্মানিত করিলেন। কিন্তু হুজুর বাহাদুর, আপনিই বলুন তো, আমার শুনায় বা মতামতে আপনাদের কি যায় আসিবে? তবু বলুন, শুনি।

সিংহজী বলিলেন—দেখ অম্বুবাবু, তুমি তো জান আমি এবং আমার পরিবার পুরানা জমানার লোক। আমাদের সমাজের প্রচলিত সংস্কার ও আচার-আচরণ মানিয়া চলি। সেই হিসাবে আমাদের ঘরের কন্যার খুব অল্প বয়সেই বিবাহ হয়। তাহার পর কন্যা যুবতী হইলে সে 'গাওনায়' শ্বশুরঘর করিতে যায়। কন্যার সাত-আট বৎসর বয়স অতিক্রম করিলেই তাহার বিবাহ দিতে হয়। নহিলে সমাজে সে একটা অসম্মানের কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

বলিয়া সিংহজী চুপ করিলেন। তারপর আবার বলিতে লাগিলেন—দেখ,

পার্বতীর ব্যাপারটা যদি মাত্র এইটুকুই হইত তাহা হইলে আমি হয়তো তাহার অল্প বয়সে বিবাহের ব্যাপারটা গরাইয়া ফেলিতে পারিতাম। কিন্তু ব্যাপারটা তাহা অপেক্ষা অনেক জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তুমি পার্বতীর জন্মবৃত্তান্ত জান। তুমি জান যে সে উর্মিলার কন্যা। আর উর্মিলা আমার বিবাহিতা স্ত্রী নহে। উর্মিলার গর্ভের কন্যার আমার সমঘরে বিবাহ হওয়া খুব কঠিন ব্যাপার। শুধু কঠিনই নয়, অসম্ভব ব্যাপারই বলা চলে। তবে পার্বতী যে উর্মিলার কন্যা এ সংবাদ খুব কেউ জানে না। খুব কেউ কেন, বলিতে গেলে তোমার মতো দুই একজন অতি অন্তরঙ্গ দোস্ত ছাড়া আর কেহ জানে না। বাজারে সবাই জানে পার্বতী আমার বিবাহিতা দ্বিতীয় স্ত্রীর কন্যা। তিনিই জোর করিয়া নিজেকে পার্বতীর মা বলিয়া পরিচয় দেন। সমস্ত জোর এবং আবদারটা তাঁহার। তিনিই চাহেন নাই পার্বতী লেখাপড়া শিখুক, তিনিই চাহেন পার্বতীর তাড়াতাড়ি বিবাহ হউক। এ ক্ষেত্রে আমি কি করতে পারি বল? আমি এ ক্ষেত্রে অসহায়।

হারাধন ইহার উত্তরে আর কোনো কথা বলিতে পারেন নাই। নীরবে নতমুখে সিংজীর সহিত নানান কুশল আদান-প্রদান করিয়া উঠিয়া আসিয়াছিলেন।

ইহার পর কিছুদিনের মধ্যেই আট বৎসর বয়সের পার্বতীর বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহ হইল সিংহজীর দেহাতের বাড়ীতে, রনৌরায়।

সেখানে বিবাহ উপলক্ষ্যে সে কী ধুম! গেস্ট হাউস অতিথিতে ভরিয়া গিয়াছে। পাটনা হইতে অতিথি আসিয়াছেন। আরা শহর হইতে বহু অতিথি আসিয়াছেন। তাহার মধ্যে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীরা আছেন। এমন কি, সাহেব জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট সুদ্ধ কিছুক্ষণের জন্য আসিয়াছিলেন। সেই অতিথি ভবনের নীচের তলার কোণের একটি ছোট ঘর সিংহজী তাঁহার এত ব্যস্ততার মধ্যেও তাঁহার অম্বুবাবুর জন্য পৃথক করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই ঘরেই উঠিয়াছিলেন হারাধন।

বাবু সুরিন্দর নারায়ণ অত্যন্ত ব্যস্ত। তাহারই মধ্যে তিনি হারাধনকে আপ্যায়ন করিয়া তাঁহার সহিত ভদ্রতা করিয়া গেলেন। তিনি চলিয়া যাইবার জন্য উঠিয়াছেন এমন সময় হারাধন তাঁহার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—হুজুর বাহাদুর, এক মিনিট দাঁড়াইয়া যান।

তিনি নিজের টিনের বাক্স হইতে একটি বাক্স চাবিসমেত বাহির করিয়া দিয়া বলিলেন—হুজুর সরকার, এটি আমার পার্বতী মাঈকে দিবেন।

সিংহজী অবাক। বলিলেন—ইহাতে কি আছে?

—কিছু গহনা।

—খুলিয়া ফেল তো!

হারাধন বাক্সটি খুলিয়া সিংহজীর সামনে ধরিলেন। এক বাক্স গহনা।
সিংহজী অবাক হইয়া বলিলেন—এ যে অনেক গহনা অম্বুবাবু। কত ভরি আছে ?
—এক শত ভরির কিছু বেশী। আমার সারা জীবনের সঞ্চয়। বলিতে পারেন আমার বুকের ভালবাসা তিল তিল করিয়া জমাইয়া এইটুকু তৈয়ারী করাইয়াছি। এই গহনা কয়টি আপনি পার্বতীকে দিবেন।
সিংহজী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তাঁহার মুখের দিকে একবার চাহিয়া বলিলেন—তুমি আমার সহিত এস।
—কোথায় ? বিস্মিত হইয়া হারাধন প্রশ্ন করিলেন।
চলিতে চলিতে সিংহজী বলিলেন—অন্দর মহলে। সেখানে তুমি নিজে হাতে পার্বতীর হাতে দিবে। আমি তোমার হইয়া দিই কেন ?
এ এক বৃহৎ পুরস্কার যে। উনিশ শো এক দুই সালে কোনো রাজপুতের অন্দর-মহলে কোন বহিরাগতের প্রবেশাধিকার। এ অতি বৃহৎ পুরস্কার অবশ্যই।
সিংহজী তাঁহাকে লইয়া অন্দর মহলের মুখে দাঁড় করাইয়া বলিলেন—দাঁড়াও। বলিয়া তিনি ভিতরে চলিয়া গেলেন।
কয়েক মিনিট পরে তিনি বাহিরে আসিয়া হারাধনকে বলিলেন—এস আমার সঙ্গে।
গৃহকর্তার সহিত তাঁহার পিছন পিছন হারাধন গহনার বাক্স হাতে সেই অতি পুরাতন ইমারতে প্রবেশ করিলেন। বহুকালের প্রাচীন ইমারত। অতি বিচিত্র তার গঠন। সরু, অন্ধকার পথ, সেই পথ ধরিয়া এদিক-ওদিক ঘুরিয়া নীচু নীচু ঘর পার হইয়া একটা অন্ধকার ঘরে তাহাকে লইয়া উপস্থিত হইলেন সিংহজী। ঘরের ভিতর অন্ধকার। তাহার উপর নীচু ছাদ। এত নীচু যে হারাধনের মনে হইতে লাগিল যেন পা একটু গোঁড়ালি উঁচু করিয়া দাঁড়াইলে ছাদ ছোঁওয়া যাইবে। ঘরে জানালা নাই।
তাহাকে ঘরের মধ্যে দাঁড় করাইয়া দিয়া সিংহজী বলিয়া গেলেন—থোড়া ঠাহরো অম্বুবাবু।
তিনি চলিয়া গেলেন। অন্ধকার ঘরের মধ্যে একা দাঁড়াইয়া হারাধন কেমন অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিলেন। চারিপাশ অতি নিস্তব্ধ। কোথাও কোনো শব্দের রেশ পর্যন্ত নাই। তবে ততক্ষণে অন্ধকার চোখে সহিয়া আসিয়াছে। চারিদিকে কেমন একটা সোঁদা ভিজে ভিজে গন্ধ।
ইহারই মধ্যে একজন মহিলা ঘোমটা টানিয়া একটি বেশ বড় পিলসুজ সমেত প্রদীপ রাখিয়া গেল। সেই মৃদু আলোয় হারাধন দেখিলেন ঘরে একটি ভারী

'কুরসি' মাত্র রাখা আছে। আর কোনো আসবাব নাই। হারাধন দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

একটু পরে সেই নিঃস্তব্ধতার মধ্যে ঝুম ঝুম করিয়া মৃদু শব্দ উঠিতে লাগিল। হারাধন বুঝিলেন তোড়া বা নূপুর পরিয়া পার্বতী আসিতেছে বধূবেশে। প্রথমে বাবু সুরিন্দর নারায়ণ ঘরে প্রবেশ করিলেন। তারপর এক ভারী-সারি, দীর্ঘাঙ্গী, ঘোমটা-ঢাকা মহিলার হাত ধরিয়া বেনারসী শাড়ী পরা, গহনায় মোড়া আট বছরের পার্বতী ঘরেব মধ্যে প্রবেশ করিল। ভদ্রমহিলা অতি সন্তর্পণে পার্বতীর হাত ধরিয়া তাহাকে কুরসির উপর বসাইয়া দিলেন।

কয়েক মুহূর্ত পূর্ব হইতেই তোড়ার ঝুম ঝুম শব্দ শুনিয়া হারাধনের বুকের ভিতরটা কেমন করিতেছিল। পার্বতী চেয়ারে বসিয়া একবার তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া মুখ নামাইয়া লইয়াছিল। কিন্তু হারাধন তাহার মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়াছিলেন। চাহিয়া থাকিতে থাকিতেই তাঁহার চোখ দিয়া নিঃশব্দে জল গড়াইয়া গাল বাহিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সে দৃশ্য দেখিয়া সিংহজী এবং তাঁহার ঘোমটা-ঢাকা পত্নী দু'জনেই অবাক হইয়া হারাধনকে দেখিতে লাগিলেন। সিংহজী এক সময় বলিলেন—মৎ রোনা অম্বুবাবু।

হারাধন মুখ নামাইয়া চোখের জল মুছিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিলেন। তবু আবার চোখের জল আসিতে লাগিল। তিনি সংবৃত্ত হইয়া গহনার বাক্সটি চাবিসমেত তাহার হাতে দিয়া গাঢ়স্বরে বলিলেন—মা, তোমার জন্য সামান্য কয়েকটা গহনা আনিয়াছি। তুমি লও। আশীর্বাদ করি, তুমি রাজরানী হও।

একবার মাত্র চোখ তুলিয়া গহনার বাক্সটি হাতে লইয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল। পাশ হইতে ঘোমটার মধ্য হইতে সিংহজীর পত্নী ফিস-ফিস করিয়া তাহকে কিছু বলিবামাত্র পার্বতী নত হইয়া মাটিতে বসিয়া হারাধনের পায়ে মাথা ছোঁয়াইয়া প্রণাম করিল। হারাধন তাহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিতে গিয়া প্রায় হা-হা করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

পার্বতী মায়ের হাত ধরিয়া রাজরাজেশ্বরী লক্ষ্মীর মতো অন্য হাতে গহনার বাক্স কাঁকালে ধরিয়া ঝুম-ঝুম করিয়া তোড়া বাজাইয়া আবার চলিয়া গেল। হারাধন কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিতে মুছিতে বাবু সুরিন্দর নারায়ণের পিছন পিছন সেই প্রাচীন গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। এবং সিংহজীই তাঁহাকে অতিথি ভবনে তাঁহার ঘরে পৌঁছাইয়া দিয়া গেলেন।

রাত্রিতে মহা-সমারোহে বিবাহ হইয়া গেল।

মহা-সমারোহে সন্ধ্যার সময় দল বাঁধিয়া বরিয়াত আসিল, ঘোড়ার চড়িয়া রেশমের

ঝকঝকে জামা পরিয়া, রেশমের ঝকমকে তাজ মাথায় দিয়া, কোমরবন্ধে তলোয়ার ঝুলাইয়া, আলো, বাজনা ও হাসিতে শোভাযাত্রা করিয়া বর আসিল। বন্দুক ছোঁড়া হইল ঘন ঘন, বোম ফাটিল, হাউই আকাশে উঠিল, চরকি বাজি পুড়িল। বিলাতী বাজনা বাজিল। সে এক হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপার।

তারপর বিবাহ হইল। কী সুন্দর ষোলো-সতেরো বছরের কিশোর বরটি! ফর্সা রঙে সদ্য গোঁফের রেখা দেখা দিয়াছে। তাহার কচি কচি দীর্ঘ লম্বা হাতের উপর পার্বতীর মাখনের মতো নরম সুন্দর হাতখানি পাতিয়া দেওয়া হইল। ভিড়ের মধ্যে থাকিয়া ঘোমটার ঢাকার মধ্যে পদ্মপাতার আড়ালে সদ্য-ফোটা পদ্মফুলের মতো পার্বতীর মুখখানি হারাধন সারাক্ষণ দেখিলেন আর তাঁহার চোখ আনন্দে কি দুঃখে কে জানে, ক্ষণে ক্ষণে ছলছল করিয়া উঠিল।

পরদিন বরকন্যা চলিয়া গেল। তিনিও সন্ধ্যার মুখে রনৌরা হইতে আরায় ফিরিয়া আসিলেন। তাহার পর তিনি আর পার্বতীকে সধবা অবস্থায় দেখেন নাই। বৎসর খানেক যাইতে-না-যাইতে পার্বতীর কিশোর স্বামী প্লেগে মারা গেল। নয় বৎসর বয়সের পার্বতী স্বামীগৃহের কল্পনা ও স্বপ্ন বুকে লইয়া পিতৃগৃহে বিধবা হইয়া বসিয়া রহিল। স্বামী কি, বিবাহ কাহাকে বলে, শ্বশুরবাড়ীর আস্বাদ কেমন, এসব কল্পনাতেও বুঝিবার পূর্বে তাহার ওদিকের সব খেলা শেষ হইয়া গেল।

পার্বতীর বিধবা হওয়ার সংবাদ যখন আসে তখন তিনি আরায় ছিলেন না। কর্মসূত্রে আরার বাহিরে ছিলেন। ফিরিয়া আসিতেই ভৃত্য চামারিয়া বলিল—হুজুর বাহাদুর পর পর দুইদিন আপনার খোঁজে আসিয়াছিলেন। এই সদাহাস্য মুখ, সদা-বিনীত ভৃত্যটি এখন তাঁহার জীবনের একমাত্র আনন্দস্থল। তিনি ফিরিতেই সে হাসি মুখে এই সংবাদটুকু পরিবেশন করিল।

হারাধন চিন্তিত মুখে প্রশ্ন করিলেন—তিনি আর কিছু বলিয়াছিলেন?

সেবক চামারিয়া হাত জোড় করিয়া হাসিয়া বলিল—না হুজুর, শুধু বলিয়াছেন আপনি আসিলেই যেন তাঁহার সহিত 'মুলাকাৎ' করেন।

হাত মুখ ধুইয়া সামান্য কিছু খাইয়া তিনি তখনই সুরিন্দর নারায়ণের কাছে দৌড়িলেন। তিনি উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে দেখিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া প্রবলপ্রতাপ রাজপুত রইস বাবু সুরিন্দর নারায়ণ সিংহ হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। তারপর কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহাকে সংবাদটি পরিবেশন করিলেন।

শুনিয়া হারাধন নড়িলেন না, কাঁদিলেন না, শুধু পাথরের মতো এক দৃষ্টিতে

সিংহজীর মুখের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া, অনেকক্ষণ পর নিঃশব্দে উঠিয়া চলিয়া আসিবার সময় সুরিন্দর নারায়ণ তাঁহার মুখের দিকে চাহিতেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—উর্মিলা কি এ সংবাদ শুনিয়া বড়ই বিলাপ করিতেছে? সিংহজী তাঁহার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন —উর্মিলা? ও, তুমি পার্বতীর মায়ের কথা বলিতেছ? সে তো অম্বুবাবু, পার্বতীর যখন তিন বৎসর বয়স তখনই রনৌবাতেই মারা গিয়াছে। সে তো আর নাই।

একসঙ্গে দুইটা মৃত্যু সংবাদ বহন করিয়া হারাধন নিঃশব্দে সিংহজীর ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

কুড়ি

তাহার পর সে এক বিপর্যয়ের কাহিনী।

শুরুতেই একটা ছোট্ট ঘটনা ঘটিয়াছিল।

সেদিন সিংহজীর নিকট হইতে ফিরিতে অনেকখানি রাত্রি হইয়াছিল। এত রাত্রি না হইলেও সিংহজীর কাছে গেলে তাঁহার ফিরিতে দেরিই হইত। তিনি যতক্ষণ না ফিরিতেন ততক্ষণ ওই বিশ-একুশ বছরের তরুণ চাকর চামারিয়া তাঁহার রাত্রির খাবার লইয়া বসিয়া থাকিত। বসিয়া বসিয়া দুই হাতের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া ঢুলিত, আর মশা তাড়াইত। হারাধন তাহাকে হাজার বার বলিয়াছেন তাঁহার খাবার রাখিয়া দিয়া সে যেন নিজে খাইয়া লয়। আগে যতদিন পার্বতী তাঁহার বাড়ীতে আসিত ততদিন তিনি নিজেই রান্না করিতেন। তারপর যখন হইতে তাহার আসন্ন বিবাহকে কেন্দ্র করিয়া পার্বতীর তাঁহার বাড়ী আসা বন্ধ হইল তখন হইতেই হারাধন নিজে হাতে রান্না করা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তখন হইতে চামারিয়াই তাঁহার রান্না করিত। তিনি অবশ্যই ব্রাহ্মণের ছেলে। বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে গ্রামে থাকিতে অবশ্যই জাতিভেদ মানিতেন। কিন্তু মল্লিক মহাশয়ের সহিত রেলের লাইনে কাজ করিবার সময় বিভিন্ন মানুষের হাতে বাধ্য হইয়া আহার করিতে হওয়ায় তাঁহার ছোঁয়াছুঁয়ির সংস্কার অনেক শিথিল হইয়া গিয়াছিল। সেইজন্য তিনি অবলীলাক্রমে চামারিয়াকে দিয়া রান্না করাইয়া তাহার হাতে খাইতে পারিতেন।

সেদিনও বাড়ী ফিরিয়া দেখিলেন চামারিয়া দেওয়ালে ঠেস দিয়া বারান্দায় বসিয়া হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া যথারীতি ঘুমাইতেছে এবং মধ্যে মধ্যে মশায় জ্বালায়

সারা শরীর নাড়িয়া মশা তাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। তিনি অন্যদিন সস্নেহে তাঁহার মাথায় কি কাঁধে হাত দিয়া তাহাকে জাগাইয়া তুলিতেন। আজ তাহাকে ডাকিলেন—চামারিয়া, এ চামারিয়া! এ বেটা চমরু!

চামারিয়া চমকিয়া জাগিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল এবং দরজার তালা খুলিয়া দিল। হারাধন ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিলেন—ওরে বাবা চমরু, আমি আজ আর কিছু খাইব না। তুই খাইয়া ফেল্।

চমরু প্রথমটায় কিছু যেন বুঝিতে পারিল না। কিছুক্ষণ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া তারপর জিজ্ঞাসা করিল—হুজুর কি হুজুর-সরকারের বাড়ীতে খাইয়া আসিয়াছেন? আজ কত যত্ন করিয়া মাংস রান্না করিয়াছি। থোড়া কুছ খাইবেন না?

হারাধন গায়ের জামাটা খুলিতে খুলিতে নিঃশ্বাস ফেলিয়া ক্লান্ত স্বরে বলিলেন—না বাবা, তুই খাইয়া নে। আমি আজ খাইব না। আজ মনটা বড় খারাপ আছে রে!

চামারিয়া নড়িল না, চড়িল না, চুপ করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহাকে ওইভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া হারাধন আরও কিছু বলা কর্তব্য মনে করিয়া বলিল—আজ মনটা বড় খারাপ আছে। প্রতি মুহূর্তে মনে হইতেছে এখান হইতে চলিয়া যাই। এই আরা শহর আর ভাল লাগিতেছে না।

তবু চামারিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহা দেখিয়া হারাধন কিঞ্চিৎ অস্বস্তি বোধ করিয়া বলিলেন—যা, খাইতে যা। দাঁড়াইয়া রহিলি কেন? জানিস, হুজুর সরকারের লেড়কি, পার্বতী, যে আমাদের এখানে আসিত, খেলা করিত, গল্প করিত, যাহার এই কিছুদিন আগে কত ধুমধাম করিয়া সাদী হইল, সে বিধবা হইয়া গিয়াছে রে! পার্বতীর স্বামী প্লেগে মারা গিয়াছে। ওই নয়-দশ বছরের মেয়েটা 'বেওয়া' হইয়া গেল।

কাতর ও করুণ স্বরে কথাটা বলিয়া তিনি বিছানায় বসিলেন। চামারিয়া স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। হারাধনও দরজা বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িলেন।

সকালে উঠিয়া আর এক বিপত্তি। অন্যদিন চামারিয়া প্রায় তাঁহারই সঙ্গে ভোরে উঠিত। তিনি স্নান পূজা শেষ করিতে করিতে চামারিয়া উঠিয়া চুল্‌হা ধরাইয়া চায়ের জল তৈরী করিয়া তাঁহার অপেক্ষা করিত। আজ কিন্তু ভোরে উঠিয়া তিনি চামারিয়াকে পাইলেন না। তিনি পূজা শেষ করিয়া কিছুক্ষণ চামারিয়ার জন্য

অপেক্ষা করিলেন। তাহাতেও তাহাকে না পাইয়া তিনি তাহাকে খুঁজিতে বাহির হইলেন। এখান ওখান খুঁজিয়াও তাহার সন্ধান পাওয়া গেল না। শেষ পর্যন্ত স্টেশনে এক চেনা মিষ্টিওয়ালার কাছে খবর পাওয়া গেল চামারিয়াকে। এক পোঁটলা লইয়া সে ট্রেনে উঠিতে দেখিয়াছে।

হারাধন নিশ্চিন্ত হইয়া নিঃশ্বাস ফেলিলেন। যাক, চামারিয়াও তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

ইহার পর বেশ কয়েকটা বছর পার হইয়া গেল। পার হইয়া গেল বড় মন্থর পদেই। সকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত এক নিরুৎসব কাজের ছকে বাঁধা। তাহার মধ্যে কোনো প্রত্যাশা নাই, আনন্দ নাই, ভবিষ্যতের স্বপ্ন নাই।

সকালবেলা স্নান, পূজাপাঠ ও জলযোগ শেষ করিয়া শহরের বাজারে নিজের ধান-চালের আড়তে গিয়া বসেন হারাধন। ব্যবসা এখন স্বাভাবিক নিয়মেই বড় হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে কোন সুখ? পয়সাকড়িও আসিতে ও জমিতে আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু তাহাতেই বা কি হইবে?

দুপুরে স্বপাক আহার করিয়া বিশ্রাম। বিকালে যথারীতি সুরিন্দর নারায়ণ সিংহের মজলিশে গল্প। আসরও আর ভাল জমে না। পার্বতী বিধবা হওয়ার পর হইতে সিংহজীর শরীর যেন ভাঙিয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। তিনি ফরাসের উপর তাকিয়া ঠেস দিয়া গড়গড়া টানেন। কাশীর তামাকের গন্ধে ঘরখানা ভরিয়া থাকে। তবু মজলিশ সরগরম হইয়া উঠে না।

হারাধন প্রায়ই সিংহজীকে বলেন—হুজুর বাহাদুর, আপনি একবার রনৌরা ঘুরিয়া আসুন। এই শীতের সময় কিছুদিন রনৌরাতে থাকিয়া সকালে খেজুরের রস খান, চিড়িয়া শিকার করুন। দেহ সুস্থ হইবে, মনে হারানো স্ফূর্তি ফিরিয়া আসিবে।

সিংহজী এক একদিন এক এক রকম কথা বলেন। কোনোদিন সায় দিয়া বলেন—তাহাই করিতে হইবে। ভালভাবে বাঁচা দরকার। কিন্তু তুমি সঙ্গে যাইবে তো?

হারাধন তাঁহাকে উৎসাহ দিয়া বলেন—নিশ্চয়। নিশ্চয় যাইব। আমি না গেলে আপনার ইয়ার কে থাকিবে?

আবার কোনো সময় এ প্রস্তাবে সিংহজী অধিকতর বিষণ্ণ হইয়া উঠেন। বলেন—আমার আর রনৌরা যাইতে ইচ্ছা করে না। সেখানে পার্বতী 'বেওয়া' অবস্থায় বাস করে। তাহাকে ওই অবস্থায় দেখিতে আমার দুই চক্ষু কষ্ট পায়।

বলিতে বলিতে তিনি গড়গড়ার নলটা ফেলিয়া দিয়া তাকিয়ায় অবসন্নের মতো শুইয়া পড়েন। বলেন—আর বাঁচিতে ভাল লাগে না অম্বুবাবু। বাঁচিয়া কি লাভ? সুখের জন্য বেঁহোশ হইয়া জোর কদম ছুটিয়া এখন দেখিতেছি গাড্ডায় পড়িয়া গিয়াছি। গাড্ডায় পড়িয়া দুর্যোধনের মতো আমারও উরুভঙ্গ হইয়া গিয়াছে। তাঃপর তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলেন—তোমার অবস্থাও তো ভাল নয়, অম্বুবাবু। জান, তোমার জন্য আমার দুঃখ হয়। তুমি নিজেকে আমার সহিত বড় বেশী করিয়া জড়াইয়া ফেলিয়াছ।

হারাধন বিস্মিত হইয়া প্রথম দিন প্রশ্ন করিয়াছিলেন—একথা কেন বলিতেছেন হুজুর সরকার?

—কেন বলিতেছি? বলিয়া হাসিয়া সিংহজী প্রশ্ন করিয়াছিলেন—তোমার কত বয়স হইল অম্বুবাবু? বোধ হয় ত্রিশ-বত্রিশ? নয়? তাহার বেশী নয় নিশ্চয়ই। কিন্তু এই বত্রিশ বছর বয়সেই যে তোমার রগের ধারে ধারে চুল পাকিতে শুরু হইয়াছে। মনে কষ্ট না থাকিলে কি এমনটা হইত? আর তোমার কষ্ট কিসের বাপু? তোমার কষ্ট তো পার্বতীকে লইয়াই।

মনের বড় কোমল স্থানে আঘাত করিয়াছিলেন সিংহজী। সত্যই তো। কবে কামের তাড়নায় বয়সের ধর্মে—উর্মিলা নামে অন্যের এক বিবাহিতা স্ত্রীকে লইয়া পলাইয়া আসিয়াছিলেন। তারপর সে উর্মিলা কোথায় কেমন করিয়া তাঁহার হাত হইতে স্বপ্নের মতো অন্তর্ধ্যান করিল। উর্মিলাকে লইয়া খেদ শেষ হইতে-না-হইতে ওই পার্বতী মেয়েটা আসিয়া তাঁহার মন জুড়িয়া বসিল। সে এমন সমগ্রভাবে জুড়িয়া বসা যে তাহার বৈধব্যের সংবাদের সঙ্গে উর্মিলার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়াও তাহার জন্য একবার খেদ হইল না, পার্বতীর বৈধব্যই তাঁহাকে পীড়িত করিয়া চলিল। আজও চলিয়াছে। সিংহজীর মতো তাঁহার সমস্ত অসুখের কারণও সেইখানেই। তবু সিংহজীর কথা শুনিয়া নিজের ছোট ছোট কাটা চুলে হাত বুলাইতে বুলাইতে হাসিয়া বলিয়াছিলেন—না হুজুর সরকার, চুল আমার দুঃখে পাকে নাই। আপনাদের এখানকার জলের গুণে পাকিয়াছে। আপনি একবার আপনার নিজের কথা মনে করুন না কেন? আপনাকে যেদিন আরা স্টেশনে প্রথম অনেক মানুষের ভিড়ের মধ্যে আরও আধ হাত উঁচু মাথায় দেখিয়াছিলাম, তখনই বা আপনার বয়স কত ছিল? বছর চল্লিশের বেশী নয়। তখনই তো আপনার মাথার সামনের দিকে চুল পাকা ছিল।

মাথায় হাত বুলাইয়া সিংহজী বলিলেন—আর বয়স হইয়া গেল অম্বুবাবু, এবার যাইলেই হয়।

এমনি করিয়া হতাশ্বাসেই প্রায় প্রতিদিনের আসর শেষ হইত। তারপর সেই হতাশ্বাস বক্ষে বনন করিয়া হারাধন স্বজনহীন গৃহে উৎসব প্রত্যাশাহীন মন লইয়া ফিরিয়া আসিয়া শয্যা আশ্রয় কবিতেন।

কিন্তু একদিন বিকালে সিংজীব মজলিশে গিয়া হাবাধন দেখিলেন, ফরাশের তাকিয়া একপাশে সরাইয়া দিয়া সটকাব নল শুধুমাত্র হাতে ধরিয়া বাবু সুবিন্দব নারায়ণ সিংহজী উত্তেজিতভাবে ফবাসে বসিয়া আছেন ও বড়া মুনিমের সহিত কথা বলিতেছেন। কিছুক্ষণ কথাবার্তাব পব মুনিমজী চলিযা যাইতেই সিংহজী উত্তেজিতভাবে বলিলেন—খবব শুনিযাছ অম্বুবাবু ?

হাবাধন তাঁহাব মুখের দিকে সপ্রশ্ন বিস্ময়েব সহিত চাহিয়া বলিলেন—কি খবর হুজুব সরকার ? আজ আপনাকে বড় উত্তেজিত দেখাইতেছে।

সটকাব নলটা ফেলিয়া দিয়া তিনি হাবাধনের দিকে খানিকটা আগাইয়া আসিলেন। তারপর ফিস ফিস করিয়া বলিলেন—খবর শুনিয়াছ আমার বেটা কলকাতাসে পাস করকে ওকীল বনা হ্যায়। ইয়ে ভি শুনা কি উ বিলায়েত যায়েগা ব্যারিস্টার হোনে কো লিয়ে। উসকা সাদী ভি হো রহা হ্যায়।

যে পুত্র পিতাকে মৃত জ্ঞানে তাহার জীবিতাবস্থাতেই তাহার শ্রাদ্ধ করিয়াছে, এবং সেই শ্রাদ্ধে পিতাকে নিমন্ত্রণও কবিযাছে সে পুত্র ওকালতী পাস করিল কি না, তাহার বিবাহ ঠিক হইল কি না, সে ব্যাবিস্টার হইতে বিলাত যাইতেছে কি না, এ লইয়া সেই পিতার মাথাব্যথা কেন ? হাবাধন তাহার মাথামুণ্ডু কিছুই আবিষ্কাব কবিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা কবিলেন—এ সবই অবশ্য সুখের ও আনন্দের সংবাদ। যাই হউক, সে তো আপনার পুত্রই। তবে একটা কথা। তাহার সহিত আপনার কোনো সম্পর্ক নাই। আর নূতন করিয়া আপনার পক্ষে সম্পর্ক স্থাপন করাও মুশকিল। তবে আপনি এত উত্তেজিত হইতেছেন কেন ?

সিংহজী বিষণ্ন হাসি হাসিলেন। হাসিয়া বলিলেন—তোমার তো বিষয় নাই, তুমি বিষয়ী লোক নও। বিষয়ী লোক হইলে তুমি এমন কথা কদাচ বলিতে না। তুমি ইহার আসল অর্থ বুঝিতে পারিয়াছ ?

হারাধন জিজ্ঞাসা করিলেন—হুজুর সরকার কি বলিতে চাহেন বুঝিলাম না।

সিংহজী তাঁহার আরও কাছে সরিয়া আসিলেন। তারপর ফিস ফিস করিয়া বলিলেন—শোন। আমার ছেলে ওকীল হইয়াছে। আমি মরিলেই সে এই সম্পত্তিতে নিজের পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠা করিবে। এমনিতেই তাহার আমার সম্পত্তিতে অধিকার আছে। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই সে এই অধিকার লাভ করিয়াছে। এখন আমি মরিলেই সে যদি এই সম্পত্তি হস্তগত করিয়া লয় তাহা

হইলে পার্বতী, আমার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী এবং আরও যে সব পোষ্য আছে তাহাদের সে ও তাহার মা দুইজনে মিলিয়া দূর করিয়া দিবে। লোকে ছেলে লায়েক হইলে আনন্দ করে, আর আমার এমন ভাগ্য যে আমি ভাবিয়া মরিয়া গেলাম।

হারাধন বুঝিলেন, সিংহজী অকারণে অত্যধিক ভয় পাইয়াছেন। হারাধন তাঁহার অকারণ ভয়কেও অত্যধিক মর্যাদা দিয়া গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—তা আপনি কি করিতে চান?

সিংহজী গম্ভীরভাবে বলিলেন—আমি উইল করিতে চাই। সে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র। লেখাপড়া শিখিয়াছে, সম্পত্তিতে তাহার ন্যায্য অংশ আছেই। আমি তাহাকে বঞ্চিতও করিতে চাহি না। তবে আমি ইহাও চাহি যে আমার কন্যা বা আমার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী পথের ভিক্ষুক হইয়া না যায়।

হারাধন গম্ভীরভাবে বলিলেন—অবশ্যই।

সিংহজী বলিলেন—সেইজন্য আমি স্থির করিয়াছি আমার পুত্রকে অর্ধেক, এবং আমার দ্বিতীয়া স্ত্রীকে ও আমার কন্যাকে বাকী অর্ধেক উইল করিয়া দিয়া যাইব। আমার দ্বিতীয়া স্ত্রীর অবর্তমানে আমার সম্পত্তির ওই অর্ধাংশ সম্পূর্ণ আমার কন্যা পাইবে।

হারাধন চুপ করিয়া রহিলেন।

সিংহজী বলিলেন—তুমি কাল আমার বড়া মুনিমকে লইয়া একবার পাটনা যাও। সেখান এক বাঙ্গালী ব্যারিস্টার আছেন, নাম বোস। কদমকুঁয়ায় থাকেন। তাঁহার সহিত কথা বলিয়া তাঁহাকে এখানে লইয়া এস। তিনি আমার সামনে উইল বানাইবেন।

তাহাই হইল।

হারাধন পাটনা গিয়া ব্যারিস্টার বোস সাহেবকে আরা লইয়া আসিলেন। তিনি তিনদিন আরায় থাকিয়া উইল তৈয়ারী করাইয়া, নিজে স্বাক্ষী হিসাবে উপস্থিত থাকিয়া উইল যথাবিহিত রেজেষ্ট্রি করাইয়া দিয়া আপনার ফি লইয়া পাটনা চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় হারাধনকে চুপি চুপি বলিয়া গেলেন—আমার মনে হয় সিংহজীর মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ দেখা দিয়াছে। উনি হয়তো পাগল হইয়া যাইবেন। তাহার পর এ উইলে আপত্তি উঠিলেও উঠিতে পারে।

হারাধন কিন্তু মিঃ বোস এ কথা বলিবার পূর্বে কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। তিনি ইহার পর হইতে বিশেষভাবে সিংহজীকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই ওই পাটনার ব্যারিস্টার সাহেবের কথা তাঁহার সত্য

বলিয়াই মনে হইতে লাগিল। সিংহজী এখন অধিকাংশ সময় বিমর্ষ হইয়া থাকেন। সে বিমর্ষতা কিছুতেই কাটে না। হারাধন থাকিলে খানিকটা ভুলিয়া থাকেন। তাও আবার তখন মধ্যে মধ্যে উত্তেজিত হইয়া উঠেন। ভয় পান। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁহার পাগলামির লক্ষণ স্পষ্ট হইয়া উঠিল। অনেকটা সময় অবসাদে ও বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন হইয়া থাকেন। কখনও বা উত্তেজিত হন, কখনও বা ভয় পান। চাকরবাকর কাহাকেও বিশ্বাস করেন না। বিশ্বাসের মধ্যে বিশ্বাস করেন বড়া মুনিমকে আর হারাধনকে। হারাধন আসিলে আর তাঁহাকে ছাড়িতে চান না। একবার একদিন হারাধনকে বলিলেন—তুমি এখন হইতে আমার কাছে থাক অম্বুবাবু। তুমি আমাকে ছাড়িয়া থাকিও না।

হাবাধন জিজ্ঞাসা করিলেন—কেন? আমাকে আপনার কাছে থাকিতে হইবে কেন? কি হইয়াছে আপনার?

সিংহজী ফিস ফিস করিয়া বলিলেন—তুমি বুঝিতে পারিতেছ না ব্যাপারটা? আমাকে কত সতর্ক হইয়া থাকিতে হইতেছে তুমি বুঝিতেছ না?

হাবাধন সোজাসুজি ঘাড় নাড়িয়া প্রশ্ন করিলেন—না। আপনাকে সতর্ক হইয়া থাকিতে হইবে কেন? কি এমন ঘটিয়াছে যাহার জন্য আপনি এমন ভীত হইবেন, এমন সতর্কভাবে থাকিবেন?

সিংহজী উত্তেজিত ও বিরক্ত হইয়া বলিলেন—তুমি অনেক জিনিস বুঝিতে পার না। তোমার যথেষ্ট বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও বুঝিতে পার না, ইহা তোমার একটা মস্ত দোষ।

তারপর বিষণ্ণভাবে বলিলেন—তোমারই বা দোষ কি? তোমাকে তো একদিন বলিয়াছিলাম তুমি বিষয়ী লোক নও বলিয়াই সব বুঝিতে পার না। তুমি বুঝিতেছ না, এই উইল করার পর হইতেই আমার চারিপাশে একটা চক্রান্ত আরম্ভ হইয়াছে। পাটনা হইতে আমার ছেলে এবং তাহার মা গোপনে গোপনে এখানকার লোকদের সঙ্গে যোগসাজস কবিয়া আমাকে হত্যা করিবার চক্রান্ত করিতেছে।

হারাধন তাঁহার অমূলক সন্দেহ সজোরে উড়াইয়া দিয়া বলিলেন—ছি, ছি, আপনার যে সমস্ত লোক আছে, অন্দরে ও অন্দরের বাহিরে এখানে, আপনার সেবা করিতেছে কত দীর্ঘকাল ধরিয়া, তাহারা কি কেউ এ কাজ করিতে পারে? আপনার মতো মালিক, আপনার মতো মনিব কোথায় মিলিবে?

সিংহজী তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়িতে থাকিলেন। তাহা দেখিয়া হারাধন পরিষ্কার বুঝিতে পারিলেন, পাটনার ব্যারিস্টার মিঃ বোস

কিছুদিন আগে আসিয়া যাহা ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছিলেন তাহাই সম্পূর্ণভাবে ঘটিয়া গিয়াছে। সিংহজীর সম্পূর্ণ মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটিয়াছে।

কিন্তু ইহা প্রতিরোধের উপায় কি? হারাধন কোনো পথ খুঁজিয়া না পাইয়া বলিলেন—তাহা হইলে এক কাজ করুন। আপনি বহুরানী এবং পার্বতীকে রনৌরা হইতে এখানে আনাইয়া লন। তাঁহাদের হেফাজতে থাকুন। তাহা হইলে তো আর কোনো চিন্তার কারণ থাকিবে না।

কথাটা তাঁহার যেন মনে লাগিল। তিনি বলিলেন—না, তাহাতেও গোলমাল হইবার ভয় আছে। এখানে যে একটা চক্রান্ত ঘটিতেছে তাহা তো আমি বুঝিতে পারিতেছি। আমি এই চক্রান্তের মধ্যে আছি, আছি। কিন্তু উহাদের এখানে টানিয়া আনিয়া কি লাভ হইবে? তাহার জন্য আমারই বরং রনৌরা চলিয়া যাওয়াই ভাল। কি বল তুমি অম্বুবাবু?

সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে সমর্থন জানাইয়া হারাধন বলিলেন—এ তো খুবই ভাল কথা। আপনি তাহা হইলে নিশ্চিন্ত হইয়া সেখানে বহুরানী ও পার্বতীর হাতে আরামে থাকিতে পারিবেন।

অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া সিংহজী বলিলেন—জান, আমি কিন্তু ইহা আদৌ চাহি নাই। বিধবা হওয়ার পর পার্বতীর মুখ আমি আর চাহিয়া দেখিতে পারি না। সেই জন্যই তো পার্বতীয়া আর তাহার মাকে রনৌরাতে রাখিয়া আমি আবায় বসিয়া থাকি। উহাদের না দেখিয়া আমার মনে যে কী কষ্ট তাহা একমাত্র রামজীই জানেন। তা তুমি যে পরামর্শ দিলে ইহা খুবই উত্তম কথা। আমি রনৌরাই যাইব। তবে তোমাকে আমার সঙ্গে যাইতে হইবে।

হারাধন বিপদে পড়িয়া গেলেন। এখানে তাঁহার ব্যবসাটি জাঁকিয়া উঠিয়াছে। এখন চলিয়া গেলে ব্যবসার ক্ষতি হইবে। এই লোকটি তাঁহার জীবনের অনেক সুখ নষ্ট করিয়াছে, আবার অনেক সুখ ও স্বস্তি ও সেই সঙ্গে সুগভীর বিশ্বাস দিয়াছে। তবু তিনি তাঁহার প্রস্তাবে সম্মতি জানানোই স্থির করিলেন। বলিলেন—ঠিক আছে, আমি আপনার সহিত যাইব।

সিংহজী অবুঝ শিশুর মতো বলিলেন—শুধু গেলেই হইবে না, আমার কাছে থাকিতে হইবে।

হারাধন হাসিয়া বলিলেন—থাকিব। তবে মধ্যে মধ্যে আমাকে এখানে আসিয়া আমার ব্যবসা দেখিয়া যাইবার অনুমতি দিতে হইবে।

সিংহজী সানন্দে সম্মতি দিলেন।

তাহার কয়েক দিনের মধ্যেই সিংহজীকে তাঁহার টমটমে বসাইয়া হারাধন

ননোরা চলিয়া গেলেন। সেখানে চবুতরায় নামিয়া একটু বিশ্রাম করিয়া সিংহজী তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন—চল।

হারাধন বলিলেন—আমি তো আপনার গেস্ট হাউসে থাকিব। তা চলুন, আমি আপনাকে বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিই।

সিংহজী তাঁহার হাতটা জোর করিয়া চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন—না, তুমি আমার সঙ্গিত আমার পুরানো বাড়ীতে থাকিবে।

কী মুশকিল। যাই হোক, তাঁহার হাত ধরিয়া তাঁহাকে অন্দর মহলে পৌঁছাইয়া দিতে চলিলেন। পুরানো বাড়ী। নীচু ছাদ। বাড়ী আবার দুর্গের মতো। তাও আবার আশপাশের জমি হইতে মাটিতে বেশ অনেকখানি বসিয়া গিয়াছে। কিন্তু সেই বাড়ীর সামনে পৌঁছিতেই আশ্চর্য দৃশ্য নজরে পড়িল। হারাধনের মনে হইল যেন দুই চারিশত বৎসরের আগের কোনো দৃশ্য অভিনীত হইতেছে। যেন কোনো রাজপুত বীর যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন যুদ্ধ জয় করিয়া। আর তাঁহাকে বরণ করিয়া লইবার জন্য পুরনারীরা মঙ্গল প্রদীপ, থালায় বিবিধ মাঙ্গলিক সমেত শঙ্খধ্বনি করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সিংহজী হাসিমুখে মাথা নত করিয়া সে বরণ গ্রহণ করিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী বহুরানীকে একবার পার্বতীর বিবাহের সময় তাঁহার ঘোমটার আড়াল হইতে হারাধন দেখিয়াছিলেন। তবুও তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। তাঁহার পিছনে বাড়ীর নানা সধবা স্ত্রীলোকের সঙ্গে পার্বতীকেও দেখিলেন হারাধন। সে মূর্তিমতী বিষণ্ণতার মতো সাধারণ একটা রঙীন কাপড়ে সেই ভিড়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে।

তাহা সত্ত্বেও পার্বতীকে দেখিয়া হারাধনের দুই চোখ ও মন জুড়াইয়া গেল। স্মৃতিশাসিত সমাজ তাহার বেশভূষার অধিকার কাড়িয়া লইলে কি হয়, যে বিশ্ববিধাতা সকলকে সমদৃষ্টিতে দেখেন ও মুহূর্তে জীবের প্রাপ্য পাওনা মিটাইয়া দেন তিনি পার্বতীতে তাহার পূর্ণ প্রাপ্য মিটাইয়া দিতে এতটুকু ইতস্তত করেন নাই। রূপে আর যৌবনে তাহার সমস্ত অস্তিত্ব ভরিয়া উঠিয়াছে এবং যেন তাহার দেহ ছাপাইয়া সে রূপ ও লাবণ্য উপচিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে। এই কয় বৎসরে সামাজিক শাসন ও তাহার তরুণ মনের চাপা যন্ত্রণা সত্ত্বেও সে অনেকখানি লম্বাই শুধু হয় নাই, সেই মোটামুটি দীঘল দেহও পরিপূর্ণভাবে ভরিয়া উঠিয়াছে। তাহার গড়ন যেন একটু ভারী ভারী। বড় বড় স্থির গম্ভীর চোখের পাতা দুইটা ভারী, ঠোঁট দুইটা পুরু এবং ভারী। ভিড়ের মধ্যে পার্বতীর চোখ তাঁহার চোখে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সে তাহার গম্ভীর চোখের দৃষ্টি

তাঁহার মুখের উপর গভীরভাবে এক মুহূর্ত স্থির রাখিয়া আবার নামাইয়া লইল। বরণের পর হারাধনের ধরা হাতখানি বাদে অন্য হাতখানি পার্বতী আসিয়া ধরিলে হারাধন দেখিলেন, হাতখানি দেহের অনুপাতে দীর্ঘ না হইলেও পরিপুষ্ট, মাংসল এবং নিটোল। এবং সে হাতে একটি আশ্চর্য লাবণ্য যেন চিক চিক করিতেছে। এক হাতে হারাধন, অন্য হাতে পার্বতী সিংহজীকে ধরিয়া শঙ্খধ্বনি ও জলধারার পিছন পিছন বাড়ীতে ঢুকিলেন।

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর সেই চাপা অন্ধকার বাড়ীর সোঁদা গন্ধে অতিষ্ঠ হইয়া হারাধন বলিলেন—হুজুর সরকার, আপনি এখন বিশ্রাম করুন, আমি অতিথি-ভবনে গিয়া বিশ্রাম করি।

সিংহজী প্রতিবাদ করিয়া কি বলিতে চাহিতেছিলেন, কিন্তু তাহার পূর্বেই পার্বতী সিংহজীকে বলিল—বাবুজী, আপনি এখনি আসিলেন, এখন আমরা আপনার সহিত কথা বলিব। সেখানে চাচাজী হাজির থাকিলে আমাদেরও কথা বলিতে অসুবিধা হইবে, চাচাজীরও অস্বস্তি হইবে। তাহার চেয়ে উনি এখন গেস্ট হাউসে বিশ্রাম করুন। আমরা আপনার সঙ্গে কথা বলি। আবার রাত্রিতে খাবার আগে উনি আসিবেন। আপনারা এক সঙ্গে খাইতে পারিবেন। হারাধন লক্ষ্য করিলেন পার্বতীর এই কথাতেই কাজ হইল। সিংহজী সুবোধ বালকের মতো তাহার কথায় সঙ্গে সঙ্গে সম্মতি জানাইলেন। হারাধন ছুটি পাইয়া গেস্ট হাউসে আসিয়া বাঁচিলেন। দুপুর হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত সেই নির্জন প্রাসাদোপম গৃহে কাটাইয়া সন্ধ্যার পর চাকরের সঙ্গে আবার সিংহজীর অন্দর মহলে প্রবেশ করিলেন।

সন্ধ্যায় হারাধনকে একেবারে বাবু সুরিন্দর নারায়ণ সিংহের পিতৃপুরুষের অতি প্রাচীন গৃহের অন্দর মহলের একেবারে নিভৃততম অংশে সিংহজীর শয়নকক্ষে হাজির করা হইল। এ ঘরখানিও অন্ধকার। তবে বিশালাকৃতি। ঘরের মধ্যে বিরাট পালঙ্ক। তাহাতে অতি পরিপাটি বিছানা। বিছানায় রেশমের চাদর বিছানো। মেঝেতে মস্ত কোমল গালিচা খাতা। ঘরের চার কোণে কাঁচের বাতিদানে মোমবাতির স্নিগ্ধ শিখা। খাটের পাশে ছোট জানালা দুইটা। সেদিক দিয়া বাহিরের আকাশ খানিকটা নজরে পড়ে। হারাধন ঘরে প্রবেশ করিতেই সিংহজী খাট হইতে প্রায় লাফিয়া নামিয়া হাসিমুখে মেঝেতে গালিচার উপর বসিলেন। নিজে হইতেই হাসিয়া বলিলেন—বুঝিলে অম্বুবাবু, আমি ভাল আছি। মনে হইতেছে রনৌরা আসিয়াই আমার ব্যারাম অর্ধেক আরাম হইয়া গিয়াছে।

এই সময় পার্বতী আসিয়া সংবাদ দিল চৌকা লাগানো হইয়াছে। অর্থাৎ খাবারের জায়গা হইয়াছে। আমরা উঠিয়া খাইতে গেলাম। পাশাপাশি বড় বড় দুইখানা পিঁড়ি। তাহার সামনে রূপার থালায় গরম পুরি রাখা। পাশে মস্ত বড় রূপার বাটিতে তরকারি। রূপার গ্লাসে জল। সরপোষ চাপা।

সিংহজী পিঁড়িতে বসিয়া এক দৃষ্টিতে খাদ্যের দিকে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন—বর্তনে কি আছে?

—মাংস। পার্বতীই জবাব দিল।

আবাব কিছুক্ষণ ভ্রূ কুঞ্চিত কবিয়া চাহিয়া থাকিয়া সিংহজী প্রশ্ন করিলেন—কি রকম মাংস রান্না হইয়াছে?

পার্বতী হাসিল। বলিল—দেশী বান্না। বেশী নুন ও বেশী ঝাল দিয়া। খাইয়া দেখুন।

—খাইব তো. কিন্তু কে বান্না কবিয়াছে?

—আমি।

—তুই? তুই কেন রান্না করিতে গেলি? আমি খাইব বলিয়া এই রাত্রিতে তুই মাংস বান্না করিলি? তোকে তো আবাব ইহারই জন্য এই রাত্রিতে স্নান করিতে হইবে?

পার্বতী হাসিয়া বলিল—তাহা হউক। আপনি কত দিন পর রনৌরা আসিলেন, চাচাজীকে সঙ্গে আনিলেন, আর আমি রান্না কবিব না? মা আমাকে বার বার নিষেধ কবিয়াছিলেন। কিন্তু আমি তাঁহাব কথা শুনি নাই।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মুখ নীচু করিয়া সিংহজী তাহার কথা শুনিতেছিলেন। পার্বতীর কথা শেষ হইলেও তিনি অনেকক্ষণ তেমনিভাবেই বসিয়া রহিলেন। তাবপব জিজ্ঞাসা করিলেন—পুরি কে বানাইল?

পার্বতী হাসিয়া বলিল—মাইজী। সব আমি আর মাইজী বানাইযাছি। আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া খান তো।

ব্যস। আর দ্বিতীয় কথা উচ্চারণ করিলেন না। খাইতে লাগিলেন। বেশ কিছুক্ষণ নিঃশব্দে খাইয়া আবার মুখ তুলিয়া বলিলেন—তোর মা কোথায়? সে আসিল না? সে আমাদের খাইতে দিয়া লুকাইয়া আছে নাকি?

পার্বতী সঙ্গে সঙ্গে বাপের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া তীক্ষ্ণভাবে বলিল—আপনি এ সব কি বলিতেছেন? মা আপনাদের খাইতে দিয়া লুকাইয়া থাকিবেন কেন? তিনি কি আপনার খাবারে বিষ মিশাইয়াছেন?

সিংহজী সঙ্গে সঙ্গে অপ্রস্তুত হাসি হাসিয়া বলিলেন—না, না, আমি তো তাহা.

বলি নাই। ও রহস্য করিয়া বলিয়াছি মাত্র। ও কিছু নয়। কিন্তু তোর মা কই?

—তিনি আপনাদের জন্য ক্ষীর বানাইয়াছেন। তাহাই আনিতেছেন।

এই সময় দুই হাতে দুই মস্ত মাপের রূপার বর্তন হাতে বহুরানী প্রবেশ করিলেন। এবং বর্তন দুইজনের থালার পাশে নামাইয়া দিলেন।

হারাধন ক্ষীরের পরিমাণ দেখিয়া ভীত। মাংস ও খুরি অর্ধেকটা খাইয়াই তাঁহার পেট ভরিয়া গিয়াছে। তিনি পার্বতীকে বলিলেন—ক্ষীর একটা ছোট কটোরাতে সামান্য পরিমাণে দিতে। পার্বতীর অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি কাতরভাবে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ওদিকে সিংহজী নির্বিকার। তিনি সমানে খাইয়া চলিয়াছেন। পার্বতী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে উদ্বিগ্নভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে। বহুরানী জিজ্ঞাসা করিলেন, আর পুরি লাগিবে কি না। তাহাতে হারাধন হাঁ হাঁ করিয়া যেখানে বলিলেন, তাঁহার আর প্রয়োজন নাই, সেখানে সিংহজী হাত তুলিয়া বলিলেন—দেও আউর দো চারটো।

বহুজী তাড়াতাড়ি গিয়া পুরির ঝুড়ি আনিয়া স্বামীর পাতে চারখানি পুরি ফেলিয়া দিলেন। সিংহজী খাইয়া চলিলেন। তিনি অন্যমনস্কভাবে খাইতেছেন তো খাইতেছেনই, তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। হারাধনের খাওয়া হইয়া গেল। তিনি পাশে উচ্ছিষ্ট হাতে বসিয়া রহিলেন।

খাইতে খাইতে হঠাৎ সিংহজী পার্বতীকে বলিলেন—সেই উইল কোথায় আছে?

পার্বতী বাপের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। বহুরানী ফিস ফিস করিয়া বলিলেন—সে আমার কাছেই আছে।

সিংহজী উদ্বিগ্নভাবে বলিলেন—হারায় নাই তো? চুরি হইয়া যায় নাই তো?

বহুরানী এবার ঘোমটা তুলিয়া বলিলেন—সে হারাইবে কি করিয়া? সে তো সিন্ধুকের মধ্যে যত্ন করিয়া রাখা আছে। তাহার 'কুঞ্জী' এই তো আমার কোমরে ঝুলিতেছে।

তবু সিংহজী উদ্বিগ্ন মুখে বলিলেন—তা হউক, তুমি ঘুমাইবার পূর্বে একবার সিন্দুক খুলিয়া ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিও, সে উইল ঠিক আছে কি না। আমাকে বলিয়া যাইও।

—বলিব।

সিংহজী খাইতে বসিয়া আর উঠিতে চাহেন না। খাওয়া আর শেষ হয় না। আবার এটা ওটা চাহিতে থাকেন। শেষে পার্বতী এবং সেই সঙ্গে বহুরানী

তাঁহাকে বার বার উঠিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সিংহজী হারাধনকে বলিলেন—উযো বাঙ্গালী চড়াই পাখীর মতন। উহার ছোট্ট কলিজা, পেটও ছোট্ট। ও কি খাইবে? আমার আরও পুরি চাই। ক্ষীর দিয়া খাইব।

বহুরানী বলিলেন—আর পুরি নাই। আমি যাহা বানাইয়াছিলাম তাহা তো শেষ হইয়া গিয়াছে। তাহা হইলে বাবাজীকে বানাইতে বলি।

সিংহজী তার স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—নহি, নহি। বাবাজী কিয়া বানায়েগা। তুম বনাওগি। আচ্ছা ছোড়ো, হম অউর না খাই।

সিংহজী উঠিয়া পড়িলেন।

হাত ধোওয়াইয়া তাঁহাকে বিছানায় শোওয়াইয়া হারাধন বলিলেন—আমি চলিলাম। আবার কাল সকালে আসিব।

—ঠিক হ্যায়।

একজন চাকর আলো লইয়া হারাধনকে গেস্ট হাউসে পৌঁছাইতে যাইতেছিল। পার্বতী তাহার হাত হইতে আলো লইয়া বহুরানীকে বলিল—আমি চাচাজীকে আগাইয়া দিয়া আসি।

পার্বতী আগে আগে চলিতে লাগিল, পিছনে হারাধন। বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিবার পরিবর্তে পার্বতী তাঁহাকে একখানি ছোট ঘরে আনিয়া ঢুকাইল। হারাধন কিঞ্চিৎ অস্বস্তি বোধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—এখানে আনিলে কেন মা?

পার্বতী হাতের আলো মেঝের উপর নামাইয়া রাখিয়া বলিল—কিছু না, কেবল আপনাকে প্রণাম করিবার জন্য। কতদিন আপনার সঙ্গে যে দেখা হয় নাই।

পার্বতী প্রণাম করিতেই হারাধনের বুকের অবরুদ্ধ স্নেহ স্রোতের উৎসধারার মুখ হইতে যেন সকল বাধা মুহূর্তে সরিয়া গিয়া সেই স্নেহ জলধারা হইয়া তাঁহার দুই চোখে দেখা দিল। তিনি পার্বতীর মাথায় হাত দিয়া বলিলেন—মা, মধ্যে মধ্যে মনে হয়, আমার দেওয়া গহনাগুলা স্পর্শ করিয়াই তোর এই দুর্ভাগ্য ঘটিয়াছে।

পার্বতী কাঁদিল না। আঁচল দিয়া মুখ মুছিয়া সে বলিল—আপনি আর আমার সম্পর্কে কিছু ভাবিবেন না চাচাজী। এখন বাবার কি হইবে বলুন।

হারাধন চুপ করিয়া রহিলেন।

পার্বতী বলিল—একদিনেই যাহা দেখিলাম তাহাতে মনে হইতেছে বাবার পুরাপুরি মাথার গোলমাল হইয়া গিয়াছে। পূর্বে লোক মারফৎ যাহা

শুনিয়াছিলাম তাহা ঠিকই। কিন্তু এ অবস্থায় তো বাবাকে ফেলিয়া রাখা যায় না। একটা চিকিৎসার তো ব্যবস্থা করিতে হয়।

কথাটা যে হারাধনের মনে হয় নাই তাহা নয়। কিন্তু তিনি কি করিতে পারেন? এখন পার্বতীর কথা শুনিয়া তিনি সোৎসাহে বলিলেন—এ তো খুবই উত্তম কথা। ডাক্তার তো পাটনায়। সেখানে কি উঁহাকে লইয়া যাওয়া সম্ভব হইবে? উনি বোধহয় পাটনা যাইতে সম্মত হইবেন না। আর উঁহাকে পাটনা লইয়া যাইবার অসুবিধাও আছে। কারণ উঁহাকে পাটনায় চিকিৎসার জন্য লইয়া গেলে জানাজানিরও আশঙ্কা আছে। সেক্ষেত্রে গোলমাল ত্বরান্বিত করিয়া লাভ কি? আমার মনে হয় পাটনা হইতে গোপনে ডাক্তার লইয়া আসাই ভাল। তুমি তোমার মায়ের সহিত প্রথমে পরামর্শ কর। আজ রাত্রিতেই কথা বল। তাহার পর তোমাদের মত হইলে পাটনা হইতে যেমন ব্যারিস্টার লইয়া আসিয়াছিলাম, সেইরূপ ডাক্তার লইয়া আসিব।

পরদিনই প্রভাতে বহুরানী ও পার্বতী সিংহজীর ঘরেই নাস্তার সময় এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। পাটনা হইতে ডাক্তার আনি ! দেখাইতে তাঁহার ঘোর আপত্তি। তাঁর সন্দেহগ্রস্ত মন ঠিক জায়গাতেই আঘাত করিল। তিনি বলিলেন—ডাক্তার দেখাইতে হইবে কেন? আমার কি হইয়াছে? আমার কিছুই হয় নাই। তোমরাই কেবল মিথ্যা ভয় পাইতেছ।

যুক্তিতর্কেও কিছু হয় না। তিনি বলিলেন—আর ডাক্তার যেখান হইতেই আসুক, পাটনা হইতে আনা চলিবে না।

—কেন? বহুরানী প্রশ্ন করিলেন।

তাহার কোনো উত্তর দিলেন না সিংহজী।

শেষে নিজেই বহুরানীকে বলিলেন—তোমার বাপের বাড়ী গয়ায় তো বহুত আচ্ছা কবিরাজ আছে। তাহাকে লইয়া এস না কেন?

আলোচনার পর তাহাই স্থির হইল। হারাধন গয়া গিয়া বহুরানীর পিত্রালয়ের সহিত যোগাযোগ করিয়া সিংহজীব চিকিৎসার জন্য কবিরাজ লইয়া আসিবেন। সেই অনুযায়ী হারাধন বহুরানীর নিকট হইতে পত্র লইয়া গয়া চলিয়া গেলেন। বহুরানীর পিতৃগৃহেও পুরাতন কালের চালচলন। তবে শহরে বাস বলিয়া কিছু একালের স্পর্শ লাগিয়াছে। বহুরানীর এক ভাই হারাধনকে সঙ্গে করিয়া কবিরাজের নিকট গেলেন। তাঁহার দাওয়াইখানায় বসিয়া তাঁহার সহিত প্রাথমিক কথাবার্তা বলিয়া উঠিবেন, এমন সময় হারাধন এক কাণ্ড করিলেন। তিনি উঁহাদের বলিলেন—আপনারা একটু অপেক্ষা করুন। আমি আসিতেছি।

বলিয়া তিনি দাওয়াখানা হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলেন। কবিরাজ মহাশয় ও বহুরানীর ভাই দুইজনে বিস্মিত হইয়া পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

কয়েক মিনিট পরেই হারাধন একটি যুবকের হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে দাওয়াখানায় ফিরিয়া আসিলেন। সে এক বিচিত্র দৃশ্য। এ যেন কেহ কোনো পলাইয়া-যাওয়া চোরকে ধরিয়া লইয়া আসিল। কিন্তু সেক্ষেত্রে তো যে ধরে এবং যাহাকে ধরে সে দুইজনের কাহারও মুখে হাসি থাকে না। তাহা হইলে? ইহারা দুইজনেই হাসে কেন?

বহুরানীর ভাই অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কি হইয়াছে?

হারাধন পলাতকের হাতটা সজোরে চাপিয়া ধরিয়া রাখিয়া হাসিয়া বলিলেন—এই 'ভাগনেওয়ালাকেই' জিজ্ঞাসা করুন, কেন কি হইয়াছে।'

বহুরানীর ভাই গয়ার পাকাপাকি বাসিন্দা, প্রতিষ্ঠাবান পরিবারের সন্তান। তিনি চোখ পাকাইয়া প্রশ্ন করিলেন—কিয়া রে?

যাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল সে হাসিতেছিল। তাহার হাসি আরও প্রসারিত, আরও বিনীত করিয়া সে হাবাধনকে বলিল—আব ছোড় দিজিয়ে হুজুর। হম আভি ভাগেঙ্গে নহি।

তাহাকে ছাড়িয়া দিতেই সে ঘরের দরজার কাছে মেঝের ধূলার উপরেই বসিয়া পড়িল।

বহুরানীর ভাই জিজ্ঞাসা করিলেন—কিয়া নাম রে?

বিনীত উত্তর আসিল—চামারিয়া।

—কোথায় কাজ করিস?

চামারিয়া বিড় বিড় কবিয়া কিছু বলিল। শুনিয়া বহুরানীর ভাই জান্‌কীলাল হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন—তবে তো বহত আচ্ছা মনিব মিলেছে রে তোর।

জান্‌কীলাল অতঃপর কবিরাজ মহাশয়ের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন—বুঝিলেন পণ্ডিতজী, ই আদমী আমাদের ত্রৈলোক্‌বাবু ওকীলের ছেলে শিব্বার কাছে কাম করে। শিব্বা তো এখন লেখাপড়া ছেড়েছে। লড়াই লেগেছে। সেই লড়াইয়ে যাবার জন্যে বায়না ধরেছে।

তারপর তার দিকে ফিরে বললেন—তুই শিব্বার কাছে কি কাজ করিস রে?

—উনকে ঘর কা কাম। কভি কভি ওকীল সাহেবের হুকুম নিয়ে জঙ্গলে চলে যাই। কাঠ বিক্রীর খবর থাকলে জঙ্গলে গিয়ে দিয়ে আসি।

—আচ্ছা।

তারপর হারাধনের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—তা আপনি ওকে পাকড়ালেন কেন?

হারাধন হাসিয়া বলিলেন—ও যে আগে আমারই কাছে কাজ করত। তারপর একদিন আমাকে না বলে পালিয়ে এল।

জান্‌কীলাল চোখ কটমট করিয়া বলিলেন—তু ভাগকে আয়া? কাহে রে?

চামারিয়া বিনীত হাস্য সহকারে বলিল—দিল নহি লাগা হুজুর। উসি লিয়ে চলা আয়া।

জান্‌কীলাল তেমনি রাগ করিয়াই বলিল—তোর দিল লাগল না বলে তুই না বলে পালিয়ে আসবি? এ কোন্ দেশী কথা বে?

চামারিয়া হাসিতে লাগিল।

তাহাকে হারাধনই উদ্ধার কবিলেন। জান্‌কীলালকে বলিলেন—আপনার ভাগনী পার্বতী যেদিন বিধবা হ'ল, সেদিন খবরটা পেয়েই ও পালিয়ে এল। তা আজ তো আমি ওকে ধরেছি। আর ছাড়ছি না, ওকে আমি কবিরাজ মশাইয়ের সঙ্গেই সঙ্গে করে নিয়ে যাব।

তারপর জান্‌কীলালকে শোনাইবার জন্যই বলিলেন—জানেন জান্‌কীলালজী, আমি আর ওই চামারিয়া দু'জনে মিলে পার্বতীকে মানুষ করেছিলাম।

চামারিয়া হাত জোড় করিয়া বলিল—হুজুর, হমকো থোড়া ছুট্টি দিতে হবে। আমার নতুন মালিককে বলে আসতে হবে।

জান্‌কীলাল বলিলেন—তোকে কিচ্ছু বলতে হবে না। ত্রৈলোক্‌বাবু আমাদের কোর্টের ওকীল, শিব্বা আমার দোস্ত। আমি বলে দেব দু'জনকেই। তুই চলে যা।

চামারিয়া সবিনয়ে বলিল—হুজুর, ওখানে আমাব থোড়া বিজ আছে, কাপড়া উপড়া আছে। সেগুলো তো নিয়ে আসতে হবে আমাকে।

জান্‌কীলাল বলিল—তাহলে এখনি চলে যা। তাড়াতাড়ি আমাদের বাড়ীতে চলে আয়। ঠিক চলে আসবি দু ঘড়িকে অন্দর। বিকেলবেলা ট্রেনে আরা যেতে হবে।

সেইদিন সন্ধ্যায় হারাধন কবিরাজ মহাশয় ও চামারিয়া দুইজনকে লইয়া আরা রওনা হইলেন। আরার বাড়ীতে চামারিয়াকে রাখিয়া তিনি কবিরাজকে লইয়া রনৌরা চলিয়া গেলেন।

কিন্তু কোনোই লাভ হইল না। বরং কবিরাজ দেখিয়া যাওয়ার পর বিপরীত ফল

হইল। সিংহজী কেবল মধ্যে মধ্যে বলিতে লাগিলেন—খবর তো পাটনা পৌঁহুছ গয়া।

পার্বতী, বহুরানী এবং হারাধন বার বার জিজ্ঞাসা করিয়াও তাঁহাকে তাহার অধিক কিছু বলাইতে পারেন না। কয়েক দিন অনবরত ওই কথা বলিয়া তাহার সঙ্গে যোগ দিলেন—আরাকে বদমাশ বড়া মুনিম তো উ লোগোকো সাথ সলহা কর রহা হ্যায়।

তখন আবার পরামর্শ করিয়া স্থির করা হইল তাঁহাকে প্রথমে আরা তারপর চিকিৎসার জন্য পাটনা লইয়া যাওয়া হইবে।

হারাধন তাঁহাকে বয়েল গাড়ীতে চড়াইয়া আরা লইয়া আসিলেন। সঙ্গে আসিলেন পার্বতী ও বহুরানী।

আবায় পৌঁছিয়াই তাঁহাব পাগলামি ঘোর উন্মাদ অবস্থায় পরিণত হইল। তিনি বড়া মুনিমকে একটা ঘুঁষি লাগাইয়া দিলেন। বলিতে লাগিলেন—তোমাদের মতলব আমি সব বুঝিতে পাবিয়াছি। তোমরা আমাকে আমার বেটা, আমার শত্রু দলীপ নারায়ণের হাতে তুলিয়া দিতে চাও? সে আমাকে ফাঁসি দিবে, ইহাই চাও তো তোমরা?

সেইদিন রাত্রিতেই চরম দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল। মধ্য রাত্রিতে অকস্মাৎ সিংহজী 'পাকড়ো পাকড়ো' করিয়া বাড়ীব দোতলার ছাতে ছুটিয়া উঠিয়া গেলেন। ও সেখান হইতে ওই 'পাকড়ো পাকড়ো' বলিতে বলিতেই দোতলার ছাত হইতে নীচের ছাতে লাফাইয়া পড়িলেন।

যখন লোকজন ছুটিয়া গেল তখন তিনি প্রাণ এবং পাগলামি দুয়ের হাত হইতেই নিষ্কৃতি পাইয়াছেন।

একুশ

ইহার পর ঘটনা দ্রুততালে ঘটিতে লাগিল।

বাবু সুরিন্দর নারায়ণ সিংহের মৃত্যুর এক সপ্তাহের মধ্যে তাঁহার একমাত্র পুত্র দলীপ নারায়ণ সিংহজী আর তাঁহার জননী, অর্থাৎ বাবু সুরিন্দর নারায়ণের প্রথমা স্ত্রী পুষ্পা দেবী আসিয়া আরার বাড়ীতে চাপিয়া বসিলেন।

সিংহজীর মৃত্যুর দুইদিন পরেই বড়া মুনিমজীর সহিত পরামর্শ করিয়া হারাধন পার্বতী ও ছোটা বহুরানীকে রনৌরাতে রাখিতে গিয়াছিলেন। সেখানেই

সিংহজীর শ্রাদ্ধ হইবে স্থির হইয়াছিল। হারাধন তাঁহাদের ওই শোকের মধ্যে যথাসম্ভব সান্ত্বনা দিয়া বসাইয়া আবার ফিরিয়া আসিবেন, এই কথা ছিল। কিন্তু তাহার পূর্বেই বড়া মুনিমজীর চিঠি গেল গোপনে। দলীপ নারায়ণ ও তাঁহার স্ত্রী আসিয়া আরার বাড়ী দখল করিয়া বসিয়াছেন।

ইহা তো জানাই ছিল। তবু এ সংবাদ পাইয়া ছোটা বহুরানী এবং সেই সঙ্গে পার্বতীর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। হারাধন তাঁহাদের আশ্বাস দিয়া বলিলেন—আপনারা এ সংবাদে এত বিচলিত হইতেছেন কেন? এমনটি যে ঘটিবে তাহা তো পূর্ব হইতেই জানা ছিল। এ সম্পত্তিতে যেমন পুত্র হিসাবে দলীপ সিংহজীব অর্ধেকে অধিকার তেমনি বাকী অর্ধেক তো আপনাদেরই। দেখুন না কি হয়। আমি এখন কয়েক দিনের জন্য আরা যাইতেছি। আবার শ্রাদ্ধেব পূর্বে ফিবিয়া আসিব।

হারাধন আবায় ফিরিয়া আসিলেন। প্রথমেই নিজের বাসায় গিয়া স্নানাহার করিয়া কিছু সময় বিশ্রাম করিয়া বড়া মুনিমজীকে সমস্ত খবর দিবার জন্য বাহির হইলেন। তিনি মনে মনে জানিতেন সিংহজীর বাড়ীতে গেলেই সিংহজীর পুত্র দলীপ সিংহজীর সহিতও সাক্ষাৎ ঘটিবে। আর সে সাক্ষাৎ তাঁহার পক্ষে খুব সুখকর হইবে না।

তাহাই ঘটিল।

সিংহজীর বাড়ীতে পোঁছিবার সঙ্গে সঙ্গে বড়া মুনিমজীর সহিত সাক্ষাতের পূর্বেই বাড়ীর নূতন মালিক দলীপ সিংহজীর সহিত হারাধনের সাক্ষাত হইয়া গেল। ছাব্বিশ-সাতাশ বৎসব বয়স্ক এক রূপবান তরুণ বাড়ীর বারান্দায় বেতের চেয়ারে খালি পায়ে বসিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র চিনিলেন হারাধন। মনে হইতেছিল বাবু সুরিন্দর নারায়ণ। যেন কেমন করিয়া উজানে পিছনের বয়সে ফিরিয়া আসিয়া চেয়ারে বসিয়া আছেন। অমনি দীর্ঘাঙ্গ, অমনি ফর্সা, অমনি মেদহীন দেহ। সামনের চুলে যেন সামান্য পাকের ছোঁয়া লাগিয়াছে। হারাধনকে সিঁড়ি দিয়া উঠিতে দেখিয়া তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছেন। হারাধন পরিষ্কার বুঝিতে পারিলেন দলীপ সিংহজীও তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অথচ মুখে হাসি লইয়া দলীপ সিংহজী তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন—কাহাকে চাই?

হারাধন হাসিমুখে বারান্দায় উঠিয়া সিংহজীর তরুণ উত্তরাধিকারীকে নমস্কার করিয়া বলিলেন—আমার নাম অম্বুজাক্ষ মুখোপাধ্যায়। আমি আপনার পিতা স্বর্গত হুজুর সরকারের বিশেষ প্রীতিভাজন লোক ছিলাম। তিনি আমাকে বিশেষ

দয়া করিতেন। আমাকে আদর করিয়া অম্বুবাবু বলিয়া ডাকিতেন। আমি যতটা সম্ভব তাঁহার সেবা করিয়াছি।

দলীপ সিংহজী হাসিয়া বলিলেন—আপনি কি আরাতেই থাকেন?

হারাধন হাসিয়া বলিলেন—জী হাঁ! আপনার পিতা আমাকে একটি ছোট্ট বাড়ী দান করিয়া গিয়াছেন এই শহরেই।

দলীপ সিংহজী হাসিয়াই বলিলেন—আমি আজ দুই তিন দিন আসিয়াছি, কিন্তু আপনাকে তো দেখিতে পাই নাই। আপনি কি শহরে ছিলেন না?

হারাধন বুঝিলেন এ তরুণ কথা দিয়া ঠেলিয়া তাঁহাকে কোথায় লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে। তিনি হাসিয়া বলিলেন—না, হুজুর সরকার, আমি তো এখানে ছিলাম না। আমি এখানে থাকিলে অবশ্যই পূর্বেই আসিতাম।

সমান হাসিয়া তরুণ জিজ্ঞাসা করিলেন—কোথায় গিয়াছিলেন?

বিশেষ সম্ভ্রমের সহিত হারাধন বলিলেন—আপনার ছোট মা আর বহিনকে আমি রনৌরাতে পৌঁছিয়া দিতে গিয়াছিলাম।

সঙ্গে সঙ্গে তরুণের সমস্ত চেহারাটার বদল হইয়া গেল। তিনি তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—বহিন? কে বহিন? আমার তো কোনো বহিন নাই।

হারাধন জিভ কাটিয়া বলিলেন—ছি, ছি, কি বলিতেছেন সিংহজী? এমন কথা বলা আপনার পক্ষে কসুর হইতেছে! এ রকম কি বলিতে আছে? আপনার বাপের কন্যা। হইতে পারে তিনি আপনার সহোদরা নহেন, কিন্তু তাই বলিয়া আপনি আপনার ভগ্নীকে অস্বীকার করিবেন এ কেমন কথা?

তরুণ সিংহজীর মুখ ক্রোধে রক্তাভ হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—আমি আপনাকে চিনি মহাশয়। আপনি সেই বাংগালীবাবু যাঁহার স্ত্রীকে আমার পিতা কাড়িয়া লইয়াছিলেন এবং যাহার গর্ভে তিনি কন্যাটি বানাইয়াছিলেন।

যে হারাধন সারা জীবন ভীরুর মত, চতুরের মত, কাপুরুষের মত কাটাইয়াছেন, বাবু সুরিন্দর নারায়ণের স্তাবকতা করিয়াছেন, তিনি জীবনে প্রথমবার আপনার সকল ভয় ও সমস্ত ক্ষুদ্রতাকে অতিক্রম করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন। তরুণ দলীপ সিংহের কথা শুনিয়াই তিনি নিজের দুই কানে আঙুল দিয়া কান বন্ধ করিয়া ধিক্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন—ছি, ছি, ছি! আপনি এ সব কি বলিতেছেন? আপনার ছোট মা, আপনার পিতার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, আপনার বিমাতার গর্ভজাতা কন্যাকে আপনি 'জারজ' বলিতে সঙ্কোচ করিতেছেন না?

তারপর তিনি তীব্র ব্যঙ্গে হাসিয়া বলিলেন—তাহাই বা বলি কেন? যে পুত্র পিতার জীবিতকালেই প্রকাশ্যে সমারোহ করিয়া পিতার শ্রাদ্ধ করেন এবং সেই

শ্রাদ্ধে পিতাকেই উপস্থিত থাকিবার নিমন্ত্রণ জানাইতে পারেন, তাঁহার পক্ষে এই ধরনের কথাই তো অতি স্বাভাবিক উক্তি!

দলীপ সিংহজী তখন রাগে রক্তাভ মুখে দুই হাত মুঠা করিয়াছেন। তিনি চাপা গলায় বলিলেন—ঠিক আছে। আদালতে এই কথা প্রমাণ করিবেন। ওই লেড়কী যে 'বেজন্মা' নয় তাহাও প্রমাণ করিবেন।

হারাধন তখন যেন এক অতলস্পর্শী খাদের শেষ সীমায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। সেইখানে দাঁড়াইয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন—ও সব প্রমাণের দায় আমারও নয়, আপনার ছোট মা আর আপনার বহিনেরও নয়। এ প্রমাণের দায় সব আপনার। তবে আপনাকে বলিয়া রাখি, আপনি যে আপনার পিতার জীবিত-কালেই তাঁহার শ্রাদ্ধ করিয়া সেই পিতাকেই সেই শ্রাদ্ধে উপস্থিত হইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, সেই নিমন্ত্রণপত্র আমি শুধু নিজে চোখে দেখি নাই, সেই খামসমেত নিমন্ত্রণপত্র আমারই কাছে আছে। আপনি যে পিতার কি সুপুত্র ছিলেন তাহা আপনি আদালতে আপনার বক্তব্য প্রমাণ করিতে পারুন চাই নাই পারুন, আমি তাহা দেখাইতে পারিব। আর যতদিন আপনার বহিনকে এ সম্পত্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে না পারিতেছেন ততদিন আপনাকে বাধ্য হইয়া আপনার বহিনকে বহিন বলিয়া মানিতে আপনি বাধ্য, এবং আমাকেও তাঁহাদের শুভার্থী হিসাবে আপনাকে মানিতে হইবে। পছন্দ হউক বা না হউক আপনার না মানিয়া উপায় নাই।

বলিয়া তাঁহার সহিত আর বাক্যালাপ না করিয়া হারাধন সেরেস্তার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন। তরুণ দলীপ সিংহজী আর ভিতরে আসিলেন না; বারান্দাতেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। হারাধন অনুভব করিলেন প্রথম দফা যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করিয়াছেন। সেটা অনুভব করিতে করিতেই তিনি সেরেস্তার ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

সেরেস্তার মুখেই বড় মুনিমজী দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি সেইখান হইতেই সব শুনিয়াছিলেন। হারাধনকে দেখিয়াই তিনি একমুখ হাসি লইয়া নিঃশব্দে তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানাইলেন। সে হাসি দেখিয়া হারাধন গভীর আশ্বাস পাইলেন। হাসিয়া তাঁহার হাতের উপর হাত রাখিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন—চলুন, কথা আছে।

সামান্য দুই একটা মামুলী কথার পর অতি মৃদুস্বরে হারাধন তাঁহাকে বলিলেন—আজ রাত্রিতে একবার আমার বাড়ীতে আসুন। আমি এখন চলিলাম।

রাত্রিতে বড় মুনিমজী হারাধনের বাড়ী আসিলেন। আসিয়াই সর্বপ্রথম তিনি

নিজের জেবের ভিতর হইতে একটি ভাঁজকরা থাম বাহির করিয়া তাঁহার হাতে দিয়া হাসিয়া বলিলেন—আপনি তো সকালে বাহাদুরি দেখাইয়া বলিলেন—সে চিঠিখানা আপনার কাছেই আছে। কিন্তু চিঠিখানা তো ছিল আমার কাছে। তবে চিঠিটার কথা বলিয়া আপনি সত্যই সাপকে বশ করিয়াছেন। এখন চিঠিখানা রাখুন।

তারপর তিনি বলিলেন—এই ঘটনার জন্য, এবং বিশেষ করিয়া এই চিঠিখানার জন্য উহারা ছোট বহুরানী আর পার্বতী মাঈয়ার নামে মামলা করিতে সাহস করিবে না। না হইলে উহারা এক দফা লড়াই ফাঁদিয়া বসিত। আপনি ওই ভয় দেখাইয়া ভালই করিয়াছেন। এই লউন, চিঠিখানা আপনি রাখুন।

চিঠিখানা একবার দেখিয়া সেখানি হারাধন মুনিমজীকে ফেরৎ দিয়া বলিলেন —মুনিমজী, এই চিঠি আপনি আপনার কাছেই রাখুন। তবে গোপনে লুকাইয়া রাখিবেন। কাহারও কাছে এ সম্পর্কে কোনো কথা প্রকাশ করিবেন না। আপনাকে একটা কথা বলিয়া রাখি। যদি কোনো দিন আমার বাড়ীতে ডাকাতি হয়, আশ্চর্য হইবেন না। এই চিঠির জন্যই আমার বাড়ীতে ডাকাতি হইতে পারে। সেই জন্যই আমি আপনাকে পত্রখানি রাখিতে বলিতেছি।

মুনিমজী হারাধনের কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ হাঁ করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন—আপনি ঠিকই বলিয়াছেন; এরূপ হইতে পারে। কিন্তু এ তো পরের কথা। এখন শ্রাদ্ধ কিরূপভাবে হইবে, কোথায় হইবে? রনৌরাতেই হইবে তো?

হারাধন বলিলেন—দেখা যাউক। আমার মনে হয়, আপাততঃ কোনো গোলমাল হইবে না। তবে মুনিমজী, আমি আর সেরেস্তার দিকে যাইব না। গেলেই দলীপ সিংহজী সন্দেহ করিবে। আর সেই সঙ্গে আমার সহিত ঝগড়া-ঝাঁটিও হইতে পারে। অনর্থক কলহ করিয়া কাজ কি?

মুনিমজী বলিলেন—দলীপজী আমাকে বহুত্‌ মিঠা মিঠা বাত্‌ বলিতেছে। আপনি চলিয়া আসার পর আপনার সহিত যে সব কথা লইয়া কলহ করিল সেইসব কথাই আবার বলিল আমাকে। বলিল—এ সম্পত্তি সমস্তই তো আমার। কন্যাকে যে সম্পত্তি পিতাজী দিয়া গিয়াছেন তাহা দুই কারণে বে-আইনী। প্রথমতঃ, পিতাজী যখন উইল করিয়াছিলেন তখনই তাঁহার মাথা বিগড়াইয়া গিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, যাহাকে কন্যা বলিয়া তিনি অর্ধেক সম্পত্তি দিয়া গিয়াছেন, সে কন্যার সম্পত্তি পাইবার কোনো অধিকারই নাই। কারণ সে কন্যা পিতাজীর বিবাহিতা স্ত্রীর কন্যা নয়; এক রক্ষিতার কন্যা মাত্র। ইহা শুনিয়া

আমি জিভ কাটিয়া বলিলাম—হুজুর সরকার, এ কথা বলিবেন না। পার্বতী মাঈয়া আপনার ছোট মাঈয়ার লেড়কি। তার উপর বেওয়া। আপনি তাঁহাকে রক্ষা না করিলে, তাঁহার মান-ইজ্জত-সম্পত্তি সব বাঁচাইয়া না চলিলে কে বাঁচাইবে? তাহার উপর আপনার ছোট বহিন, আপনার চেয়ে কমসে কম দশ বছরের ছোট।

মুনিমজী চুপ করিতেই হারাধন বলিলেন—তাহা হইলে যাহা হইবার তাহা তো হইয়াই গিয়াছে। দলীপ সিংহজী তো বুঝিয়াই গিয়াছেন যে আমার মতই আপনি দুসরা দলে, তাঁহার দলের লোক নহেন।

মুনিমজী হাসিয়া বলিলেন—শুনুন না তাহার পর। আজ রাত্রিতে খাইবার সময় আমরা যখন বাড়ীর ভিতরে বারান্দায় খাইতে বসিয়াছি তখন দলীপ সিংহজীর মা, বাবুজী সাহাবের প্রথমা স্ত্রী, আসিয়া আমাদের খাওয়ার কাছে দাঁড়াইলেন। আমি একবার মুখ তুলিয়া চাহিয়া চোখ নামাইয়া লইলাম। আমি সিংহদের সেরেস্তায় প্রায় আমার 'বচপন' হইতেই কাজ করিতেছি। সুরিন্দরবাবুর প্রথম সাদীর সময় আমি এ বাড়ীতে হাজির ছিলাম। বাবুজীর প্রথমা স্ত্রীও অসাধারণ সুন্দরী। দীর্ঘাকৃতি, ফর্সা। যখন সাদী হয় তখন সবাই বলিয়াছিল এ রাম-সীতার মিলন হইল। সে দিনের পর কতকাল গিয়াছে। তাঁহার ওই ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের ছেলে রহিয়াছে। তাহা সত্ত্বেও দেখিলাম ভদ্রমহিলা যেন এই বয়সে আরও সুন্দরী হইয়াছেন। আমি একবার দেখিয়া চোখ নামাইয়া লইলাম। এই সময়ে একজন নোকর তাঁহার জন্য একখানা কুর্সী দিয়া গেল। তিনি আমাদের সামনে বসিয়া আমাদের খাওয়ার তদারক করিতে লাগিলেন।

হারাধন কিঞ্চিৎ উত্তেজিত হইয়া নড়িয়া-চড়িয়া বসিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনার সহিত কি কথাবার্তা হইল বলুন তো।

মুনিমজী হাসিয়া বলিলেন—বলিব বলিয়াই তো আসিয়াছি। শুনুন।

বড় মাঈজী জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনারা সেরেস্তার সকলে এখনও সেই আগের মতই এ বাড়ীতে খান দেখিতেছি। আমি যখন এ বাড়ীতে সাদীর পর প্রথম আসি তখনও এই ব্যবস্থা ছিল মনে আছে। তা মুনিমজী কি আমার সাদীর সময়ও ছিলেন?

আমি বুঝিলাম, বড়া মাঈজী আমার সহিত ইচ্ছা করিয়াই সজ্ঞানে ভাল ব্যবহার করিতেছেন। আর উনি যে আমার সহিত ভাল ব্যবহার করিতেছেন, সে কথাটাও আমাকে বুঝাইয়া দিতে চাহেন।

আমি বলিলাম—মাঈজী, আপনি এখন শোক পাইয়াছেন। এখন আপনারা আমাদের খাওয়ার কাছে কেন বসিয়া থাকিবেন? আপনি বরং এখন যান, বিশ্রাম করুন।

বড়া মাঈজী হাসিয়া বলিলেন—আমার বাড়ীতে আপনারা খাইবেন, আর আমি একবারও দেখভাল্ করিব না ইহা কি সঙ্গত ও শোভন হয়? আর এ দেখা তো আমার কর্তব্যই।

সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন—আচ্ছা, আপনাদের খাওয়ার সময় পূর্বে বাড়ীর কেহ, মানে কোন মহিলা, উপস্থিত থাকিতেন না?

আমি বলিলাম—না। হুজুর বাহাদুর তো খাওয়া-দাওয়া করিয়া তাড়াতাড়ি শুইয়া পড়িতেন। আর হুজুর বাহাদুর ছাড়া তো আবার এ বাড়ীতে কোন জেনানা থাকিত না। কাজেই কে থাকিবে?

তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন—কেন, কোনো জেনানা যদি এ বাড়ীতে না থাকিত তো তাহারা থাকিত কোথায়?

কেন? দেহাতে। বনৌরায়। সেই তো হুজুর বাহাদুরের দেশ।

বড় মাঈজী জিজ্ঞাসা করিলেন—সেইজন্যই কি আপনারা বনৌরাতে শ্রাদ্ধ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন?

আমি বলিলাম—জী হাঁ। আর তা ছাড়া ছোট মাঈজী আর পার্বতী মাঈয়া দু'জনেরই ইচ্ছা শ্রাদ্ধটা বনৌরাতেই হউক।

বড় মাঈজী বলিলেন—আমি আর দলীপ ভাবিয়াছিলাম শ্রাদ্ধটা এখানে এই আমার বাড়ীতেই সম্পন্ন করিব। তা আপনাদের সকলের যখন ইচ্ছা বনৌরাতে শ্রাদ্ধ করার, তখন তাহাই হউক।

তারপরই বড় মাঈজী প্রশ্ন করিলেন—তাহা হইলে আমাদের কবে বনৌরা যাইতে হইবে?

আমি বলিলাম—আপনি যেদিন হুকুম করিবেন। তবে আগে আগে যাওয়াই ভাল।

হারাধন সব চুপ করিয়া শুনিলেন। তারপর বলিলেন—আপনি ব্যাপারটা বুঝিলেন মুনিমজী?

মুনিমজী বলিলেন—কি বলুন তো?

হারাধন বলিলেন—উঁহারা ঝগড়া করিতে চান না। অন্ততঃ এখন চান না।

মুনিমজী বলিলেন—ঝগড়া না হওয়াই তো ভাল। সকলে মিলিয়া-মিশিয়া থাকিলেই তো সবচেয়ে আনন্দের হয়।

মুনিমজী উঠিলেন। বলিলেন—আমি আজ উঠি।

হারাধন বলিলেন—চিঠিটা ভাল করিয়া কিন্তু গোপনে রাখিবেন।

পরদিন সকালে হারাধন সদ্য স্নান ও পূজা পাঠ করিয়া উঠিয়াছেন, এমন সময় আবার মুনিমজী আসিয়া হাজির। তাঁহার মুখে একমুখ হাসি। হারাধন সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি ব্যাপার? এত সকালে একমুখ হাসি লইয়া?

বড় মাঈজী আপনাকে ডাকিতেছেন। আমাকে বার বার অনুরোধ করিয়া আপনার কাছে আসিতে বলিলেন। আপনি একবার এখুনি 'তুরন্ত' চলুন। বলিলেন—আমি জানিতাম না আমার বেটা কাল অম্বুবাবুকে বহত 'কঢ়া' বাত বলিয়াছেন। তাঁহাকে লইয়া আসুন। আমি আমার বেটার হইয়া তাঁহার কাছে 'মাফি' মাঙিয়া লইব।

সুতরাং হারাধনকে মুনিমজীর সহিত যাইতেই হইল। যাইতে যাইতে একবার হারাধনের মনে ক্ষণিকের জন্য সন্দেহ আসিয়াছিল। কিন্তু সে সন্দেহকে তিনি সঙ্গে সঙ্গে মন হইতে বেশ সজ্ঞানে বিদূরিত করিলেন। সন্দেহহীন প্রসন্ন মনেই তিনি বাবু সুরিন্দর নারায়ণের বাড়ীতে তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর সম্মুখীন হইলেন।

মুনিমজীর সহিত হারাধন গিয়া উপস্থিত হইতেই খবর পাইবামাত্র তিনি দ্রুতপদে হাসিমুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হাত জোড় করিয়া হারাধনকে বলিলেন —কাল আমার বেটা আপনার সঙ্গে 'বহত' খারাপ ব্যবহার করিয়াছে। আমি জানিতে পারিবামাত্র তাহাকে 'বহত' তিরস্কার করিয়াছি। আমি তাহার অপরাধের জন্য, কসুরের জন্য আপনার কাছে হাত জোড় করিয়া মাফি মাঙিতেছি।

তাহার পর তাঁহাদের দুইজনকে কুর্সীতে বসাইয়া তিনি বলিলেন—আপনি অম্বুবাবু, আমার স্বামীর বহত বড়া দোস্ত ছিলেন। আপনার সঙ্গে যদি আমাদের সম্পর্ক খারাপ হয় তো সে বড় দর্দের ব্যাপার হইবে। আমি জানি আমার সতীনের মেয়ে পার্বতীকে আপনি অত্যন্ত স্নেহ করেন। তাহাকে কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছেন। পার্বতী আমারও মেয়ে। সে আমার বেটার বহিন। আমার এবং বেটার প্রথম কর্তব্য তাহাকে রক্ষা করা। তাহার মান-সম্মান, ইজ্জৎ-সম্পত্তি সব রক্ষা করার দায় আমাদের। আমার স্বামী সম্পত্তির অর্ধেক যদি তাহাকে দিয়া গিয়া থাকেন তাহাতে তাঁহার কসুর হইয়াছে বলিতে পারিব না। কসুর তো আমার আর আমার বেটার। আমি আর আমার বেটা যদি বরাবর তাঁহার কাছে থাকিতাম, তাঁহার সেবা করিতাম, তাহা হইলে তিনি যে উইল করিয়াছেন তাহা করার তো কোনো কারণ ঘটিত না।

এখন আমাদের নিজের কসুর স্বীকার করিয়া অবস্থাটা আমাদের মানিয়াই লইতে হইবে। এবং আমার বেটা সমস্ত সম্পত্তি শুধু তাহার নিজের হইয়া নয়, তাহাব বহিনের হইয়াও দেখাশুনা করিবে। এ কাজে আপনার এবং বড মুনিমজীব সাহায্য অবশ্যই জরুরী প্রয়োজন। বনৌরাতে শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা হইয়াছে, ভালই হইয়াছে। আমরাও স্থিব করিয়াছি, আমিও সপরিবারে বনৌবাতেই বাস করিব।

তাঁহার কথা শুনিয়া হাবাধনেব সমস্ত সংশয় সম্পূর্ণরূপে অবগত হইল। ভদ্রমহিলার বুদ্ধি ও বিবেচনা দেখিয়া হারাধন বিমুগ্ধ হইলেন। তিনি আবেগের মাথায় বলিয়া বসিলেন—আপনাব এমন বুদ্ধি-বিবেচনা। ইহার সুযোগ ও সাহায্য যদি হুজুর সরকাব পাইতেন তাহা হইলে তাঁহাব জীবনেব পবিণাম এমন বিয়োগান্ত হইত না।

ভদ্রমহিলা হাসিলেন। বলিলেন—আমাবও তাই মনে হয়। আফসোস হয় সেজন্য।

তাহাব পব হাসিকে আবও একটু প্রকট কবিয়া বলিলেন—যাক, যাহা ঘটিয়া গিয়াছে তাহাব জন্য তো আফসোস কবিয়া কোনো লাভ নাই। এখন ভবিষ্যতে যাহাতে সকলে মিলিয়া সুখে শান্তিতে আনন্দে থাকিতে পাবি সেইদিকেই সব দৃষ্টিটা দেওয়া বোধ হয় ভাল। না কি বলেন?

হাবাধনেব একটি মুখ। কিন্তু তিনি পঞ্চমুখে সাধুবাদ জানাইয়া তাঁহাব কথা সমর্থন কবিলেন।

বড মাঈজী বলিলেন—আমি তাহা হইলে দুই এক দিনের মধ্যেই বনৌবা চলিয়া যাইব। আপনাবা শ্রাদ্ধেব বেশ দুই এক দিন পূর্বেই বনৌবা পৌঁছিয়া যাইবেন।

হারাধন এবং বড় মুনিমজী দুইজনেই সশ্রদ্ধ ও সকৃতজ্ঞভাবে সমর্থন কবিয়া বলিলেন—নিশ্চয়, নিশ্চয়। ইহাতে আব কথা কি?

বড মাঈজী বলিলেন—আমি এবং আমাব বেটা খবর পাইয়া তাডাতাডি চলিয়া আসিয়াছি। আমার পুত্রবধু তাহার বাপের বাড়ীতে রহিয়াছে। তাহাকে সোজা বনৌরা যাইবার জন্য টেলিগ্রাম করিয়া দিয়াছি।

হারাধন এবং মুনিমজী বনৌরা গিয়া একই সঙ্গে আশ্চর্য ও পুলকিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা একই সঙ্গে দেখিলেন দেবী দুর্গার মত বড মাঈজী সমস্ত আয়োজন পরিচালনা কবিতেছেন আর সেই সঙ্গে তিনি ছোট বহুবানী ও

পার্বতীকে অহরহ কাছে কাছে রাখিয়া হাসি ও সমাদর দিয়া তাঁহাদের অভিষিক্ত করিতেছেন।

অনেক ভিড়ের মধ্যে বাবু সুরিন্দর নারায়ণের একমাত্র পুত্র দলীপ সিংহজী শ্রাদ্ধ করিতে বসিয়াছেন। তাঁহার নিকট হইতে স্বল্প দূরে একটি সুন্দরী যুবতী বসিয়া আছেন। হারাধন বুঝিলেন তিনি দলীপজীর স্ত্রী। আরও একটি রূপবান তরুণ সর্বত্র হা হা করিয়া হাসিয়া স্ফূর্তির জোয়ারে ভাসিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। দলীপজীর স্ত্রী এবং তরুণটিকে দেখিয়া তিনি কাহাকেও প্রশ্ন না করিয়াই বুঝিতে পারিলেন ছোকরা দলীপের শ্যালক।

এক সময় সুযোগ পাইয়া ভিড়ের মধ্য হইতে পার্বতীকে কাছে ডাকিয়া হারাধন প্রশ্ন করিলেন—কেমন আছিস মা পার্বতী?

প্রশ্ন করিবার পূর্বেই পার্বতীর মুখ খুশীতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে এক-মুখ হাসিয়া ঘাড় দোলাইয়া বলিল—জানেন চাচাজী, বাবার মৃত্যুর পর হইতেই বড় ভয় পাইতেছিলাম। ভয় পাইতেছিলাম বড় মাঈজীকে আর ভাইজীকে। বহুত কসুর হইয়াছিল। উঁহারা এত ভাল কি বলিব! উঁহাবা আমাকে এবং মাঈজীকে প্রায় বুক দিয়া আগলাইয়া রাখিয়াছেন।

একটু থামিয়া সে আবাব বলিল—বাবুজীই মনে মনে ভয় পাইয়া আমাদের এই রকম ভয় পাওয়াইয়া দিয়াছিলেন। বাবুজীবই 'গলত' হইয়াছিল। বড় মাঈজীর আর ভাইজীর কোনো কসুর নাই।

হারাধন এত সত্ত্বেও একটু বিষণ্ণ হইয়া গেলেন। যে লোকটা ইহাদেরই মমতায় শঙ্কিত হইয়া শেষ পর্যন্ত পাগল হইয়া গেল পার্বতী আজ পরোক্ষভাবে তাহাকেই দোষ দিতেছে? সংসার এমনিই আজব জায়গা বটে।

তিনি হাসিয়া বলিলেন—এ খুবই আনন্দের কথা। তোর কথা শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।

পার্বতী চঞ্চল হইয়া উঠিল। বলিল—আমি এখন যাই চাচাজী। আমাকে না দেখিতে পাইলে বড় মাঈজী চিন্তা করিবেন, আমাকে খুঁজিবেন।

পার্বতী চলিয়া গেল। হারাধন মনে মনে অনেকখানি নিশ্চিন্ত হইলেন। তাঁহার অনুভব করিয়া ভাল লাগিল যে, পার্বতী এবং ছোট বহুরানী শুধু নিরাপদ আশ্রয়েই নাই, তাঁহারা যে নিরাপদ আশ্রয়ে আছেন এ বোধটাও তাঁহাদের দুইজনের মনেই বিশ্বাস হইয়া বসিয়া গিয়াছে।

এ সম্পর্কে ছোট বহুরানীর সঙ্গেও শ্রাদ্ধের পর চলিয়া আসিবার সময় একবার কথা বলার সুযোগ আসিয়াছিল। সেই সময় তিনিও অনুরূপ মনোভাবই প্রকাশ

করিয়াছিলেন। হাসিমুখেই বলিয়াছিলেন—জানেন, হুজুর সরকারেরই 'গলত' হইয়াছিল। ইঁহারা মা বেটা দুইজনেই লোক খুবই ভাল। খুব বিবেচক। দরাজ দীল। তবে মা বেটা দুইজনেরই খুব অহঙ্কার।

বলিয়া নিজেই তাহার সংশোধন করিয়া ছোট বহুরানী বলিয়াছিলেন—তা উঁহাদের বিশেষ করিয়া দিদিজীর এত গুণ আছে যে উঁহার অহঙ্কার থাকিলেও তাহা শোভা পায়। বরং অহঙ্কার না থাকিলেই যেন তাঁহাকে মানাইত না। আপনি আমাদের জন্য আর ভাবিবেন না। আমরা দিদিজীর নিরাপদ আশ্রয়েই আছি।

হারাধন শ্রাদ্ধান্তে প্রসন্ন মনেই আরায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

তাহার পর একটা বছর নিশ্চিন্তেই কাটিয়া গেল। এই এক বছর বাবু সুরিন্দর নারায়ণের পুরা সংসার রনৌরাতেই মহা আনন্দে অতিবাহন করিয়াছে। সে সংবাদ তিনি মধ্যে মধ্যে পাইয়াছেন। মধ্যে সংসারের কর্ত্রী দলীপজীর মায়ের সঙ্গে ছোট বহুরানী, পার্বতী, দলীপের স্ত্রী, রনৌরা হইতে আসিয়া একবার আরার বাড়ীতে বেশ কয়েক দিন খুব আনন্দে কাটাইয়া গেলেন। সে সময় পাটনায় দলীপের শ্বশুরবাড়ী হইতে তাহার শ্যালক, ছোট শ্যালিকা ইহারাও আসিয়া সে আনন্দকে ঘনতর করিয়া তুলিল। সেইখানেই তাহার শেষ হইল না। দলীপকে আরায় রাখিয়া বাকী সকলেই রনৌরা চলিয়া গেল। সে সময় পার্বতী ও ছোট বহুরানীর সঙ্গে হারাধনের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। হারাধন দেখিয়া আবার দ্বিতীয় বার নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন যে উঁহারা মাতা-পুত্রী গভীর নিশ্চিন্ততার মধ্যে বেশ আনন্দেই আছেন। সেবার দলীপের শ্যালকের সহিত ভাল করিয়া হারাধনের আলাপ হইল। বেশ ছেলেটি। যেমন রূপবান, তেমনি বুদ্ধিমান ও মধুর স্বভাবের তরুণ। পাটনা কলেজ হইতে বি. এ. পাস করিয়া আইন পড়িতেছে। তাহার ইচ্ছা দলীপের মামার অধীনে জুনিয়ার হইয়া কাজ করে ও পরে পাটনায় প্র্যাকৃটিস করে। দেখিয়া হারাধনের বুকের ভিতরটা বেদনায় টনটন করিয়া উঠিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইয়াছিল, আহা, এমনি একটি তরুণের সহিত যদি পার্বতীর আবার বিবাহ হওয়া সম্ভব হইত! ভাবনাটা তিনি মাথার মধ্যেই রাখিয়াছিলেন; ফেলিয়া দেন নাই। মনে হইয়াছিল, পার্বতীর বড় মা তো তাহাকে নিজের কন্যার মতই জ্ঞান করেন। ছেলেটি ল'টা পাস করুক। তারপর সুযোগ-সুবিধা মত তিনিই কথাটা দলীপের মায়ের নিকট উত্থাপন করিবেন। তিনি নিশ্চয়ই প্রস্তাবটা সহৃদয়তার সহিত বিবেচনা করিবেন।

মাস ছয়েক পর পার্বতী তাহার বড় মায়ের সহিত আবার একবার আরায় আসিল। এবার আর ছোট বহুরানী আসেন নাই; আর সকলেই আসিয়াছে। দলীপের স্ত্রীও আসিয়াছে। তাহারা আসিবার পরদিনই দলীপের সেই শ্যালক, নাম বোধহয় তাহার মহীন্দর, সে-ও আসিয়া গেল। সে যখন আসে তখন সেখানে হারাধনও উপস্থিত ছিলেন। তাহার সহিত আবার আলাপটা ঝালাইয়া মনটি আরও প্রসন্ন হইয়া উঠিল। সে পরের বছর ফাইন্যাল ল' পরীক্ষা দিবে। তাহার সহিত কথা কহিতে কহিতেই হারাধন দেখিলেন মহীন্দরের আসার সংবাদ ইতিমধ্যে অন্দরমহলে পৌঁছাইয়া গিয়াছে এবং তাহাতে অন্দর-মহলে যেন খুশীর জোয়ার আসিয়াছে। সেই জোয়ার অন্দরমহল ছাপাইয়া বাহিরের ঘর পর্যন্ত ঠেলিয়া আসিয়াছে। বাহিরের ঘরের দরজার আড়ালে অন্ততঃ দুইটি মুখ হারাধন দেখিতে পাইলেন। দলীপের স্ত্রীর মুখ এবং পার্বতীর মুখ।

হারাধনের বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিল। দলীপের স্ত্রীব আসার কারণটা বুঝিতে পারা যায়। তাহার ভাই আসিয়াছে, তাহার উদ্‌গ্রীব হওয়া কিছু আশ্চর্য নয়। কিন্তু পার্বতী? পার্বতী কেন আসিবে? তাহা হইলে কি কোনো মুগ্ধতা তাহার তীব্র জ্বালাকর সূত্র দিয়া তাহাকে অন্দরের ভিতর হইতে সকল লজ্জা-সঙ্কোচ অতিক্রম করিয়া টানিয়া আনিয়াছে? তাহা যদি হয় তাহা হইলে তো বিপদ আছে। হারাধন আর প্রশ্ন করিয়া মহীন্দরকে আটকাইলেন না। হাসিয়া বলিলেন—যাও বাবা, তোমার জন্য অন্দরমহল চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

তরুণ সুন্দর ছেলেটি গভীর বিনয় ও সম্ভ্রম প্রকাশ করিয়া হাসিতে হাসিতে অন্দরমহলে প্রবেশ করিল। হারাধন ভাবিতে লাগিলেন—ওই তরুণটিও কি নিজের ভগ্নীর সহিত পার্বতীর উপস্থিতি লক্ষ্য করিয়াছিল?

সেবার কয়েকদিন পর হারাধন আবার একবার পার্বতীব সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। গিয়া তাঁহাকে সেদিন বেশ কিছুক্ষণ পার্বতীর জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে হইয়াছিল। শেষে তিনি যখন চলিয়া আসিব কি না ভাবিতেছেন তখন লঘুচঞ্চল পদবিক্ষেপে পার্বতী আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার মুখ-চোখের চেহারা দেখিয়া আশ্চর্য ও চমকিত হইয়া উঠিলেন হারাধন। পার্বতীকে এত সুন্দর তিনি কখনও দেখেন নাই। বৈধব্যের অনুশাসনে তাহার যে রূপ ও যৌবন সর্বদা গুপ্ত ও আবৃত হইয়া থাকিত ছাইচাপা আগুনের মত, আজ যেন কোন আশ্চর্য মন্ত্রবলে ফুৎকারে সেই সমস্ত অনুশাসন, বিষণ্ণতা

অর্থহীন ছাইয়ের মত সরিয়া গিয়া, উড়িয়া গিয়া তাহাকে এক আশ্চর্য সৌন্দর্যের মহিমা লইয়া প্রকাশ করিয়াছে। তাহার মুখে একটা চঞ্চল আপাত অর্থহীন অথচ গভীর অর্থবহ হাসি খেলা করিতেছে। গাল দুইটায় রক্তাভা ফাটিয়া পড়িতেছে। চোখের দৃষ্টি অতি উজ্জ্বল, চকিত ও চঞ্চল।

হারাধন উঠিয়া দাঁড়াইলেন। হাসিমুখে তিনি বলিলেন—তোকে আজ মা বড় সুন্দর দেখাইতেছে। কিন্তু তুই আজ এত চঞ্চল কেন?

পার্বতী যেন আনন্দে ও উচ্ছ্বাসে হাঁফাইতেছিল। নিজের চাঞ্চল্য যথাসম্ভব গোপন করিয়া সে বলিল—আজ এক জায়গায় বেড়াইতে যাইবার কথা আছে। সেইজন্য ব্যস্ত ছিলাম।

—কে কে যাইবে?

—ভাইজী, ভাবীজী, মহীন্দরভাই ও আমি।

হারাধন হাসিয়া বলিলেন—তোমার বড় মায়ের মত লইয়াছ?

পার্বতী হাসিয়া বলিল—জী হাঁ। আমি যাইতে চাহি নাই। ভাবীজী ও মহীন্দরভাই বার বার বলিতেছিলেন। ভাবীজীই মাজীর কাছে অনুমতি লইয়া আসিয়াছেন।

হারাধন হাসিয়া বলিলেন—তাহা হইলে যাও, বেড়াইয়া এস।

একটা ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস চাপিলেন তিনি। মনে হইল, আহা! দুঃখী বেচারী! জীবনের সমস্ত আনন্দ হইতে সেই বালককাল হইতে বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে। যদি বেড়াইয়া সামান্য খানিকটা আনন্দ পায় পার্বতী, তাহা হইলে শাস্ত্র ও অনুশাসন যতই মুখভার করুক, এই বৃহৎ পৃথিবী তাহাতে বিন্দুমাত্র বিরক্ত হইবে না।

বলার সঙ্গে সঙ্গে পার্বতী যেন হারাধনের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া বাঁচিয়া গেল। সে হাসি মুখে বলিল—আমি তাহা হইলে আজ চলিলাম চাচাজী। আপনি যেন রাগ করিবেন না।

তাঁহার বিস্মিত সস্নেহ দৃষ্টির সম্মুখ দিয়া পার্বতী যেন আনন্দে উড়িয়া চলিয়া গেল। এ পার্বতীকে তিনি আর কখনও দেখিতে পান নাই।

আরও মাস কয়েক পরের কথা।

হারাধনের স্পষ্ট মনে আছে শীতের সময় তখন। সদ্য শীত পড়িয়াছে। রাত্রি তখন অনেকখানি। তিনি চৌকির উপর গায়ে ঘন করিয়া লেপ চাপা দিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। মেঝেতে চামাবিয়া ঘুমাইতেছে। এই সময় বাহিরের

দিকের দরজায় ক্রমাগত বেশ জোরে ধাক্কা উঠিতেছে শুনিয়া তিনি গাঢ় ঘুম হইতে জাগিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিলেন।

আবার শব্দ।

হারাধন বিছানা হইতে নামিয়া চামারিয়াকে ডাকিলেন। জোয়ান ছেলেটা সারাদিনের পরিশ্রমের পর সজোরে নাক ডাকাইয়া মড়ার মত ঘুমাইতেছে। তাহাকে ধাক্কা দিয়া ডাকিয়া হারাধন তুলিয়া দিলেন। ফিসফিস করিয়া বলিলেন—বাহিরে কেহ ডাকিতেছে।

চামারিয়া উঠিয়া পড়িল। হারাধন চৌকির নীচে হইতে কমানো হ্যারিকেনটি বাড়াইয়া দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

আবার শব্দ। এক সঙ্গে বেশ কয়েকবার ধাক্কা।

হারাধন দরজার খিলে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কে?

দরজার ওদিকে বাহির হইতে সাড়া আসিল—ভাইজী, জলদি খুলুন।

হারাধন নিজের কানকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। এ কাহার কণ্ঠস্বর? ছোট বহুরানী বাহিরে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে ডাকিতেছেন? একি সম্ভব?

হারাধন আবার প্রশ্ন করিলেন—কে? ছোট বহুরানী?

বাহির হইতে সাগ্রহ উত্তর আসিল—জী। জলদি খুলিয়ে।

হারাধন দরজা খুলিয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইতে কয়টি প্রাণী হুড়মুড় করিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়া আবার খিল দিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। দরজা খুলিয়া হারাধন যতটুকু দেখিয়াছিলেন তাহাতে বাড়ীর সামনে কাঁচা রাস্তার উপর একখানা বয়েল গাড়ীকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছিলেন।

হারাধনের অবাক দৃষ্টির সামনে ঘরে ঢুকিলেন চারজন। তিনজন স্ত্রীলোক, একজন পুরুষ। স্ত্রীলোক তিনজনের মধ্যে দুইজনের গায়ে চাদর জড়ানো। বাকী জনের মাথায় শুধু ঘোমটা। পুরুষটির একহাতে পাকা বাঁশের লাঠি, অন্য হাতে কাঁচের চৌকা লণ্ঠন। সামনের স্ত্রীলোকটি পিছন ফিরিয়া দরজা বন্ধ হইয়াছে এ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইয়া মুখের ঘোমটা ও চাদর সরাইয়া হারাধনের হাত নিজের দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন—ভাইজী সাহাব, আপনি আপনার পার্বতীয়াকে বাঁচান।

নিশীথ রাত্রিতে এক দুঃখী একক মানুষের নির্জন গৃহে এ কি নাটক! হারাধন স্তম্ভিত অবস্থা হইতে যেন খানিকটা সম্বিত ফিরিয়া পাইয়া প্রথমেই বলিলেন—আপনারা প্রথমে বসুন। আরাম করিয়া চৌকির উপর বসুন তো।

ছোট বহুরানী তখনও বিব্রত, বিশেষ ভয়ার্ত। তিনি বলিলেন—উহারা পার্বতীয়াকে খুন করিয়া ফেলিবে। আপনি তাহাকে বাঁচান।

হারাধন তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন—এই শহরে কাহাকেও খুন করা অত সহজ কাজ নয়। আপনি ভয় পাইবেন না। আগে আপনি চৌকিতে উঠিয়া বসুন তো। পার্বতী, তুইও বস মা।

তাঁহার কথায় ছোট বহুরানী যেন খানিকটা সাহস ফিবিয়া পাইলেন। তিনি চৌকিতে বসিয়া পাশের ঘোমটা-ঢাকা ও চাদর-মোড়া প্রাণীকে হাত ধরিয়া টানিয়া তাঁহার পাশে চৌকিতে বসাইলেন।

হারাধন কলসী হইতে লোটাতে জল আনিয়া তাঁহার হাতে দিয়া বলিলেন—পিজিয়ে।

নিজে খানিকটা জল খাইয়া, জলের লোটাটা পার্বতীর হাতে দিয়া তিনি একটা গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—ভাইজী, সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে। সব দিক দিয়া সর্বনাশ। যাহা ঘটিয়াছে তাহার ফলে ইজ্জৎ নষ্ট হইয়াছে, সম্পত্তি হইতে অধিকাব নষ্ট হইয়া যাইবে, সমাজে-সংসারে কোথায় দাঁড়াইব শেষ পর্যন্ত তাহাও জানি না। তাহাব উপর প্রাণ-সংশয়।

হাবাধন স্তম্ভিত বিমূঢ় দৃষ্টিতে ছোট বহুরানীর মুখের দিকে সভয়ে চাহিয়া রহিলেন। কোনো প্রশ্ন কবিতেও তাঁহার ভয় হইতে লাগিল।

ছোট বহুরানী আবার কম্পিত দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—ভাইজী, তাহাই যদি না হইবে, তাহা হইলে আমি এই জোয়ানী মেয়েকে সঙ্গে করিয়া রনৌরা হইতে এই মধ্য রাত্রিতে আরায় পৌছিয়া, নিজের বাড়ীতে না গিয়া তোমার কাছে ছুটিয়া আসিয়াছি কেন?

হারাধন এবার ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করিলেন—কি ঘটিয়াছে?

এতক্ষণ অনেক ক্লেশ, অনেক ভয় ও অনেক উদ্বেগের অন্তরালে যে মনস্তাপ আগ্নেয়গিরির গলিত পদার্থের মত চাপা ছিল তাহা বিপুল বলে সহসা বাহির হইয়া আসিল। ছোট বহুরানী প্রবল ক্ষোভে নিজের অলঙ্কারহীন শূন্য ভারী হাতে মাথায় ঘন ঘন আঘাত করিয়া বলিলেন—এই হইয়াছে, এই হইয়াছে, ভাইজী! আমার কপাল পুড়িয়াছে, মুখ পুড়িয়াছে, বুকের ভিতরটা এখনও জ্বলিতেছে। কি বলিব আপনাকে! বলিতেও কথা আটকাইয়া যাইতেছে। বহুত সরম কি বাত! এহি লেড়কি নিজের, নিজের মরা বাপের, নিজের বংশের, সকলের সর্বনাশ ঘটাইয়াছে।

হারাধনের বুকের ভিতরটা দুম দুম করিয়া উঠিল। ভয়ে, উদ্বেগে ও

ভবিষ্যতের আশঙ্কায়। তিনি ছোট বহুরানীর ওই এক কথায় সব বুঝিয়া গিয়াছেন।

তিনি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—এখন উপায় ?

সঙ্গে সঙ্গে চারিপাশে চাহিয়া দুই ভৃত্য ও এক দাসীকে দেখিয়া সতর্ক হইয়া বলিলেন—তোমরা একটু বাহিরে যাও, চামারিয়া, তুইও যা রে, আমি ছোট বহুরানীর কথা শুনি।

ছোট বহুরানী ধমক দিয়া বলিলেন—না, কাহাকেও বাহিরে যাইতে হইবে না। যা ঘটিবার তাহা ঘটিয়াছে এবং সে খবর আমার লোকেরা জানেই। আর আপনার নোকর, ও আজ না জানিলে কাল জানিবে। থাকুক। এখন শুনুন ভাইজী। আমি আপনার কাছে যে জন্য আসিয়াছি। আপনি পার্বতীকে বাঁচান। পার্বতী যদি আর কয়েক ঘণ্টা রনৌরা কি আরায় থাকে তাহা হইলে ওর মৃত্যু অবধারিত। আমার সতীন ও সৎ ছেলে পার্বতীকে কুলে কলঙ্ক দিবার অজুহাতে খুন করিবে। কোনোক্রমে তাহাদের মানানো যাইবে না। সেই জন্যই আমি উহাকে লইয়া পলাইয়া আসিয়াছি। পাছে জানাজানি হয়, পাছে আমার সতীন ও সতীনপো জানিতে পারে, সেইজন্য আমাদের নিজেদের বাড়ীতে উঠি নাই। আশ্রয় ও পরামর্শের জন্য সোজা আপনার কাছে আসিয়া উঠিয়াছি। এখন আপনি আপনার এই বেটী পার্বতীয়াকে বাঁচান। আপনি উহাকে হাতে করিয়া মানুষ করিয়াছেন। আজ উহার পিতাজী নাই। উহাকে আজ আপনি না বাঁচাইলে কে বাঁচাইবে ?

এই সময়ে চাদর ও ঘোমটার ভিতর হইতে পার্বতী একটা হাত বাহির করিয়া কি যেন ইঙ্গিত করিয়া চৌকির উপরেই টলিয়া পড়িয়া গেল। কথার মধ্যেই ঝি'টি যদি তাহাকে না ধরিত তাহা হইলে সে হয়তো চৌকি হইতে খোয়া-বাঁধানো মেঝেতেই পড়িয়া যাইত।

পার্বতী অজ্ঞান হইয়া গিয়াছে। ছোট বহুরানী কাঁদিয়া তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—হতভাগী কেন মরিয়া গেল না ? কেন বিধবা হইয়া বাঁচিয়া রহিল ?

তাহার পর হারাধনের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—রনৌরা হইতে আসিতে আসিতে পথেও একবার অজ্ঞান হইয়া গিয়াছিল।

হারাধন কিছু বলিবার আগেই চামারিয়া লোটা-ভর্তি জল লইয়া পার্বতীর মাথার কাছে দাঁড়াইয়া লোটাটি ছোট বহুরানীর হাতে দিতে গিয়াও দিল না। ছোট বহুরানী তখন কাঁদিতেছিলেন। চামারিয়া লোটা হইতে এক আঁজলা

জল লইয়া সজোরে পার্বতীর অনাবৃত মুখে একটা ঝাপটা দিল। সেই সঙ্গে সকলকে, এমন কি হারাধনকেও বিস্মিত করিয়া হা হা করিয়া কাঁদিতে লাগিল। একবার করিয়া সে পার্বতীর মুখের দিকে তাকায়, আর তাহার কান্নার বেগ দ্বিগুণিত হয়।

ঘরের সকলেই অবাক। পার্বতীও জ্ঞান ফিরিয়া পাইয়া চোখ মেলিয়া ওই আশ্চর্য অকল্পনীয় দৃশ্য দেখিয়া অবাক। সে কিছুক্ষণ নির্নিমেষ চোখে চামারিয়ার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া চোখ বন্ধ করিয়া শুইয়াই রহিল।

হারাধন তাহাকে বার দুই চুপ করিতে বলিলেন। কিন্তু তাহাতেও তাহার কান্নার বেগ বিন্দুমাত্র কমিল না দেখিয়া তিনি তাহাকে ধমক দিলেন—এই চামারিয়া, তুই চুপ কর। অমন করিয়া কাঁদে না।

তিনি চামারিয়া হাত হইতে জলের লোটাটা লইয়া বলিলেন—তুই ওই কোণে চুপ করিয়া বস। আর বেশী কাঁদিস না।

তাহার পর চামারিয়ার কান্নার কৈফিয়ৎ দিয়া বলিলেন—আপনার বোধ হয় মনে আছে, পার্বতীর যখন পাঁচ-ছয়-সাত বছর বয়স তখন প্রায় প্রতিদিন দিনের অনেকখানি সময় পার্বতী আমার কাছে থাকিত। তখন আমি আর চামারিয়া দুই জনে পার্বতীকে লইয়া সারাদিন ব্যস্ত থাকিতাম। পার্বতী আমার কাছে খাইত বলিয়া চামারিয়া কখনও আমার খাবার ছুঁইত না, কি পার্বতীকে নিজে হাতে কখনও খাইতে দিত না। চামারিয়া পার্বতীকে আমার চেয়ে কম ভালবাসিত না। তাই আজ তাহার কষ্ট দেখিয়া সে কাঁদিতেছে। তাহার কান্নার কোনো দোষ নাই।

ছোট বহুরানী এতক্ষণে নিজেকে খানিকটা সামলাইয়া লইয়াছেন। তিনি বলিলেন—কিন্তু ভাইজী, এখানে আপনার বাসায় তো আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করা ঠিক হইবে না।

হারাধন প্রশ্ন করিলেন—কেন? এত ভয় পাইতেছেন কেন?

ছোট বহুরানী বলিলেন—এখানেও বিপদ আছে। রনৌরাতে উহারা এতক্ষণে নিশ্চয় বুঝিয়াছে আমি পার্বতীয়াকে লইয়া পলাইয়াছি। উহারা কি ছাড়িয়া দিবে মনে করেন? উহারা জানার সঙ্গে সঙ্গে পিছনে পিছনে লোক পাঠাইয়া দিবে পার্বতীকে খুন করিবার জন্য।

হারাধন হাসিয়া বলিলেন—তা কি সম্ভব? ইংরেজের রাজত্বে খুন করা কি এতই সোজা? আপনি ইংরেজ সরকারকে জানেন না।

ছোট বহুরানী বলিলেন—আপনিও রাজপুতকে ঠিক জানেন না ভাইজী। রাজপুতের রক্ত গরম হইলে খুন তাহার মাথায় চড়িয়া যায়। তখন সে আর জ্ঞানের পরোয়া করে না। তখন নিজের মাথা হইতে খুন নামাইয়া তবে তাহার ছুটি।

হারাধন বলিলেন—তাহা হইলে এখন আপনি কি করিতে চান?

ছোট বহুরানী চুপ করিয়া রহিলেন।

তাঁহার মনটা ও মনের ভিতরের ভাবনাকে পরিষ্কার করিয়া দিবার জন্য হারাধন বলিলেন—আপনি তো বয়েল গাড়ীতে তিন চার ঘণ্টা আসিয়াছেন। এই তিন চার ঘণ্টায় নিশ্চয় অনেক কথাই ভাবিয়াছেন আপনি। কি ভাবিয়াছেন, কি করিতে চান, তাহাই পরিষ্কার করিয়া বলুন না।

ছোট বহুরানী তবু নীরব।

হারাধন বলিলেন—আপনি কি আবার পার্বতীকে আমার কাছে রাখিবার জন্য আনিয়াছেন?

এবার ছোট বহুরানী সঙ্গে সঙ্গে কথা বলিয়া উঠিলেন। বলিলেন—না, না। আপনার কাছে পার্বতীকে রাখিবার জন্য আমি উহাকে এখানে আনি নাই। এখানে পার্বতী থাকিলে তাহাকে উহারা যে ভাবেই হউক মারিয়া ফেলিবে। আরেঃ বাপ, আমার সতীন ও সতীনপোর সে কি রাগ পার্বতীর উপর!

তাহা হইলে আপনি কি চান?—হারাধন প্রশ্ন করিলেন।

ছোট বহুরানী বলিলেন—পার্বতীকে গোপনে কোথাও এখনি সরাইয়া না দিলে উহাকে বাঁচানো মুশকিল হইবে। উহাকে আরা হইতে সরাইয়া দিতে হইবে। এবং আজ রাত্রেই সরাইয়া দিতে হইবে।

হারাধন বলিলেন—সে রকম নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ আশ্রয় কোথায় আছে? কোথায় পাইব?

অকস্মাৎ তাঁহার মাথায় একটা কথা খেলিয়া গেল। তিনি ছোট বহুরানীকে বলিলেন—একটা কাজ তো আপনি অনায়াসে করিতে পারেন? আপনি পার্বতীকে লইয়া আপনার পিত্রালয় গয়ায় গিয়া থাকিতে পারেন?

শুনিয়া ছোট বহুরানী হারাধনের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া চোখ নামাইয়া লইলেন। তাহার পর বলিলেন—না, সে বেশ সুবিধা হইবে না।

হারাধন জিজ্ঞাসা করিলেন—কেন?

সঙ্গে সঙ্গে হাসিয়া বলিলেন—এ প্রশ্ন করিলাম বলিয়া অপরাধ লইবেন না।

আমি তো এক আপনার পিত্রালয় ছাড়া পার্বতীর নিরাপদ আশ্রয়ের কোনো ক্ষেত্র চোখের সামনে দেখিতে পাইতেছি না।

ছোট বহুরানী ধীরে ধীরে বলিলেন—আপনি রাজপুতের ইজ্জতের অভিমান জানেন না। যাহা ঘটিয়াছে তাহা আমার পিত্রালয়ে প্রকাশ পাইলে সেখানেও পার্বতীর আশ্রয় নিরাপদ থাকিবে না। এ অবস্থায় আমি জানিয়া শুনিয়া পার্বতীকে সেখানে কি করিয়া লইয়া যাইব? কন্যার ভাল ঘরে বিবাহ দিতে পারিবে না এই ভবিষ্যৎ ভাবিয়া রাজপুত বাপ কন্যাকে আঁতুড়ঘরে নুন দিয়া কন্যা হত্যা করিত একথা কি কখনও শোনেন নাই! সেই রাজপুত তো!

ছোট বহুরানী নীরব হইলেন। হারাধনও নীরব। ঘরে সকলের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যাইতেছে। এই মুহূর্তে সমাধানযোগ্য প্রশ্নটা যেন সকলের বুকের উপর ভারের মত চাপিয়া বসিয়াছে।

অকস্মাৎ সকলকে বিস্মিত ও চমকিত করিয়া ঘরের অন্ধকার কোণ হইতে চামারিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া ডাকিল—হুজুর।

সকলেই যেন নিজ নিজ ভাবনায় বিষন্নতায় নিমগ্ন ছিল। তাহারই মধ্যে চামারিয়ার ডাক শুনিয়া হারাধন চমকিয়া উঠিলেন। চাহিলেন চামারিয়ার দিকে। অদ্ভুত এক নাটক সৃষ্টি করিয়া জোড় হাতে চামারিয়া তাঁহার সামনে আগাইয়া আসিয়া আবার বলিল—হুজুর!

এই সমস্যার চাপানো স্তব্ধতার সম্মুখে চামারিয়ার এ ডাক একটা প্রক্ষিপ্ত ব্যাপাব যেন। তাই সেইভাবেই হারাধন তাহার সম্বোধনে কোনো গুরুত্ব আরোপ না করিয়া প্রশ্ন করিলেন—কিয়া রে চামারিয়া?

চামারিয়া বলিল, হাত জোড় করিয়া বিশেষ সম্ভ্রম সহকারেই বলিল—হুজুর, পার্বতীজীকি রহনে কো লিয়ে বহুত আচ্ছা জায়গা হ্যায়। হম ছিপা কর্কে রাখ দেঙ্গে উনকি। কোন তকলিফ হবে না দিদিজীর।

হারাধন অবাক। অবাক বহুরানী। অবাক বোধহয় পার্বতীও। সকলেই এই তুচ্ছ চাকরটার কথা শুনিয়া অবাক। বহুরানী চামারিয়ার কথাগুলি ধৃষ্টতা বিবেচনা করিয়া কঠিন দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আছেন। তাঁহার বোধ হয় মনে হইতেছে দুর্ভাগা পার্বতীর রূপ ও যৌবনের সহিত তাহার ভ্রষ্টতা যুক্ত করিয়া এই ধৃষ্ট মনে মনে তাহার সম্পর্কে লোলুপ হইয়া উঠিয়াছে। হারাধন বিস্মিত। চামারিয়ার মত নিরীহ, বিনীত একটি দীন মানুষ এত বড় একটা সাহসের ও স্পর্ধার কথা কি করিয়া বলিল? ও যে পার্বতীকে লুকাইয়া রাখার কথা বলিতেছে সে কোথায়, কাহার কাছে? শুনিয়া তাঁহার মনে এক

আশ্চর্য কৌতূহল হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—পার্বতীকে তুই কোথায় লুকাইয়া রাখিবি? এমন জায়গাই বা কোথায়? কে এমন মানুষ আছে যে তোকে ইহাতে সাহায্য করিবে?

চামারিয়া সোৎসাহে বলিল—তেমন লোক আছে হুজুর! তেমন জায়গাও আছে! রানীমাঈ হয় তো সে বাবুকে চিনিতেও পারেন।

ছোট বহুরানী বিস্মিত দৃষ্টিতে চামারিয়ার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার চোখের দৃষ্টি বলিতেছে—এই বোকা, বুদ্ধিহীন মূর্খটা মনের লোলুপতায় এ কোন প্রলাপ বকিতেছে!

হারাধন প্রশ্ন করিলেন—উনি তাহাকে চেনেন?

চামারিয়া বলিল—জী সরকার! উঁহার ছোট ভাইয়ের তিনি দোস্ত। তিনিও গয়ার আদমি। বহুত বড়া আদমির বেটা! গয়ার ত্রৈলোক্‌বাবু ওকীলের ছোট বেটা। নাম শিব্বা মহারাজ। শিউজীবাবু। তিনি লড়াইয়ে গিয়াছিলেন। বহুত দরাজ দীল। গয়া হইতে থোড়া দূরে ওঁর এক জঙ্গল আছে। আপনাদের হুকুম হইলে আমি দিদিজীকে সেখানে লুকাইয়া রাখিব। তামাম দুনিয়ায় কেহ জানিতে পারিবে না। আর শিব্বা মহারাজ জেনানাকে আপনা মাইজীর মত সম্মান করেন।

হারাধন ছোট বহুরানীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। তাঁহার মুখ হইতে এখন বিস্ময় অন্তর্হিত হইয়া সন্দেহ দেখা দিয়াছে। তিনি চামারিয়ার মুখের দিকে চাহিয়া কি ভাবিতেছেন। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন—ত্রৈলোক্‌বাবু ওকীলকে আমি চিনি। বহুত ভারী আদমি। ওঁর ছোট বেটাকে আমি আমার সাদীর আগে দেখিয়া থাকিব। তাহাকে ঠিক চিনি না।

এই কথাবার্তার মধ্যে বন্ধ দরজায় ঠুক ঠুক করিয়া টোকা পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কথা থামিয়া গেল। আবার ছোট্ট ছোট্ট আঘাত। ইঙ্গিতের মত।

হারাধন সতর্ক হইয়া দরজার কাছে আসিয়া বলিলেন—কে?

চাপা ফিস ফিস স্বরে আওয়াজ আসিল—আমি। বড়া মুনিমজী।

হারাধন সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলিয়া দিলেন। দরজা খুলিয়া দিতেই বড় মুনিমজী প্রবেশ করিলেন। সকলকে এক ঝলক দেখিয়া লইয়া তিনি হারাধনকে প্রশ্ন করিলেন—আপনি এখনও ইহাদের লইয়া 'গপ্' করিতেছেন? এখনও বাহির হইয়া পড়েন নাই? আর বিলম্ব করিবেন না, বাহির হউন।

হারাধন একটা নিঃশ্বাস ফেলিতে গিয়া যেন নিঃশ্বাস ফেলিতে পারিলেন না। নিঃশ্বাস রোধ করিয়াই প্রশ্ন করিলেন—কেন?

মুনিমজী চাপা গলায় বলিলেন—আপনি এখনও প্রশ্ন করিতেছেন 'কেন'? বনৌবা হইতে ইতিমধ্যে আরার বাড়ীতে ছোট বহুরানী ও পার্বতী মাঈয়ার খোঁজ করিতে লোক আসিয়া গিয়াছে। আরও শুনিলাম ইহাদের পিছনে পিছনে বিরুধা লোহার আসিতেছে।

বিরুধা লোহারের নাম শুনিয়া সকলেরই মুখ বিবর্ণ ও পাংশু হইয়া গেল। এখানে সকলেই তাহাকে জানে। সে একজন স্বভাবদুর্বৃত্ত। খুন, জখম, রাহাজানি কিছুতেই তাহার ভয় নাই। পার্বতীর পিতা স্বর্গত সুরিন্দর নারায়ণও তাহাকে এই জাতীয় কর্মে নিয়োগ কবিতেন। একে সে স্বভাবদুর্বৃত্ত, তাহার উপর তাহার বুদ্ধি-বিবেচনাও কম। সে একটা অন্ধ শক্তির মত। পিশাচসিদ্ধ তান্ত্রিকের হাতে তাহার বশীভূত প্রেতেব মত।

মুনিমজী বলিলেন—খবরটা নিয়া যে লোক আসিয়াছে তাহাকে ভুলাইবার জন্য বলিলাম, উহারা বোধহয় তোমাদের ভয়ে কোনো ঘুরপথে আসিতেছে। সেই জন্যই বিলম্ব। আর আরায় আসিলে তো এ বাড়ীতেই আসিবে। কাজেই উহারা এ বাড়ীতে পৌঁছানো পর্যন্ত অপেক্ষা কব। এই বলিয়া উহাদের আপাততঃ নিরস্ত ও শান্ত করিয়া এখানে আসিতেছি। আপনারা এখনি আরা ত্যাগ করুন। ভোর রাত্রিতে পাটনা যাইবার একটা ট্রেন আছে। সেই ট্রেন যে কোনো উপায়ে ধরুন। তাহাবও আর খুব বিলম্ব নাই। ট্রেনে উঠিয়া চিন্তা-ভাবনা যা করার করিবেন। এখানে আব অনর্থক বিলম্ব করিবেন না।

সকলে প্রায় কাঁপিতে কাঁপিতে বাড়ী হইতে বাহিব হইলেন। সেই শীতের রাত্রিতে আঁকাবাঁকা ঘুরপথে আরা স্টেশনে উপস্থিত হইয়া তবে কিঞ্চিৎ স্বস্তি। কিছুক্ষণ পরেই ট্রেন আসিল। সকলকে ট্রেনে তুলিয়া দিয়া মুনিমজী চলিয়া গেলেন। হারাধন, ছোট বহুরানী, পার্বতী, ঝি, চাকর ও সেইসঙ্গে চামারিয়াকে লইয়া যাত্রা করিলেন। প্রধান ভরসা এখন চামারিয়া।

ট্রেনে আলোচনা করিয়া একটা সিদ্ধান্ত লওয়া হইল। ছোট বহুরানী ঝি ও চাকর সমেত তাঁহার পিত্রালয়ে উঠিবেন। হারাধন পার্বতীকে লইয়া তীর্থযাত্রী হিসাবে পাণ্ডাদের গৃহে আশ্রয় লইবেন। চামারিয়া শিবাজীর সহিত দেখা করিতে যাইবে ও তাহার কাছে আশ্রয়ভিক্ষা করিবে। এদিকে বহুরানী ভাই জানকীলালের কাছে ও বাড়ীতে ত্রৈলোক্যবাবুর ছোট বেটা সম্পর্কে খোঁজখবর লইবেন।

তাহাই হইল। গয়া স্টেশনে নামিয়া সমস্ত দলটা তিন ভাগ হইয়া গেল।

চামারিয়া চলিয়া গেল শিবাজীর বাড়ী। হারাধন পার্বতীকে লইয়া বিষ্ণু মন্দিরের দিকে চলিলেন। তিনি আসিয়া সময়মত ছোট বহুরানীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। বহুরানী বাকী লোকজন লইয়া বাবু সুরিন্দর নারায়ণের পত্নীর উপযুক্ত গৌরবে পিত্রালয়ের দিকে রওনা হইলেন।

পিত্রালয়ে কোনো সংবাদ না দিয়া পৌঁছানো বিস্ময় ও আনন্দ দুইয়েরই কারণ হইল। গৃহে তখনও তাঁহার বৃদ্ধ পিতা ও মাতা জীবিত। কাজেই সমাদরের কোথাও কমতি নাই। বাবাকেই ঘুরাইয়া তিনি প্রথম প্রশ্ন করিলেন—আপনি ত্রৈলোক্‌বাবুকে তো ভালই চিনিতেন? ত্রৈলোক্‌বাবু কেমন মানুষ ছিলেন বাবা?

এক মুহূর্তে প্রশংসায় শতমুখ হইয়া বৃদ্ধ পিতা বলিলেন—আরে বাপ্‌রে বাপ, উ তো সাধু মহাত্‌মা আদমী! একালের গয়াকে যাঁহারা বানাইয়াছেন ত্রৈলোক্‌বাবু তাঁহাদের একজন।

—তাঁহার ছেলেরা সব কেমন?

পাকা বিষয়ী পিতা অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তুই ত্রৈলোক্‌বাবুর ছেলেদের খবর লইতেছিস কেন?

বিষয়ী মানুষের কন্যা, বিষয়ী মানুষের স্ত্রী, সারাজীবন বিষয়-আশয়ের মধ্যে কাটাইয়াছেন। একটা প্রয়োজনীয় মিথ্যা খুব সহজেই উচ্চারণ করিতে পারিলেন তিনি। খুব সহজেই বলিলেন—ট্রেনে আসিবার সময় ত্রৈলোক্‌বাবুর ছোট লেড়কার সহিত আলাপ হইল। সে কেমন লোক বাবা?

বাবা হাসিয়া বলিলেন—কে শিব্বা? শিবাজী? ও তো আমাদের জান্‌কীলালের সহিত লেখাপড়া করিত। লেখাপড়া বিশেষ খুব হয় নাই। তবে ত্রৈলোক্‌বাবুর চার লেড়কার মধ্যে লেখাপড়া না শিখিলেও শিব্বা বহত সাচ্চা আদমী। বাপের মত। বোধহয় বাপের চেয়েও বেশী। তবে মাথায় কিছু ছিট আছে। ছিট আছে বলিয়াই আদমী হিসাবে আরও সাচ্চা। লড়াইয়ে গিয়াছিল। মেসোপটেমিয়ায়। লড়াই হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। এখন কাঠের ব্যবসা করিতেছে। কিন্তু টাকার উপর উহার কোনো নেশা নাই। বোকাও আছে। সেদিন দেখা হইলে বলিলাম—শিব্বা, লড়াই তো করিলে, এবার সাদী কর। তা আমাকে বলে, নহি চাচাজী, হম এক ফৌজ বনায়েঙ্গে শিউজী মহারাজকে মাফিক। সাদী নহি করনা! আমি জানকীকেও জিজ্ঞাসা করিয়াছি। সে বলে—রূপয়া আর জেনানা দুই-ই শিব্বাকে দিয়া আপনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন। চাহিবামাত্র আপনি ঠিক ঠিক ফেরৎ পাইবেন।

ছোট বহুরানী হাসিয়া বলিলেন—উ বাচ্চা থোড়া পাগল ভি হোগা। তব মালুম হোতা কি বহত সাচ্চা আদমী।

তিনি নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। ইহার চেয়ে আচ্ছা আশ্রয় আর কোথায় মিলিবে ?

দুপহরের দিকে হারাধন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তিনি তাঁহাকে সব বলিয়া তাঁহাকে নিশ্চিন্ত করিলেন। ছোট বহুরানীর কাছে সব শুনিয়া যখন তাঁহাদের পক্ষের দুশ্চিন্তা সব মিটিল তখন তাঁহারা চামারিয়ার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

চামারিয়া ছোট বহুরানীর কাছে আসিল সন্ধ্যাবেলায়। হারাধন তখনও উপস্থিত ছিলেন। চামারিয়া বলিল—উনি রাজী হইয়াছেন। সব শুনিয়া বলিয়াছেন—ঠিক আছে। আমি কাল বয়েল গাড়ী ঠিক করিয়া রাখিব। তুই উহাকে লইয়া সোজা জঙ্গলে চলিয়া যা। আমি দুই দিন পরে গিয়া থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিব। তবে একটা কথা আমাকে সাচ্‌মুচ্‌ বল। আমি কোনো পুলিশের হুজ্জুতিতে পড়িব না তো ?

ছোট বহুরানী একটা আশ্চর্য কথা বলিলেন—তোকে যদি কেহ কোনোদিন পার্বতীর সঙ্গে তোর কি সম্পর্ক এ কথা জিজ্ঞাসা করে তাহা হইলে তুই পরিষ্কার বলিবি পার্বতী আমার স্ত্রী। দুসাদের মেয়ে। উহার সহিত আমার সাগাই হইয়াছে।

শুনিয়া চামারিয়ার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে সঙ্গে সঙ্গে দুই কানে আঙুল দিয়া মুখটা অতি তিক্ত করিয়া জবাব দিল—সীয়ারাম ! সীয়ারাম ! আরে রাম, রাম ! ই আপ কিয়া বোলিন মাঈজী ? উ তো মেরা বেটিকে মাফিক হ্যায়। হম সব কৌইকো বলেগা উ হমারা বেটি লাগতি হ্যায়।

সেদিন ছোট বহুরানী চামারিয়ার হাতে হারাধনের সম্মুখে একটি চটের ঝোলা তুলিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন—ইহার মধ্যে পার্বতীয়ার গহনা আছে। উহার কোনো জরুরৎ হইলে খরচ করিবি। উহার বাচ্চা হইলে তাহাকে মারিস না। তাহাকে মানুষ করিবি। পার্বতীয়ার কোল জুড়িয়া তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিবি।

তাহার পর আপন মনেই যেন বলিয়াছিলেন—এ এক দিক দিয়া ভালই হইয়াছে। ভালবাসিবার জন্য পার্বতী একটা বাচ্চা তো পাইবে।

বাইশ

আমি ডাইরী প্রায় শেষ করলাম। এর পর একটা পৃষ্ঠা খালি। পরের পৃষ্ঠা থেকে আবার লেখা। এবার আমাকেই উদ্দেশ করে মামা লিখেছেন। আমি ডাইরীটা উল্টে রেখে একবার জানলা খুলে বাইরের দিকে চাইলাম। ভেবেছিলাম রাত্রি শেষ হয়ে এসেছে। কিন্তু জানলা দিয়ে দেখলাম তখনও বনস্থলী ঘন অন্ধকার। বড় বড় শিরীষ গাছের ফাঁক দিয়ে আকাশের যেটুকু অংশ নজরে পড়ল তাতে দেখতে পেলাম সপ্তর্ষিমণ্ডল তখনও অস্ত যায় নাই। নিকষ কালো আকাশে তখনও অসংখ্য তারা ভাস্বর হয়ে জ্বল জ্বল করছে। ঠাণ্ডা রয়েছে সেই সঙ্গে। হিমেল বাতাস ঘরে ঢুকছিল। জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে আবার ডাইরীটা নিয়ে বসলাম।

মামা লিখেছেন—

"চন্দ্রশেখর, তুমি পড়িবে বলিয়াই আমি এ ডাইরী লিখিয়াছি। হারাধনবাবু মধ্যে মধ্যে গোপনে গয়া আসিয়া চামারিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পার্বতীর সমস্ত সংবাদ লইয়া যাইতেন। এখানে চামারিয়ার সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলা প্রয়োজন। চামারিয়া জাতিতে দুসাদ কি মুসহর। তাহাকে লইয়া কেহ মাথা ঘামায় না; মাথা ঘামাইবার কারণও দেখে না;—সে এতই তুচ্ছ ব্যক্তি। কিন্তু তাহার মত বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান মানুষ সংসারে দুর্লভ। সে আজ দশ-এগারো বৎসর ধরিয়া পার্বতীর সমস্ত দায়িত্ব হাসিমুখে বহন করিয়া আসিতেছে। কোনো প্রতিদানের প্রত্যাশা করে নাই। শুধু পিতার মত উহাদের রক্ষা করিয়াছে মাত্র। এ ধরনের মানুষ কি সভ্য সমাজে গণ্ডায় গণ্ডায় পাওয়া যাইবে?

চন্দ্রশেখর, তুমি একদা নরা সম্পর্কে আমাকে শিবাজীকে সতর্ক করিয়া দিবার কথা বলিয়াছিলে। তোমার বোধহয় স্মরণ আছে, আমি তোমার কথায় স্পষ্টতঃই বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলাম—অতিরিক্ত গল্প-উপন্যাস পড়িয়া তোমার বুদ্ধির গোলমাল হইয়াছে। তুমি শিবাজীকে এত দেখা সত্ত্বেও ঠিকমত চিনিলে না! শিবাজীকে চেনা ও বুঝা খুবই সহজ। খুব বেশী সহজ বলিয়াই তোমরা ওকে দেখিয়াও চিনিতে পারিলে না।

তুমি কি জান চন্দ্রশেখর, শিবাজী কি প্রকারের মানুষ? আজ দশ বৎসর সে পার্বতীকে অরণ্য মধ্যে আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছে, অথচ আজও পর্যন্ত তাহার

সহিত ভাল করিয়া কথা বলে না। তাহাকে ফুফাজী বলিয়া সম্বোধন করে। তাহার কন্যা সুরস্মৃতিয়াকে আদরে আদরে ভরাইয়া রাখে। তাহাকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্যই সে মাতা ও কন্যা দুইজনকে আমার কাছে রাখিবার প্রস্তাব করিয়াছে। অথচ ইহাতে তাহার বিন্দুমাত্র স্বার্থ জড়িত নাই।

চামারিয়া যেদিন তাহার কাছে পার্বতীর জন্য আশ্রয় চাহিয়াছিল সেদিন, তখন তাহার কত বয়স? তখন সদ্য যৌবন। সে তো কই এ সম্পর্কে একবারও চিন্তা করে নাই। আশ্রয় দেওয়া উচিত হইবে কি না ইহা লইয়া এক মুহূর্ত ভাবে নাই। অথচ আমি সেই ঘটনার দশ বৎসর পরে, তাহার চেয়ে দশ বৎসরের বেশী বড় হইয়াও ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না পার্বতী ও তাহার মেয়েকে আশ্রয় দিব কি না।

আমার অস্থিরচিত্ততা কিছুতেই যাইতেছিল না। স্থির করিতে পারিতেছিলাম না কি করিব। ইতিমধ্যে একদিন হারাধনবাবু আমার কাছে আসিয়া, ইহার পূর্বে যাহা বর্ণনা করিলাম তাহা সবিস্তারে বলিয়া, পার্বতী ও সুরস্মৃতিয়ার জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করিয়া গেলেন। তাঁহার মুখে যাবতীয় ঘটনা শুনিয়া আমি উহাদের আশ্রয় দিতে প্রতিশ্রুত হইলাম। এবং তাঁহাকে বলিলাম—আপনি মধ্যে মধ্যে আসিয়া উহাদের দেখিয়া যাইবেন। তাহাতে আমি সুখীই হইব।

হারাধন হৃষ্টমনে চলিয়া গেলেন।

তাহার কয়েক দিনের মধ্যেই শিবাজী আসিয়া হাজির হইল। আমি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। শিবাজী আমাকে অনুরোধ করিবার সঙ্গে সঙ্গে আমি তাহার প্রস্তাবে রাজী হইতে পারি নাই, এজন্য আমার মনে কিঞ্চিৎ দুঃখ ছিল। মধ্যে হারাধনবাবুর সহিত কথা বলিয়া সব জানিয়া একটা কথাই আমার বেশী করিয়া মনে হইতে লাগিল, শিবাজী কী উদার ও শুভ্র চরিত্রের পুরুষ! সে আসিতেই আমি সানন্দে নিজে হইতেই বলিলাম—শিব্বা, আমি তোমার ফুফাজী পার্বতীয়া ও তাহার কন্যাকে আমার কাছে রাখিব। তুমি তাহাদের লইয়া আইস।

শিবাজী মহা খুশী। সে সঙ্গে সঙ্গে আমার পা জড়াইয়া ধরিয়া পরমোৎসাহে বালকের মত আনন্দের প্রলাপ বকিতে লাগিল—এমন কথা আমার দাদোজী ছাড়া আর সংসারে কে বলিতে পারে? এমন দীল-ই বা কয়জনের আছে? ইত্যাকার কথা। আর তাহার মাঝখানে যেখানে সেখানে তাহার মুদ্রাদোষ-জনিত অজস্র 'খুনি'র প্রয়োগ। বহু কষ্টেই তাহার বালকীয় উল্লাসকে সংযত করিলাম।

তাহার পর হারাধন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মুখে যে কাহিনী শুনিয়াছিলাম তাহা তাহাকে বলিতে লাগিলাম। শিবাজীর চরিত্র যেমন বিচিত্র, তাহার মনের গতি-প্রকৃতিও তেমনি বিচিত্র। আমার কথা কিছুক্ষণ শুনিতে শুনিতে সে মধ্যে মধ্যে চঞ্চল হইয়া উঠিতে উঠিতে শেষ পর্যন্ত অধৈর্য হইয়া হাসিতে লাগিল। আমি কিঞ্চিৎ রুষ্ট হইয়া বলিলাম—তুমি হাসিতেছ কেন?

সে হাসিয়া বলিল—ওসব আমি শুনিয়া কি করিব? আর আমি ওসব খবর মোটামুটি জানি। আমার ভৃত্য ও ফুফাজীদের রক্ষক চামাবিয়ার মুখে কিছু কিছু শুনিয়াছি। ওসব শুনিয়া কি লাভ? আমাব ওসব কাহিনীতে কি যায় আসে? একটি দুঃখী, ভাগ্যতাড়িতা অভিজাত ঘরের কন্যাকে আমার অধিকারেব সীমানার মধ্যে আশ্রয় দিযাছি। সে যাহাতে নিরাপদে ও নিশ্চিন্ত-ভাবে আমার আশ্রয়ে, আমার মায়ের মত ভগ্নীর মত থাকিতে পারে তাহাই দেখা আমার কাজ। আমি সেইটুকুই চেষ্টা কবি। তাহার বাহিরে তাহার জীবনের কথা শুনিয়া লাভ কি? ফুফাজীর দুঃখের কাহিনী যখন শুনিয়াছিলাম তখন তাহার ভাই দলীপ সিংহের উপর সাময়িকভাবে খুব ক্রোধ হইয়াছিল। তখন কিছুদিন কেবল মনে হইত, ব্যাটাকে যদি কোনোক্রমে হাতের কাছে পাই তাহা হইলে প্রহার করিয়া ব্যাটাকে কিছু শিক্ষা দিই। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আমার সে সখ ও সে রাগ চলিয়া গেল। তখন এ কথা মনে পড়িলে হাসিও আসিত দুঃখও হইত। হাসি আসিত এইজন্য যে এ ধরনের সুযোগ আমার কাছে কখনও আসিবে না। সে একজন ধনী, অভিজাত ব্যক্তি, আপনার বিষয়-সম্পত্তি-ঐশ্বর্য লইয়া তাহার মধ্যে সে নিজের সুখেই আছে। আমার হাতে প্রহার খাইবার জন্য সে আমার সম্মুখে আসিবে কেন? আর দুঃখ হইত এইজন্য যে পৃথিবীর সমস্ত দুর্বৃত্তকে শাসন করিবার শক্তি আমার নাই। থাকিলে বড়ই ভাল হইত। যদি থাকিত তাহা হইলে শয়তানগুলাকে এলোপাথাড়ি ঘুঁসি চালাইয়া শায়েস্তা করিয়া দিতাম। ফুফাজীর দুঃখের জীবনের কথা শুনিয়া তাহার দুঃখের আসল কারণ কে তাহা অনুমান করিবার চেষ্টা করিতাম। যে তাহার এই দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী তাহাকে হাতের কাছে পাইলে আমি নিশ্চয়ই তাহার ঘাড়টা মটকাইয়া ফুফাজীর পায়ের কাছে নত করিয়া দিয়া তাহাকে ফুফাজীকে আবার আইনসঙ্গতভাবে বিবাহ করিতে বাধ্য করিতাম। কিন্তু জানেন দাদোজী, ওইসব কথা চিন্তা করিতে আমার খুব ভাল লাগে না। তাই ভাবি না। আমার মনে হয়, এই পৃথিবীতে মানুষে মানুষে কোনো ভেদ থাকিবে না, সবাই ভরপেট খাইতে পাইবে, আনন্দে থাকিবে, হৈ হৈ

করিয়া জীবনে পথ চলিবে, কেহ কাহারও অনিষ্ট করিবে না, কাহারও উপার্জিত অন্নে কেহ ভাগ বসাইবে না। অন্নের ভাগ যদি দিতে হয়, মানুষ নিজেই হাসিমুখে তাহা অন্যকে দিবে। যদি কেহ কাহারও কিছু কাড়িয়া খাইতে চায়, তবে আশপাশের মানুষ সেই কাড়িয়া লইবার জন্য উদ্যত হাতখানা সজোরে ভাঙিয়া দিবে। আর আমার মনে হয়, সেই সময় আমি সেখানে থাকিলে সবচেয়ে সেরা ব্যাপার হয়। আমিই সেই ভাঙার কাজটা, শাস্তি দিবার কাজটা নিজে হাতে করিতে পারি।

বলিয়া শিব্বা হা হা করিয়া অট্টহাস্য করিতে লাগিল। হাসিতে হাসিতে বলিল —এইসব ক্ষেত্রে প্রাণ ভরিয়া ঘুঁসি চালাইতে আমার ভারী আনন্দ। কিন্তু সে রকম প্রহার আমি দুই-একবারের বেশী দিবার সুযোগ পাই নাই।

বলিয়া শিব্বা, আমার শিব্বা আবার হা হা করিয়া হাসিতে লাগিল।

চন্দ্রশেখর, এই শিবাজী। শিবাজী এত সহজ, সরল ও উদার বলিয়াই তাহাকে চিনিতে তোমাদের এত অসুবিধা ও কষ্ট। এসব তোমরা বিশ্বাসই করিতে পার না।

যাই হোক, পার্বতী এবং তাহার কন্যা সুরস্বতিয়া আমার কাছে আসিয়া বাস করিতে লাগিল। আমি ও শিবাজী দুইজনে মিলিয়া সুরস্বতিয়াকে স্কুলে ভর্তি করিয়া দিলাম।

সাড়ে তিন মাস চার মাসের মাথায় হারাধনবাবু আবার আসিলেন উহাদের দেখিতে, আমার বাড়ীতে। আমি তাঁহাকে আদরের সহিত গ্রহণ করিলাম। সেদিন রাত্রিতে পার্বতী ও সুরস্বতিয়া শুইয়া পড়িলে হারাধনের সহিত নিরিবিলি আলাপের মধ্যে তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম—আচ্ছা, একটা কথা কিছুতেই আমার ভাবনায় ধরা পড়িতেছে না। আপনি পার্বতীর জন্ম হইতে সেদিন পর্যন্ত জীবনের যে কাহিনী বলিলেন তাহার মধ্যে যেন কিছু স্ব-বিরোধিতা আছে। সেই কথা আমাকে পরিষ্কার বুঝাইয়া বলিতে পারেন?

হারাধন আমার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন—বলুন!

আমি প্রশ্ন করিলাম—আপনি বলিয়াছিলেন, সুরিন্দর নারায়ণের প্রথমা স্ত্রী ও তাঁহার পুত্র দলীপ সিংহ তো পার্বতীকে প্রথম হইতেই গভীর মমতার সঙ্গে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারাই আবার ওই বাচ্চা মেয়েটাকে খুন করিবার জন্য খুনীর মত উগ্র হইয়া উঠিলেন কেন? ইহার কারণ কি?

হারাধন হাসিতে লাগিলেন। হাসিয়া ঘাড় দোলাইতে দোলাইতে বলিলেন—

জানেন, আমি নিজেকে মস্ত বুদ্ধিমান বলিয়া মনে করিতাম। জীবনে চতুরতা, অসততা, মিথ্যাচার ও ভ্রষ্টতা যথেষ্ট পরিমাণ দেখিয়া তাহাকে প্রতিরোধ করিবার বুদ্ধির প্রভূত চর্চা করিয়াছি। চর্চা করিয়া মনে হইয়াছে আমি সমস্ত শ্রেণীর বুদ্ধির শয়তানিকে প্রতিরোধ করিবার শক্তি রাখি। কিন্তু সুরিন্দর নারায়ণের প্রথমা পত্নীর সহিত দ্বন্দ্বে নামিয়া ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে আমার চেয়েও দুষ্টবুদ্ধি ও দুরভিসন্ধিসম্পন্ন মানুষ সংসারে থাকিতে পারে। আমার সহিত সাক্ষাতের প্রথম দিনেই আমার সহিত তাঁহাদের যে সংঘর্ষ হইয়াছিল তাহা হইতেই শত্রুপক্ষ নিজের যুদ্ধ-পদ্ধতি একদিনে বদল করিয়া লইয়াছিলেন। মনের ভিতরে পার্বতী ও সুরিন্দর নারায়ণের দ্বিতীয়া স্ত্রীর উপর প্রবল প্রতিহিংসা গোপন রাখিয়া তাঁহারা সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিলেন এবং সেই সুযোগ সুরিন্দর নারায়ণের প্রথমা পত্নী বিশেষ চিন্তা সহকারে দিনে দিনে ধীরে ধীরে রচনা করিয়াছিলেন। পনরো-ষোলো বছরের একটি বিধবা কন্যার সম্মুখে অতি দুর্লভ লোভনীয় সামগ্রীর মত তিনি দলীপ সিংহের রূপবান শ্যালককে স্থাপন করিয়া ঘটনাটি ঘটাইয়া দিলেন। আমার বদ্ধ ধারণা, এ ব্যাপারে তাঁহারা সকলেই উদ্যোগী ছিলেন এবং ওই অবোধ, দুঃখী বালিকাটিকে অপরাধের আগুন স্পর্শ করিতে প্রলুব্ধ করিয়াছিলেন ও উৎসাহ দিয়াছিলেন।

শুনিয়া আমি চুপ করিয়া গিয়াছিলাম। তাঁহাকে আর কোনো প্রশ্ন করি নাই। তাঁহার এই উত্তর আমার নিকট মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্যই মনে হইয়াছিল। বুঝিয়াছিলাম এই অপরাধের ভয় দেখাইয়া পার্বতী ও তাঁহার অভিভাবিকা ছোট বহুরানীকে তাঁহাদের অধিকারের সীমা হইতে তাড়ানোই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল।

চন্দ্রশেখর, এ বিষয়ে তোমাকে আমার মাত্র আর একটি কথা বলার আছে। চামারিয়ার অভিভাবকত্বে ও শিবাজীর পৃষ্ঠপোষকতায় যে ছয় সাত আট বৎসর পার্বতী গয়ার জঙ্গলের সংগোপনতায় দীন দরিদ্র ঝোপড়ির মধ্যে বাস করিয়াছিল তাহার কোনো সংবাদ আমি জানি না। তবে আমি অভ্রান্তভাবে অনুমান করিতে পারি যে, ওই কয় বৎসর সেখানে তাহার গভীর স্বস্তির মধ্যেই কাটিয়াছিল। ইহার অধিক আমি আর কিছু জানি না। তবে এটা অনুমান করিতে পারি তাহার অন্তরের সদ্য-মুকুলিত প্রেম যাহা তাহার দেহের মধ্যে ফলের মত দিনে দিনে একই সঙ্গে তাহার প্রাণের ইচ্ছার বিরোধী ও অনুগত হইয়া অনিবার্যভাবে বাড়িয়া উঠিতেছিল তাহা মনের মধ্যে প্রবল একটা মার খাইয়াছিল। সেই প্রহারের ফলে সে তাহার সব প্রবৃত্তি, বাসনা ও ইচ্ছার

উপর তাহার মুখের ঘোমটার মত একটা আবরণ ফেলিয়া দিয়াছিল। তাহার ভিতরে কি ঘটিতেছে তাহা সে আর দ্বিতীয় কাহাকেও জানিতে দেয় নাই। আমি গম্ভীর স্নেহ ও সমাদরের সহিত তাহাকে গ্রহণ করিলেও আমাকেও সে কোনোদিন জানিতে দেয় নাই। আমার ধারণা সে তাহার প্রেমকে দিনে দিনে তিলে তিলে অপরাধ জ্ঞান করিয়া হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছে।

আমার কাছে পার্বতী যখন তাহার কন্যাকে লইয়া বাস করিতে আসে আমারও তখন তাহাকে প্রথম প্রথম দেখিয়া ইহাই মনে হইত। কিন্তু কিছু দিন যাইতে যাইতেই আমার সে ধারণা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইতে লাগিল। সাপের একটা খোলস তাহার অঙ্গ হইতে খসিয়া যাইবার পর যেমন তাহার অঙ্গে আবার নূতন ত্বক জন্মলাভ করে, অনুভব করিলাম পার্বতীর মনেও যেন প্রেম ও আসক্তির একটা নূতন ত্বক গজাইয়াছে। আমার বয়স হইয়াছে, নিজেও কখনও কোনো স্ত্রীলোককে ভালবাসা হয় নাই এবং কাহারও ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যেও আসি নাই কখনও। তাই আমি স্ত্রীলোকের মনের সুকুমার যে দিকটি, যাহা তাহারা সর্বদা গোপনতার দ্বারা আবৃত রাখে, সে-দিকটির সঠিক সংবাদ জানি না। কিন্তু পার্বতী এখানে আসার পর হইতে আমার নিকট লজ্জা ও সংকোচের দূরত্ব যেমন কমিতে লাগিল, যেমন তাহার মাথার ঘোমটা হ্রাস পাইতেছিল, তেমনি আমি যেন কেমন করিয়া তাহার মনের গোপন খবরও একটু একটু করিয়া পাইতে লাগিলাম।

পার্বতী এমনিই বড় শান্ত ও গম্ভীর স্বভাবের মেয়ে। তাহার উপর দুর্ভাগ্যের পীড়নে সে আরও শান্ত, আরও গোপনতাপ্রিয় হইয়া গিয়াছে। তাহার মুখে হাসি, মনে আনন্দ কদাচিৎ দেখিয়াছি। কিছুদিন সে তাহার কন্যাকে লইয়া আমার গৃহে থাকিতেই আমি একটা বিচিত্র ব্যাপার লক্ষ্য করিলাম। ইহারই মধ্যে মাঝে মাঝে সে এক-আধদিন যেন কিঞ্চিৎ সজীব এবং হয়তো বা উৎফুল্ল হইয়া উঠিত। দেখিয়া আমার ভাল লাগিত। আমি আমার কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে তাহাকে লক্ষ্য করিতাম।

তাহার পর একদিন ইহার কারণ আমার কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিল। শিবাজী পার্বতী ও সুরসুতিয়াকে আমার কাছে রাখিয়া যাইবার সময়, আমার অনুমতি লইয়াই, চামারিয়াকে আমার কাছে রাখিয়া গিয়াছিল। সে আমার বাড়ীর ফাইফরমাস খাটিত, আমার সংসার সচল রাখিত। আবার আমার প্রয়োজনে দেহাতে গিয়া আমার জমিজমাও দেখিয়া আসিত।

একদিন লক্ষ্য করিলাম, পার্বতী মাথার ঘোমটা খাটো করিয়া চামারিয়াকে সকাল

বেলাতেই কি যেন ফরমাস করিতেছে। দেখিয়া আমার কৌতূহল হইল। পার্বতী অমন হাসিমুখে চামারিয়াকে কি নির্দেশ দিতেছে? ফরমাস করিয়া পার্বতী রান্নাঘরে ঢুকিয়া গেলে আমি পথে বাহির হইয়া গেলাম। এবং চামারিয়ার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে চামারিয়া বাড়ীর ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিলে অত্যন্ত সহজভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম—কি রে চামারিয়া, কোথায় চলিলি?

সদা-সঙ্কুচিত, সদা-লজ্জিত ও সদা-বিনীত চামারিয়া প্রায় হাত জোড় করিয়া বলিল—মছলি কিনিতে।

—মছলি? আমি অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম।

চামারিয়া আরও সংকুচিত হইয়া বলিল—হাঁ, মছলি।

আমি আর কোনো প্রশ্ন করিলাম না। আমি নিজে মাছ খাইলেও মাছ খুব একটা পছন্দ করি না। পার্বতী তো বিধবা। সে মাছ খায় না। আর বাকী সুরস্থতিয়া। তাহারও খাইবার বড় একটা জ্বালা নাই। মাছের জন্যও তাহার খুব একটা মাথাব্যথা নাই। আর চামারিয়ার ভাবনা কে ভাবে! তাহারা আবার কে কবে মাছ খায়? তাই পার্বতীর মাছ কিনিতে দেওয়া লইয়া আমার কিঞ্চিৎ আশ্চর্যই লাগিল।

দুপুর বেলা খাইতে বসিয়া ব্যাপারটা আমার কাছে অকস্মাৎ পরিষ্কার হইয়া গেল। সেদিন দুপুরের কিছু আগে শিবাজী আমার বাড়ীতে আসিয়া হাজির হইল। শিবাজীর সেদিন আসিবার কথা ছিল। কিন্তু সেকথাটা আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

শিবাজী আসিয়াই এক দফা সুরস্থতিয়াকে লইয়া হৈ হৈ করিল। তাহাকে কোলে লইল। তাহাকে মাথায় চাপাইয়া হৈ হৈ করিয়া নাচিয়া, ঘুরাইয়া নামাইয়া দিল। তাহার পর আমার সহিত বসিয়া অনেকক্ষণ গল্প করিল। হা হা করিয়া হাসিল। উহার চোখের সামনে বা আড়ালে কি ঘটিল তাহা ফিরিয়াও দেখিল না।

ওদিকে তাহার চোখের আড়ালে মায়ে আর কন্যায় নিঃশব্দ কলহ হইতেছিল। শিবাজীর সহিত কথা বলিতে বলিতে আমি তাহা লক্ষ্য করিলাম। শিবাজী আসিয়াছে বলিয়া সুরস্থতিয়া সেদিন ইস্কুলে যাইতে চাহে নাই। কিন্তু পার্বতী জোর করিয়া নিঃশব্দ ধমক দিয়া তাহাকে স্নান করাইয়া, ভাত খাওয়াইয়া, চামারিয়ার হাত ধরিয়া ইস্কুলে পাঠাইয়া দিল। চোখের জল মুছিতে মুছিতে সুরস্থতিয়া ইস্কুলে গেল।

এদিকে শিবাজীর গল্পের শেষ নাই। আমার সহিত সে মনের আনন্দে গল্প করিতেছিল। এক সময় চামারিয়া আসিয়া তাগিদ দিল—হুজুর, বেলা হইয়াছে। স্নান করুন।

স্নান করিয়া আমরা দুইজনে বারান্দায় সামনাসামনি খাইতে বসিলাম। খাইতে বসিয়া মাছের রহস্য আমার কাছে পরিষ্কার হইল। বুঝিলাম শিবাজী আসিবে বলিয়াই পার্বতী অত সকালে চামারিয়াকে মাছ কিনিতে পাঠাইয়াছিল।

সেদিন আমার চোখের উপর হইতে একটা পর্দা যেন উঠিয়া গেল। ইহার পর আমি সকৌতুক দৃষ্টিতে পার্বতীর কাজকর্ম নিঃশব্দভাবে লক্ষ্য করিয়াছি। দেখিয়াছি শিবাজী এ বাড়ীতে আসিলে, দশ দিন, পনর দিন, কি বিশ দিন অন্তর আসিলে, পার্বতী কি বিপুল পরিমাণে খুশী হয়। সে অবশ্য হাজার চেষ্টা করিয়া নিজের মনের খুশীটিকে চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা করে। কিন্তু আমি দেখিতে পাই, তাহার ঘোমটা তাহার লজ্জার অন্তরাল হইতে সে খুশী ক্রমাগত ঠিকরাইয়া ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। পার্বতী বুঝিতে পারে না। কিন্তু আমি বুঝিতে পারি। আমার ভালও লাগে, আবার কেমন লজ্জাও বোধ হয়।

আবার দুঃখও হয়। আমি জানি ইহার কোনো পরিণাম নাই। শিবাজী যদি ভিন্ন ধরনের মানুষ হইত তাহা হইলে কথা ছিল। কিন্তু ও যে ধরনের মানুষ, তাহাতে এই সব সূক্ষ্ম ব্যাপার উহার নজরেও পড়িবে না। এদিক দিয়া আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত।

বুঝিলে চন্দ্রশেখর, এই হইল আমার শিবাজী। শিবাজীকে বুঝিতে পারা তোমাদের মত লোকের দৃষ্টিতে সহজ হইবে না। সেই জন্যই তোমাকে সতর্ক করিয়া দিলাম।

মামার ডাইরী শেষ হয়ে গেল।

ডাইরীটি আবার যেমন কাগজে মোড়া ছিল তেমনি প্যাক করে স্যুটকেশে তুলে রাখলাম। তারপর আবার একবার জানলা খুলে আকাশের চেহারাটা দেখলাম। নাঃ, এখনও সামান্য রাত্রি আছে। অন্ধকার ফিকে হলেও অন্ধকার আছে। বিছানায় চাদর টেনে, আলোটা কমিয়ে শুয়ে পড়লাম।

কিন্তু ঘুম এল না। উঠে বসলাম। কি করব ভাবলাম একবার। মনে মনে একটা কিছু ভেবে নিয়ে উঠে পড়লাম। দরজা খুলে বেরিয়ে এলাম বারান্দায়। বারান্দায় বের হতেই ভোরের অরণ্যভূমির টাটকা, ঠাণ্ডা হিমেল বাতাস শিবাজীর মতই সর্বাঙ্গে সস্নেহ ঝাপটা দিয়ে যেন আমার রাত-জাগা শরীরকে

আদর করে গেল। আমি বুকভরে দুবার অরণ্যের কৌতুক সজোরে টেনে বুকে পুরে নিয়ে শিবাজীর ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়ে দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকলাম—এ মামাজী, মামাজী!

কোনো সাড়া নেই। একটু চুপ করে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম। ঠাণ্ডা বাতাস আবার একটা সস্নেহ এলোমেলো ঝাপটা দিয়ে গেল। বাতাসটা সরে যেতে কানে ঘরের ভেতর থেকে গাঢ় নাসিকা গর্জনের ধ্বনি এসে ঢুকতে লাগল। হাসি এল আমার। আরেঃ বাপ্, কী নাক ডাকার আওয়াজ মামাজীর! যেন জয়ঢাক বাজছে! সিদ্ধি খেয়ে শিবাজীর মত মানুষের শেষ রাত্রির আরামের ঘুম। এ ভাঙানো খুব সোজা কাজ নয়।

আমি দাঁড়িয়ে ভাবছি মামাজীকে নিয়ে এই ভোর রাত্রিতে কৌতুক করব কি না, এমন সময় ওপাশের ঘরের দরজা খুট্ করে খুলে গেল। বেরিয়ে এলেন হারাধন মুখুজ্জে মশাই।

আমি কাল শোবার আগে পর্যন্ত এই জঙ্গলে যে তুচ্ছ, সম্মানহীন মানুষকে দেখেছিলাম, যাকে অবহেলা ও উপেক্ষা করে বার বার নিজের সেই অবহেলা তাঁকে জ্ঞাপন করেছি, এ তো সে লোক নয়। এ এমন একজন মানুষ যে নিজের জীবনে নিজে জীবনের এক কণা প্রসাদ চেয়েও পায়নি, এবং না পেয়ে নতমস্তকে ফিরে এসেছে, অথচ তা নিয়ে জীবনের কাছে কোনো অভিযোগ করেনি। শুধু তাই নয়, এই বিফল, হতভাগ্য মানুষটি নিজের সমস্ত জীবনটা আর একজনের জন্যে বিলিয়ে দিয়েছে। সেই সম্মানটা ওঁর পাওনা আছে। ওঁকে বের হতে দেখে আমি শিবাজীর ঘরের দরজার কাছ থেকে সরে ওঁর দিকেই এগিয়ে গেলাম। হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলাম—কি, ঘুম হয়ে গেল?

উনি আমার মুখের দিকে একটু অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন। আমার ওঁর সঙ্গে কথা বলার ভঙ্গিতে যে স্পষ্ট পরিবর্তন তার কারণ উনি ধরতে পারছেন না। তবে সে কারণ উনি সন্ধান করার চেষ্টা না করে আমার সম্মানকে যেন পাশ কাটিয়ে গিয়ে একটু হেসে জবাব দিলেন—হ্যাঁ বাবা, ঘুম হয়ে গেল। তা আপনি এত সকালে উঠলেন যে?

আমি আমার সম্মান প্রদর্শনকে ওঁর কাছে স্পষ্ট করে দিলাম। বললাম—আমি আপনার চেয়ে অনেক বয়ঃকনিষ্ঠ, আপনি আমাকে তুমিই বলবেন।

উনি আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন স্পষ্ট জিজ্ঞাসা নিয়ে। মামার ডাইরীতে যে সব ঘটনা বিবৃত হয়েছে তার মধ্যে বার বার ওর বুদ্ধির পরিচয় পেয়েছি। এবং উনি নিজেও সেখানে একাধিকবার ওঁর নিজের বুদ্ধির অহঙ্কার করেছেন।

আমার দিকে অমনভাবে তাকিয়ে উনি আর একবার নিজের বুদ্ধিমত্তারই পরিচয় দিলেন।

ওঁর সেই দৃষ্টির উত্তরে আমি তাঁকে বললাম—এতদিন আমি আপনাকে চিনতাম না। কাল রাত্রিতে চিনেছি।

উনি তেমনিভাবেই আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। আমি আবার বললাম—আপনি কাল রাত্রিতে যা বলতে চাচ্ছিলেন, যা বলতে এসেছিলেন, তা আমি সবই জেনেছি। আপনি না বলতেই জেনেছি।

উনি আমার মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কি করে জানলেন?

ওঁকে অল্প দু-চার কথায় সব বললাম।

আমার কথা শুনে চুপ করে রইলেন মুখুজ্জে মশাই। অনেকক্ষণ পর বললেন—এ এক অদ্ভুত অবস্থা বাবা। ওরা আমার কেউ নয়। কিন্তু ওরাই আমার সব। অথচ ওরা যে আমার কেউ একথা মুখ ফুটে খুলে বলতে গেলে ওদের গায়ে কলঙ্কের ছিটে লাগবে, আমাকে লোকে পাগল ভাববে।

আমিও ওঁর কথাটা শুনলাম চুপ করে। তারপর বললাম—পার্বতীজীর আর ওর মেয়ের তো কোনো অভাব থাকার কথা নয়।

মুখুজ্জে মশাই সঙ্গে সঙ্গেই হেসে বললেন—অভাব তো নাই বাবা।

আমি বললাম—সেই তো। পার্বতীর নিজের তো অনেক গহনা ছিল। তা ছাড়া আপনি দিয়েছিলেন বিয়েতে। সে সব রনৌরা থেকে চলে আসবার সময় ওঁরা নিয়ে এসেছিলেন। সে গহনা কোথায়?

মুখুজ্জে মশাই বললেন—আপনাকে বলতে বাধা নেই। অন্য কাউকে বলতাম না। আমি শুনেছি আপনি আপনার মামার সব সম্পত্তি শিবাজীবাবুকে লিখে দিচ্ছেন। তাতেই বুঝলাম আপনি একাধারে ভাল লোক আর বুদ্ধিমান লোক—দুই-ই। আপনাকে বলি, ওর গয়না সব আমার কাছেই আছে। তা ছাড়া আমার নিজেরও টাকাকড়ি আছে কিছু। জীবনে তো সবাই যার পেছনে ছোটে আমিও তো তাই ছুটতে চেয়েছিলাম। মেয়েমানুষ আর টাকা। তা মেয়েমানুষের পেছনে ছোটার নটে গাছটি তো সিংহ মশাই-ই আমার প্রথম যৌবনেই মুড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাই সব জেদটা লেগেছিল টাকা রোজগারের পেছনে। টাকাপয়সাও কিছু আমার আছে। সে সবই তো পার্বতী আর তার মেয়ের। আমি বছর কয়েক আগে পার্বতীর মায়ের নাম করে গহনাগুলো সব চামারিয়ার হাত দিয়ে তুলে দিতে চেয়েছিলাম শিবাজীর হাতে। তা শিবাজী নেয়নি। সে চামারিয়ার ওপর রাগ করেছিল। বলেছিল—নিজের

'আপনা আদমীকে' খেতে দিয়ে কি কেউ পয়সা নেয়? আর এতই যদি ফুফাজীর মায়ের দেবার সখ তো ওদের জিনিস ওদের হাতে দে গিয়ে। কই-রোজ ডাকাত এসে লুটপাট করে নিয়ে যাবে। সে বেশ ভাল হবে। এই শুনে আমি আর ও নিয়ে উচ্চবাচ্য করিনি। সে সব আমার কাছেই আছে। অর্থাভাব ওদের নেই বাবা। আছে নিরাপদ আশ্রয়েব অভাব। এতদিন আপনার মামা ছিলেন, তাঁব আশ্রয়ে নিবাপদেই ছিল ওরা। এখন তিনি নেই, তাই ওদের আশ্রয়েব কথা নতুন করে ভাবছি।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম—আজ আমার মামা নেই, কিন্তু আপনি তো আছেন। আপনি মামাব জায়গায় গয়ার বাড়ীতে থেকে ওদের রক্ষা করুন অভিভাবক হয়ে। এ তো খুব সহজ ব্যবস্থা, ভগবানই করে বেখেছেন।

আমার কথা শুনে হারাধন মুখুজ্জে অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি সেই উষাকালেব অস্পষ্ট আলোতেও দেখতে পেলাম তাঁব ছোট ছোট পিঙ্গল চোখ দুটিতে আব্‌ছা জলের আভাস এসেছে। অবণ্যভূমির অন্ধকার সত্ত্বেও তা আমার দৃষ্টিব অগোচর রইল না। তিনি গলা ঝেড়ে বললেন—সেই বাসনা মনে নিযেই তো ঘুব ঘুর করছি বাবা এখানে। আমি বুঝতে পাবছি, আমাকে এখানে কেউ চেনে না, জানে না। কাবও কোনো কৌতূহলও নেই আমার সম্পর্কে। সবাবই মনে সন্দেহ—এ লোকটা অকারণে কেন এখানে ঘুর ঘুব করছে!

আমি হেসে বললাম—তা খানিকটা মিথ্যে বলেননি। ব্যাপারটা সবাবই কাছে খানিকটা সেই বকমই মনে হয়েছে।

তাবপর বললাম—ঠিক আছে। আপনি তো এই জন্যেই এসেছেন এখানে?

মুখুজ্জে মশাই বললেন—তা ছাড়া আর কি বাবা? শিবাজীকে তো বলতে হবে কথাটা।

আমিই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বললাম—আপনি ভাববেন না। আমিই বলছি শিবাজীকে। সকালেই কথা বলছি।

সকাল বেলা উঠেই শিবাজী হৈ হৈ লাগিয়ে দিলে।

আমি মুখুজ্জে মশাইকে বনের মধ্যে খানিকটা এগিয়ে দিয়ে চামারিয়ার দেওয়া এক পথপ্রদর্শকের হাতে তাঁকে ছেড়ে দিয়ে বাংলোর দিকে আসছিলাম। মুখুজ্জে মশাই এখন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত 'ঝাড়ো' নদীতে যাবেন। সেখানে স্নান আর আহ্নিক সেরে ফিরবেন।

আমি বাংলোর কাছাকাছি আসতেই শিবাজীর চড়া গলার আওয়াজ পেলাম—চামারিয়া, এ চামারিয়া !

চামারিয়ার সাড়া পেলাম না। কিন্তু শিবাজীর গলার আওয়াজ থেকে বুঝলাম চামারিয়া তার কাছাকাছিই রয়েছে। শিবাজী চীৎকার করছে—কি কোথায় গেল তোর সব? জলদি লে আও। রোদ উঠে গেলে কি আর খেতে ভাল লাগবে, না খাওয়া যাবে ?

আমি আপন মনে একটু হাসলাম। কি খাওয়ার কথা বলে হল্লা করছে শিবাজী? বেশ এক ধরনের জীবন ওর। বসন্ত দিনের শিমুল গাছের ফাটা তুলোর মত গায়ে সূর্যের আলো দেখে চিকচিক করতে করতে পৃথিবীর ধুলোর সঙ্গে সম্পর্কহীন হয়ে একান্ত ভারহীন অবস্থায় আকাশ আর পৃথিবীর মাঝখান দিয়ে ভাসতে ভাসতে উদ্দেশ্যহীন হয়ে ভেসে চলে যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে কে জানে! তবে যাচ্ছে এ বিষয় নিশ্চিত। এই যাওয়াতেই তার আনন্দ।

তবে অমনভাবে ভেসে যাওয়া তো সোজা কথা নয়। পৃথিবীর ধুলোর সঙ্গে সম্পর্কহীন হওয়া, তার সঙ্গে বিনা চেষ্টায় সম্পর্ক ছিন্ন করা ভাল কি মন্দ জানি না, তবে সে অবস্থায় পৌঁছুনো সবারই ভাগ্যে ঘটে না। শিবাজীর ভাগ্যে এটা যেন কেমন করে ঘটে গিয়েছে। তাই সদা সর্বদা সে এমন আনন্দে থাকতে পারে। তা উপস্থিত মুহূর্তে শিবাজী কি খাওয়া নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছে, তা জানবার জন্য কিঞ্চিৎ কৌতূহল হ'ল।

এগুতে এগুতেই শুনলাম—চামারিয়ার পর সে আমাকে খুঁজছে। সে সমান চীৎকার করে ডাকছে—ভাগনা, এ ভাগনা! তুম কাঁহা গয়া? এ চন্দরবাবু! এ ভাগনাবাবু!

হাসতে হাসতেই একটা ঝোপ আর বাঁক পার হয়ে বাংলোর খালি চৌহদ্দির ভেতর হাজির হলাম। দেখলাম, শিবাজী একটা কাঁচের গেলাস হাতে দাঁড়িয়ে তাতে চুমুক দিচ্ছে। আমাকে দেখে বেশ খানিকটা হেসে বললে—আরে, আরে ভাগনা, সকাল বেলাতেই কোথায় গিয়েছিলে খুনি ?

তার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে হেসে বললাম—এই একটু বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। গ্লাসে একটা শেষ চুমুক দিয়ে গ্লাসটা চামারিয়ার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললে—তুমি তো খুনি আবার 'পোয়েট' আপনি। কি বলে যেন, তুমি বুঝি 'নেচার'স্ বিউটি দেখতে বেরিয়েছিলে? কিন্তু ও রকম খুনি বেরিয়ো না কিন্তু! মহা বিপদ হতে পারে। ভালু আছে, হুড়ার আছে।

শিবাজী আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। আমি তার কথাটা শেষ করতে না দিয়ে বললাম—আর কিছু না থাকুক, অন্তত মৌমাছি আছে।

আমার কথা শুনে হা হা করে অট্টহাস্য করে উঠল শিবাজী। এ তার একটা মনোমত রসিকতা হয়েছে। সে হাসতেই লাগল, হাসতেই লাগল। হা হা হা হা।

হাসতে হাসতে সে বললে—ব্যাপারটা তোমার এখনও মনে আছে খুনি?

তার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললাম—তা মনে আছে বৈকি!

হাসতে হাসতে শিবাজী বললে—লরার সেই মুখটা মনে আছে তোমার? লাল্‌চে ওলের মত মস্ত বড় গোল মুখটা?

আমি বললাম—কেন, তোমার নিজের ফুটবলের মত মুখটা মনে নেই?

শুনে সঙ্গে সঙ্গে আবার অট্টহাস্য।

আমি বারান্দায় উঠতেই চামারিয়া একটা গ্লাস আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে—পিজিয়ে হুজুর।

গ্লাসটা হাতে নিতে নিতে জিজ্ঞাসা করলাম—কি হে চামারিয়া?

শিবাজী হেসে বললে—তুমি 'নেচারের' 'বিউটি' দেখে যা মনে মনে 'ড্রিঙ্ক' করছিলে খুনি, এ হ'ল তাই। একেবারে স্রেফ 'নেচার' থেকে কেড়ে আনা খাঁটি মাল। এর নাম হ'ল রস। খেজুরের রস।

গ্লাসে চুমুক দিয়ে বললাম—মামাজী, তুমি ভালই আছ। সকালে খেজুরের রস, সন্ধ্যেতে ভাঙের সরবৎ।

মামাজী হা হা করে হেসে বললে—বলতো, বলতো ভাগনা, ভাল আছি না খুনি?

হেসে বললাম—তা আছো।

কিন্তু আমার সেই হাসির মধ্যে বোধহয় আমি নিজের অগোচরেই হাল্কা রসিকতার চেয়ে গভীর কোনো গূঢ় ব্যঞ্জনা জুড়ে দিতে পেরেছিলাম যা দেখে শিবাজীর মত অর্ধমনস্ক লোকও বললে—অমন করে খুনি বলছ কেন ভাগনা?

মামাজীই আমার গূঢ় অস্পষ্ট ব্যঞ্জনাটিকে স্পষ্ট করে দিলে তার প্রশ্ন দিয়ে। আমি তার মুখের দিকে পুরোপুরি চেয়ে তাকে বললাম—কেন বলছি তোমাকে বলব? তুমি অনুমতি দিলে বলব।

আবার সেই চেনা শিবাজী। সেই হৈ হৈ হাসি। হা হা করে হেসে শিবাজী আমার পিঠে তার শক্ত হাতের দরাজ থাপ্পড় মেরে বললে—আরে তুমি কে

খুনি খুব 'সৈরিয়াস' হয়ে উঠলে। বল না কি বলবে? যা পুছবে তার জবাব দিতে খুনি, এ বান্দা হাজির। বল, বলে ফেল।

আমি মন ঠিক করে ফেললাম। ঠিক করে ফেললাম আসল কথাটা আজ এখনি বলব ওকে। যে প্রশ্ন আমার মনে ওর সম্পর্কে সর্বদা জাগ্রত হয়ে থাকে, যেটা ওর কাছেও নিশ্চয় একটা মূল প্রশ্ন, সেই প্রশ্নটাই আজ করব ওকে। ছাড়ব না। হালকা হাওয়ায় আলোর রঙ গায়ে-মাখা ভারহীন সামগ্রীকে একবার ধুলোর ওপর নামিয়ে আনব। ধুলোতে দাঁড় করিয়ে দেব ওকে। ওকে জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা মামাজী, এই হাল্কা চালে চলে তুমি জীবনের আসল 'প্রবলেম'টাকে কত দিন এড়িয়ে থাকবে?

আমার প্রশ্নটা পরিষ্কারভাবে না বুঝেও শিবাজী আমার মুখের দিকে একটু জিজ্ঞাসুভাবে চেয়ে বললে—তোমার কথাটা তো ঠিক বুঝতে পারলাম না ভাগনা। 'প্রবলেম' বলতে তুমি কি বলছ?

আমি তার প্রশ্ন শুনেও তার কোনো উত্তর দিলাম না। তার মুখের দিকে চেয়েই রইলাম। আমার সেই বাক্যহীন চেয়ে থাকার প্রশ্নের গুরুত্বটা বুঝে শিবাজী কেমন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল যেন। আমি হেসে বললাম—মামাজী, তুমি একবার লরাকে মা বলে, লরার 'বিগবেবী' হয়ে পার পেয়েছিলে। কিন্তু এখন কি করছ?

আমার প্রশ্ন শুনে খানিকটা বিহ্বল হয়ে গেল শিবাজী। বোকার মতই খানিকটা কাতরতা নিয়ে প্রশ্ন করলে—এখন কি করছি?

জিজ্ঞাসা করলাম—পরিষ্কার করে জিজ্ঞাসা করব?

একটু ক্লিষ্ট হাসি হেসে সে বললে—বল না কেন, বল।

বললাম—মামাজী, লরা দু দিনের জন্যে এসেছিল। দু দিন পরে চলে গিয়েছে তোমার পাশ থেকে। সমস্যা মিটে গেছে। কিন্তু এই যে পার্বতী দিনের পর দিন, বছরের পর বছর এক ঝোপড়ির মধ্যে বাস করে তোমাকে ভালবেসে চলেছে, এর সমাধান কোথায়?

আমার প্রশ্ন শুনে আসল কথাটা শিবাজী অস্বীকার করলে না। শুধু বিহ্বল মুখে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। যেন এ ভালবাসায় তার কত অপরাধ ঘটেছে। পার্বতীর তাকে ভালবাসার কথাটাও সে অস্বীকার করলে না, আবার সে যে পার্বতীকে ভালবাসে না, এ কথাটাও বললে না। তার বিহ্বল নীরব মুখ দেখে শুধু মনে হতে লাগল সে যেন কোনো মহা অপরাধ করেছে। সে কিছুক্ষণ বিবর্ণ মুখে ধরা পড়ে যাওয়া অপরাধীর মত আমার মুখের দিকে চেয়ে

মুখ নামাল। তারপর মুখ তুলে খুব দুঃখীর মত বললে—হমারা কিয়া কসুর ভাগনা, তুমহি বাতাও তো। আমি কি করব? ও যদি আমাকে ভালবাসে আমি কি করব?

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—মামাজী, তুমি ওকে ভালবাস না?

শিবাজী আমার হাত দুটো চেপে ধরে বললে—তুমি বিশ্বাস কর ভাগনা, আমি কখনও ওর দিকে চাইনি, পিয়ার করতেও চাইনি। কিন্তু যদি কেউ অমন করে পিয়ার করে পুরো দীল লাগিয়ে দেয় তা হলে তাকে ভাল না বেসে পারা যায়?

একটু চুপ করে থেকে শিবাজী আবার বলতে লাগল—সেও তো আজ বহুত রোজ হয়ে গেল। কমসে কম করিফ দশ বছর হবে। চামারিয়া আমাকে পার্বতীয়ার সব কথা বলে আমার পা ধরে বললে—হুজুর সরকার, আপনি এ জেনানাকে আপনার জঙ্গলে একটা ঝোপড়িতে থাকবার আশ্রয় দেন। না হলে অত বড় রইস ঘরের মেয়ে, একদম ছোটে, বহুত বাচ্চা, ফুলকে মাফিক, উ মর যায়গা। তা দেখ ভাগনা, আমি ওকীল ত্রৈলোক্‌বাবুর বেটা, আমি শিবাজী, শিব্বা মহারাজ হবার স্বপ্ন দেখি, আমি একটা দুঃখী মেয়েকে আশ্রয় দিতে পারব না? তাই আশ্রয় দিলাম ওকে। কিন্তু তুমি বিশ্বাস কর ভাগনা, আশ্রয় দিলাম বটে, কিন্তু দু বছরের মধ্যে আমি মেয়েটির মুখ দেখিনি। মেয়েটি শুনেছিলাম পেটে বাচ্চা নিয়ে এসেছে। গয়া থেকে ডাক্তার এনে ওকে দেখিয়েছিলাম। তারপর ওর বাচ্চা হ'ল। বাচ্চাটা বছর খানেকের হলে চামারিয়া কোলে করে বাচ্চাটাকে এই বাংলোতে নিয়ে আসত। আমি আদর করতাম তাকে। গয়া গেলে ফিরবার সময় বাচ্চাটার জন্যে টুকিটাকি জিনিস নিয়ে আসতাম। মেয়েটা এলে মেয়েটার হাতে দিতাম। না হলে চামারিয়ার হাতে দিয়ে দিতাম। তখনও পর্যন্ত আমি পার্বতীয়াকে দেখিনি। চামারিয়া অবিশ্যি তার আগে কখনও কখনও ছোট বর্তনে করে রান্না-করা তরকারি কি মাছ কি মাংস নিয়ে আসত। বলত, পার্বতীয়া রান্না করে পাঠিয়েছে আপনার জন্যে। ওই পর্যন্ত। খেয়ে ভাল লাগুক আর মন্দ লাগুক, ভদ্রতার খাতিরে তারিফ করতাম। তার বেশী কিছু না।

হঠাৎ থেমে গেল শিবাজী। আমার মুখের দিকে চেয়ে তার মুখখানা লজ্জায় ভরে গেল। লাজুক হাসি হেসে বললে—আরে রাম রাম, এ সব কি বলছি আমি তোমাকে। বহুত সরম কি বাত। যত সব আজেবাজে কথা।

বলে দামাল ছেলের মত হৈ-চৈ করা শিবাজী লজ্জায় যেন একটা নরম রসে টসটসে লতার মত নুইয়ে পড়ল।

ভারী ভাল লাগল আমার। এ আর এক শিবাজী, যাকে আমি চিনি না। আমি কেন, বোধহয় কেউ কোনোদিন দেখেনি এ শিবাজীকে। প্রেমে পড়লে কি মানুষ এমনিই হয়! তখন প্রেমেব কথা, ভালবাসার কথা, ভালবাসার মানুষের কথা মুখ ফুটে বলতেই সব চেয়ে সুখ। আমি তাকে উৎসাহিত করে বললাম—তারপর? তারপর বল।

শিবাজী লাজুক-লাজুক মুখে বলতে লাগল—তাবপব ভাগনা, একদিন, ওই বাচ্চা মেয়েটা তখন দু-আড়াই বছবের। একদিন ওকে কোলে করে তাকে চামারিয়া নিয়ে এসেছিল বাংলোতে। আমি মেযেটাকে নিয়ে খেলা কবছিলাম। কি কাজ পড়ায় আমি চামারিয়াকে পাঠালাম। চামাবিয়া আব ফেবে না। এদিকে বিকেল হয়ে এসেছে। বনে বিকেলের আলো কমে গিয়ে ছায়া নেমে আসছে। মেযেটা ওব মায়েব কাছে যাবাব জন্যে কাঁদতে লাগল। কাছে-পিঠে চামারিয়া নেই, কেউ নেই। আমি আব কি কবি। আমিই মেয়েটাকে কোলে করে চললাম ওদেব ঝোপডিব দিকে। তুমি দেখছ তো এখানকাব চারদিক। ঘন বনের মধ্যে বড বড গাছের তলা দিযে পাযে চলা পথ। খানিকটা যেতে যেতে দেখি আব্ছা আব্ছা নীল্চে সবুজ অন্ধকাবেব মধ্য দিযে লাল শাডী পরা একটি মেয়ে আসছে। আমাব কোলে মেযেটা কান্না থামিযে হেসে বললে—মা আসছে। আমি থমকে দাঁডিযে গেলাম। মাথায ঘোমটা নেই, মস্ত বড় রুখু চুলের খোঁপা মাথায়। দেখলাম, মেযেটি ভাল করে বেশবাস করে না। রুখু চুল উড়ছে বনের বাতাসে। আমাকে দেখেই মেয়েটি মাথায় ঘোমটা টেনে দিলে। সেই নির্জন বন, কেউ কোথাও নেই, সেই লাল শাডী-পরা মেয়েটিকে দেখে আমার মনে কেমন কষ্ট হতে লাগল। মেয়েটি কাছে আসতেই আমি সুরসুতিয়াকে কোল থেকে বাডিয়ে তাব দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম—আপকি বেটি। আমাব হাত থেকে নিজেব মেয়েকে কোলে নিতে যেতেই দু-আড়াই বছরের দামাল মেয়েটা আনন্দে লাফিযে পডল মায়ের বুকে। তাতে ওর মাথার ঘোমটা আবার খসে গেল। ওব সেই একভাব রুখু চুলের খোঁপা দেখলাম আবার। সেই সময় পার্বতীয়া একবার তার বড বড ভারী ভারী চোখ মেলে খুব গম্ভীর হয়ে চাইল আমার মুখের দিকে। তাবপরই ঘোমটায় মুখ ঢেকে পিছন ফিরে নিজের ঝোপড়ির দিকে চলে গেল। আমি সেইখানেই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

আবার একবার থামল শিবাজী। থেমে থেকে আবার বলতে লাগল। বললে—ভাগনা, কি বলব তোমাকে, তারপর থেকে আমার জীবনের রঙটাই যেন বদলে

হয়ে গেল। আমি জানি, আমি খুব বেশী লেখাপড়া জানি না আমার দাদাদের মত। আমার বুদ্ধিসুদ্ধিও থোড়া কম। বিয়ে করা আমার হবে না। বিয়ে করলে গোলমালে পড়তে হবে আমাকে। তার ওপর আমার যে রকম মেজাজ, তাতে আমার কথার ওপর কথা বললে আমি হয়তো বউকে মেরেই বসব। তাই বিয়ে-সাদিব কথা ভাবতাম না। জেনানাদের কথাও ভাবতাম না। কিন্তু এর পর আমাব যে কি হয়ে গেল। গয়ার এই ঘন জঙ্গলের মধ্যে আমার জন্যে কোনো মস্ত বড গাছের তলায় সকাল বেলার নরম রোদে কি দুপুরেব রোদে, ঝাঁ-ঝাঁ আকাশেব দিকে কি বিকেল বেলার মেঘে-ঢাকা কালো আকাশের দিকে একজন মেয়ে আমাব কথা মনে করে তার ভারী ভারী বড বড চোখ মেলে চেয়ে আছে—এ ভাবলেই মন-মেজাজ অন্য রকম হয়ে যেত।

শিবাজী একবার থামল আবাব। প্রথম শীতের সকালের নরম রোদ্দুর, ফিকে কুয়াশা আর বড গাছের অতিকায় দেহ চুঁইয়ে সদ্য মাটিতে নামতে লেগেছে। সেইদিকে নবম নরম চোখে স্বপ্নাচ্ছন্নের মত তাকিয়ে শিবাজী আবার বলতে লাগল।

আমার ভারী ভাল লাগছিল তার কথা শুনতে। আমি বুঝতে পারছি শিবাজীর গোপন মনের দরজা এই প্রেমের উত্তাপে খুলে গিয়েছে। এখন সেই দবজা দিয়ে সব গোপন কথা আস্তে আস্তে না চাইতেই বেরিয়ে আসবে।

শিবাজী বলতে লাগল—জানো ভাগনা, সেই থেকে আমার মন-মেজাজ সব আস্তে আস্তে বদলে গেল। আমি আর এই জঙ্গল ছেড়ে বাইরে থাকতে পারতাম না। কাজে অকাজে এখান ওখান গেলে মনটা সর্বদা এখানেই পড়ে থাকত।

শুনে আমি হাসতে লাগলাম। আমার হাসি দেখে খানিকটা অবাক হয়ে শিবাজী বললে—হাসছ কেন ভাগনা? আমার কি কোনো কসুর হয়েছে?

আমার হাসি তাতে বেড়েই গেল। বললাম—না, না, মামাজী, কসুব কিছু হয়নি তোমাব। তবে মানুষ যখন প্রেমে পড়ে তখন এমনিই হাল হয় মানুষের।

শুনে শিবাজী আমার মুখেব দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল। আব আমি হাসতে লাগলাম।

রহস্য হিসেবে কারও প্রেমের গোপন কাহিনী শোনার মত অভিজ্ঞতা আর বোধহয় নেই। তাই আমি হাসতে হাসতে তাকে উৎসাহিত করে বললাম—বল, বল মামাজী, থামলে কেন?

আমার কথায় শিবাজীর ফ্যাল্‌ফ্যালানি দূর হ'ল না। সে একান্ত অপরাধীর

মত বললে—ভাগনা, আমার জিন্দিগীর হাল-চাল বদলে গেল। কিন্তু তুমি বিশ্বাস কর, সেই প্রথম দিন দেখার পর আমি নিজে কোনোদিন এগিয়ে তাকে দেখতে যাইনি। তার সামনে দাঁড়াইনি। আমার পরিষ্কার মনে আছে, এই ব্যাপারের, মানে প্রথম দেখা হওয়ার পর পার্বতীর সঙ্গে আমার দ্বিতীয় বার দেখা হয়েছিল আরও বছর দেড়েক পর।

হেসে বললাম—সাল-সনগুলো তো ঠিকই মনে রেখেছো দেখছি।

শিবাজী লজ্জিত হয়ে হেসে বললে—মনে যে সব সাফ সাফ রয়ে গিয়েছে, ভাগনা। কিছুই তো ভুলিনি। দেখা করতে ইচ্ছে ঠিকই করত, কিন্তু ভয়ে দেখা করতে পারতাম না।

অবাক হয়ে বললাম—ভয়? কিসের ভয়? কাকে ভয়?

শিবাজী বললে—কোনো বিশেষ মানুষকে কি আর ভয় করতাম? তা নয়। ভয় হ'ত ওর কাছাকাছি গেলে সবাই বুঝতে পারবে আমি কেন ওর কাছে এসেছি।

বুঝলাম। সত্যিই তো আগুন কি আঁচল দিয়ে ঢেকে বেখে গোপন করা যায়?

শিবাজী বললে—ওর কাছে যেতাম না। কিন্তু কতবার ওদের ঝোপড়ির রাস্তা দিয়ে হন হন করে চলে গিয়েছি যদি ওকে দেখা যায়। কতদিন এই বাংলোর বারান্দায় দাঁড়িয়ে চোখ মেলে চেয়ে থেকেছি, যদি সবুজ গাছপালার মধ্যে ওর লাল শাড়ী নড়তে চড়তে দেখা যায়। কিন্তু বিশ্বাস কর ভাগনা, আমি কখনও ওর কাছে যাইনি। আমি সব সময় ওর কথা ভাবলেও ওর কাছে গিয়ে দাঁড়াবার সাহস আমার হ'ত না। দীল আমাব পিয়ারে ভরা ছিল। কিন্তু কোনো দিন কাউকে জানতে দিইনি। ওর কাছে যেতে শুরু করলাম ওর মেয়ে খানিকটা বড় হওয়া থেকে। যখন কাছে যেতে আরম্ভ করলাম তখন মনে হতে লাগল, এই তো, এইবার সবাই ব্যাপারটা জেনে যাবে। কি করি? তখন ওকে 'ফুফাজী' বলে ডাকতে আরম্ভ করলাম। কিন্তু জানো ভাগনা, পার্বতীকে পিয়ার করে আমার একটা উপকার হয়েছিল।

আমি ওর মুখের দিকে চাইলাম।

শিবাজী বললে—সেই সময়ে তুমি লরাকে নিয়ে এসেছিলে। আমার ওই পিয়ার আমাকে লরার হাত থেকে বাঁচিয়েছিল ভাগনা। না হলে কি আর আমি বাঁচতাম সেদিন? আমিও তো মানুষ, ভাগনা।

তারপর আবার বললে—তারপর কত দিন এমনি করেই কেটে গেল। আমি মনের দিক দিয়ে বেশী করে জড়িয়ে পড়ছিলাম। বুঝতে পারছিলাম, এমনভাবে

কাছাকাছি আমাদের আর বেশী দিন থাকা উচিত নয়। সেইজন্যে আমি ওকে এখান থেকে সরাবার কথা ভাবতে লাগলাম। ভেবে ঠিক করলাম, পার্বতী আর সুরস্তিয়াকে গয়ায় দাদোজীর কাছে রেখে আসব এখান থেকে সরিয়ে. সুরস্তিয়াকে ইস্কুলে পড়ার অছিলা করে। সেই মতলব নিয়ে আমি দাদোজীর কাছে গিয়ে ওদের রাখবার কথাটা বললাম। দাদোজী প্রথমটায় ওদের কাছে রাখতে আপত্তি করলেন। তারপর মেনে নিলেন শেষ পর্যন্ত। আমি ওদের গয়ায় দাদোজীর কাছে এনে রেখে দিয়ে বেঁচে গেলাম। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। একটা ভয় আমার ঘাড় থেকে নেমে গেল যেন।

—কিন্তু জানো ভাগনা, ওদেব গয়ায় নিয়ে আসবার সাত দিন আগে একটা ঘটনা ঘটল। আমি সেই কথাটা বলব তোমাকে। সেদিন আমি খুব বেঁচে গিয়েছি। ভগবান খুব বাঁচিয়েছেন আমাকে।

একটু চুপ করে থেকে শিবাজী বললে—জানো ভাগনা, সেদিনও এমনি শীতের সময়। চামারিয়া গিয়েছিল পাশের জঙ্গলের বস্তিতে বকরী কিনতে। আমিই পাঠিয়েছিলাম। সুরস্তিয়া গয়া চলে যাবে ইস্কুলে পড়তে। আবার কখন আসবে। তাই থোড়া আচ্ছা খানার আয়োজন করতে বলেছিলাম। চামারিয়া আর সুরস্তিয়া বলেছিল 'খিচ্ড়ী' বানাতে। আমি বারণ করেছিলাম। আমি খিচড়ীর বদলে বহুত আচ্ছাসে পুরী বানাতে বলেছিলাম। সেই সঙ্গে ক্ষীরের মিষ্টি। ফুফাজী দাঁড়িয়েছিল সেখানে মাথায় ঘোমটা দিয়ে। সুরস্তিয়া বার বার 'খিচ্ড়ী' খাবার বায়না করলে তাকে ধমক দিলাম। বললাম—বোকা মেয়ে, কিচ্ছু বোঝে না। বোঝে না যে আমি খিচ্ড়ীর চেয়ে পুরী খেতে ভালবাসি।

এটা সকালবেলার কথা। দুপুরের দিকে কেমন মন খারাপ করতে লাগল। কেবল মনে হতে লাগল ওরা দু'জন এখান থেকে চলে গেলে আমার এই জঙ্গল বড় বাজে জায়গা হয়ে যাবে আমার কাছে। এতদিন এ জঙ্গল আমার কাছে রাজার বাড়ী ছিল, সেখানে হরবখত দুটি চোখ ঘোমটার আড়ালে দেওয়ালীর রোশনাইয়ের মত জ্বলত, সেই রোশনাই বরাবরের জন্যে নিভে যাবে। বারান্দায় বসে বসে মন খারাপ করে এইসব ভাবছিলাম। এমন সময় শীতের দিনের আলো আস্তে আস্তে কমে গিয়ে সারা আকাশে মেঘ ঘন হয়ে এল। বাতাস বইতে লাগল এলোমেলো। আমার বুকের ভেতরটা হু-হু করতে লাগল। আমি বারান্দা থেকে নেমে এগিয়ে চললাম। আমি কোন দিকে যাচ্ছি বুঝেও যেন বুঝতে পারিনি। খানিক পরে মেঘ-মেঘ আকাশ আর এলোমেলো

বাতাসে দোলা গাছপালার দিকে চেয়ে বুঝলাম, এ ওদের সার সার ঝোপড়ির পিছন দিকটা, যেখানে ওরা গোরু ছাগল বেঁধে রাখে খুঁটো পুঁতে, চরতে দিয়ে যায়। হঠাৎ একটা ঝোপের আড়ালে লাল শাড়ী দেখে আমার বুকের ভিতরটা চমকে উঠল। আমি অন্য একটা ঝোপের আড়ালে চুপ করে দাঁড়ালাম। সেখান থেকে দেখতে পেলাম ফুফাজী তার দড়ি-বাঁধা ছাগলের খুঁটো ধরে বাঁধতে এসেছে। সে আমাকে ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হাতের খুঁটোটা ফেলে দিলে। তারপর আস্তে আস্তে ঝোপটাকে বেড় দিয়ে আমার পিছনে এসে দাঁড়াল। তারপর শনশনে বাতাসের সঙ্গেই যেন সুর মিশিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বললে—বাবুজী সাহাব !

—আমার বুকের ভিতরটায় ঢেঁকির পাড় পড়ছিল তখন। আমাকে ফিরে চাইতে হ'ল। পার্বতীয়া তখন সরে এসে আমার দু-হাতের মধ্যে দাঁড়িয়েছে। সে আমার দিকে ঘোমটা খানিকটা তুলে চেয়ে বললে—আপ হিঁয়া খড়া কেঁউ. বাবুজী সাহাব ?

—বললাম, একা বাংলোতে বসে ভাল লাগছিল না। তার ওপর মেঘ করেছে। সেইজন্যে একবার বেরিয়ে এলাম বেড়াতে।

—পার্বতী হাসল। হেসে বললে—বেড়াতে বেরিয়েছেন ? তা ভাল। বাবুজী, এক রোজ একটা ঝুটা বাত বলুন না। আমি খুশী হব।

—বুঝলে ভাগনা, পার্বতী কখনও একা আমার সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে কথা বলেনি। তাছাড়া এ কি ধরনের কথা ! আমি তো এ পার্বতীকে চিনি না। তাই আমার বুকের ভেতরটায় কষ্ট হতে লাগল, ভয়ও লাগতে লাগল। তাই ভয়ে ভয়ে অপ্রস্তুত হয়ে বললাম—বল, কি ঝুটা বাত বলতে হবে, বলছি।

—বড় বড় চোখে আমার দিকে চেয়ে পার্বতী বললে—একবার আমাকে খুস করবার জন্যে বলুন না—পার্বতীয়া, আমি তোমার জন্যে এসেছি এখানে !

—আমি শশব্যস্ত হয়ে বললাম—আরে না, না, সাচ বলছি, মন খারাপ করছিল বলে এদিকে এসেছি।

—পার্বতী কেমন অদ্ভুতভাবে হেসে বললে—তাই তো বলছি ! আপনাকে সাচ বাত বলতে তো বলিনি। আপনাকে ঝুটা বাত বলতেই তো বলেছি। একবার বলুন না, আমি এখান থেকে আমার বেটিকে নিয়ে চলে গেলে আপনার দীলে খুব দর্দ হবে।

—কি বলব ভাগনা, শুনে আমি পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইলাম। আমি কি বলব ? সত্যি কথাটা আমি বলব কি করে ? ওর মুখ দেখে বড় মায়া হচ্ছে·

পাগল। ও জীবনে সামান্য ভুলের জন্যে কত কষ্ট পেয়েছে, আজও কষ্ট পাচ্ছে। কত বড় ঘরের মেয়ে, কোথায় কেমন দুঃখিনীর মত লুকিয়ে একটা ঝোপড়ির মধ্যে বাস করছে। তাকে ভালবাসার কথা বলে আরও কষ্ট দেব? আর কথা বলেই তো এর শেষ হবে না। কিন্তু ওর সঙ্গে এগিয়েই বা যাই কি করে?

আমি বললাম—কেন, তুমি ওকে সাদি করে ফেললে না কেন? আজকাল তো বিধবার বিয়ে হয়।

শিবাজী দুঃখিত হয়ে হাসল। বললে—ওই জঙ্গলের মধ্যে একা বাস করে সেসব কথাও আমি অনেক ভেবেছিলাম। তাও হয় না ভাগনা। যদিও সেইটেই সবচেয়ে ভদ্র, সহজ ও সম্মানের পথ ছিল। কিন্তু পার্বতী সে-পথে পা বাড়াতে ভয় পেত। আমি এদেশের মেয়েদের সংস্কার তো জানি। তারা একে মেনে নিতে পারবে না। তাছাড়া আমার নিজের মনও এতে সায় দেয়নি। বিধবা পার্বতীকে বিয়ে করলে সবাই আমাদের দু'জনের দিকেই ঘৃণার চোখে চাইত। ভাবত, একটা লুচ্চা একটা লেড়কিওয়ালা বিধবা মেয়েকে লোভে পড়ে বিয়ে করেছে। তা যাক, শোন তারপর। আমি কোনো কথা না বলে চুপ করে রইলাম। পার্বতী এবার কাঁদতে লাগল। কাঁদতে কাঁদতে বললে—আপনি আমার বেটিকে লেখাপড়া শেখাবার ছল করে আমাকে এখান থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন।

—তার কথা শুনে, তার কান্না দেখে আমিও দু'হাতে মুখ চেপে হু-হু করে কাঁদতে লাগলাম। খানিকক্ষণ কেঁদেই আমার ভয় হ'ল, হয়তো কেউ আসতে পারে এদিকে। আমি চোখ খুলে দেখলাম, পার্বতী গভীরভাবে অবাক হয়ে অতি তৃপ্তির সঙ্গে আমার কান্না দেখছে। আমার চোখে চোখ পড়তেই তার মুখে খুব অস্পষ্ট হাসি ফুটে উঠল। সে হেসে আমাকে মৃদু স্বরে ঠাট্টা করে বললে—এ মর্দানা আদমী কভি রোতা হ্যায়? মৎ রোনা।

বলতে বলতেই সে ছোট্ট মেয়ের মত আমার সামনে থেকে ছুটে চলে গেল প্রজাপতির মত। আমি সেখানে দাঁড়িয়েই রইলাম। কয়েক মিনিট পর মোটা মোটা ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে আমিও পা বাড়ালাম বাংলোর দিকে।

শিবাজী আবার থামল। আবার বলতে লাগল—সেই মাত্র একবার। দু'জনে সেই একবার মাত্র দেখা হয়েছিল। আর কোনোদিন কখনও কোনো ভালবাসার কথা বলিনি ওকে। পার্বতীও শুনতে চায়নি। যেকথা আমার মনের মধ্যেই নিজেকে আমার মন মুখ ফুটে শোনাতে লজ্জা পায়, সংকোচ করে, সেকথা

কখনও কাউকে বলার কথাই ওঠে না। আজ তোমাকে বললাম। এ কেমন ভালবাসা জানো ভাগনা? এ এক দিলদুখানা, বেমার বাচ্চা লেড়কার মত। একে সারা জীবন কোলে করে এক জায়গাতেই ঠায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি। এগিয়ে যাবার রাস্তা নাই। বাচ্চার বড় হবার উপায় নাই। মুখ ফুটে তার কাঁদবার উপায় নাই। তাহলেই তামাম দুনিয়ার চোখ পড়বে এর ওপর। নিন্দে হবে। তাতে আমারও লজ্জা, যাকে ভালবাসলাম তারও লজ্জা আর দুঃখ। তাই হা হা করে হেসে, হৈ-চৈ করে, নেশা-ভাঙ করে কাটিয়ে দিই। বুঝলে!

বলেই সে হঠাৎ আচমকা চেঁচিয়ে বললে—আরে এ চামারিয়া, কঁহা গয়া রে? আরে ফিন এক এক গিলাস তো পিলাও।

বলার মিনিট কয়েকের মধ্যেই চামারিয়া আবার দু' গেলাস রস নিয়ে এসে হাজির হ'ল। তার একটায় চুমুক লাগিয়ে শিবাজী বললে—দিনে ভাগনাবাবুকে কি খিলাবি? একটা বকরী মার না, এঁ্যা?

শিবাজী উঠতে যাচ্ছিল। আমি তার হাঁটুতে হাত রেখে বললাম—একটু বস। আমার মনে হচ্ছিল, আমি যেন আজ প্রথম আসল শিবাজীকে দেখলাম। যে একবার মাত্র দেখা দিয়ে গায়ে আবার একটা পোশাক পরে নিলে। এই হৈ-চৈ করা ছেলেমানুষের মত মানুষটার আড়ালে যে গম্ভীর, সহজ, বিষণ্ণ প্রেমিক মানুষটি বাস করে তাকে দেখে ছেলেমানুষী-করা মানুষটা যে তার বাইরের চেহারা তা বুঝলাম। গম্ভীর, গভীর মানুষটা এই এত কথা বললে, কিন্তু একবার তার মুদ্রাদোষের 'খুনি'টা কোথাও যোগ করেনি।

আমি এখনও সেই গোপন মানুষটারই সঙ্গী হয়ে আছি। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—এইবার কি করবে?

শিবাজী অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে—কিসের?

—পার্বতী আর সুরসুতিয়ার এবার থাকার কি ব্যবস্থা হবে?

শিবাজী চিন্তিতভাবে বললে—ভাবছি। বলতে গেলে সেই কথা ভাববার জন্যেই এখানে ফিরে এসেছি, বুঝলে ভাগনা। ভেবে ঠিক হদিশ পাচ্ছি না। চামারিয়াকে না হয় ওদের কাছে রেখে দিলাম। কিন্তু চামারিয়া তো আর ওদের অভিভাবক হতে পারবে না। তার জন্যে ভাল লোক চাই। তবে দাদোজীর মত লোক আর কোথায় পাব? তাই ভাবছি।

হেসে বললাম—ভগবান তোমার মুশকিল আসান করে রেখেছেন। সেই রকম লোক তোমার হাতের কাছেই হাজির রয়েছে।

শিবাজী বেশ অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বললে
—তুমি কার কথা বলছ ভাগনা?

বললাম—কেন, ওই তো হারাধন মুখুজ্জে মশায়ই তো হাজির তোমার কাছেই।

—হারাধন মুখুজ্জে? মানে, ওই মুখে তালাবন্ধ ভদ্রলোক? মুখে কথা বলে না, শুধু জুলজুল করে সব তাকিয়ে দেখে? ওকে চিনি না, জানি না, ওর ওপর ওই দুটো অল্পবয়সী মেয়ের ভার দেব কি করে? তুমিই বল।

হেসে বললাম—তুমি না চিনলে কি হবে, তোমার পার্বতীয়া ওঁকে খুব ভাল করে চেনে। উনি পার্বতীয়াকে ছেলেবেলা থেকে নিজের হাতে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছিলেন। সে খবর জান তুমি? সেই কথা বলতেই উনি কাল সন্ধ্যেবেলা মুখ খুলেছিলেন। তা আমরাই তো সে মুখ বন্ধ করে দিয়েছিলাম। তা আর শুনবে কি তুমি?

শিবাজী আরও অবাক। বললে—তা তুমিই বা এত সব জানলে কি করে?

কি করে জেনেছি বললাম শিবাজীকে। বললাম—মামার ডাইরী আমি কাল সারারাত জেগে পড়েছি। তুমিও পড়, পড়লেই জানতে পারবে।

শিবাজী সঙ্গে সঙ্গে হা হা করে হেসে উঠল। বললে—ওরে বাবা, তুমি খুনি ভাগনা, আমাকে আর বই খাতা খুলে লেখাপড়া করতে ব'লো না। 'লিখা-পড়ি'কে আমার বিষম ভয়। তুমি তো পড়েছ, তুমিই আমাকে মুখে মুখে বল। বেশ ভালই হবে, এক 'কিস্‌সা' শোনা যাবে।

একটু থেমে সে বললে—জানো ভাগনা, চামারিয়া খুনি, মধ্যে মাঝে পার্বতীর সম্বন্ধে টুকিটাকি কথা বলতে চেয়েছে আমাকে। আমি কতক শুনেছি, কতক শুনিনি। যা শুনেছি তাও আবার প্রায় সব ভুলে গিয়েছি। চামারিয়ার কথাতেই তো আমি পার্বতীয়াকে আশ্রয় দিয়েছিলাম। আমিই ওকে প্রথমেই বলতে বলে দিয়েছিলাম কেউ পার্বতীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে সোজাসুজি বলবি, ও তোর জেনানা। তা জানো ভাগনা, ব্যাটা আবার এমন, ও আমার কথা শুনে সরমে কালীমায়ীর মত জিভ বের করে বলেছিল—আরে রাম রাম, সীয়ারাম। লোকে এখানে আব্‌ছা আব্‌ছা কিছু জানে। যদিও এখানকার লোকে ওকে মুখে চামারিয়ার জেনানা বলে তবু মনে মনে জানে ও চামারিয়ার কেউ হয় না। ওর বেটিকে দেখে আরও বেশী করে বোঝে সেই কথা। তা এখন বল হারাধনবাবুর কথা। কিস্‌সা শোনা যাক।

হেসে বললাম—এই সাত সকালে 'কিস্‌সা' শুনতে বসবে? দিনের আলোয় কিস্‌সা শুনলে যে আবার শাশুড়ীর চোখ কানা হয়।

হা হা করে হেসে উঠল শিবাজী। তার পুরনো হাসি। বললে—বলেছ খুনি ভালই ভাগনা। আমার বউই নেই তা শাশুড়ী। আমারই তো তা হলে দিনের বেলা কিস্‌সা শুনবার কথা। বল তুমি।

আমি গুছিয়ে বসে শিবাজীকে সংক্ষেপে সমস্ত কাহিনীটা শোনালাম। বেশ মন দিয়েই শুনলে শিবাজী। সব শুনে সবিস্ময়ে বললে—আচ্ছা! এহি বাত! তব তো ঠিকই হুয়া। আব ছোটে দাদোজীকো বুলাইয়ে।

—ছোটে দাদোজী ?

শিবাজী হেসে বললে—হাঁ, হাঁ, ছোটে দাদোজী। শিব্বাব তো এক দাদোজী চাহিয়ে।

আমরা কথা বলতে বলতেই মুখুজ্জে মশাই তাঁর পথ-প্রদর্শকের সঙ্গে ঝাডো' নদী থেকে স্নান ও পূজা সেরে ফিরে এলেন। তাঁকে দূর থেকে আসতে দেখেই শিবাজী চীৎকার করতে লাগল—চামারিয়া, এ চামারিয়া !

নিঃশব্দে হাজির হ'ল চামারিয়া। শিবাজী বললে—ছোটে দাদোজীকে জল খেতে দে।

বুঝতে না পেরে হাঁ করে দাড়িয়ে রইল চামারিয়া। শিবাজী প্রায় হল্লা করে উঠল—সমঝা নহি, এ বুদ্ধু ? আজসে উয়ো তো হমারা ছোটে দাদোজী। ভগবান মিলা দিয়া। যাও উনকে লিয়ে 'জলখাই'কে ব্যবস্থা করো।

বলে আঙুল দিয়ে শিবাজী দেখিয়ে দিলে মুখুজ্জে মশাইকে।

হারাধন মুখুজ্জেকে হাতের ইশারা করে ডাকলে শিবাজী। তিনি কাছে আসতেই তাঁকে নিজের হাত চাপড়ে বসবার আসন দেখিয়ে দিয়ে সে বললে—হম তো ভাগনাকা পাশ সব কুছ শুন লিয়া। আপ আজসে তো হমারা ছোটে দাদোজী হো গয়া। আপ হমারা সাথ চলিয়ে গয়া মে। দেখিয়ে, ভগবান্‌নে হমারা এক দাদোজী লে লিয়া তো আওর এক মিলা দিয়া।

হারাধন মুখুজ্জে স্থির দৃষ্টিতে শিবাজীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর আপন মনে বিড়বিড় করে কিছু বললেন। কি বললেন তা বুঝতে পারলাম না। পরক্ষণেই গলা ঝেড়ে নিয়ে তিনি আপনার ঘরে চলে গেলেন।

আবার ফিরে এসে শিবাজীর সামনে দাঁড়িয়ে বললেন—বাবা, এবার থেকে তোমার গয়ার আর এখানকার ব্যবসার সব হিসেবপত্র আমি রাখব, বুঝলে ? তোমাকে কিছু করতে হবে না।

বলে, তিনি আবার হন হন করে চলে গেলেন।

পরদিনই আমরা গয়া ফিরে এলাম। গয়া পৌঁছেই শিবাজী পার্বতীকে ডাকলে—ফুফাজী, আপ এক বাত শুন লিজিয়ে। আপ তো দাদাজী নহি হ্যায়, উন্‌সি লিয়ে আপকি আওর এক দাদোজী লায়ে হেঁ। লিজিয়ে।

বলে তিনি হারাধনকে দেখিয়ে দিলেন।

আমাকে আরও কয়েকদিন থাকতে হ'ল গয়ায়। আমাব নামে আগে নামজারী করিয়ে তারপর শিবাজীব নামে আমি মামাব সব সম্পত্তি শিবাজীকে দানপত্র করে রেজেষ্ট্রী করে দিলাম।

আমার কাজ শেষ হ'ল।

শিবাজী আমাকে নিয়ে ষ্টেশনে রওনা হবে এমন সময় পার্বতী এসে আমার সামনে দাঁড়াল। মাথায় আজ ঘোমটা নেই। সে হাসিমুখে আমাকে বললে—বছরে একবাব করে অন্তত আসবেন ভাইজী। ভুলবেন না।

তেইশ

কিন্তু আমার আর গয়া যাওয়া হয়নি।

যেসব কথা সেদিন শিবাজীর সাহচর্যে সেই বটগাছতলায় তার সঙ্গে সারাদিন কাটানোর মধ্যে টুকরো টুকরো মনে এল তাই গাঁথলাম এতক্ষণ ধরে।

এসব কি আজকের কথা? মনে মনে হিসেব করে দেখলাম শেষ গয়া থেকে মামার সমস্ত সম্পত্তি শিবাজীকে দানপত্র করে যখন চলে আসি সেটা উনিশশো আটাশ কি উনত্রিশ সাল। তখন আমার বয়স ছিল ত্রিশ-একত্রিশ।

তারপর আমার নিজেরই জন্মান্তর ঘটে গিয়েছে। সেই উনিশশো আটাশ-উনত্রিশ সালের প্রান্তে ত্রিশ-একত্রিশ বছর বয়সে দাঁড়িয়ে আমি নিজেই কি তখন জানতাম যে, আমি আমার একটা জন্ম ও অভিজ্ঞতার বৃত্ত সম্পূর্ণ করে এক ভিন্নতর জন্মের মধ্যে দিয়ে ভিন্নতর অভিজ্ঞতার মধ্যে যাচ্ছি?

এর এক বছর পরেই গান্ধীজীর আইন অমান্য আন্দোলন এল। পতঙ্গ যেমন করে প্রাণের চরম পরিপূর্তির প্রত্যাশায় আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে তেমনি করেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম সে আন্দোলনে। স্বভাবতঃই আগুনের ছোঁয়া লেগে পাখা পুড়ে গেল। কিন্তু আমার কি সৌভাগ্য জানি না, সেই পাখা পোড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমিও গুটি কেটে প্রজাপতির মত বেরিয়ে এলাম। রাজনীতি ছাড়লাম, সাহিত্যকে আশ্রয় করলাম পুরোপুরি জীবন-ধর্ম জ্ঞানে। সেই থেকে

নেশার মত ক্রমাগত সেই পথ ধরেই চলেছি। সেই উনিশশো আটাশ-উনত্রিশ সাল থেকে এই উনিশশো বাহান্ন সনে এসে পড়েছি। মাঝখানে বাইশ, তেইশ কি চব্বিশটা বছর কেটে গিয়েছে! আর কি সেই পুরনো কথা, পুরনো বন্ধন মনে থাকে ?

তবু দেখছি মনে ছিল। বটগাছেব তলাষ রূপণ ছায়ায় সতরঞ্চির ওপর বসে শিবাজীর সঙ্গে গল্প করতে একে একে সব কথাই এখানে খানিকটা, ওখানে খানিকটা, মনে পড়ে গেল। আমাব সহযাত্রীবা গাছেব ছায়ায় প্রায় সকলেই তন্দ্রার ঘোরে আচ্ছন্ন। ঝোপড়ির মধ্যে মাংস রান্না হচ্ছে। তার উৎকৃষ্ট তাজা গন্ধ পাচ্ছি। আর সেই গন্ধ আস্বাদ কবতে করতে শিবাজীর গল্প শুনছি।

শিবাজীকে বললাম—মামা, তারপব তোমাব খবব বলতো দেখি।

শিবাজী হেসে বললে—আবে মেরে পিয়ারে ভাগনা, আজ রাত্তিরটা থেকে যাও না। তবে তো সব খবর বলি তোমাকে।

বললাম—না মামা, সে হয় না। কলকাতায় অনেক কাজ পড়ে আছে। অনেকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ কববার কথা দেওয়া আছে। কয়েকটা মিটিং-ও আছে কাল। আমি না গেলে সেসব পণ্ড হযে যাবে। আমার নিজেরও কিছু কাজ আছে। না গেলে আর্থিক লোকসান হয়ে যেতে পারে।

শিবাজী হাসল ম্লানভাবে। আমাব কথা যেন মেনে নিলে। বললে—না, তাহলে আর তোমাকে কি করে থাকতে বলব ? তুমি ফিরেই যাও তোমাদের গাড়ী মেরামত হলে।

বেলা দুটো সওয়া দুটোব সময় ঝোপড়িব দরজায় কাচকড়ার চুড়ির শব্দ হ'ল। বুঝলাম, এ অন্সুইয়ার আহ্বানের সংকেত। শিবাজীকে বললাম—যাও, শুনে এস।

উঠে গেল শিবাজী। একটু পরেই আবার ফিরে এল হৈ হৈ করতে করতে। সে প্রায় এক হল্লা লাগিয়ে দিলে—উঠিযে, উঠিয়ে মেহমান্‌লোগ। খানা তৈয়ার। হম তো পনহলেই মাফি মাঙতে হেঁ। ভুখকে মারে সব কইকো নিদ্ আ গয়া। আব উঠিয়ে, আস্নান করিয়েগা তো চলিয়ে মেরা সাথ। উ তালাওমে আস্নান কর লিজিয়ে।

আমাকে জিজ্ঞাসা করলে—তুমি আস্নান করবে ভাগনা ?

আমি বললাম—না, আমি ভোরেই স্নান করে বেরিয়েছি। আমার আর স্নানের দরকার হবে না।

শিবাজী বললে—তাহলে হাত মুখ ধুয়ে নাও।

সঙ্গে সঙ্গে সে হল্লা তুললে—চামারিয়া, চামারিয়া হো!

সঙ্গে সঙ্গে ঠিক সেই আগের মত চামারিয়া এসে হাজির নিঃশব্দে। আমার দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসছে। তার মানে আমাকে চিনতে পেরেছে চামারিয়া এতকাল পরেও। সে হাতজোড় করে নমস্কার করলে আমাকে। আমি বললাম—ভাল আছ চামারিয়া?

সে কৃতার্থ হয়ে হাতজোড় করে বললে—জী সরকার। আপকা দোয়াসে অচ্ছাহি হ্যায়।

শিবাজী সেই বহু বছর আগের মত তাকে ধমকে চেঁচিয়ে উঠল—আরে বুদ্ধু, কিয়া বাত বনানে লগ গয়া? পহেলে ভাগনা বাবুকো তো বলটিসে পানি দো।

চামারিয়া সেই বহু বছর আগের মতই অবুঝ বালকের অবোধ আদেশ পালন করার মত হাসিমুখে চলে গেল। একটু পরেই ওর টিনে-ছাওয়া ঝোপড়ির পাশের টিনের চালা থেকে ডাকলে—আইয়ে হুজুর, পানি দিয়া।

আমি গিয়ে হাজির হলাম সেখানে। একটা জায়গায় মাটির ওপরেই অনেকগুলো ইঁট পাতা। সরু সরু পুরনো ইঁট। তার ওপর একটা কাঠের চৌকি। এক পাশে দুটো বড় বালতিতে জল আর এক অ্যালুমিনিয়মের মগ।

এই জনহীন মরুভূমির মত জায়গায় এ যে রাজা-বাদশার আয়োজন! খুশী মনে গায়ের জামা খুলে চামারিয়ার হাতে দিতেই সে হাসিমুখে বললে—সরকার, আপ আস্নান কর লিজিয়ে না। বহুত অচ্ছা লাগেগা।

চামারিয়ার কথা শুনে স্নানই করে ফেললাম। স্নান করতে করতে জিজ্ঞাসা করলাম—এ ইঁট কোথা থেকে এনেছো চামারিয়া? ওই তালাওয়ের ভাঙা ঘাট থেকে, নয়?

চামারিয়ার তো সদা সর্বদা জোড়হাত। সে ঘাড় নেড়ে বললে—জী সরকার।

আমার অনুমানই ঠিক। তার মানে, এ ইঁট হ'ল আখড়াইয়ের দীঘির ঘাটের ইঁট। হয়তো ওই ইঁটেরই এক-দুখানার ওপরে আমার 'আখড়াইয়ের দীঘি'র গল্পের কালী বাগ্দী মাথা গুঁজে পড়েছিল।

ওদিকে যাঁরা পুকুরে স্নান করতে গিয়েছিলেন তাঁরা মাথায় ভিজে তোয়ালে চাপিয়ে হাসিমুখে ফিরে আসছেন। আমার চোখে চোখ পড়তে প্রোডিউসার ভদ্রলোক বললেন—খুব ভাল করলেন দাদা স্নান করে।

অন্য একজন, ইউনিটের ক্যামেরাম্যান বললেন—এখানে ছবি নিলে ছবি যা হবে একখানা। আর দাদা, কী পুকুর, আর কী জল! এমাথা থেকে ওমাথা নজর চলে না, আর কাকের চোখের মত জল। আর তেমনি কী ঠাণ্ডা!

তবে ঘাট নেই। আঘাটায় স্নান করতে হ'ল। যত পাজাড়ি, আর পদ্মের জঙ্গল।

আমার মাথার মধ্যে কেমন এক ধরনের মিশ্র স্মৃতি তৈরী হয়ে যাচ্ছিল। আখড়াইয়ের দীঘির পরিবেশের সঙ্গে গয়ার সেই জঙ্গলের ছবি কেমন করে মিলে-মিশে যাচ্ছিল যেন।

এই সময় শিবাজী এসে ডাকলে—খাবার জায়গা হয়ে গিয়েছে। খেতে বসতে হবে।

শিবাজীর মূল আস্তানার দুদিকে দুটো চালা। একটার থেকে বেরিয়ে অন্যটায় গিয়ে হাজির হলাম। শিবাজী নিজে শালপাতার তাড়া হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা যেতেই শিবাজী দরাজ গলায় বললে—মেহ্‌মান লোগ, বৈঠ্ যাইয়ে। সে প্রত্যেকের হাতে তিনখানা করে পাতা দিতে লাগল। বলে দিলে, একখানায় বসা, দুখানায় খাওয়া। আমরা সারিবন্দী বসে গেলাম। জন-নয়েক লোক আমরা। তার মধ্যে সাতজন আছি। আর দু'জন কান্দী গিয়েছে মিস্ত্রী আনতে।

দলের কয়েকজন সেই অনুপস্থিত দু'জনের জন্যে ভাবতে লাগলেন। শিবাজী বললে—কোনো ভাবনা নেই খুনি। ওঁরা খুনি ঠিক এসে যাবেন।

খেতে বসলাম। খাসা আয়োজন। আর কী উপাদেয় রান্না। সরু চালের ভাত, ঘি, মুগের ডাল, মাছ ভাজা আর মাংস। এখানে এই জনহীন মরুভূমিতে ঝাঁ ঝাঁ দুপুর রোদের ভেতর যে এইভাবে আমাদের স্নানাহার হবে তা কে জানত। এটা আমাদের কাছে একটা 'সারপ্রাইজ'। আমাদের পরিবেশন করছে চামারিয়া আর অনসূইয়া। মাংস আর ভাজা মাছ অনসূইযাই পরিবেশন করলে। মাথায় ছোট্ট ঘোমটা, মাজা চিকণ রঙ, সিঁথিতে অল্প সিঁদুর, হাতে এক হাত কাঁচকড়ার চুড়ি। পরনে লাল শাড়ী। সে প্রতিটি জনের সামনে বেশ সপ্রতিভভাবে হেসে আর মাছ বা মাংস লাগবে কি না তা জিজ্ঞেস করে করে স্বচ্ছন্দে পরিবেশন করে গেল। কোথাও আটকাল না তার। শিবাজী দাঁড়িয়ে রইল হাসিমুখে গৃহস্বামী হয়ে।

খাওয়া হতে-হতেই দেখলাম অনেক দূরে ফাঁকা মাঠে ধুলো উড়িয়ে একখানা জিপ আসছে। আমাদের ক্যামেরাম্যান হৈ হৈ করে উঠল—ওই আসছে, আমাদের গাড়ী আসছে। যাক, ভাগ্য আমাদের ভালই বলতে হবে। ফাঁকা মাঠে পথের মধ্যে এই খাওয়া, তার সঙ্গে গাড়ী মেরামতের ভাবনারও শেষ হ'ল।

শিবাজী কোমরে হাত দিয়ে নায়কের মত আমাদের 'দেখভাল্' করছিল। সে বলছিল—আপনারা খুনি শহরের লোক কি না, তাই আপনাদের অত ভাবনা। অত খুনি ভাবনা কিসের মশাই? আমরা তো ফাঁকা মাঠেই পথের ধারে রয়েছি। আর খুনি বেঁচেও আছি দিব্যি। আপনারা এসেছেন। গাড়ী মেরামত হোক, রাত্তিরটা থাকুন। আমার অনসুইয়ার হাতের মুর্গীর রোষ্ট খান রাত্তিরে। গানা-বাজানা করুন। তারপর কাল ভোরে চা খেয়ে রওনা হবেন।

প্রোডিউসার ভদ্রলোক খেতে-খেতেই দু'হাত যতখানি কাছাকাছি আনা যায় এনে হাতজোড় করার ভঙ্গি করে বললেন—আজ্ঞে আমাদের মাপ করবেন। আজ সন্ধ্যেতেই আমাদের ফিরে যেতে হবে। আর আবার তো আমরা আসছিই আপনার এখানে শুটিং করতে। তখন তো আপনার আশ্রয়েই থাকতে হবে।

শিবাজী চটে গেল খানিকটা। বললে—আরে মশাই, আমি কি খুনি আপনাদের আটকাচ্ছি? রাস্তা দিয়ে খুনি কত লোক তো যায়, কত লোক আসে। তাদের নিয়ে কি খুনি আমার মাথাব্যথা থাকে? তা থাকে না। আমি তো খুনি আর পাগল-ছাগল নই যে রাস্তা দিয়ে যে যাবে তাকেই ডেকে আদর করে থাকতে বলব। কিন্তু আপনাদের সঙ্গে এমন এক আদমি রয়েছে যে হমারা দীলকে প্যার। তাকে আচমকা পেয়ে গিয়েছি বলেই খুনি আমার এত বলা।

তার বলার ভঙ্গি এত অকপট, এত সরল যে তার সাফ কথা শুনেও কেউ রাগ করলে না। হাসতে লাগল। সবচেয়ে বেশী হাসল প্রোডিউসার। কিন্তু শিবাজীর মনের আর্তি আমার মনকে ছুঁয়ে গেল। আমি হাসতে পারলাম না। মুখ নীচু করে খেতে থাকলাম।

খাওয়া হয়ে গেল। সন্ধ্যের কাছাকাছি গাড়ীও মেরামত হয়ে গেল। মিস্ত্রীদের পৌঁছুবার কথা বলায় তারা বললে—আমাদের আর উল্টে কাঁদী পৌঁছে দিতে হবে না। আমাদের সঙ্গে করে সাঁইথিয়া নিয়ে চলুন। আমরা ওখান থেকে বাসে ফিরে আসব।

আমরা সবাই জামাকাপড় পরছিলাম। তৈরী হচ্ছিলাম রওনা হবার জন্যে। শিবাজী আমার যাওয়াটা মেনে নিয়েছে। দুপুরের রাগও ভুলে গিয়েছে। সে জোর করে বিকেলে একবার চাও খাইয়ে দিলে।

চা খেয়ে পাঞ্জাবিটা গায়ে চড়াচ্ছি, শিবাজী ওদিকে অন্য অতিথিদের সঙ্গে কথা

বলছে, এমন সময় শিবাজীর দুসাদিন অনসুইয়া এসে আমার কাছে, বেশ কাছে এসে দাঁড়াল। মাথার ঘোমটা পুরোটাই তোলা। এক মাথা চুল দেখতে পাচ্ছি। সে আমার দিকে খুব রহস্যময়ভাবে তাকিয়ে বললে—বাবুজী সাহাব, আপনি এলেন, চলে যাচ্ছেন; আমার সঙ্গে একটা কথাও বললেন না? চিনতেই পারলেন না আমাকে? মেরা নসীব!

বলে যেন একটি সূক্ষ্ম কৌতুকে সে একটু হাসল। সে হাসি অতি উৎকৃষ্ট হাসি। সে হাসি কলকাতার লেখাপড়া জানা কোনো ঘরনীর মুখেও দিব্যি মানিয়ে যেত। এ মেয়ে আধুনিক সভ্যতার অনেকখানিই আত্মসাৎ করেছে বলে মনে হ'ল। তবু তার কথা থেকে, তার হাসির ভঙ্গি থেকে যেন তাকে আব্‌ছা আব্‌ছা চিনতে পারলাম। আমি অবাক হয়ে বললাম—তার মানে, তুমি, তুমি, তুই সুরসুতিয়া?

এইবার অনসুইয়া হেসে ভেঙে পড়ল। হাসতে হাসতে বললে—এইবার এতক্ষণে চিনেছেন তাহলে?

হেসে বললাম—চিনলাম। কিন্তু তুই অনসুইয়াই বা কেন হলি কেন আর শিবাজী তোকে দুসাদিনই বা বলতে গেল কেন?

মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হাসতে লাগল অনসুইয়া। বললে—আপনাকে বলব বলেই তো এসেছি। কিন্তু একটা দিন না থাকলে বলব কি করে?

আমি তার মুখের দিকে চেয়ে এক মুহূর্তেই ঠিক করে ফেললাম, আমি একটা দিন রয়েই যাব। জামাটা খুলতে লাগলাম।

অনসুইয়া অবাক হয়ে বললে—কি হ'ল?

বললাম—আজ রয়েই গেলাম। তোরই জন্যে।

অনসুইয়া স্বর নরম করে বললে—নহি নহি ভাগনাবাবু, ওইসা নহি বোলনা। আমার জন্যে থাকলেন শুনলে আপনার মামা মনে দুঃখ পাবেন।

অনসুইয়ার কথায় একটু লজ্জা পেলাম। বললাম—তাই হ'ল। তবে কথাটা কি জানিস? যখন শুনলাম তোর নাম অনসুইয়া আর তুই দুসাদিন, তখন ভেবেছিলাম গয়ার জীবনটা মামাজী পুরোপুরি চুকিয়ে দিয়ে গয়া ছেড়ে একটা নতুন জীবনে পা দিয়েছে। এখন দেখছি গয়ার জঙ্গলের সেই জীবন, সেই গল্প আজও শেষ হয়নি। গয়ার জঙ্গল থেকে মামাজী সে জীবনকে, আর সেই সঙ্গে সেই জীবনের গল্পকে মুর্শিদাবাদ জেলার ফাঁকা মাঠে টেনে নিয়ে এসেছে। সে জীবনে পুরনো সুরসুতিয়া আছে। আছে অনসুইয়া হয়ে। চিরকালের পুরনো চামারিয়া, সে-ও আছে। তাই ভাবছি, পুরনো গল্পের শেষটা শুনে যাই।

অনুসূইয়া ছুটে চলে গেল আমার কাছ থেকে। একটু পরেই শিবাজীকে ডেকে নিয়ে এল। বেশ জোর করে হুকুম জারি করে বললে—ভাগনাবাবুকে বল আজ থেকে যেতে। আমি বলছি, তা উনি শুনছেন না।

শিবাজী হাসল একটু বোকার মত।

আমিই বললাম—আমি আজ আর কাল একটা বেলা রয়েই গেলাম মামাজী।

এক মুহূর্তে বদলে গেল শিবাজী। সে আমাকে জড়িয়ে ধরে চীৎকার করে উঠল—হুর্‌রে! তাবপর আমাকে ছেড়ে দিয়ে ছুটে চলে গেল জীপের কাছে।

আমিও হাসিমুখে গেলাম ওদেব পিছু পিছু। শিবাজী তখন উৎফুল্ল মুখে ওদের বলছে—মেহ্‌মান লোগ্‌, ফেয়ারওয়েল। ফির্‌ আইয়েগা, ফির্‌ মিলেঙ্গে। বাকী সেরা মেহ্‌মান কো তো হম্‌ রাখ লিয়া।

আমি হাসিমুখে প্রোডিউসারকে বললাম—ভাই, আজ এখানে রয়ে গেলাম। পৌঁছে আমার বাড়ীতে একটা খবব দিয়ে দেবেন। আমি কাল রাত্রিতে রওনা হয়ে পরশু সকালে পৌঁছুব।

প্রোডিউসাব হেসে বললে—ঠিক আছে দাদা, আপনি কিচ্ছু ভাববেন না। আমি আপনার বাড়ীতে খবর দিয়ে দেব। আপনি এক রাত আপনাব 'আখড়াইয়ের দীঘি'র হাওয়া খান। আর আপনার মামা-মামীর সঙ্গে গল্প করুন।

সরল শিবাজী শুনে হাসতে লাগল খুশী হয়ে। কিন্তু 'মামা-মামী'র মধ্যে রসিকতার অন্তরালে যে অতি সূক্ষ্ম শ্লেষটি ছিল তা আমাকে বিদ্ধ করে গেল। উত্তর দিতাম। হয়তো বা রূঢ় কি নিষ্ঠুর উত্তরই দিতাম। কিন্তু দেওয়া হ'ল না। জীপ দুটো তার আগেই ধুলো উড়িয়ে যেন সন্ধ্যার আব্‌ছা অন্ধকাবে মিলিয়ে গেল। সামনেব অন্ধকারের দিকেই রুষ্ট মন নিয়ে চেয়ে থাকলাম।

কিন্তু পিছন ফিবে তাকিয়েই মনটা খুশীতে চমকে উঠল। মনে হ'ল, এ আমি কোথায় রয়েছি! সামনে যতদূর দৃষ্টি যায় একটা অস্পষ্ট ধূসরতা দূর-দিগন্ত পর্যন্ত ধূ-ধূ করছে। না না, মর্ত্যলোকের ধুলোয় নয়, আকাশলোক থেকে ঝরে-পড়া জ্যোৎস্নায় এক আশ্চর্য ধূসরতার সৃষ্টি হয়েছে। আর সব কিছুকে ছাপিয়ে সামনে আখড়াইয়ের দীঘির ধারের বড় বটগাছটার ডালের ফাঁক দিয়ে পূর্ণিমার চাঁদ উঠছে।

হ্যাঁ, পূর্ণিমারই চাঁদ তো। একেবারে গোল সোনার থালার মতো। মনে পড়ল আগামীকাল বৈশাখী পূর্ণিমা। ওই তো কোথায় যেন ওই ধূসর কৃষ্ণাভ

বনরেখার ভেতর থেকে গম্ভীর ঢাকের শব্দও ভেসে আসছে। কাল বৈশাখী পূর্ণিমা, মানে বুদ্ধ পূর্ণিমা। এখানে এই রাঢ় অঞ্চলে ধর্মরাজের পূজার ও উপবাসের মধ্য দিয়ে সেই অমৃতময় পুরুষের জন্মদিন উদ্‌যাপিত হয়।

আমি হাঁ করে চাঁদের দিকে চেয়েছিলাম। শিবাজী আমার কাছে এসে দাঁড়াল। বললে—কি দেখছ ভাগনা? চাঁদ? আরে চাঁদ তো ছোট বাচ্চাতেই দেখে। মা চাঁদ দেখিয়ে খুনি ছেলে ভোলায়। বড় মানুষে আবার চাঁদ দেখে নাকি?

আমি তার কথাগুলো শুনেও শুনলাম না যেন। আমি বিহ্বল হয়ে এই জনহীন, ধূ-ধূ মাঠের মাঝখানে আকাশের চাঁদই দেখছিলাম। আমি আপন মনেই তাকে বললাম—জানো মামা, আমি অল্প বয়সে একটা গল্প লিখেছিলাম। এই আখড়াইয়ের দীঘি নিয়ে। সে এক মেঘে ঢাকা অন্ধকার রাত্রির গল্প। সেই টিপ টিপ বৃষ্টির অন্ধকার রাত্রিতে ঠ্যাঙাড়ে টাকা রোজগার করবার জন্যে অন্ধকারে ঝোপের ভেতর বসেছিল, মানুষকে ঠেঙিয়ে মেরে তার সব কেড়ে নেবার জন্যে। সেদিন সে ভুল করে মারলে নিজের একমাত্র ছেলেকে।

পাশ থেকে নারীকণ্ঠে সঙ্গে সঙ্গেই শুনলাম—আয় বাপ্!

ফিরে চাইলাম। দেখলাম আমার অন্য পাশে সুরসুতিয়া এসে দাঁড়িয়েছে। সে, আমি গল্প আরম্ভ করবার মুহূর্তেই এসে পাশে দাঁড়িয়েছিল। সবটা শুনে সে চমকে উঠে সভয়ে খেদোক্তি করে বললে—আয় বাপ্।

আমি ওর দিকে ফিরে বললাম—তুই গল্পটা বুঝতে পারলি? যে লোকটা পেশা বেছে নিয়েছিল মানুষ খুন করে টাকা রোজগার করবে, সেই লোকটাই একদিন ভুল করে মারলে নিজের একমাত্র ছেলেকে।

একটা ঢোঁক গিলে সুরসুতিয়া বললে—এই রকম সত্যি সত্যি হয়েছিল?

আমি হেসে বললাম—হয়েছিল কি না জানি না, তবে আমি এই রকম গল্প লিখেছিলাম। তবে বুঝলি রে, আমি যদি আজকের এই চাঁদের আলোয় ধোওয়া এই ধূ-ধূ মাঠের মধ্যে আখড়াইয়ের দীঘি ওই গল্প লিখবার আগে দেখতাম তাহলে ও গল্প লিখতামও না, লিখতেও পারতাম না। তা তুই গল্পটা বুঝতে পারলি?

সুরসুতিয়া কিছু বলবার আগেই শিবাজী হা হা করে হেসে বললে—আরে ভাগনা, ও বুঝবে না খুনি তো কি আমি বুঝব? ও বি. এ. পর্যন্ত পড়েছে তা জান?

আমি অবাক হয়ে বললাম—আরে তাই নাকি? আচ্ছা, আচ্ছা!

খুব তারিফ করলাম ওকে।

শিবাজী সঙ্গে সঙ্গে বললে—আরে তুমি যে এখন এত বড় লিখনেবালা হয়েছ তা কি আমি জানতাম ? স্বরস্বতিয়াই তো প্রথম আমাকে তোমার কথা বলেছিল।

আমি সকৌতুক বিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম—কি রকম ?

শিবাজী সোৎসাহে বললে—দু'বছর আগে আমরা তখন কান্দীতে ছিলাম কান্দীর কাছে রাস্তা তৈরীর কাজ হচ্ছিল। আমরা তখন থাকতাম কান্দীতে একটা বাংলা কাগজে তোমার নাম আর ছবি দেখে ও আমাকে দেখাতে নি আসে। তোমাকে দেখেই তো খুনি আমি চিনলাম। বললাম—হাঁ, ইয়ে তে মেরা ভাগনা। আমার কথা শুনে ও চোখ বড় বড় করে বললে—আরে বাপ ইয়ে ওহি আদমী ? আমার ছেলেবেলায় জঙ্গলে দেখেছিলাম। আরে বাপ উ এত্‌নে বড়া 'রাইটার' বন গয়ে ?

শুনে হাসতে লাগলাম। স্বরস্বতিয়াকে কিছু বলবার জন্যে পাশ ফিরে তাকাতে গিয়েই দেখলাম স্বরস্বতিয়া নেই। সে চলে গিয়েছে।

শিবাজী গলা তুলে ডাকল—স্বরস্বতিয়া, এ স্বরস্বতিয়া !

চামারিয়া এসে দাঁড়াল নিঃশব্দে। বললে—উ তো চায়ে বনা রহি হ্যায়।

শিবাজী বললে—আমাদের জন্যে ওই বটগাছের তলায় সতরঞ্চি পেতে দে আর রাত্তিরের খাবার ব্যবস্থা কর্।

আমরা দু'জনে বটগাছের তলায় এসে বসলাম সতরঞ্চির ওপর। গ্রীষ্মদিনের দাহ আস্তে আস্তে কমে আসছে। কোন্ দূর-দিগন্ত থেকে মধ্যে মধ্যে ঝিরঝির করে বাতাস বয়ে আসছে। বটগাছের পাতায় তারই খস্‌খসানি। চামারিয়া দুটো তাকিয়া দিয়ে গেল। আর দিয়ে গেল এক গড়্গড়া। আমি বালিশে গড়িয়ে পড়তে পড়তে বললাম—তুমি তো দেখছি জঙ্গল ছেড়ে এসে এই ফাঁকা মাঠেও দিব্যি বাদশার মতো আছ।

শিবাজী হাসিমুখে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে গড়গড়া টানতে টানতে হাসল।

জিজ্ঞাসা করলাম—তারপর এক বছর কি রকম করে কাটালে বল দেখি।

একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ে যেতেই একই সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম—আজ সকালে যখন এলাম তখন কাকে অমন করে তাড়াচ্ছিলে—'নেহি মাংতা হ্যায়। ভাগো ভাগো। চলা যাও' বলে ? দেখলাম ছাঁদটা ঠিক আগের মতই আছে। এতটুকু বদলায়নি।

শিবাজী আবার হাসল হা হা করে। বললে—সকালেই তো হিসেব করলে। বাইশ-তেইশ বছর পার হয়ে গেল। যারা আমার সঙ্গে এই পঁচিশ-ত্রিশ বছর আছে তাদেরই বলছিলাম। কাল ওরা-সব খুব খেটেছিল, বাড়তি কাজ

করেছিল। আমি দুটো বকরীর দাম দেব বলেছিলাম। তা আজ সকালে বকরার দাম নিয়ে বলে, হুজুর মালিক, আজ ছুটি দিন। আজ বকরী কেটে পরব করি। তাই তাড়াচ্ছিলাম ওদের। ওইভাবেই গাল-মন্দ দিয়ে ওদের ছুটির আর্জিটা মঞ্জুর করলাম আর কি!

আমি অবাক হয়ে বললাম—এরা কি সেই শিব্বা মহারাজের মাউলী সৈন্যের মতো তোমার গয়ার সেই জঙ্গলের দুসাদ মুসহরের বাহিনী?

গড়গড়ার নলটা সরিয়ে রাখতে রাখতে শিবাজী বললে—জী, তারাই।

বললাম—এমন টুকরো টুকরো করে বললে তো হবে না। গোড়া থেকে বল।

শিবাজী বললে—আরে মেরে পিয়াবে ভাগনা, তুমি ভাই কেতনা বড়া লিখনেবালা, তোমার কাছে আমি কি 'গপ্' বলব? আমি বলতে পারব কেন? সে খুনি তুমি বরং সুরস্থতিয়াব কাছে শুনবে। ডাকি সুরস্থতিয়াকে।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিয়ে বললাম—আরে না না, ওকে ডাকতে হবে না। তুমিই বল। আমি তোমার মুখ থেকেই শুনব। আমি বরং তোমাকে ধরিয়ে দি। সেই তোমার ছোটে দাদোজী, মানে হাবাধন মুখুজ্জে পার্বতী আর সুরস্থতিয়াকে নিয়ে গয়ায় থাকবেন এই ঠিক হ'ল। সেই ব্যবস্থা হ'ল দেখে আমি চলে এলাম। তুমি তার পর থেকে বল।

শিবাজীর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। সে হৈ-চৈ করতে পারে, দুমদাম করে কাজ করতে পারে। কিন্তু এত দীর্ঘদিনের ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ দেওয়া তাব পক্ষে অসাধ্য ব্যাপার।

তবু সে আরম্ভ করলে। বলতে লাগল—ছোটে দাদোজীর ব্যবস্থা আরও পাকা, বুঝলে ভাগনা। আমি তখন জঙ্গল থেকে গয়ায় কমই আসতাম। ইচ্ছে করেই কম আসতাম। ছোটে দাদোজী ওদের অভিভাবক তখন। আর তিনি পার্বতীয়াকে চেনেন ছেলেবেলা থেকে। আমি ঘন ঘন গেলে আমার যাওয়াটা তিনি কি চোখে দেখবেন তা তো জানি না।

ছোটে দাদোজীর হাতে ওদের ভার দেওয়ার দু'মাস পর আমি আবার গেলাম গয়ায়। ঢুকতেই সুরস্থতিয়া ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। কাঁদে আর বলে, তুমি এতদিন আসনি কেন? আমি বাড়ীটা দেখছিলাম। দেখলাম, ছোটে দাদোজী বাড়ীর হাল ফিরিয়ে দিয়েছে। গোটা বাড়ী মেরামত করিয়েছে, চুনকাম করিয়েছে। আমাকে অনেক আপ্যায়ন করে বললে—বাবা, তোমার বাড়ী তোমাকে না বলেই মেরামত করিয়েছি। তবে জানি, তুমি কিছু

মনে করবে না। আর বাবা, আমি কি অপরাধ করলাম যে তুমি এতদিন পরে এলে?

কিন্তু পার্বতী যে কে সেই। সে আমার সঙ্গে আলাদা করে কথা বলেনি, মুখের ঘোমটা এক ইঞ্চিও কমায়নি। তবে ওর মনটা বুঝতে পারতাম খাবারের থালা থেকে। ভাতের থালা এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত নানান্ রান্নায় ভর্তি হয়ে থাকত।

প্রথম দিন খেতে খেতে ছোটে দাদোজীকে জিজ্ঞাসা করলাম—বাড়ী মেরামত করতে কত খরচ পড়ল দাদোজী?

ছোটে দাদোজী বললেন—কেন বাবা, একথা জিজ্ঞাসা করছ কেন? খরচটা দেবে বলে? তা বেশী খরচ তো হয় নাই। আর যা হয়েছে তা আমারই দেবার ক্ষমতা আছে। আমার নিজের কিছু টাকা আছে। আর পার্বতীয়ারও অনেক গয়না আছে বাবা। টাকার ভাবনা নেই। আমার টাকাতেই চলে যাবে। আর পার্বতীর গহনা পার্বতী রেখেছে সুরসুতিয়াব বিয়ের জন্যে।

বুঝলে ভাগনা, সব শুনে আমি চুপ করে গেলাম। আর কিছু বললাম না। তারপর থেকে আগের মতই মাসে একবার দু'বার করে গয়া আসতে লাগলাম। ছোটে দাদোজী জোর করে আমাব হিসেবপত্রও খুঁটিয়ে দেখে দিতেন।

একবার গিয়ে শুনলাম, ঢনঢন শাব কাছে আমি যে টাকা ধার করেছিলাম তা সুদসুদ্ধ সব শোধ করে দিয়ে এসে ধারের কাগজখানা ফিরিয়ে এনেছেন।

আমি আপত্তি করায় তিনি খুব দুঃখ করে বলেছিলেন—বাবা, তুমি শিবের তুল্য মানুষ। আমি সেই শিব পূজা করেছি। যদি আমার বা আমাদের কোনোদিন অর্থাভাব হয় তখন তোমাকে বলব, চাইব তোমার কাছে।

ছোটে দাদোজী তখন গয়াতে ধানচালের কারবার আবার আরম্ভ করেছেন। আমাকে বললেন—বাবা, আমি চুপ করে বসে থাকতে পারি না। তাই আবার কাজে লেগেছি। তুমি বিশ্বাস কর, কোনো টাকা রোজগারের ধান্দা আমার নাই। বসে থাকি না খই ভাজি। তবে সুরসুতিয়ার বিয়েও দিতে হবে তো। আর তা ছাড়া টাকা কোনোদিনই বেশী কি বাড়তি হয় না বাবা? তা কাজে লাগেই। আমি যদি মুফতে কিছু আনতে পারি তো মন্দ কি?

দিন ভালই চলছিল ভাগনা। বেশ ভাল। এমন কি, বলতে গেলে দাদোজীর সময়ের চেয়েও ভাল চলছিল। আমার কেউ নাই, কিন্তু আমার কত আত্মীয়-স্বজন। গয়ায় এক সংসার, আর জঙ্গলে প্রায় তিন চারশো লোক।

বেশ দিন চলছিল।

ছোটে দাদোজী ব্যবসা করে, সংসার দেখে, পার্বতী রান্নাঘরে রান্না করে, সুরস্থতিয়া ইস্কুলে যায়। সুরস্থতিয়া লেখাপড়ায় বেশ ভাল। বরং যত দিন যেতে লাগল ততই ভাল হয়ে উঠতে লাগল লেখাপড়ায়। ছোটে দাদোজী, দাদোজীর মতো ওর লেখাপড়া দেখিয়ে দিতে পারত না বলে, ছোটে দাদোজী ওর জন্যে মাষ্টার রেখে দিলেন।

যতদূর মনে পড়ছে সেটা বোধহয় উনিশ শো সাঁইত্রিশ সাল। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিলে সুরস্থতিয়া। পরীক্ষা দেবার সময় গোল বাধল ওর পরীক্ষার ফর্ম ভর্তি করা নিয়ে। ওর বাবার নাম চাই। খুব অস্বস্তিতে পড়লাম। পার্বতী চুপ। সে এ নিয়ে কথা বললে না একটিও। সুরস্থতিয়া আমাকে কেবল তাগিদ দেয়। দেরি করাও চলবে না। আমি ছোটে দাদোজীকে জিজ্ঞাসা করলাম কি করা যায়। ছোটে দাদোজী পার্বতীর সঙ্গে আড়ালে পরামর্শ করলেন। তারপর আমাকে বললেন—কি করি বলতো বাবা? এ তো খুব মুশকিলের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। বুঝলে ভাগনা, আমার মনে হ'ল সুরস্থতিয়া বড় হয়েছে। ওকে সব খুলে বলা উচিত। সেই কথাই বললাম ছোটে দাদোজীকে। ছোটে দাদোজী বোধহয় পার্বতীকে বলেছিলেন সেকথা। তারপর যে কি হ'ল তা বুঝলাম না। সেদিন পার্বতী আর সুরস্থতিয়া দু'জনেই ঘর বন্ধ করে শুয়ে রইল। কেউ উঠল না, খেলে না। ছোটে দাদোজী ও নিয়ে একটিও কথা বললেন না। তিনিই নিজে রান্না করলেন। খেলাম আমরা দু'জনে। চুপচাপ খেতে খেতে উনি যেন সেই চুপচাপটা ভাঙবার জন্যেই চেষ্টা করে হেসে বললেন—কি বাবা, রান্না খারাপ হয়েছে? বহুদিন তো রান্না করিনি। তবে এক সময় তো আমি নিয়মিত রান্না করেই খেয়েছি। খেয়ে দেখ বাবা। আমিও হেসে বললাম—ভালই হয়েছে। এখন আপনার রান্না প্রতিদিনই খেতে রাজী আছি। ছোটে দাদোজী হেসে বললেন—তার দরকার হবে না বাবা। পার্বতীই কাল থেকে রান্না করবে। আজ মা-মেয়ে দু'জনেরই বেশ চড়া ধাক্কা লেগেছে তো। ওকথা মুখ ফুটে বলা আর কান পেতে শোনা—দুই-ই কঠিন কাজ। তুমিই বল না বাবা।

সেদিনটা গেল। পরদিন সকালেই এক আশ্চর্য ব্যাপার। পার্বতীয়া প্রতিদিনের মতো স্নান করে রান্না ঘরে চলে গেল। কিন্তু সুরস্থতিয়া যেন এক রাত্রিতেই বদলে গিয়েছে। খুশীতে চনমন করছে সে। সে স্নান করল, খাওয়া-দাওয়া করল। তারপর আমাকে সঙ্গে নিয়ে ইস্কুলে গেল। ইস্কুলের সঙ্গে তো আমার বেশী সম্পর্ক নাই, তুমি জানই। তবু আমাকে সবাই মোটামুটি চেনে। চেনে বোধহয়

ত্রৈলোক্যবাবু ওকীলের লোক বলে। সবাই আমাকে খুব খাতির করলে। ইস্কুলের হেড মিসট্রেস্ আমায় আদর করে তাঁর সামনে বেঞ্চে বসালেন। আমার পাশে বসেই সুরসুতিয়া ফর্ম ভর্তি করল। ওর ফর্ম ভর্তি করা হয়ে গেলে হেড মিস্ট্রেস ফর্মখানা দেখে আমার হাতে দিয়ে বললেন—আপনি তো সুরসুতিয়ার গার্জেন। আপনি একবার দেখুন। হেসে বললেন—এতদিনে তোর নাম পালটাবার সখ হ'ল? কেন সরস্বতী নাম খারাপ কি? তা বেশ, তোর যখন ইচ্ছে তখন অনুসূয়াই হয়ে যা। কি বলেন শিবাজীবাবু?

আমি কিন্তু ফর্ম দেখতে গিয়ে অবাক। এসব কি লিখেছে সুরসুতিয়া তার ফর্মে? তার নাম অনসুইয়া দুসাদ। বাবার নাম চমরুপ্রসাদ দুসাদ। এ কি এসব? আমি সুরসুতিয়ার মুখের দিকে চাইলাম। সুরসুতিয়ার মুখে ভাবের বিন্দুমাত্র তার-তফাৎ নেই। সে বেশ সহজভাবেই আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। কিন্তু ডান হাত দিয়ে শক্ত করে একটা চিমটি কেটে দিলে আমাকে। সে ইঙ্গিতের মানে আমি বুঝলাম। এ সম্বন্ধে কোনো কথা বলতে ও আমাকে বারণ করছে। আমি চুপ করে রইলাম। ফর্ম আর পরীক্ষার ফীজ জমা দিয়ে ওকে নিয়ে ইস্কুল থেকে বেরিয়ে এলাম। রাস্তায় এসে জিজ্ঞাসা করলাম—ও সব তুই কি লিখলি ফর্মে?

সঙ্গে সঙ্গে সুরসুতিয়ার মুখ-চোখের চেহারা বদলে গেল। ওর মুখখানা যেন রাগে উত্তেজনায় চকচক করে উঠল। চোখ দুটো যেন ঝকঝক করে উঠল। আমার দিকে ফিরে চনমন করে বললে—তা না হলে কি লিখতাম বলুন তো? যার বাবার নাম জানা নেই সে কার নাম লিখত?

এর কি জবাব দেবো আমি? চুপ করে রইলাম।

সুরসুতিয়া বললে—তাই যা করেছি ঠিকই করেছি। অল্প বয়েস থেকে চামারিয়াকেই বাবা বলে জেনে এসেছি। জ্ঞান বুদ্ধি হলে আমার বদবুদ্ধি কেমন মন্ত্রণা দিয়েছে—ও তোর বাবা নয়! মায়ের মুখেও দু'একবার এ রকম কথা শুনেছি। শুনে মনে কেমন সন্দেহ হ'ত। যাক, এখন থেকে আমি চামারিয়াকেই বাবা বলে মনে করব।

আমি কোনো উত্তর না দিয়ে ওর পাশাপাশি হেঁটে চললাম। হাঁটতে হাঁটতে এক সময় অদ্ভুতভাবে আমার মুখের দিকে চেয়ে কেমন এক রকম করে বললে—যাক। বাবার নাম জানি না, এ তো তবু মন্দের ভাল। ভাগ্যে আমার ফর্মে আপনার নাম লিখতে হয়নি।

আমার সমস্ত শরীরের মধ্যে কি হয়ে গেল। আমি থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম।

রাগে আমার মধ্যে তখন যেন রক্ত এখান থেকে ওখানে বেবাগা পাগলা ঘোড়ার মতো ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছিল। আমি তার দিকে চেয়ে বললাম—কি, কি বললি তুই? আমাকে কি বললি?

ও আমার রাগ দেখে অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপর আমার রাগ দেখেও তা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে খিল খিল করে হেসে ভেঙে পড়ল।

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। কিন্তু ও তখনও সমানে পাগলের মতো হেসে চলেছে। আমি ওর দিকে কিছুক্ষণ স্তম্ভিতের মতো তাকিয়ে থেকে ওকে ফেলে হনহন করে এগিয়ে চলে গেলাম।

অনেকটা এগিয়ে চলে এসেছি, এমন সময় শুনলাম, স্বরস্বতিয়া আমাকে পিছন থেকে ডাকছে—বাবুজী সাহাব, এ বাবুজী সাহাব। খড়া হো যাইয়ে। শুনতে হেঁ, খড়া হো যাইয়ে।

আমার পেছনে আমি ওর হিলতোলা জুতোর খট্‌খট্‌ শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। আমি রাগ সত্ত্বেও দাঁড়িয়ে গেলাম। ও ছুটতে ছুটতে এসে আমার হাত চেপে ধরল। আমার মুখের দিকে চেয়ে স্বরস্বতিয়া বললে—আমার ওপর রাগ করেছেন?

আমার ওর মুখের দিকে চাইতে রাগ হচ্ছিল। ও আমাকে বললে—তাকান তো আমার দিকে। তাকিয়ে দেখুন। আমি কি বলেছি আপনাকে?

আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম—কি বলেছিস তুই-ই ভেবে দেখ।

ও কেমন অবলীলাক্রমে হেসে বললে—কি কিছু অন্যায় বলেছি?

বললাম—তুই-ই বল, অন্যায় বলেছিস কি না।

ও বেশ সহজভাবেই বললে—আমি যা বলেছি তার মানে কি এই নয় যে, আপনার ওপরে আমার পিতৃত্বের দায়টা ভাগ্যে চাপানো হয়নি?

আমি বুঝে বললাম—তাই তো!

—তা হলে দোষের কি পেলেন?

আমাকে চুপ করে যেতে হ'ল। তবু রাগতভাবে বললাম—না। তাহলেও তুমি এমনভাবে আর কথা বলো না। তোমার মায়ের নামের সঙ্গে আমার নাম জড়িয়ে কোনো কথা তুমি কোনো দিন উচ্চারণ ক'রো না। তুই তো আমাকে জানিস। অন্য কেউ এ ধরনের কথা বললে আমি তার কি হাল করতাম তা তো তুই আন্দাজ করতে পারিস।

স্বরস্বতিয়া আবার হেসেই সারা।

হাসতে হাসতে সে বললে—বহুত আচ্ছা। আমি বুঝতে পেরেছি। আমার মাকে আপনি ও রকমভাবে পেয়ার করেন না। এই তো?

সত্যি বলছি ভাগনা, আমার মনে হ'ল মেয়েটা কী নির্লজ্জ! আমি রাগ করে চুপ করে রইলাম। ও আমার হাত ধরে টানতে টানতে বললে—ঠিক আছে, আপনাকে আর গোস্‌সা করতে হবে না। আমি এ নিয়ে আর কোনো কথা বলব না।

সুরস্বতিয়ার পরীক্ষা হয়ে যেতেই ছোটে দাদোজী বললেন আমাকে—এবার ওর বিয়ে দাও।

সুরস্বতিয়ার বিয়ে দেওয়া খুব সহজ কাজ ছিল না। কিভাবে ওর বিয়ে হবে? কে ওকে বিয়ে করবে? ওর কোন্ পরিচয়ে বিয়ে হবে? আমি ভেবে কূলকিনারা পেলাম না কি বলব এ সম্পর্কে। তাই ছোটে দাদোজীকে বললাম—ছোটে দাদো, আপনি সুরস্বতিয়াব মাকে জিজ্ঞাসা করুন।

ছোটে দাদোজী আমাকে বললেন—পার্বতীয়ার ওর এখন বিয়ে দেবার মত নেই। ও বলছে, সুরস্বতিয়া যদি পাস করতে পারে তা হলে আপনারা ওকে ভাল করে লেখাপড়া শেখান। তারপব ও বড় হয়ে ওর পছন্দমতো যাকে খুশি বিয়ে করবে।

ছোটে দাদোজী আমাকে বললেন—পার্বতীয়া আমাকে কি বললে জানো বাবা? বললে—চাচাজী, ওকে দুনিয়ায় এনেই আমি ভুল করেছি। আমার ভুলেই ও দুনিয়ায় এসেছে। আর কোনো ভুল আমি ওর ওপর চাপিয়ে দিতে চাই না। ওর নসীবে যা আছে তাই হবে।

সুতরাং ওর বিয়ের কথাটা চাপা পড়ে গেল।

সুরস্বতিয়ার বয়েস তখন সতেরো-আঠারো বছর। রূপ তখন ফেটে পড়ছে ওর। ওকে সুরস্বতিয়া বললে ও তখন খুব রাগ করত। বলত—আমাকে সুরস্বতিয়া বলবেন না। আমার নাম অনসুইয়া। অনসুইয়া দুসাদ। পরীক্ষা দেওয়ার পর থেকেই সেই সঙ্গে সে খুব উৎসাহ করে লাফাচ্ছিল আমি পাস করে পাটনায় কলেজে পড়ব।

দাদোজী তার কথা শুনে হাসতেন। বলতেন—আগে থেকে কলেজে পড়ব বলে লাফাস না। আগে পরীক্ষার ফল বের হোক, পাস কর।

দাদোজীর প্রতিবাদে সুরস্বতিয়া ক্ষেপে উঠত। রাগ করে বলত—পাস আমি করবই দেখবে। আর ভাল করেই পাস করব। তোমরা তো আর কেউ পাস করনি। তোমরা পাসের কি জানবে?

পরীক্ষার ফল বের হ'ল। সুরস্থতিয়া সত্যি সত্যিই ভাল করে পাস করল। ফার্স্ট ডিভিসনে, বেশ ভাল নম্বর পেয়েই। শুধু তাই নয়। সংরক্ষিত শ্রেণীর মেয়ে দুসাদকন্যা বলে সে একটা বিশেষ স্কলারশিপও পাবে। তার আর উৎসাহের অন্ত নাই।

ছোটে দাদোজী আর পার্বতীর মত নিয়ে আমি সুরস্থতিয়াকে নিয়ে পাটনা গেলাম কলেজে ভর্তি করতে। প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে দেখা করে ওকে পাটনা কলেজে আর হোস্টেলে ভর্তি করে দিয়ে এলাম। আসবার সময় ঘোমটা খুলে পার্বতী আমাকে ছোটে দাদোজীর সামনেই বললে—বাবুজী সাহেব, ও যতদূর পড়তে চায়, পড়ুক। ওকে বাধা দেবেন না। আর আমি জানি, আপনি বেঁচে থাকলে ওর পড়বার খরচার অভাব হবে না।

আমার সঙ্গে ট্রেনে যেতে যেতে সুরস্থতিয়ার সে কী মূর্তি! এক সময় আমাকে বললে— জানেন, মা আমাকে কি বলেছে?

আমি হেসে বললাম—কি বলেছে তোর মা তোকে?

বলেছে, তোর যতদূর খুশি তুই পড়। আর পড়তে পড়তে যাকে তোর পছন্দ হবে বুঝে-শুনে তাকেই তুই সাদী করবি। তবে খুব সাবধান, আমি যে ভুল করেছি, সে ভুল খবরদার করবি না।

আমি গম্ভীর হয়ে ঘাড় নেড়ে বললাম—তোর মা ঠিকই বলেছে। এবার তুই কলেজে পড়বি। কত ভাল ভাল ছেলের সঙ্গে আলাপ হবে তোর। তারই মধ্যে দেখতে ভাল, লেখাপড়ায় স্বভাবে সব দিক দিয়ে ভাল, একটা ছেলেকে বেশ বাজিয়ে ভাল ছেলে কি না দেখে, পছন্দ করে বিয়ে করে ফেলবি। আমরা সবাই খুশী হব।

সুরস্থতিয়া চুপ করে গেল।

ওকে যখন ভর্তি করে হোস্টেলে রেখে চলে এলাম তখন ওর সে কী কান্না! আমি ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে এলাম—আমি মাসে একবার করে এসে তোকে দেখে যাব।

ভর্তি হওয়ার পরই দু-তিন মাসের মধ্যে পূজোর ছুটি হয়ে গেল। আমি গিয়ে নিয়ে এলাম সুরস্থতিয়াকে। মাঝখানেও একবার যেতে হয়েছিল দেখতে কথা-মতো। পূজোর ছুটিতে ওকে বাড়ী নিয়ে আসবার জন্যে আনতে গিয়ে ওকে দেখে অবাক হয়ে গেলাম। মনে হ'ল, ও কী সুন্দর হয়েছে। ওকে মুখে অবশ্য কিছু বললাম না। দু-চার বার ওকে ভাল করে দেখে বুঝলাম, ওর যেটা সত্যিকারের সৌন্দর্য তাকে ও আবিষ্কার করতে পেরে তাকে ফুটিয়ে তুলেছে।

ওর সর্ব অবয়বে, পোশাকে এমন একটা মার্জনা আর রুচির ছোঁয়া লেগেছে বলেই ওকে এত সুন্দর দেখাচ্ছে। আমি যে ওকে দেখে মুগ্ধ হয়েছি সেটা ও বুঝতে পারছিল। আমি লক্ষ্য করে দেখলাম আমার মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে ও বারে বারে আমার দিকে তাকিয়ে খুব লজ্জা পাচ্ছিল। শেষে একবার বলেই ফেললে —এমন অবাক হয়ে কি দেখছেন?

আমার মনটা, কি বলব ভাগনা, খুশীতে ভরে উঠেছিল। আমি একমুখ হেসে খোলা মনেই বললাম—তুই কী সুন্দর হয়েছিস রে সুরসুতিয়া!

ও আমাকে সঙ্গে সঙ্গে ধমকে উঠল। বললে—না, আমাকে সুরসুতিয়া বলে ডাকবেন না।

আমি তো অবাক। বললাম—কেন রে? তবে তোকে কি বলে ডাকব?

ও সঙ্গে সঙ্গে প্রায় হুকুমের মতো বললে—আপনি আমাকে অনসুইয়া বলবেন।

আমি আরও অবাক। বললাম—কেন রে, সুরসুতিয়া কি দোষ করলে?

ও আমাকে ধমকে উঠল। বললে—সুরসুতিয়া বলে আমার মায়ের যে একটা বেটি ছিল সে মরে গিয়েছে। আমি অন্‌সুইয়া দুসাদ। আমি একেবারে আলাদা মানুষ।

আমি বোবার মতো ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ওর কথার মানেও ঠিক বুঝতে পারলাম না।

ও আমার মুখের ভাব দেখে বললে—আপনি তো ভীষণ বোকা, আর লেখা-পড়াও করেননি। তাই সব ধরতে পারেন না। কিছুদিন আগে পাটনায় রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন ওঁর নাচের ট্রুপ নিয়ে। এখানে নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা' দেখালেন। তাতে চিত্রাঙ্গদা বলছে—

বলে হঠাৎ থেমে গেল শিবাজী। নিজের কপালে টোকা মেরে বার বার চিত্রাঙ্গদা কি বলছে তা মনে করবার চেষ্টা করলে। কিন্তু মনে করতে পারলে না। মনে করতে না পেরে আমার মুখের দিকে চেয়ে হেসে বললে—নাঃ, মনে করতে পারছি না। একেই তো ভাগনা, লেখাপড়া শিখিনি, তার ওপর 'মেমারি'ও আম্যর বহুত দুবলা। দাঁড়াও, দাঁড়াও।

বলে শিবাজী হঠাৎ চীৎকার করে ডাকতে লাগল—অন্‌সুইয়া, এ অন্‌সুইয়া!

অন্‌সুইয়া কিছু রান্না করছিল। আমি বেশ কৌতুকের সঙ্গেই শুনছিলাম। এতক্ষণ শিবাজীর কথার মধ্যেই নিবিষ্ট ছিলাম। বাইরের দিকে নজর যায়নি। এতক্ষণে গল্পে সাময়িক ছেদ পড়তে আমি সামনের দিকে, আশে-পাশে চাইবার মনটি ফিরে পেলাম।

অনুভব করলাম, দিনের সেই প্রচণ্ড দাবদাহের উত্তাপটা কমে এসেছে। আশ-পাশটা অনেকটা ঠাণ্ডা ও স্নিগ্ধ হয়েছে। মধ্যে মধ্যে বাতাস বইছে শিরশির করে। সর্বোপরি চাঁদের কী শোভা! পূর্ণিমার চাঁদ বটগাছের ডালপালার আড়াল থেকে বেশ খানিকটা ওপরে উঠে এসেছে। চাঁদের রঙ একেবারে পুরো হলদে। সেই হলুদ চাঁদের হলুদ জ্যোৎস্নায় সামনে যতদূর চোখ যায় সব ধু-ধু করছে। জনহীন মাঠের মাঝখানে সে এক পাগল-করা আশ্চর্য ধু-ধু জ্যোৎস্না। দেখে ভাল লাগার সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা ভয়-ভয়ও লাগছিল।

শিবাজীর ডাকাডাকিতে শিবাজীব অনসূইয়া বেরিয়ে এল। হাসিমুখেই। তার কোমরে শাড়ীর উপব একখানা বড় তোয়ালে জড়ানো। তাতে হাত মুছতে মুছতে সে এসে দাঁড়াল। হাসিমুখেই বললে—ডাক কিসের জন্যে?

তার কথার ভঙ্গী থেকে আমি সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম, শিবাজীকে আমার সামনে 'তুমি' বলতে ওব লজ্জা হচ্ছে। সেই জন্যে কথাটা অমন ভাববাচ্যে বললে।

শিবাজী হা হা করে হেসে বললে—আরে অনসূইয়া, রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদার সেই লাইনটা কি রে?

যেন আকাশ থেকে পড়ল অনসূইয়া। বললে—চিত্রাঙ্গদার কোন্ লাইন?

শিবাজী খুব সহজেই বললে—কেন, তুই আমাকে যেটা প্রায় বলতিস?

লজ্জা পেলে অনসূইয়া। বললে—যত সব বাজে কথা। কোন্ লাইন তা কি মনে আছে?

কথাটা সত্যিই। উনিশশো বাহান্ন সালে হঠাৎ উনিশশো সাঁইত্রিশ সালের কথা মনে করা সহজ নয়। কিন্তু অনসূইয়ার ভঙ্গী দেখে মনে হ'ল কথাটা অনেক দিন আগের হলেও তার মনে পড়েছে বা মনে আছে।

শিবাজী আমার সামনেই তাকে একান্ত মিনতি কবে বললে—বল্ না, বল্ না বাপু, তোর তো ঠিকই মনে আছে।

বিব্রত হয়ে হাসল অনসূইয়া। তোয়ালেতে হাতটা মুছতে মুছতে অনসূইয়া বললে—কোন্‌টা? সেই 'আমি এক রজনীতে ফোটা'?

সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নেড়ে শিবাজী সোৎসাহে বললে—হ্যাঁ, হ্যাঁ।

অনসূইয়া আমার দিকে চেয়ে সুরেলা গলায় বললে—'আমি এক রজনীতে ফোটা অরণ্যের পিতৃমাতৃহীন ফুল!' বলেই সে বললে—হয়েছে তো? এবার আমি যাই?

—যা।

সুরসুতিয়া চলে যেতে আবার গল্পে ফিরে এল শিবাজী। বললে—জানো ভাগনা, সেদিন আমাকে ওই লাইনটা বলে বললে—আমার বাপ নেই, মায়েব পেটে হয়ে যে নাম ছিল সে নামও আমি ফেলে দিযেছি। আমি এখন অন্‌সুইযা। অন্‌সুইয়া দুসাদ।

বললাম—বেশ কবেছিস। এখন আচ্ছাসে লিখাপডি কব। তা হঁ্যা, কত সুন্দব সুন্দর ছেলে চাবপাশে দেখছিস তো। তাবই একটা পছন্দ কবে ফেল। তবে দেখিস, বেশ বেছে হিসেব কবে পছন্দ কবিস।

অন্‌সুইয়া বললে—সে আপনাকে বলতে হবে না। সে আমি যা হয় করব।

বাডী পৌছে পার্বতীব হাতে মেযেকে দিযে বললাম—ফুফাজী, এই নাও তোমাব বেটি। কেমন সুন্দব হযেছে দেখ।

সুবসুতিযা এসেছে শুনে একদিন লবা দেখা কবতে এসেছিল। আমি তখন ছিলাম গযায়। লবা এসে ওকে হিন্দীতেই বললে—কি বে সুবসুতিযা, কেমন আছিস? কলেজ কেমন লাগছে?

সুরসুতিয়া কতখানি বদলেছে লবাব সঙ্গে ওব কথাবার্তা থেকে তাব খানিকটা বুঝলাম। ও আগে লবাকে লবা মেমসাব বলে ডাকত। এখন ওকে ডাকলে মিস লবা বলে। আব কথাবাতায ওব সে কী স্বাচ্ছন্দ্য। ওব কথাবাতা থেকে আমি বুঝতে পাবছিলাম সুবসুতিয়া শুধু বয়সেই বাড়েনি, বুদ্ধি বিবেচনাতেও অনেকটা বেড়েছে।

সেকথাটা লবা মেমসাবও বললে ওকে—সুবসুতিয়া, তুই তোব মাযেব চেযেও বড হয়ে গিয়েছিস।

কথাটা শুনে একটু অবাক হযে লবাব মুখেব দিকে চেয়ে থেকে সুবসুতিয়া খুব খুশী হ'ল যেন। তাবপব বসিকতা কবে হেসে বললে—এই কথাটা তোমাব এই ভদ্রলোককে বুঝিয়ে বল তো। ওকে বুঝিযে দাও তো সুবসুতিয়াব বযস এখন উনিশ নয়, কমসে কম 'উনতিশ'।

বলে আমাব দিকে চেয়ে হেসে গড়িয়ে পড়ল। ঘোমটাব আডাল থেকে পার্বতী তাকে মৃদু ধমক দিলে—এই অন্‌সুইয়া, কি হচ্ছে কি?

জানো ভাগনা, সে রাত্রিতে আমি অনেক ভাবলাম। কোথায় যেন একটা কি বেশ বড অদলবদল হয়ে গিযেছে, যাচ্ছে। সেটা ওই সুরসুতিয়াকেই কেন্দ্র কবে। সুরসুতিয়া বাইরে অনেক সুন্দর হয়েছে, মনের দিক দিয়েও অনেক বেড়েছে, এ সব ঠিক। কিন্তু তাব চেয়ে বড় কথা, আমার মনের ভেতর কেমন

অদলবদল ঘটে যাচ্ছে। সেই কবে কতদিন আগে থেকে স্বরস্বতিয়ার সেই ছেলেবেলা থেকে আমি তো ওর মা পার্বতী আর ও দু'জনকেই ভালবেসে আসছি। এতে তো কোন সন্দেহ নেই। সে ভালবাসায় কি অদলবদল হয়ে যাচ্ছে আমার মনের মধ্যে? এ তো ঠিক যে, পার্বতীর কথা ভেবেই আমার গয়ার জঙ্গলে বাস কত সুমধুর হয়েছিল। তার ভাবনাই তো আমার সারা মনে তখন সবসময় আতরের গন্ধের মত ছেয়ে থাকত। তখন কুঁচো চিংড়ির মত স্বরস্বতিয়া তো নজরেই পড়ত না। আর আজ স্বরস্বতিয়া যে ক্ষণে ক্ষণে ওর মাকে ঢেকে দিচ্ছে। স্বরস্বতিয়াই আমার মনে আসছে বেশী করে।

তা হলে আমি কি দু'জনকেই ভালবাসছি না কি? এ কি লজ্জার কথা! অপরাধের কথা! স্বরস্বতিয়াকে ভালবাসি এ কথাটা মনে হলেই নিজের কাছেই নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে এ খবর যদি পার্বতী কোনো রকমে বুঝতে পারে তা হলে ও দীলে খুব চোট পাবে। আর স্বরস্বতিয়াকে কোলে বুকে পিঠে করে পার্বতী, আমি আর চামারিয়া তিনজনে মানুষ করেছি। স্বরস্বতিয়া তো আমার কাছে আমার বেটির মত। ছি, ছি, তাকে কি ভালবাসার কথা ভাবা যায়? অথচ স্বরস্বতিয়াকে অত ভালই বা লাগছে কেন? নাঃ, এ কোনোক্রমেই ভাল কাজ নয়। ভাল চিন্তা নয়। আমাকে এ থেকে সরে যেতে হবে। কালই জঙ্গলে ফিরে যাব। আমি জংলী মানুষ, আমারও ওই জঙ্গলই ভাল। ভেবে ঠিক করার সঙ্গে সঙ্গেই আমি অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে উঠেই বললাম—আমি আজ জঙ্গলে চলে যাব।

শুনে ছোটে দাদোজী থেকে স্বরস্বতিয়া পর্যন্ত সবাই অবাক। স্বরস্বতিয়া ছলছল চোখে আমার হাত ধরে বললে—আমি মোটে কাল এলাম আর বাবুজী সাহাব, আপনি আজই চলে যাবেন? আমি নতুন কায়দা শিখেছি মাংস রান্না করার। ভেবেছিলাম আপনাকে এক রোজ রান্না করে খাওয়াব। তা আর হবে কি করে?

আমি একটা মানসিক সংকটের মধ্যে পড়লাম। তবে আমি সাধারণ সাদামাটা মানুষ। তাই আমি সাদামাটা রাস্তায় তার সহজ মোকাবিলা করতে গিয়ে হা হা করে হেসে বললাম—এই কথা? বেশ তো, এখন তো সকালবেলা। আমি তোকে মাংস এনে দিচ্ছি বেশী করে। তুই রান্না কর, আমাদের খাওয়া। তারপর খানিকটা আমার সঙ্গে দিয়েও দে। আমি জঙ্গলে গিয়েও খাব।

তাই হ'ল। সেদিন স্বরস্বতিয়ার হাতের রান্না মাংস খেলাম অনেক তারিফ

করে। বললাম—এ যে ফুফাজীর রান্নার চেয়েও আচ্ছা রান্না হয়েছে রে! শুনে ফুফাজীও অনেক হাসল। আমি বললাম—আমাকে সঙ্গে মাংস দিয়ে দিলি? বেশ খানিকটা দিস। আমি আর চামারিয়া দু'জনে খাব।
সেইদিন আমি জঙ্গলে ফিরে এলাম। ফিরে এসে যেন নিজেকেও নিজের কাছে ফিরে পেলাম। জঙ্গলের বড় বড় শাল আর শিরীষ গাছের তলায় দাঁড়িয়ে মনটি আবার আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে এল। নিজের মনের পুরানো স্বস্তির ভাবটি ফিরে এল। শান্ত মনের চেহারাটি আমার নিজের কাছেই মনের পুরোনো কথাটা আস্তে আস্তে শোনালে। সুরস্থতিয়া আচ্ছা করে লেখাপড়া শিখে নিজের পছন্দমত কাউকে বিয়ে করুক, বিয়ে করে আনন্দে থাকুক। আমি বেচারা পার্বতীকে যেমন অনেক দূর থেকে পিয়ার করেছি, তেমনিই পিয়ার করি। ওর আমি ছাড়া আর কে-ই বা আছে? আমি যদি ওর দিক থেকে মুখ ফেরাই তা হলে দুঃখী মেয়েটা কোনোদিন কোনো কথা বলবে না। কিন্তু ঘোমটার আড়ালে নিঃশ্বাস ফেলে ও মরে যাবে।
আমি ঠিক করলাম আমি আমার গয়া যাওয়া বন্ধ করে দেব। সুরস্থতিয়ার অল্প বয়স, সামনে ওর মস্ত জীবন, অনেক আশা. অনেক আনন্দ রয়েছে। ও তাই দিয়ে সুখে থাকুক। ও যদি কোনোদিন আমার এই ভাল লাগার কথা বুঝতে পারে তাহলে আমার জন্যে ওর আজীবনের ভাল লাগাটা বিষিয়ে যাবে। আমার লজ্জায় ও লজ্জা পাবে। আর ও আমার চোখের বাইরে থাকলে আমিও ওকে আস্তে আস্তে ভুলে যাব।
আমার ভাগ্যগুণে লরার হাত দিয়েই ঠিক এই সময়েই একটা মস্ত অর্ডার পেয়ে গেলাম। চামারিয়া এসেছিল আমার সঙ্গে। ও যখন জঙ্গল থেকে গয়ায় ফিরে গেল তখন ওর হাত দিয়ে ছোটে দাদোজীকে একটা চিঠি পাঠিয়ে দিলাম —আমি এখন কিছুদিন গয়ায় যেতে পারছি না। আমার হাতে একটা ভারী অর্ডার এসে গিয়েছে। সেইটা সাপ্লাই তাড়াতাড়ি দিতে হবে বলে আমি আর এখন কিছুদিন এখান থেকে নড়তে পারছি না।
চামারিয়া চলে গেল। আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।
বলতে বলতে হঠাৎ শিবাজী চুপ করে গেল। চোখের সামনের পূর্ণিমার চাঁদের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে ও কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। তারপর বললে—আচ্ছা ভাগনা, তোমার ল্যাংড়া হরিয়াকে মনে আছে? যে জঙ্গলকে বলত, আমার মা! সে জঙ্গল ছেড়ে কোথাও যেত না, যেতে চাইত না। জোর করলে নিজের খোঁড়া পায়ের অছিলা দিত। আসলে কি জান, জঙ্গল ছেড়ে কোথাও

গিয়ে তার মন টিঁকত না। জঙ্গল আমার মা কি না তা জানি না। তবে আমারও জঙ্গল ছেড়ে বাইরে কোথাও গিয়ে থাকতে ভাল লাগত না। এমন কি মধ্যে মাঝে গয়ায় গেলেও মনে হ'ত এ কোথায় এসেছি! বড্ড গোলমাল হৈ-চৈ লাগত কানে। মনে হ'ত মানুষজন বড্ড বেশী, আর এরা অকারণে বড্ড হৈ-হল্লা করছে, যা না করলেও দিব্যি চলে যেত। আর মনে হ'ত এখানে বড্ড বেশী আলো। কোথাও কোনো ছায়া নেই।

আমি তোমাকে কি বলব ভাগনা, জঙ্গলের মধ্যে কয়েকদিন থাকতে থাকতেই আমার মনে হ'ল যেন আমার মনটা আবার জুড়িয়ে গিয়েছে। আবার সেই আগের মত শান্ত, হাসিখুশী হয়ে উঠেছে। এখন বুঝতে পারি হরিয়া কেন জঙ্গলকে মা বলত। আমার মনের সকল দুঃখ, সব জ্বালা যেন এই গভীর বনের নির্জনতা আর নিস্তব্ধতায় ছায়ায় আস্তে আস্তে আরোগ্য হয়ে গেল। সেই নিস্তব্ধ গভীর বন, যেখানে সাড়া নাই, শব্দ নাই, যেখানে ডাল পড়লে ঢেঁকি হয়, পাতা পড়লে কুলো হয়, যেখানে একটা গোরুর সামান্য ডাক এই এতখানি হয়ে গুম গুম করে কানে লাগে, সেইখানকার আধো ছায়া, আধো অন্ধকার, সেখানকার অন্তহীন স্তব্ধতা আমাকে তার বুকের ভেতর যেন চেপে ধরে রেখে আমার সব জ্বালা যন্ত্রণা সারিয়ে দিলে। এমন কি তোমাকে কি বলব ভাগনা, আরও অল্প বয়সে পার্বতীকে যে ভাললাগা আমার মনকে আর বনকে দুইকেই খুশী করে তুলত তাও যেন কোথায় হারিয়ে গেল. ফুরিয়ে গেল। আমাকে ভালবাসলেও যেন কিছু এসে যায় না, আমি ভালবাসলেও তাতে কোনো ইতরবিশেষ হয় না। আর আমাকে কেউ ভাল না বাসলেই বা কি? তাতেও কিছু এসে যায় না! মনটা দিনে দিনে বিষম খুশী হয়ে উঠল।

কিন্তু কি বলব ভাগনা, তোমার খুশী হওয়া শুধু যদি তোমারই ওপর নির্ভর করত! কিন্তু তা করে না। বুঝলে ভাগনা! মানুষই তোমাকে হাসায় আর কাঁদায়; দুঃখ দেয় আবার সুখ দেয়। তোমার নিজের হাতে কিছু নাই. বুঝলে!

প্রায় মাসখানেক হতে চলল। আমার অর্ডার সাপ্লাইয়ের সব কাজ শেষ হয়ে হাত খালি। এমন সময় একদিন কি হ'ল বলি! সেদিন সকালেই খুস মেজাজে দুটো মুর্গী মারিয়েছি। স্যাংড়া হরিয়াকেও খেতে বলেছি আমার সঙ্গে। হরিয়া বসে বসে বাংলোর সামনে মুর্গী ছাড়াচ্ছিল। আমি ঘরের ভিতর বসে হিসেব দেখছিলাম। হিসেব দেখতে ভালই লাগছিল। কারণ লাভটা মোটামুটি ভালই হবে। এমন সময় হঠাৎ হরিয়া বলে উঠল—আরে বাপ, তু কাঁহাসে?

ঘরের ভেতর থেকে হরিয়ার ওই কথা শুনে আমার একটু অবাক লাগল। ওই কথা ওই স্বরে কাকে বলছে হরিয়া? খাতাপত্র বন্ধ করে উঠে বাইরে গেলাম। যা দেখলাম তাতে চক্ষু স্থির হবার যোগাড়! হরিয়ার কাছে স্বরস্থতিয়া দাঁড়িয়ে। আমি সঙ্গে সঙ্গে তার কাছে ছুটে গিয়ে তার হাত ধরে বললাম—স্বরস্থতিয়া, তুই? তুই কার সঙ্গে, কি করে এলি? একা এসেছিস?

স্বরস্থতিয়া বেশ সহজভাবেই বললে—হ্যাঁ, একাই এসেছি।

আমার ভয়, বিস্ময় আর দুশ্চিন্তা বেড়েই চলেছে। আমি ওর হাত ধরে ঝাঁকি দিয়ে বললাম—একা তুই কি করে এলি? কিসে এলি?

স্বরস্থতিয়ার ভয় নেই। সে বেশ হেসে বললে—একটা ট্রাক আসছিল দেওপুরা জঙ্গলে। তারাই আমাকে এই জঙ্গলের মুখে নামিয়ে দিয়ে গেল। ড্রাইভারের নাম হরকিষণ, আপনাকে চেনে। তারই সঙ্গে এলাম।

আমার তখন স্বরস্থতিয়ার ওপর প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে। আমি ওর হাতটা সজোরে চেপে ধরেছিলাম। ওকে চাপা গলায় বললাম—খুব করেছ। উঠে এস।

তাকে টেনে ঘরের ভেতর নিয়ে এলাম। ওর জন্যে ভয়ে, উদ্বেগে আমার বুকের ভেতরটা তখন শুকিয়ে গিয়েছে। সেই সঙ্গে কৌতূহলও হচ্ছে, ও কেন এল এমন করে? জিজ্ঞাসা করলাম—তোর আসার কি দরকার পড়ল?

আমাকে ও খুব ভাল করেই জানে। আমার ভয়, উদ্বেগ আর উত্তেজনা বুঝেই ও বেশ সহজভাবেই বললে—আপনি তো অনেক দিন যাননি। তাই দেখতে এলাম আপনি কেমন আছেন। অসুখ-বিসুখ করেছে কি না। না কি আমাদের ভুলে গেলেন?

ওর কথার আড়ালে এমন একটা হাল্কা, ঠাট্টা-ঠাট্টা ভাব ছিল যা দেখে আমার শুধু আশ্চর্যই লাগছিল না, রাগও হচ্ছিল। আমি চাপা গলায় বললাম—এই দেখবার জন্যেই এসেছিস বুঝি? তা মাকে বলে এসেছিস? ছোটে দাদোজী জানেন?

বেশ সহজভাবেই স্বরস্থতিয়া বললে—না, ছোটে দাদোজী গয়ায় নেই। উনি দেহাতে গিয়েছেন জমি দেখতে। আমি মাকে জানিয়ে এসেছি।

—তোর মা তোকে আসতে দিলেন?

স্বরস্থতিয়া বললে—আসতে কি আর দেয়? আমি জোর করে চলে এসেছি। মা আমাকে খুব গালমন্দ করলে। শেষে কি বললে জানেন?

বলে হাসতে লাগল স্বরস্থতিয়া। আমি ওর ভাবভঙ্গি, কথাবার্তার ধরন দেখে আমার প্রচণ্ড রাগ সত্ত্বেও ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ও যেন ওর ওই

হাসি দিয়ে, ওই ভঙ্গি দিয়ে আমাকে প্রতি মুহূর্তে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করছে। আমি অবাক হয়ে বললাম—কি বললে তোকে তোর মা?

সুরসুতিয়া হেসে বললে—যাদের বাপের ঠিক নেই তাদের স্বভাব এমনিই হয়।

আমি আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারলাম না। রাগ জমেই ছিল মনে। তার উপরে ওর মুখে অবলীলাক্রমে এই রকম অশালীন কথা শুনে আর রাগ চেপে রাখতে পারলাম না। আমি সঙ্গে সঙ্গে ওর গালে ঠাস করে একটা চড় সজোরে কষিয়ে দিয়ে বললাম—এই যে এসেছিস আর এই যা বললি তার জন্যে তোর এইটা পাওনা ছিল।

যার কাছে আজীবন অযাচিত আদর আর প্রশ্রয় পেয়েছে তার কাছে এতখানি বয়সে এই মার খেয়ে অবাক হয়ে গেল সুরসুতিয়া। কেমন এক রকম মুখ করে আমার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। তারপর কোনো কথা না বলে উঠে দাঁড়াল। বললে—ঠিক বলেছেন। আপনি যদিও বোকা, তবু মধ্যে মধ্যে ঠিক কথা বলেন। আজও বললেন। আমার যা পাওনা ছিল তা তো পেয়ে গিয়েছি। এইবার চললাম।

আমি তো অবাক। বললাম—কোথায় যাবি?

—যেখান থেকে এসেছিলাম সেখানে। গয়ায়। পরশু তো আবার কলেজ খুলবে। পরশু সকালেই তো পাটনা যেতে হবে।

আমি উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে বললাম—তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে?

সুরসুতিয়া হেসে বললে—আমাকে দেখে তাই মনে হচ্ছে বুঝি? দেখছেন না, আপনার চড় খেয়েও একটা কথা বললাম না। তাতেও বলবেন আমার মাথা খারাপ?

আমি আর পারলাম না। ওর মাজা মাজা রঙের মাখনের মত নরম গালে আমার শক্ত হাতের চড়ের দাগ রক্তমুখী হয়ে ফুটে আছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে ওর গালে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে নিজের অজান্তে কাঁদতে লাগলাম। কাঁদতে কাঁদতে ওর মাথাটা দু'হাত দিয়ে আমার বুকের সঙ্গে চেপে ধরলাম।

খানিকক্ষণ আমার দুই হাতের মধ্যে মাথাটা রেখে তারপর আস্তে আস্তে মাথাটা ছাড়িয়ে নিলে সুরসুতিয়া। তারপর বেশ নিরুত্তাপ গলাতেই বললে—মার হ'ল, আদর হ'ল, এবার যাই?

আমার কিছু বলার নেই, কিছু করার নেই যেন। আমার আবার ইচ্ছে হ'ল ওকে আবার এক চড় মারি। আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমাকে কষ্ট দেবার

জন্যেই ও ওইভাবে আমাকে কথা বলছে। আমি আকুল হয়ে ওর হাত চেপে ধরে বললাম—তুই কি পাগল হয়েছিস যে তোকে আমি একা যেতে দোব?

আবার সমান ঠাণ্ডা গলায় ও বললে—ও, তাহলে আমার মাথা এখনও খারাপ হয়নি, একলা গেলে কি যেতে চাইলে খারাপ হবে?

আমি অসহায়ের মত বললাম—তুই অমন করে কথা বলছিস কেন?

ও আবার সমানভাবে বললে—কেমন করে বলছি? ঠিকই তো বলছি কথা। আমি যেমন ধরনের মেয়ে তেমনি তো কথা বলব? ছোটবেলা থেকে এই বনের মধ্যে মানুষের সমাজ থেকে লুকিয়ে ছায়ার মধ্যে আমাকে মানুষ করেছেন। কিন্তু আমি যা তাই তো হব। সাপের মুখে তো বিষ দাঁত হবেই। সে বলে আর লাভ কি?

আমি আর কথা বাড়ালাম না। ওকে স্নান করতে বললাম। তারপর ওকে খাইয়ে আমার পাশের ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে বললাম—তুই ঘুমিয়ে পড়। বিকেলে তোকে নিয়ে ফিরব।

বিকেল বেলা ফিরিবার জন্য কিষেনের গাড়ী আটকাবার জন্যে লোক পাঠিয়ে দিলাম আগে। তারপর ওকে নিয়ে রওনা হলাম। পথে যেতে যেতে জিজ্ঞাসা করলাম—তোর কি হয়েছে বল তো সুরসুতিয়া?

সুরসুতিয়া আমাকে বললে—আপনারা আমার কাছে সব 'ছিপিয়ে' রাখলে কি হবে, যা জানার আমি জেনেছি।

আমি অবাক হয়ে বললাম—কি জেনেছিস তুই?

সুরসুতিয়া বেশ হেসেই বললে—আমি কি তাই! মা আমাকে না বললে কি হবে, মিথ্যে বললে কি হবে, আমি সব জেনেছি। আর আমি আপনাকে 'সাচমুচ' বলছি, আমি সব 'সাচমুচ' জানার সঙ্গে সঙ্গে মনে হচ্ছে আমি সাপের বাচ্চা সাপ। আমার যেন বিষদাঁত গজাচ্ছে। আপনাকে বলছি এই দাঁত দিয়ে আমি ঠিক ঠিক আদমিকে আমি ঠিক কামড়ে শেষ করে দেব। আপনি দেখবেন।

আমি হেসে বললাম—বেশ বাপু, তাই করিস। কোন দিন তোর ইচ্ছে হলে কামড়াবার লোক না পেলে আমাকেই কামড়ে বিষ ঢেলে দিস। সেই সবচেয়ে ভাল হবে।

সুরসুতিয়া বললে—আপনি যা বলেছেন বলুন, কিন্তু একরোজ দেখতে পাবেন।

আমি ওকে সেবার পাটনা পৌঁছে দিয়েছিলাম।

তারপর আর যাইনি।

এমনি করে দুটো বছর কেটে গেল। অনসুইয়া আই. এ. পাস করলে। আমি যে সুরসুতিয়াকে চিনতাম সে সুরসুতিয়া আর নেই কিন্তু। ও অবিশ্যি বরাবরই খানিকটা জেদী, প্রগল্‌ভ, হৈ-চৈ করা মেয়ে ছিল। খানিকটা উত্তপ্ত স্বভাবের। যার রাগ বেশী, কথা অনেক। অনসুইয়া হয়ে সেই রাগের আগুনের ওপর যেন এক পরত ছাইয়ের ঢাকা পড়েছে। সেবার ওকে নিয়ে গয়ায় ফিরে মেয়েকে পার্বতীর কাছে হাসি মুখে হাজির করে দিয়ে বলেছিলাম—ফুফাজী, এই নিন আপনার বেটি। মেয়েটাকে যাবার আগে আপনি মারেন নি কেন? ওর একটা পা কেন ভেঙে দেন নি? তা হলে তো আর যেতে পারত না।

পার্বতী মেয়ের দিকে একবার চেয়ে ঘোমটায় মুখ ঢেকেছিলেন। কোনো কথা বলেন নি।

সেই থেকে পার্বতী অনসুইয়া নাম নেওয়া সুরসুতিয়াকে বেশ এড়িয়ে চলত। আমার মনে হ'ত পার্বতী আর নিজের পেটের মেয়েকে ঠিক আগের মত আপনার বলে মনে করতে পারে না।

আমারও তাই। আমিও অনসুইয়াকে মনে মনে ভয় পেতাম। তাকে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতাম। ও যে কেন একা অমন আমার কাছে হঠাৎ চলে গিয়েছিল, সেটা আবিষ্কার করতে পারি নি।

আই. এ. পরীক্ষাতেই বেশ ভাল ফল করেছিল অনসুইয়া। 'শিডিউলড্ কাস্টের' মেয়ে বলে ভাল রকম স্কলারশিপও পেয়েছিল একটা।

তখন বোধহয় থার্ড ইয়ারই চলছে অনসুইয়ার, লরা মেমসাব একবার কাঠ বাছবার জন্যে আমার কাছে জঙ্গলে এল। লরা মেমসাব আমার একজন বড় কাস্টমার, তার ওপর তার সঙ্গে আমার একটা ভাল বন্ধুত্ব ছিল বলে খুব খুশী হয়েই তার আসাটা 'সেলিব্রেট' করছিলাম। ঘি ভাত আর মাংস রান্না করিয়েছিলাম। খাবার আগে সন্ধ্যেবেলা উৎকৃষ্ট ভাঙের সরবৎ।

বারান্দায় দু'জনে পাশাপাশি বসে ভাঙের সরবৎ খেতে খেতে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা মেমসাব, আমি তো এতকাল তোমাকে কাঠ যোগাচ্ছি, তুমি তো কম সময় কাঠ দেখতে এসেছ। আমার ওপরেই তো নির্ভর করেছ বরাবর। এবার নিজেই এলে যে?

লরা মেমসাব ভাঙের গ্লাসে আরাম করে চুমুক দিয়ে বললে—এ খদ্দের খুব খুঁতখুঁতে আছে, বুঝলে শিব্বা সাহেব। তা ছাড়া আরও একটা খবর তোমাকে বলব বলে এসেছি।

—বল।

—আমি ক'দিন আগে একটা কাজে পাটনা গিয়েছিলাম জান? সেখানে ক'দিনই ছিলাম। তা তোমার সুরসুতিয়াকে দেখলাম একটি ছোকরার সঙ্গে ঘুরছে। একদিন নয় পর পর তিন দিন দেখলাম। শেষদিন ওর সঙ্গে কথা বললাম ওকে ডেকে।

আমি শুনলাম অবাক হয়েই।

লরা মেমসাব আরও বললে—দেখ শিব্বা সাহেব, একটা অল্পবয়সী মেয়ে, একটা অল্পবয়সী ছেলের সঙ্গে মিশছে, এটা আমার চোখে খারাপ লাগে না, আমাদের সমাজ এটা সমর্থনই করে। কিন্তু তোমাদেব সমাজ করে না। সেইজন্তেই খবরটা দিলাম তোমাকে।

আমি চুপ করে ওর দিকে তাকিয়ে শুনছিলাম। এটা সুরসুতিয়া ভাল করছে কি মন্দ করছে তা ভেবে ঠিক করতে পারছিলাম না।

লরা বললে—আমি ওকে ডাকলাম। ও ছেলেটিকে বোধহয় দাঁড়াতে বলে আমার কাছে এগিয়ে এল বেশ হাসিমুখে। জান, আমি যে ওকে একটি অপরিচিত ছেলের সঙ্গে দেখেছি, আমি যে এ কথা তোমাকে বা ওর মাকে বলে দিতে পারি তার জন্যে বিন্দুমাত্র ভয় বা সঙ্কোচ দেখলাম না ওর মুখে। বেশ হেসে হেসেই কথা বললে আমার সঙ্গে। আমি শেষে জিজ্ঞাসা করলাম—তোর সঙ্গে ও কে রে সুরসুতিয়া? তা আমাকে হেসে বললে—আয়াম নট সুরসুতিয়া। আয়াম অনুসুইয়া তুসাদ। ও আমার বন্ধু। বয় ফ্রেণ্ড। ওর নাম কমল নয়ন সিনহা। মেডিকেল কলেজে ফোর্থ ইয়ারে পড়ে। তাবপর জান শিব্বাজী, হাউ আনইউজ্যাল্, অস্বাভাবিক ব্যাপার, সুরসুতিয়া কি বললে জান আমাকে? বললে—আমার বয় ফ্রেণ্ড কি সুন্দর দেখেছ?

শুনে, কি বলব তোমাকে ভাগনা, আমার ভাল লাগল না। তবু চুপ করেই রইলাম। ভাল মন্দ কিছু বললাম না।

লরাই বললে—বাট আই মাষ্ট সে, বলতেই হবে শিব্বাজী. সুরসুতিয়ার বয় ফ্রেণ্ড খুব সুন্দর দেখতে। লম্বা, পাতলা ছিপছিপে চেহারা, গেহুঁকে মাফিক রঙ। বহুত খুপসুরত।

লরা মেমসাব পরদিন চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল একটু খবর নিয়ো, নজর রেখো তোমার সুরসুতিয়ার ওপরে।

কথাটা আমার মনেই রয়ে গেল। সুরসুতিয়া কার সঙ্গে মিশছে, কি ফল হবে এর, এসব ভাবতাম। কিন্তু কথাটা আর কাউকে কিছু বলি নি।

ফোর্থ ইয়ারের শেষের দিক। সেবার ও বি. এ. পরীক্ষা দেবে। পূজোর ছুটিতে

বাড়ী এসে সুরস্থতিয়া ওর মাকে আর ছোটে দাদোজীকে বললে—আমি সাদী কবব।

ওব মা তো অবাক। ওর কথা শুনে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল। ছোটে দাদোজী হেসে বললেন—সাদী করবে ভাই, এ তো খুব ভাল কথা। তবে পাত্রের নাম, ঠিকানা, বংশ পরিচয় এসব বল। পাত্র কি করে তা বল।

সুবস্থতিয়া বললে—পাত্রের নাম কমল নয়ন সিনহা। এবার ডাক্তারী পরীক্ষা দিয়েছে। খানদানী ঘরের ছেলে।

পার্বতী নাকি বলেছিল—ছেলে তো জাতে রাজপুত। তুই তো দুসাদ। তোকে বিয়ে করবে?

সুরস্থতিয়া বলেছিল—হ্যাঁ। আমি নিজেই একথা তাকে বলেছিলাম। তা সে মানে না। সে রেজেস্ট্রী করে বিয়ে করতে চায়। আমি রাজী হই নি। তা ছেলে আমাকে বলেছে তার গার্জেনরা তোমার কাছে আসবে তোমার মত নিতে।

আমি তখন গয়ায় ছিলাম না। গয়ায় গিয়ে ছোটে দাদোজীর মুখে কথাটা শুনলাম। ছোটো দাদোজী আমাব সঙ্গে পরামর্শ করে বললেন—একবার ছেলের তো খোঁজ নিতে হয়।

আমি বললাম—সেই ভাল।

ছোটে দাদোজী বললেন—তা হলে চল আমরা দু'জন একবাব পাটনা যাই। ছেলেটিকেও দেখে আসা হবে, আর দরকার হলে ছেলের বাড়ীতেও কথা বলে আসব।

সুরস্থতিয়া তখন পাটনা চলে গিয়েছে। আমরা দু'জন পাটনা গেলাম। সুবস্থতিয়ার সঙ্গে দেখা করলাম। বললাম—ছেলেটির সঙ্গে একবার দেখা করিয়ে দে আমাদের।

সুরস্থতিয়া হেসে বললে—আচ্ছা।

ছেলের সঙ্গে দেখা হ'ল সেইদিনই। সুরস্থতিয়াই দেখা করিয়ে দিলে। হ্যাঁ, রূপ আছে বটে ছেলেটার। লরা মেমসাব মিথ্যে বলে নি। লম্বা, পাতলা ছিপছিপে, গেহুঁর মত গায়ের রঙ। সুরস্থতিয়া সুন্দরী। কিন্তু এ তার তুলনায় অনেক বেশী সুন্দর।

কথাবার্তা হ'ল। ছেলের ডাক্তারী পাস করে বিয়ে করে বিলেত যাবার ইচ্ছে। বেশ সদালাপী ছেলে।

ছোটে দাদোজী জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার নাম কি ভাই?

—আমার নাম কমল নয়ন সিনহা।

ছোটে দাদোজী হেসে বললেন—তোমার নাম অনসুইয়ার মুখে আগে শুনেছি। তবু একবার জিজ্ঞাসা করলাম। তা তোমার দেশ কোথায়? পাটনায়?

কমল নয়ন হেসে বললে—পাটনাতেই থাকি। এখানে আমার মায়ের বাপের বাড়ী, ঠাকুমায়েরও বাপের বাড়ী। আসল বাড়ী আমার আরায়।

—আরা শহরে? না দেহাতে?

—দেহাতে। মনৌরা।

—আচ্ছা। বলে নড়েচড়ে বসলেন ছোটে দাদোজী।

ছেলেটিই হেসে বললে—বাকীটাও শেষ করে নি। বাবা দাদোব নামটা বলে নি। ওঁরা ওখানকার খানদানী রইস আদমি। বড় তালুকদার। বাবার নাম দলীপ নারায়ণ সিনহা, দাদোর নাম সুরিন্দর নারায়ণ সিনহা।

শুনতে শুনতে দেখলাম ছোটে দাদোজীব মুখখানা যেন ঝুলে পড়ল। আমি দেখলাম, কিন্তু কিছু ঠিক তখন বুঝতে পারলাম না। ছেলেটিও বিশেষ কিছু লক্ষ্য করলে না। সে আপন মনে প্রাণের আনন্দে কথা বলে যাচ্ছিল।

ছোটে দাদোজী আস্তে আস্তে ছেলেটিকে বললেন—ভাই, মেয়েটির জাতটি তো তুমি ভাল করে জান?

ছেলেটি অসংকোচে হেসে বললে—সে আমি খুব ভাল করে জানি। অনসুইয়া খুব আপত্তি করেছিল। কিন্তু আমি ওসব আপত্তি মানি না। আমি অনসুইয়াকেও বুঝিয়ে বলেছি। বাড়ীতেও বলেছি। আমার বাবা খুব একটা আপত্তি করেন নি। তবে আমার ঠাকুমা আব মায়েব খুব আপত্তি ছিল। তাতে আমি তাঁদেরও মত করিয়েছি। অনসুইয়া জানে না, আমি আমার মা আর ঠাকুমাকে ওকে দেখিয়ে দিয়েছি গোপনে। তাঁবাও শেষমেষ মত দিয়েছেন। এখন আপনারা মত দিলেই হয়।

ছোটে দাদোজী গলা ঝেড়ে বললেন—তোমাকে দেখে গেলাম। তোমার মতও জেনে গেলাম। এখন আমরা একবার অনসুইয়ার মায়ের সঙ্গে কথা বলি। তারপর তোমাকে জানাব।

ছেলেটি হেসে বললে—বেশ, তাই করুন। তবে দেরি করবেন না। বেশী দেরি করলে আমি গিয়ে হাজির হব আপনাদের কাছে। সিভিল ম্যারেজ সেরে আমি যত তাড়াতাড়ি পারি বিলেত চলে যাব পড়তে।

ছেলেটি চলে গেলে ছোটে দাদোজী খুব গম্ভীরভাবে বললেন—আজকেই গয়া ফিরে চল বাবা শিবাজী। সঙ্গে সুরসুতিয়াকেও নিয়ে চল।

সুরসুতিয়াকে নিয়ে আমরা ফিরে এলাম গয়ায়। গয়া ফিরবার সময় ছোটে

দাদোজী সারা রাস্তা বিশেষ কোন কথা বললেন না ; খুব গম্ভীর হয়ে রইলেন। গয়া ফিরে তিনি আমাকে চুপি চুপি ডেকে বললেন—চল, আজ বিষ্ণুপাদপদ্মে পিতৃপুরুষকে পিণ্ড দিয়ে আসি।

আমি হেসে বললাম—কেন ? এ ব্যবস্থা কেন ?

উনি বললেন—অকর্ম তো কিছু নয়। ভাল কাজই। দু'জনেই করে আসি চল। অনসুইয়া ওর মায়ের সঙ্গে হাসি-গল্প করতে লাগল। আমরা বেরিয়ে গেলাম। নিরঞ্জনায় স্নান করে পিণ্ড দিলাম আমরা। পিণ্ডদান করতে গিয়ে ছোটে দাদোজী খুব কাঁদলেন।

ফিরবার পথে ছোটে দাদোজী আমাকে বললেন—বাবা শিবাজী, তোমাকে একটা কথা বলি, স্বরস্বতিয়ার এ বিবাহ হবে না। হতে পারে না।

আমি তো অবাক। বললাম—এ আবার কি বলছেন আপনি ? কেমন সুন্দর ছেলে, ভাল বংশ, ডাক্তার, তার ওপর বিলেত যাচ্ছে। জাত আলাদা হলেও তো কোনো অসুবিধা নাই। সিভিল ম্যারেজ হবে। তখন আর কথা কি, আপত্তি কিসের ?

ছোটে দাদোজী চটে উঠলেন। বললেন—বাবা শিবাজী, তুমি আমার আশ্রয়দাতা, অন্নদাতা। তুমি দেবতার মত মানুষ। তবু তোমাকে বলছি তুমি যত বোকা তত বুদ্ধু। তুমি কি কিছুই বুঝতে পার না, কিছুই খেয়াল হয় না তোমার ?

আমি হাঁ করে ছোটে দাদোজীর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম কিছু বুঝতে না পেরে। ছোটে দাদোজী গলা খাটো করে চুপি চুপি আমাকে বললেন—ওই কমল নয়নের পরিচয় শুনে তুমি বুঝতে পারলে না, ওই কমল নয়ন স্বরস্বতিয়ার মামাতো ভাই। জাত না মানলেও মামাতো-পিসতুতো ভাই বোনে কি বিয়ে হয় ?

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

ছোটে দাদোজী গভীর মনস্তাপের সঙ্গে বললেন—স্বরস্বতিয়ার ভাব-ভালবাসা হ'ল তো হ'ল নিজের মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে ? কী কপাল!

বললাম—তা হলে ?

ছোটে দাদোজী বললেন—এ বিয়ে তো হতে দেওয়া যায় না। তার আগে পার্বতীকে বলতে হবে সব কথা।

বললাম—নিশ্চয়ই। আপনি বলবেন। আমি আজকেই জঙ্গলে ফিরে যাচ্ছি। আমি সেইদিনই চলে গেলাম গয়া থেকে। ভাবলাম, এখন কিছুদিন আর যাব না।

কিন্তু পনর দিনের মাথায় চামারিয়া এসে হাজির ছোটে দাদাজীর চিঠি নিয়ে। আমাকে পত্রপাঠ যেতে হবে। আর কিছু লেখেন নি ছোটে দাদোজী।

চামারিয়াকে জিজ্ঞাসা করেও বিশেষ কিছু বুঝতে পাবলাম না। সে শুধু বললে —ভারী কুছ গডবড হুয়া হুজুব।

মনে ভাবনা নিয়েই এলাম গয়ায। দেখি ছোটে দাদোজী মুখ চুন কবে বসে আছেন। জিজ্ঞাসা কবলাম—কি হযেছে?

উনি বললেন—মায়ে বেটিতে দু'দিন খুব কথা কাটাকাটি হয়েছে। কাল সকালেও কথা কাটাকাটি হযেছে খুব। তাব ফলে মা মেযে দু'জনেব কেউ খায নাই। ছোটে দাদোজী বান্না কবে দু'জনকে খাওয়াবাব চেষ্টা কবেছিলেন তাতে সুরসুতিযা খেলেও, পার্বতীকে খাওয়ানো যায় নি। বলতে গেলে পার্বতী গত দু'তিন দিন না খেয়েই আছে। কিন্তু আসল ব্যাপাব আবও গুরুতব।

—কি ব্যাপার?

ছোটে দাদোজী বললেন—দিন চার পাঁচ আগে কমল নযন এসে হাজির। আমবা এখান থেকে তাব সঙ্গে সেই কথা বলে আসাব পব আর কোনো খবব দিইনি বলে সে সোজাসুজি চলে এসেছিল এখানে। সে যখন এসেছিল তখন পার্বতী সুরসুতিযাকে তাব সঙ্গে দেখা কবতে না দিযে নিজেই দেখা কবেছিল। তাকে আদর করে বসিযে ভাল কবে খাইযে ধীবে সুস্থে সমস্ত কথা বলে, বলেছিল —বাবা, আমাব নসীব, নইলে এমনটা ঘটবে কেন? আমাব মেযেব নসীব এমন যে সে পছন্দ কবল তাব নিজেব মামাতো ভাইকে বাবা কি বলব, আমি তোমার পিসী। তোমাব বাবা, ঠাকুমা জানেন আমাকে। পার্বতীব নাম বলো তাঁদেব। তাঁবা ঠিক চিনতে পাববেন। পুবনো কথা থাক। তবে তুমি কি কবে তোমার পিসতুতো বোনকে বিয়ে কববে? তা তো হয় না। আমিও তা হতে দিতে পাবি না। শুনে ছেলেটি আব কোনো কথা না বলে উঠে চলে গিয়েছিল। তার পরদিনই সে ছেলেটি পাটনা ফিবে বিষ খেযে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। এ খবব পার্বতী শুনেছে সুরসুতিয়াও শুনেছে। তারপর থেকেই মায়ে-মেয়েতে ঝগড়া চলছে।

সব শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। ছোটে দাদোজী আমাকে ফিস ফিস কবে বললেন কথাগুলো। সারা বাডীটা কেমন নিস্তব্ধ। যেন কেউ কোথাও নেই। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—সুবসুতিযা কোথায, পার্বতী কোথায?

শুনলাম না খেয়ে দু'জনে দু'ঘরে শুযে আছে। আমি এসেছি তা ওরা জানতে পেরেছে কি না জানি না। জানুক না-জানুক আমি এসেছি এটা নিজেই

জানাবার জন্যে নিজেই ফুফাজীর ঘরের বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ডাকলাম—ফুফাজী, ফুফাজী, আপনি উঠুন। আমি এসেছি। আমাকে খেতে দিন।

কিছুক্ষণ পরে দরজা খুলে মাথায় ভাল করে ঘোমটা টেনে ফুফাজী বেরিয়ে এলেন। আমি সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি আজ তিন রোজ খান নি? কি এমন হয়েছে যে এমন করে না খেয়ে ঘর বন্ধ করে শুয়ে আছেন? ছোটে দাদোজী আমার কাছেই দাড়িয়েছিলেন। আজ ফুফাজী আমার কথা শুনে সোজাসুজি ছোটে দাদোজীর সামনেই বললে—কি হয়েছে সে শুনে আর আপনার কাজ নেই। আর শুনলেও আমার বুঝাবার মাথা কি মন কোনোটাই নেই? আপনার বুদ্ধি কি মেজাজ যদি থাকত তা হলে আমারও এই হাল হ'ত না আর মেয়েও অমন হয়ে তৈরী হ'ত না।

পার্বতী যেন আজ জ্বলছে। আমি চুপ করে রইলাম কিছুক্ষণ। তারপর বললাম—তোমার মেয়ে কি এমন দোষ করেছে যে এমন করে বলছ?

পার্বতী আমাকে প্রায় ধমক দিয়েই বললে— কি করেছে তাকেই ডেকে জিজ্ঞাসা করুন।

আমারও কেমন রাগ চড়ে গেল। এই মানুষটা সারা জীবন একটা কথা বলে নি। শুধু মুখের উপর ঘোমটা টেনে মুখ বন্ধ করে রেখে আমারই চোখের সামনে মেয়েটাকে মানুষ করলে, মেয়েটা ছাড়া যার জীবনের কোনো আনন্দ নেই, সেই মেয়ে তাকে উত্তর করেছে, এমনভাবে কষ্ট দিয়েছে যে সেই যন্ত্রণায় আজ তার মুখের ঘোমটা খসে পড়েছে। আমার বুকের ভেতরটা কেমন মুচড়ে উঠল। আমি সুরস্থতিয়ার ঘরের দরজায় ধাক্কা দিয়ে বললাম— এই সুরস্থতিয়া, বেরিয়ে আয় তো একবার।

সুরস্থতিয়া বেরিয়ে এল। তারও মুখ উপবাসে শুকিয়ে গিয়েছে। মুখে কিন্তু দুঃখ বা অনুশোচনার কোনো চিহ্ন নেই। চোখগুলো চকচক করছে। তাকে দেখেই আমার রাগ আরও চড়ে গেল। আমি তাকে ধমক দিয়ে বললাম—কি করেছিস তুই? কি বলেছিস মাকে? মায়ের কাছে মাফি মাঙ্ লে।

সুরস্থতিয়া সাপের মত ফুঁসে উঠল। বললে—মাফি মাঙব? কেন? কি করেছি কি আমি?

পার্বতী রাগে ফুঁসে উঠল—কি করেছিস তুই? কি করেছিস তুই নিজের মুখেই বাবু সাহেবকে বল। তোর যদি সাহস থাকে, মনের জোর থাকে, যা বলতে আমার মুখে আটকে যাচ্ছে তুই বল।

সুরস্মৃতিয়া ঠিক সাপের ছোবল দেবার মত হিস হিস করে বললে—না, মুখে আমার আটকাবে না। আমি সোজাসুজিই বলছি। আমার ওপর যে কসুর হয়েছে আমি তার শোধ নিয়েছি। বেশ হিসেব করে শোধ নিয়েছি। আমাকে তোমার পেটে জন্ম দিয়ে তারা আমার যে অপমান করেছে আমি তা উশুল করে নিয়েছি।

আমি তো অবাক। বললাম—কি পাগলের মত বকছিস রে তুই ?

সুরস্মৃতিয়া নিষ্ঠুর হাসি হেসে বললে—বকছি ? আপনার যেমন আকল, তেমনি বুঝছেন।

পার্বতী এবার ক্ষেপে গেল। রাগে তার চোখ দুটো ঝলসাতে লাগল। সে বললে—কাকে তুই কি বলছিস সে হিসেবও তোর হারিয়ে গেল।

—ঠিকই বলছি। তুমি চুপ করে শোন।

পার্বতী রাগে পাগল হয়ে গিয়ে ঘরের ভেতর থেকে রুটি-বেলা 'বেলন'টা এনে ছুটে গিয়ে মেয়ের চুল ধরে তার পিঠের ওপর বেলন দিয়ে পিটতে লাগল। আমি কয়েক মুহূর্ত বিভ্রান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে দু'জনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে সুরস্মৃতিয়াকে পার্বতীর হাত থেকে ছাড়িয়ে দিলাম। দু'জনেই আমার দু'পাশে দাঁড়িয়ে হাঁফাতে লাগল। আমি জোর করে ছাড়িয়ে দিলে কি হবে, কারও রাগ তখনও বিন্দুমাত্র কমে নি।

হাঁফাতে হাঁফাতে পার্বতী বললে—ও শয়তানি কি করেছে জানেন ? ও জেনে বুঝে, হিসেব করে, অনেক ধান্দা করে ওর মামেরা ভাইকে খুঁজে বের করে তার সঙ্গে এতদিন ধরে পিয়ার করেছে। তার মানে বুঝতে পারছেন ? ও জানত যে তার সঙ্গে ওর সাদী হবে না। ও নিজে পিয়ারের ভান করেছে। আর ছেলেটাকে কষ্ট দিয়েছে। ওঃ, তুই এত নিষ্ঠুর ! এত শয়তানী ! আর ওর সেই শয়তানির জন্যে ছেলেটা জহর খেয়ে মরতে গিয়েছিল। ছি ! ছি ! ছি ! তুই এমন ? তুই তো যাকে ভালবাসবি, পিয়ার করবি, তাকে তোর দরকার হলে হাসতে হাসতে জহর খাইয়ে দিতে পারবি।

সুরস্মৃতিয়া বিষাক্ত দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে অত্যন্ত তিক্ত বিদ্বেষের বিষ ছড়িয়ে বললে—আমি কাকে পিয়ার করব, তাও তোমাকে ভাবতে হবে না, তাকে কি খাওয়ার তাও তোমার না ভাবলেও চলবে।

বলে সুরস্মৃতিয়া ছুটে গিয়ে নিজের দরজায় খিল লাগিয়ে দিলে।

পার্বতী চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। গোলমাল আরম্ভ হতেই ছোটে দাদোজী সরে গিয়েছিলেন। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে পার্বতী হঠাৎ হু হু

করে কাঁদতে লাগল। আমি ওর কাছে এগিয়ে গিয়ে ওর মাথায় হাত রেখে বললাম—কেঁদ না। চুপ কর।

ও অঝোর ঝরে কাঁদতে কাঁদতে বললে—আমাকে চুপ করতে বলবেন না বাবুজী সাহাব। আমার মরণই ভাল।

সেই রাত্রিতেই পার্বতীয়া বিষ খেলে। সকালে যখন আমরা জানলাম তখন ও মারা গিয়েছে।

ছাব্বিশ

শিবাজী থামল।

গভীর মনোনিবেশ করে শিবাজীর গল্প শুনছিলাম। শিবাজী থামতেই আবার নিজের পরিপার্শ্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলাম। চাঁদ আরও খানিকটা মাথার উপর উঠে এসেছে। অবাধ জ্যোৎস্না চারিপাশে ধূ ধূ করছে। মনে হচ্ছে যেন কোন্ পরীর রাজ্যে বসে আছি। ঘড়িতে দেখলাম রাত্রি মাত্র পৌনে দশটা। অথচ এরই মধ্যে যেন রাত্রিতে নিশুতি রাতের স্পর্শ লেগেছে।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে শিবাজী চাঁদের দিকে চেয়ে বললে—সেইদিন রাত্রিতে কাঁদতে কাঁদতে পার্বতীয়া আমাকে বলেছিল—বাবুজী সাহাব, আমার একটা অনুরোধ, সুরসুতিয়াকে তুমি সাদি ক'রো। নইলে অন্য কারও হাতে গেলে ওর বহুত দুখ হবে। একথা কেন বলেছিল পার্বতী আমি জানি না। সেই তার শেষ কথা।

বলে, আবার চুপ করে গেল শিবাজী।

ঘড়ির দিকে আবার একবার চাইলাম অভ্যাসবশত। পৌনে দশটা। চারিপাশে নিশুতি রাত্রির স্তব্ধতা যেন ঝিম ঝিম করছিল। চারিপাশে চাইতেই দেখলাম লাল শাড়ী পরা অনসুইয়া ঝোপড়ির মুখে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে এদিক ওদিক চাইতে দেখে সে আমাদের কাছে এগিয়ে এল। এসে দাঁড়াল আমাদের কাছে। হাসিমুখে বললে—এখন খাবেন? চৌকা লাগাব?

তাকালাম শিবাজীর দিকে। শিবাজী আদৌ ভাবপ্রবণ স্বভাবের মানুষ নয়। কিন্তু সে যেন এই মুহূর্তে ভাবপ্রবণ হয়ে পড়েছে বলে মনে হ'ল।

তাকে ওই অবস্থায় দেখে খিল খিল করে হাসতে লাগল সুরসুতিয়া। বললে—ভাগনাবাবুকে 'গপ' শোনাচ্ছিলে তো? আমার কথা বলছিলে তো?

শিবাজী হেসে বললে—এখন আমার কথা বলা মানেই তো তোর কথা বলা। ও একই ব্যাপার। জান ভাগনা, আমি লিখিপড়ি আদমি নই, বহত লিখিপড়ি আদমিকে আমার ডর লাগে। এসব ভাল করেই জানে আমার অনসুইয়া। সেইজন্যে ও লেখাপড়ার একটা কথা বলে না আমার কাছে। ও একেবারে আমার কাছে 'দুসাদিন' হয়ে থাকে।

লজ্জা পেলে সুরস্বতিয়া। বললে—ভাগনাবাবুকে তুমি ঘরের কথা বলে দিচ্ছ। ভাগনাবাবু কেতনা বড়া লিখনেবালা আদমি। আমাদের সব কথা লিখে দেবেন। বেশী ব'লো না।

হেসে বললাম—আমার মুশকিল হয়েছে কি, তোকে কিছুতেই আমার মামার স্ত্রী, মানে আমার মামী বলে মনে করতে পারছি না। কেবল তোকে সেই ছেলেবেলার দশ বছরের সুরস্বতিয়াই বড় হয়েছে মনে হচ্ছে। তাই দ্যাখ না, তোকে 'তুই' বলতে আটকাচ্ছে না।

সুরস্বতিয়া দেখলাম কথাবার্তায় তুখোড় হয়েছে। লেখাপড়া শিখেছে তো। আমার কথার উত্তরে হেসে বললে—তা আমি তো আসলে আপনার বেটিই। তাই মনে করবেন আমাকে। তা এখন খাবেন আসুন।

জিজ্ঞাসা করলাম—কি রান্না করেছিস?

সুরস্বতিয়া বললে—আগে বলব না। খেতে বসে দেখবেন।

খেতে বসলাম ঝোপড়ির বাইরে টিনের চালায়। ময়দার পরোটা, গাওয়া ঘিয়ে ভাজা, মুর্গীর মাংস, চাটনী আর মিষ্টি।

জিজ্ঞাসা করলাম—এই ফাঁকা মাঠে মিষ্টি কোথা থেকে এল?

শিবাজী বললে—বাসের ড্রাইভারকে আনতে দিয়েছিলাম। কান্দী থেকে এনেছে।

খেতে খেতে হঠাৎ একটা কথা মনে হ'ল। হেসে বললাম—আচ্ছা মামা, জীবনের প্রথম দিকটা তো বনের ভেতর কাটালে, এখন এই ধু-ধু মাঠে কাটাচ্ছ; এ ভাল লাগে তোমার?

হা হা করে হেসে উঠল শিবাজী। সেই পুরনো শিবাজী। হেসে বললে—তুমি বড় লিখনেওয়ালা তো তাই, ধরেছ ঠিক। আমার ভালই লাগে। সুরস্বতিয়ার তো আরও ভাল লাগে। মাঝখানে দু'বছর কাশীতে বাড়ী ভাড়া করে ছিলাম শহরের মধ্যে। দু'জনেই মনে মনে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। তাই দু'জনে পরামর্শ করে একদিন শহর থেকে এখানে চলে এলাম।

খাওয়া হয়ে গেল।

আমি ঘড়ি দেখে জিজ্ঞাসা করলাম—কি মামা সাহেব, আর কিছুক্ষণ বাইরে বসবে, না এখনি শুয়ে পড়বে?

আমার মনে হ'ল আমার প্রশ্নে বিব্রত হ'ল শিবাজী। তবে সে কিছু বলবার আগেই খিল খিল করে হেসে উঠল সুরসুতিয়া। বললে—এই তো মুশকিল করলেন ভাগনাবাবু! রাত্রিতে খাওয়ার পর আপনার মামাজীর আর কিছু করার ক্ষমতা থাকে না। কোনো-কোনোদিন খেতে বসেই ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে।

একটু চুপ করে থেকে সুরসুতিয়াই আবার বললে—আমিই ওকে এ অভ্যাসটা করিয়েছি।

হেসে বললাম—অভ্যেসটা কিন্তু ভাল নয়।

দুই চোখে প্রশ্ন নিয়ে সুরসুতিয়া বললে—কেন? ভাল নয় কেন? খেয়ে শুয়ে পড়াই তো ভাল।

বললাম—না রে। তাতে উলটো ফল হয়। বরং খাওয়ার পর খানিকটা বসে থাকা ভাল।

কেন ভাল তা ওকে বুঝিয়ে বললাম। ও চুপ করে শুনলে। বললে—এটা তো ভাবিনি। জানতাম না।

তারপর শিবাজীকে বললে—বাইরে গিয়ে বস না খানিকটা। আজ থেকেই অভ্যেস কর।

শিবাজীর চোখ তখন ঘুমে জড়িয়ে আসছে কচি বাচ্চার মত। সে জড়ানো গলায় বললে—কাল থেকে অভ্যেস করব। আজ ঘুমুই, বুঝলি?

আমার চোখের সামনেই ঝোপড়ির মধ্যে নিজের চার-পাইয়ে শিবাজী শুয়ে পড়ল এবং আমাকে অবাক করে দিয়ে আমারই চোখের সামনে দিব্যি নাক ডাকাতে লাগল।

দেখে হাসতে লাগল সুরসুতিয়া। হাসতে হাসতে বললে—আপনার তো এত তাড়াতাড়ি ঘুম আসবে না। আপনি কিছু পড়বেন? ওই দেখুন, কিছু বই আছে, ইচ্ছে হলে নাড়াচাড়া করুন।

আমি যে চার-পাইয়ে বসেছিলাম তার মাথার কাছে একটা ছোট্ট র‍্যাক। দেখলাম, তাতে হিন্দী প্রেমচন্দের কয়েকখানা উপন্যাসের সঙ্গে গীতবিতান, সঞ্চয়িতা রয়েছে। তারই সঙ্গে রয়েছে খান কয়েক শরৎচন্দ্র। তার সঙ্গে অবাক হয়ে দেখলাম—বিভূতিভূষণ, মানিকের বইয়ের সঙ্গে আমারও দু-তিনখানা বই রয়েছে। আমার নিজের একখানা বই টেনে নিলাম। মলাট ওলটাতেই

পরিষ্কার বাংলা অক্ষরে দেখলাম—শ্রীমতী অনসূয়া সরকার। কেয়ারফ—শ্রীশিবাজী সরকার, কান্দী, ১৯৫০।

বই নাড়াচাড়া করে বুঝলাম স্বরস্থতিয়া একেবারে বাঙালী হয়ে গিয়েছে। আর ও অল্পস্বল্প নয়, যথেষ্ট বুদ্ধিমতী। কারণ এসব পড়াশুনো করবার জন্যে এক ধরনের পরিশীলিত মন দরকার। আর ওর দৌড় যে এতখানি তা ও আমাকে এতটুকু জানতে দেয়নি।

ও তখনও আমার কাছেই দাঁড়িয়েছিল। আমি হেসে বললাম—তুই তো সোজা মেয়ে নস স্বরস্থতিয়া। তুই তো আমাকে তোর মনের চেহারা এতটুকু বুঝতে দিসনি!

ও সঙ্গে সঙ্গে ওর নিজের প্রসঙ্গ থেকে কথাটা ঘুরিয়ে দিয়ে অন্য প্রশ্ন করলে। বললে—যে গল্পটা তখন বললেন সে গল্পটা আপনার কোন্ বইয়ে আছে?

আমি হেসে বললাম—কলকাতা গিয়ে বইটা তোকে পাঠিয়ে দেব। তা তোর ঠিকানা কি এখন? কেয়ারফ আখড়াইয়ের দীঘি?

স্বরস্থতিয়া হাসতে লাগল। আমি বললাম—আমি নয় তো এখানে শুলাম। তুই কোথায় শুবি?

—কেন, আমার গেষ্ট রুমে।

—গেষ্ট রুম? সে কোনখানে রে?

—এর পাশেই। আমরা কেয়ারফ আখড়াইয়ের দীঘিতে থাকলে কি হয়, আমাদের এখানে প্রায়ই গেষ্ট থাকে। তাই গেষ্ট রুম রাখতে হয়েছে।

আমি স্বরস্থতিয়াকে বললাম—যা তুই খা গিয়ে। আমি বরং তোর বই নাড়াচাড়া করি।

স্বরস্থতিয়া বললে—আপনি পড়ুন তাহলে। দরজা খোলা থাক। আমি এসে দরজা বন্ধ করে দিয়ে যাব।

স্বরস্থতিয়া চলে গেল।

আমি একখানা বই হাতে শুয়ে পড়লাম। মাথার কাছে একটা কেরোসিনের টেবলল্যাম্প জ্বলছে। তার ওপারে একটা জানালা। এদিকে দরজা খোলা। আমার খুব অদ্ভুত লাগতে লাগল। কেমন খানিকটা যেন অস্বস্তিও ছিল মনে মনে। জানালা দিয়ে ধু ধু চাঁদের আলোয় ধোওয়া মাঠ নজরে পড়ছে মাথা তুলে চাইলে। সামনের খোলা দরজা দিয়ে ঝকঝকে চাঁদের আলো ঘরে এসে ঢুকছে। আচমকা দেখলে মনে হয়, ঘরের খোলা দরজায় ফুটফুটে সাদা কাপড়-পরা কে যেন নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে।

তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি তা আর জানি না।

সকাল বেলা ঘুম ভাঙল শিবাজীর ডাকে। ডাকের উপর ডাক।

উঠে বসলাম। শিবাজী বললে—চা খেয়ে নাও, তারপর একটু বেড়িয়ে আসি।

হেসে বললাম—চা একটু পরে খাব। তার আগে কিছু কাজ আছে আমার।

প্রাতঃকৃত্য সেরে, হাত-মুখ ধুয়ে স্বরস্বতিয়াকে বললাম—তুই পূজোটুজো করিস নাকি?

আমার কথায় বেশ উৎসাহিত হয়ে স্বরস্বতিয়া বললে—আপনি পূজো করবেন? আপনি দু'মিনিট ঠাহব যাইয়ে।

বলে, স্ববস্বতিয়া অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি টাটকা কাপড় পবে নিলাম। স্ববস্বতিয়া আমাকে ডাকলে—আস্থন।

গেলাম ওর পিছন পিছন ওর গেষ্ট রুমে। দেখলাম, সেখানে সবই রয়েছে। একটি চৌকিতে লক্ষ্মী, গণেশ আর শিবের ছবি। গঙ্গাজলের পাত্র, ধূপদানীতে জলা ধূপকাঠি। সামনে আসন পাতা। আমি আসনে বসতে বসতে বললাম—তুই রোজ পূজো করিস?

স্বরস্বতিয়া হেসে বললে—তা বসি একবার ক:ব। অ।স্নানের পর বসি একবার।

তাবপর বললে—আমি যাই?

সামনেব চিত্রপটেব দিকে চেয়ে জলপাত্র থেকে হাতে গঙ্গাজল তুলতে তুলতে ঘাড় নাড়লাম।

পূজো শেষ করে প্রণাম সেরে উঠে দেখি, দরজার কাছে হাসিমুখে শিবাজী দাঁড়িয়ে। বললে—পূজো হয়েছে? আব তো চায় পিয়োগে?

হেসেই বললাম—জরুর।

চা খেয়ে বের হলাম শিবাজীর সঙ্গে। শিবাজী হঠাৎ বললে—আমি কিন্তু ভাগনা, পূজোটুজো কিছু করি না। ও সব কেমন আসে না আমার।

হেসে বললাম—যখন তোমার ওসব আসে না তখন দরকার কিসের? যখন মনে হবে আসছে তখন করবে। ও সব তখনকার জন্যে তোলা থাক।

শিবাজী বললে—কিন্তু তোমাকে পূজো করতে দেখে আমার মনে হচ্ছিল যেন আমি পূজো না করে অন্যায় করি। স্বরস্বতিয়াও পূজো করে, দেখে, খুব ভাল লাগে। তখন মনে হয়, আমিও এবার থেকে পূজো করব। কিন্তু তা আর হয়ে ওঠে না।

চুপ করে রইলাম।

শিবাজী বললে—আমি বাপু, খাই দাই আর কাঁশি বাজাই। সারাদিন কুলিদের সঙ্গে হৈ চৈ করতে করতে চলে যায়। আর পূজোটুজোর কথা মনে থাকে না। তখন কেবল মন টাকা-পয়সা আর কাজের কথা ভাবে আর পেট খাই-খাই করে।

আমি হাসতে হাসতে বললাম—এ খুব ভাল কথা। তা এখন কোথায় চললে?

শিবাজী আমার হাত ধরে টানতে টানতে বললে—এস না, এস না!

আমার হাত ধরে টানতে টানতে শিবাজী সেই বড় বটগাছটার পাশ দিয়ে আখড়াইয়ের দীঘির পাড়ে উঠল। প্রায় পাহাড়ের মত উঁচু গড়ানে পাড়, এঁটেল আর কাঁকুরে মাটিতে তৈরী। তারই উপর দিয়ে চলতে লাগলাম অনেক নীচে দাম আর পানাড়ির জঙ্গল পার হয়ে। একেবারে সত্যি সত্যি কাকের চোখের মত কালো জল টলটল করছে, সকালেব বাতাসে তাতে মধ্যে মধ্যে ঝিলিমিলি কেটে যাচ্ছে। ওদিকে সেই বাঁধানো ঘাট তিনতলা বাড়ির সমান উঁচু, যার সর্বাঙ্গ ভেঙে ভেঙে পড়েছে, আজও পড়ছে। শিবাজী আমাকে তার উলটো দিকের পাড় ধরে নিয়ে গিয়ে একটা জায়গায় যেখানে পাড়টা অন্যদিকে বাঁক নিয়েছে সেখানে দাঁড় করিয়ে দিলে। তারপর সামনে তাকিয়ে বললে—ওই দেখ।

দেখলাম। উঁচু পাড় থেকে গড়ানো সমতলে নীচে সারি সারি দীন দরিদ্র ঝোপড়ি। ইঁট, চট আর নতুন পুরনো টিন দিয়ে তৈরী। দেখে অবাক হলাম। এই ফাঁকা ধু-ধু জনহীন মাঠের মাঝখানে বাদশাহী সড়কের ধারে এই বিশাল দীঘিকে কেন্দ্র করে কারা বাস করছে এখানে?

শিবাজীর মুখের দিকে তাকিয়েই তার উত্তর পেলাম। দেখলাম, শিবাজী হাসছে। বুঝলাম, ওরা কারা। বললাম—মাউলী সৈন্যবাহিনীর একাংশ বুঝি, শিব্বা মহারাজ?

শিবাজী হেসে বললে—হ্যাঁ। আমি যখন গয়ার জঙ্গল বিক্রী করে দিয়ে চলে আসি তখন জঙ্গলে ঝোপড়িতে যারা থাকত তাদের সবাইকে ডেকে বললাম—তোরা যদি এখানে থাকতে চাস থাকতে পারিস, আমি, ওকীল সাব, যিনি কিনেছেন এই জঙ্গল, তাঁকে বলে তোদের থাকার ব্যবস্থাও করতে পারি। কিম্বা তোরা যারা আমার সঙ্গে যেতে চাস তারা যেতেও পারিস আমার সঙ্গে। তাতে একদল ওখানে রয়ে গেল, একদল বেরিয়ে চলে এল আমার সঙ্গে। যারা আমার সঙ্গে এসেছে, এ তাদেরই আস্তানা।

আমি শিবাজীর দিকে চাইলাম। বাহাদুরি আছে লোকটার! যে দেশ ত্যাগ করে ভিন্ন দেশে, ভিন্ন পরিবেশে জীবিকার সন্ধানে এসেছে, তারই উপর যে বিশ্বাসে নির্ভর করে এতগুলো লোক সপরিবারে তার পেছন পেছন চলে এসেছে, সে তো সোজা বিশ্বাস নয়!

আমি বললাম—তা তুমি গয়া থেকে সেখানকার বাস উঠিয়ে তোমার পৈতৃক সম্পত্তি ওই জঙ্গল বিক্রী করে দিয়ে চলে এলে কেন?

শিবাজী বললে—ওটাই তো আমার 'কিসসার' শেষ ভাগ। বলব বলেই তো তোমাকে নিয়ে এলাম। চল, ওই বটগাছতলায় বসি গিয়ে।

এখানে এই সরোবর-কেন্দ্রিক ধূ-ধূ মাঠে ওই বনস্পতির মত বটগাছটিই একমাত্র আশ্রয়। আমরা দু'জন দুটো বটগাছের নাবালের টুকরোর তৈরী চেয়ারে বসলাম বটগাছের ছায়ায়। রৌদ্র এই সবে উঠছে।

শিবাজী বললে—বুঝলে ভাগনা, পার্বতীয়ার মৃত্যুর পর আমাদের জীবনটা যেন কেমন হয়ে গেল। আমাদের জীবন মানে আমি, ছোটে দাদোজী, সুরস্থতিয়া আর চামারিয়ার জীবন। জানো ভাগনা, আমাদের জীবন চামারিয়াকে বাদ দিয়ে ভাবা যায় না, আমি ভাবতে পারি না। তুমি তো সব জান। তোমার মনে আছে নিশ্চয়, চামারিয়া পার্বতীয়াকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছিল। চামারিয়া পার্বতীয়াকে এত ভালবাসত যে, ওরই টানে সারাজীবনটা সে বিয়ে-সাদি না করে কাটিয়ে দিলে। ওকে আমাদের সবারই এত বিশ্বাস যে, যখন সুরস্থতিয়ার বাপের নাম পাওয়া যাচ্ছে না তখন সুরস্থতিয়া অসঙ্কোচে চামারিয়ার নাম আর পদবী বসিয়ে দিলে নিজের পরিচয় হিসেবে।

একটু চুপ করে থেকে শিবাজী বললে—আমার কি ধারণা জান ভাগনা? চামারিয়াও এক অদ্ভুত ধরনে ভালবাসত পার্বতীয়াকে। অদ্ভুত ধরনের এক ভালবাসা। যেখানে পার্বতীয়া সেখানেই চামারিয়া। বলতে গেলে চামারিয়া ছিল পার্বতীয়ার ছায়া। পার্বতীয়ার মৃত্যুর পর চামারিয়া ঠিক কতদিন যে না খেয়ে ছিল তা আমরা সঠিক কেউ জানি না। তখন সবাই আমরা নিজের নিজের শোক, নিজের নিজের দুঃখ নিয়ে মশগুল। একদিন সুরস্থতিয়াই আমাকে খুব ভয়ে ভয়ে বললে—বাবুজী সাহাব, একজন তো জহর খেয়ে মরেছে, এবার কিন্তু আর একজন না-খেয়ে মরবে।

সেকি! কে মরবে না-খেয়ে?

সুরস্থতিয়া বললে—আমাদের চামারিয়া। ও বোধহয় দিন পনরো কিছু খায়নি।

ভয় পেয়ে বললাম—সেকি! চল দেখি!

গিয়ে দেখলাম, ব্যাপার তাই বটে। চুপচাপ শুয়ে আছে। কিছু বললে কেবল কাঁদে। কিছু খেয়েছে কি না বার বার জিজ্ঞাসা করলাম। তা জবাব দেয় না, চুপ করে থাকে। শেষে ধমক দিয়ে বললাম—ওঠ্, উঠে খা। তা উঠে বসে হাউ হাউ করে কেঁদে বললে—নহি হুজুর, আর আমাকে খেতে বলবেন না। বহুত খেয়েছি। আর খাব না। আমি না-খেয়েই মরব।

আবার ধমক দিতে হ'ল। বকে, বুঝিয়ে ওকে স্নান করালাম, অল্প কিছু খাওয়ালাম। বেশ কয়েকদিন খায়নি, দুর্বল হয়ে পড়েছে। একসঙ্গে বেশী খেলে শরীর খারাপ হবে।

ও খাওয়া ধরলে বটে, কিন্তু কথাবার্তা বলে না, কাজকামও করে না। শুধু চুপচাপ বসে থাকে। আবার বকাবকি করলাম। বললাম—কাজকাম না করলে চলবে কি করে?

ও চুপ করে থাকল। কথার জবাব দিলে না, উঠলও না। দ্বিতীয় দিনে আবার বকতেই ও আমাকে পরিষ্কার বললে—আমি আর থাকব না হুজুর।

আমি অবাক হয়ে বললাম—থাকবি না তো কি করবি?

—আমি চলে যাব।

—কোথায় যাবি?

—যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাব। এখানে আর আমার ভাল লাগছে না।

আমি ওর কথা শুনে চুপ করে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। আমার মনে হ'ল ও তো আমারই মনের কথাটা যেন আমাকেই বললে। আমারও যে আর এখানে ভাল লাগছে না।

আমি ওকে বললাম—চল, আমরা জঙ্গলে চলে যাই।

ছোটে দাদোজীকে সেদিন সন্ধ্যেতে বললাম কথাটা। ছোটে দাদোজী আমার মুখের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন—বাবা শিব্বা মহারাজ, আমারও আর এখানে ভাল লাগছে না। দেখছ না, আমি সারাদিন বিষ্ণুপাদ মন্দিরে গিয়ে বসে থাকি। তাতেও শান্তি পাচ্ছি না। বাবা, একটা মানুষকে কেন্দ্র করে আমরা এতগুলো মানুষ যে বাস করতাম তা আগে বুঝতে পারিনি।

তারপর উনি বললেন—তা সুরসুতিয়ার কি হবে?

বললাম—ওকে আপনার কাছেই রাখুন।

তারপর বললাম—দাঁড়ান, আপনার সামনেই ওকে কতকগুলো কথা জিজ্ঞাসা করি।

সুরস্থতিয়াকে ডাকতেই সে এসে দাঁড়াল। বললাম—বস। ক'টা কথা জিজ্ঞাসা করব।

ও বেশ সহজ হয়েই বসল ছোটে দাদোজীর পাশে। দেখলাম, আমাদের মধ্যে ও-ই কেবল শোকটা মোটামুটি সয়ে নিয়েছে। ও আমার কথা শুনে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে—বলিয়ে।

ওকে জিজ্ঞাসা করলাম—তোর তো সামনে বি. এ টেষ্ট পরীক্ষা। পরীক্ষা দিবি না? সোজা উত্তর পেলাম—না। আর পড়ব না।

জিজ্ঞাসা করলাম—দু'বছর পড়লি, সামনে টেষ্ট, তার দু'তিন মাস পরেই ফাইন্যাল পরীক্ষা। পরীক্ষা দিলেই তো পাস করবি। তবু পরীক্ষা দিবি না?

কোন চাঞ্চল্য নাই, কোন দ্বিধা নাই, সুরস্থতিয়া পরিষ্কার উত্তর দিলে—না, আর পড়ব না। আর পড়াশুনো করতে ইচ্ছে নাই।

—তাহলে কি করবি?

আবার সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলে—এখনও ভেবে দেখিনি। তবে পড়ব না আর. এটা ঠিকই করেছি। আপনারা আর আমার লেখাপড়া নিয়ে ভাববেন না।

বললাম—বেশ, তাহলে তুই এখানেই থাক। আমি আর চামারিয়া কাল সকালে জঙ্গলে চলে যাচ্ছি।

ও শুধু বললে—বেশ। আমি এখন চললাম। লরা মেম সাহেব এসেছে।

ও চলে গেল।

পার্বতীয়ার মৃত্যুর খবর পেয়ে লরা এসেছিল সঙ্গে সঙ্গে। তারপর থেকে প্রতিদিনই আসত সুরস্থতিয়ার কাছে।

আমি চামারিয়াকে নিয়ে পরদিন সকালে জঙ্গলে চলে গেলাম। জঙ্গলে ফিরে গিয়েও দেখলাম ভাল লাগছে না, বরং বেশী খারাপ লাগছে। কাঁদতে ইচ্ছা করছে। কাজকর্ম করতে ইচ্ছা করে না। অথচ জঙ্গলের গাছপালার দিকে চাইলে মন হু হু করে। ছোটখাটো কথা মনে পড়ে, আরও কষ্ট হয়।

জান ভাগনা, আমার অনেকটা বয়স হ'ল কিন্তু মৃত্যু খুব বেশী দেখিনি। বাবা যখন মারা গিয়েছিলেন তখন বয়েস অনেক কম ছিল। একসঙ্গে অনেক কেঁদেছিলাম, কেঁদে থেমে গিয়েছিলাম। ভুলেও গিয়েছিলাম বোধহয় বাবাকে। তারপর দাদোজী। দাদোজীকে ভালবাসতাম দূর থেকেই। কিন্তু এবার দেখলাম, এ ব্যাপারটা ভিন্ন রকম। অহরহ ছুতোয়-নাতায় পার্বতীয়ার কথা মনে পড়ে আর কষ্ট হয়। আর মনে হয়, আহা, জহর পিয়ে ওর মরবার সময় কত কষ্ট হয়েছে। একা ঘরে মরবার সময় কত ভয় পেয়েছে।

এই সময়টায় মধ্যে মধ্যে পার্বতীয়ার ঝোপড়ির ধার দিয়ে বেড়াতে যেতাম, যা ও এখানে থাকার সময় কখনও করিনি। মধ্যে মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতাম সেই ঝোপের পাশে যেখানে সেই কতদিন আগে গয়া যাবার আগে একদিন ও আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে কেঁদেছিল। সেখানে তখন একটা ছোট্ট ফুলগাছ ছিল। সেই গাছটা এখন মস্ত হয়েছে। সারা গাছ ফুলে ভর্তি। আমি তারই কাছে কতদিন দাঁড়িয়ে সেই পুরনো, হারানো দিনটির কথা মনে করে কষ্ট পেয়েছি, আবার সুখও পেয়েছি।

কিন্তু কিছুতেই আর মন শান্ত হয় না। জঙ্গলে অমনি করে একটা পুরো মাস কেটে গেল। একদিন চামারিয়াকে ডেকে বললাম—চামারিয়া, এখানেও যে ভাল লাগছে না। কি করি বলত?

চামারিয়া আমার কথা শুনে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল।

বললাম—এক কাজ করা যাক। গয়ার বাস তুলে দিয়ে, এ জঙ্গল বিক্রী করে কোথাও চলে যাই। কি বলিস?

আশ্চর্য ব্যাপার। চামারিয়া সঙ্গে সঙ্গে চোখ মুছে হাসতে লাগল। বললে—ওহি আচ্ছা হোগা হুজুর। হিঁয়াসে কোই দুসরা জায়গা চলিয়ে।

ঠিক আছে। তাই হবে। আমি মন ঠিক করে নিলাম। আর তার পরদিনই চামারিয়াকে নিয়ে গয়া চলে গেলাম। ছোটে দাদোজীকে বললাম কথাটা।

আমার কথা শুনে ছোটে দাদোজী তো অবাক। তিনি আমার মুখের দিকে অনেকক্ষণ বোকার মত চেয়ে থেকে বললেন—এ তুমি কি বলছ বাবা শিবাজী? তুমি এই সোনার সম্পত্তি বিক্রী করে দিয়ে কোথায় যাবে? সেখানে গিয়ে কি করবে?

বললাম—কোথায় যাব তা ত জানি না। আর কি করব তাও বলতে পারি না। তবে এখানে আর ভাল লাগছে না।

ছোটে দাদোজী বললেন—কোথায় যাবে তা না হয় না-জানলে, কিন্তু কি করবে তা না জানলে চলবে কি করে? দেখ বাবা, তুমি মানুষ ভাল, কিন্তু তোমার মাথায় বুদ্ধি বলে কিছু নেই। এ কাঠ-টাঠের ব্যাপার কিছু জান বোঝ তুমি। কিন্তু ওই পর্যন্তই। তার বেশী কিছু জান না। বুঝবার মন কি বুদ্ধি কিছুই নাই তোমার। তুমি এই কাঠের ব্যবসা ছেড়ে অন্য কোথাও গেলে সত্যি সত্যি বিপদে পড়বে। আর তাছাড়া আরও একটা কথা আছে।

—কি কথা?

এবার সত্যি সত্যি একটা ভারী কথা বললেন ছোটে দাদোজী—বেশ, বুঝলাম,

তুমি এখানে থাকতে চাইছ না, এখান থেকে চলে যাবে। কিন্তু সুরস্মৃতিয়ার কি হবে?

এ কথাটা তো সত্যি সত্যিই ভাবিনি আমি। অথচ এটাই তো সবচেয়ে ভাববার কথা। আমি চুপ করে থাকলাম কিছুক্ষণ। তারপর ছোটে দাদোজীকে বললাম—সুরস্মৃতিয়ার তা হলে বিয়েটা দিয়ে দিন।

ছোটে দাদোজী মুখেব একটা তিক্ত ভঙ্গি করলেন। বললেন—বাবা, তুমি, তোমার বুদ্ধিহীনতা বলব না, তোমার সরল বুদ্ধির পরিচয় দিলে। সুরস্মৃতিয়ার বিয়ে দিন বললেই কি বিয়ে হয়ে যায়? একবার কি ঘটল দেখলে না? ওর বিয়ে দেওয়া কি খুব সোজা হবে মনে কর?

আমার সত্যি সত্যিই তখন মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল বুঝতে পারছি। ছোটে দাদোজীর কথা শুনে আমি চুপ করে রইলাম। ছোটে দাদোজী বললেন—বাবা, আমি সুরস্মৃতিয়ার ব্যাপারটা ভেবে দেখেছি। আমার ধারণা, বিয়ের ব্যাপারে বহুদিন আগে থেকে ওর মনে মনে একটা কিছু ঠিক করা আছে। আর না হয়, ওর ভালবাসবার ক্ষমতাই নাই। এই দুয়ের এক না হলে, ও মেয়ে একটা অল্পবয়সী সুন্দর ছেলের সঙ্গে ওই রকম পাকা হিসেব করে খেলা করতে পারে?

আমি কি বলব? চুপ করেই রইলাম। ছোটে দাদোজী বললেন—তোমাকে আমি বলছি বাবা, তুমি যদি ও মেয়ের বিয়ের ভার নাও নিতে পার; আমি পারব না। আমার সাধ্যিও নেই, সাহসও নেই।

আমি গোঁয়ারের মত বলে ফেললাম—কিন্তু এর তো একটা ব্যবস্থা করতে হবে। ওকে তো আর জলে ফেলে দিতে পারবেন না।

ছোটে দাদোজী জিজ্ঞাসা করলেন—তা পারব না। তা চাইছিও না। কিন্তু ও কি করতে চায় তা ওকেই ডেকে জিজ্ঞাসা কর।

যে কথা সেই কাজ। আমি সঙ্গে সঙ্গে হাঁক পাড়লাম—সুরস্মৃতিয়া, এ সুরস্মৃতিয়া!

মুখে একমুখ হাসি নিয়ে চুলের বিনুনীর ফাঁস খুলতে খুলতে সুরস্মৃতিয়া এসে দাঁড়াল। প্রথমেই বললে—আমি অনসুইয়া। আমাকে সুরস্মৃতিয়া বলে ডাকতে বারণ করে দিয়েছি না?

আমি গম্ভীরভাবেই বললাম—বেশ, তাই বলেই ডাকব। এখন একটা কথা বলছিলাম।

বেশ হাসিমুখেই সুরস্মৃতিয়া বললে—বলুন।

বললাম—আমার আর এখানে ভাল লাগছে না। তাই আমি ঠিক করেছি

আমি আমার গয়ার জঙ্গল বিক্রী করে দিয়ে এখান থেকে চলে যাব। এ বাড়ি থাকবে। এখানে ছোটে দাদোজী থাকবেন। তুমি থাকতে চাইলে তুমিও থাকতে পার। তবে তুমি কি করবে সেটা তুমি ভেবে দেখ।

সুরস্থতিয়ার হাসি এক চুল কমল না। সে হেসেই বললে—আমার জন্মে ভাবছেন যখন সে ভাল, খুব ভাল। তবে আমি বড় হয়েছি। আমার জন্মে এখন না ভাবলেও চলবে। আমার জন্মে যখন ভাবছেনই তখন বলি, আমি লরা মেম সাহেবের সঙ্গে কাজ করব। ওর কাছে টাইপটাও শিখে নেব; আবার সেই সঙ্গে ব্যবসাও করব ওঁর সঙ্গে। ওঁর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে।

আমি গম্ভীরভাবে বললাম—তাতেই তো সমস্যার শেষ হবে না। তোমাকে তো বিয়ে-সাদিও করতে হবে। আমার তো মনে হয় কলকাতার ইংরেজী কাগজে তোমার বিয়ের জন্মে একটা জিজ্ঞাপন দিলে কেমন হয়?

সুরস্থতিয়া আমার কথা শুনে কেমন থমকে গেল। আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপর আবার আগের মতই হেসে বললে—বিয়ে বিয়ে করে অত ভাবতে বসলেন কেন? আপনার কি নিজের বিয়ে করার খুব সখ হয়েছে, না কি? তা যদি হয় তা হলে আমার বিয়ের বদলে নিজের বিয়ের একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে দিন না। সেই তো ভাল হবে।

সুরস্থতিয়া আমাকে ছোটে দাদোজীর সামনে এমনভাবে কথা বলতে পারে, এ আমি কল্পনাই করিনি। রাগে আমার কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল। রাগে অধীর হয়ে বললাম—সেদিন এক চড় খেয়ে তুই দেখছি শায়েস্তা হ'স্‌নি। তোকে আর এক চড় দিতে হবে দেখছি।

আমি রেগে সোজা দাঁড়িয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু সুরস্থতিয়া বিন্দুমাত্র ভয় না পেয়ে খিল খিল করে হেসে বললে—কই, আজ মারুন না, দেখি সাহস কতখানি!

আমি আরও রেগে তেড়ে এগুতে যাচ্ছিলাম ওর দিকে, এমন সময় নিদারুণ ভয় পেয়ে ছোটে দাদোজী আমাদের মধ্যে পড়ে বললেন—আরে, আরে, তোমরা করছ কি? ও বাবা শিবাজী, তুমি করছ কি? এই সুরস্থতিয়া, তুই কাকে কি বলছিস তোর খেয়াল নাই?

আমাকে থেমেই যেতে হ'ল। বললাম—আমি আর দেরি করব না। আপনাকে বলে যাচ্ছি ছোটে দাদোজী, আমি কয়েক দিনের মধ্যেই সমস্ত ব্যাপার চুকিয়ে ফেলব। প্রথম কথা, আমি আজকেই ওর বিয়ের জন্মে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন পাঠিয়ে দেব কলকাতায়। ওর বিয়ে দিয়ে এখানকার সব বিক্রী-সিক্রী করে দিয়ে চলে যাব এখান থেকে।

স্বয়স্থতিয়া চুলের বিনুনীর গুছি খুলতে খুলতে মুখ বাঁকিয়ে বলে গেল—ওরে আমার মর্দানা রে!

কথাটা আমি শুনতে পেলাম। কিন্তু কোনো জবাব দিলাম না। আমার রাগে কেবল মনে হচ্ছিল ওর হাত দু'খানা মুচড়ে ওর মাথাটা ধরে দেওয়ালে সজোরে ঠুঁকে দিই। তার বদলে বললাম—এই আমি এক্ষুণি বেরুচ্ছি। ওই দুই কাজ করে বাড়ি ফিরে আসব।

বাড়ি থেকে তো বের হলাম। কিন্তু লেখাপড়ার কাজগুলো করব কি করে? বিজ্ঞাপন লেখা তো আমার দ্বারা হবে না। আর জঙ্গল বিক্রীর ব্যাপারে প্রথম পরামর্শই বা করব কার সঙ্গে? প্রথমেই কেমন ঝট করে লরার কথা মনে পড়ে গেল। সুতরাং আর বেশী কিছু ভাবলাম না। একেবারে সোজা চলে গেলাম লরার বাড়ি।

লরা তখন সৌভাগ্যক্রমে বাড়িতেই ছিল। আমাকে পেয়ে খুব খুশী। বললে—হ্যালো বিগ বেবী, বুড়ো খোকা, কি খাবে বল।

—কিচ্ছু না। আমার অনেক কাজ আছে তোমার সঙ্গে। আমাকে তোমার খানিকটা সময় দিতে হবে। আমার মেজাজ খুব খারাপ হয়ে আছে, বুঝলে!

লরা খুব হাসল [illegible]াট। বললে—তোমার মেজাজ খারাপ? এখানকার তোমার জানা লোকেরা তো বলে—শিব্বা ইজ্ লাইক গড শিভা। হি ইজ সো গুড। তোমাকে কিছু খেতেই হবে, বুঝলে? খুব ভাল 'মছলি' পেয়েছি। তুমি আগে দু'পিস ফিশ ফ্রাই খাও। সঙ্গে চা। তারপর তোমার কথা শুনব।

খাওয়া হ'ল। তার সঙ্গে এক গ্লাস ভাঙের সরবৎ। সরবৎ খেতে খেতে লরা বললে—এইবার বল তোমার কাজের কথা।

বললাম—স্বয়স্থতিয়ার বিয়ে দেব। ভাল পাত্র চাই। স্টেট্‌স্‌ম্যানে একটা বিজ্ঞাপন দিতে হবে। আমার বিদ্যের দৌড় তো জান। তুমি একটা বিজ্ঞাপন লিখে দাও দেখি।

আমার কথা শুনে লরা অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে—তুমি ওর বিয়ে দেবার জন্যে হঠাৎ এত ব্যস্ত হয়ে পড়লে কেন?

বললাম—ওর বিয়ে দিয়ে দেওয়াটা আমার পক্ষে খুব জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওর বিয়ে না দিলে আমি কিছুই করতে পারছি না, এক পা এগুতে পারছি না। অথচ আমার অনেক কাজ।

লরা একটু চুপ করে থেকে বললে—দেখ, তোমার যত কাজই থাকুক, তুমি ওকে

বিয়ে দেবার জন্যে এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? ওর মা সবে এই মাস দুই আড়াই মারা গিয়েছে। ওর মনটা স্বভাবতঃই বিভ্রান্ত হয়ে আছে। ওকে কিছু সময় দাও, ওর মনটা স্থির হোক। তার ওপর ধর, তার আগে ওর ওপর দিয়ে অত বড় আরও একটা বিয়োগান্ত ব্যাপার ঘটে গিয়েছে।

আমার মাথায় তখন জেদ চেপেছে। আমি মাথা নেড়ে বললাম—দেখ, আমি তোমার কাছে এই কাজটার জন্যে এসেছি, পরামর্শ চাইতে আসিনি। আমার দেরি করবার সময় নেই। আমি আমার জঙ্গল বিক্রী করে দিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারি, এখান থেকে চলে যাব।

আমার কথা শুনে স্তম্ভিতের মত লরা অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললে—তুমি এখান থেকে চলে যাবে তোমার জঙ্গল বিক্রী করে দিয়ে? হ্যাটস্ হোয়াই ইউ ওয়ান্ট টু ডিসপোজ অব সুরসুতিয়া বাই ম্যারেজ? এইজন্যে তুমি সুরসুতিয়ার বিয়ে দিয়ে খালাস পেতে চাও? বাট হোয়াই? কিন্তু কেন?

আমি মুখভার করে বললাম—কেন তা কি করে বলব? আমার আর এখানে থাকতে ভাল লাগছে না। এই শহর, এমন কি আমার জঙ্গল, সব আমার কাছে তেতো মনে হচ্ছে।

আমার মুখের দিকে চেয়ে বার বার মাথা নেড়ে, মুখ চুক চুক করে লরা বললে —আয়, পুয়োর সোল। শিব্বা, তুমি ভারী দুঃখী। আমি তো তোমাকে কতদিন আগে বলেছিলাম। পার্বতীয়া মরে গিয়ে তোমার এই হাল হয়েছে।

আমি চুপ করে রইলাম। লরা বললে—কিন্তু শিব্বা, তুমি সেই বিগ বেবীই রয়ে গিয়েছ। তুমি খবরদার তোমার জঙ্গল বিক্রী ক'রো না। অমন লাভের জিনিস। ইট্স্ এ ট্রেজার ট্রোভ। ওটা রত্নখনি তোমার। কদাচ বিক্রী ক'রো না ওটা।

আমার আবার রাগ চড়ে উঠল। বললাম—দেখ, আমি তো তোমাকে আগেই বলেছি, আমি তোমার মতামত চাই না। আমার কাজগুলো করে দাও।

লরা আবার মাথা নাড়লে বার বার—তুমি সেই চিরকাল একই রকম রয়ে গেলে। বেশ, আমার মতামত তোমাকে নিতে হবে না।

বলে, আমাকে বসিয়ে সে কাগজ-পেন্সিল নিয়ে লিখতে লাগল। অনেকক্ষণ লিখে, কাটাকাটি করে, আমাকে দেখিয়ে সে টাইপ-রাইটার নিয়ে বসে বিজ্ঞাপনের কপি আর একখানা চিঠি তৈরি করে আমার হাতে দিলে। তারপর বললে—এই তো তোমার একটা কাজ করে দিলাম। আর, তুমি আমার

মতামত না চাইলেও তোমাকে একটা পরামর্শ দিই, মন দিয়ে শোন। যদি তুমি তোমার জঙ্গল বিক্রীই কর তা হলে যার তার কাছে যেয়ো না। তোমাকে বোকা পেয়ে ঠকিয়ে নেবে। না, না, রাগ ক'রো না। তাতে তোমারই ক্ষতি হবে শিব্বা মহারাজ। বাট ইট ইজ এ ফ্যাক্ট্। ব্যাপারটা তাই। তুমি সোজা তোমার বাবার জুনিয়ার ছিলেন, এ্যাডভোকেট মিঃ সিনহার কাছে চলে যাও। তিনি তোমার জঙ্গল কিনতে পারেন। আমাকে একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন। উনি ভাল, সৎ লোক। ঠিক ঠিক দাম পাবে। ঠকবে না।

কথাটা আমার খেয়াল হয়নি। লরা তো আমাকে ঠিকই মনে পড়িয়ে দিয়েছে।

বললাম—তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। তুমি ঠিকই বলেছ।

লরা বললে—তুমি যদি চাও আমিও তোমার সঙ্গে যেতে পারি।

আমি আশ্বস্ত হয়ে বললাম—এস, এস না। আমি খুব খুশী হব।

দু'জনে বের হলাম। প্রথমে পোস্টাপিসে বিজ্ঞাপনটা আর তার জন্যে টাকা মানি-অর্ডার করে দিয়ে মিঃ সিনহার কাছে গেলাম দু'জনে। অল্প কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর মিঃ সিনহাই জঙ্গলটা কিনতে চাইলেন। তিনি নিজে থেকেই যে দাম দিতে চাইলেন তাই যথেষ্ট মনে হ'ল। আর, সে দাম ভালই। লরাই সমস্ত কথাবার্তাটা বললে আমার হয়ে।

আমি পরদিনই জঙ্গলে ফিরে গেলাম। মিঃ সিনহাও আমার সঙ্গে গেলেন জঙ্গল দেখতে। লরাও ছিল সঙ্গে। তিনি ঘুরে ঘুরে জঙ্গল দেখে মনে মনে খুশী হয়ে ফিরে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন জঙ্গলে কোন গাছ কত আছে তার একটা ফর্দ করে দিতে। তাই লরাও রয়ে গেল আমার সঙ্গে।

দু'জনে দিন পনরো থেকে ফর্দটা তৈরি হ'ল। ফর্দ এক কপি আমাকে দিয়ে আর একটা কপি মিঃ সিনহাকে দেবার জন্যে ফিরে গেল লরা। আমিও দিন সাতেকের মধ্যে ফিরে গিয়ে দলিলে সই করব রেজেস্ট্রী অফিসে, এই ঠিক থাকল।

আমি জিনিসপত্র গোছাবার জন্যে রয়ে গেলাম। দু'পুরুষের সম্পত্তি, আমার এতকালের আস্তানা। জিনিসপত্র গোছানো খুব সহজ কাজ নয়। আমি ধীরে-সুস্থে জিনিসপত্র গোছাচ্ছি। যখন থেকে সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে সব বিক্রী করে এখান থেকে চলে যাব তখন থেকেই মন বেশ ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে।

এমন সময় একদিন ডাকে বিজ্ঞাপনের কাটিং আর সেই সঙ্গে বিজ্ঞাপনের উত্তরে খানকয়েক চিঠি এসে হাজির হ'ল। আমি সেইগুলো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলাম।

এই সময়ে শিবাজীর ধীর কণ্ঠের কথাগুলির উপর কোন দূরের গ্রাম থেকে আসা ঢাকের গম্ভীর শব্দ আছড়ে পড়ে তার কথাগুলিকে আবৃত করে দিলে। ঢাকের শব্দটা থামবার জন্যে শিবাজী চুপ করে গেল।

আজ ধর্মরাজ পূজো। রাঢ়ের প্রায় সার্বজনীন উৎসব। ব্রাহ্মণ থেকে আরম্ভ করে সমাজের নিম্নতর বর্ণের কাছে এ পূজো সমান আদরের। আজ রাঢ়ের মানুষের একটা বিশিষ্ট অংশ উপবাস করে থাকে। বিকেলের দিকে ধর্মরাজের পূজা শেষ হলে তখন উপবাস ভঙ্গ করার সময় আসে।

শিবাজী চুপ করে বসেছিল, বোধহয় ঢাকের বাজনা শুনতে শুনতে কিছু ভাবছিল। তার চোখের স্তিমিত একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকা মৃদু দৃষ্টি থেকে বুঝতে পারছি সে নিবিষ্ট হয়ে কিছু ভাবছে। একবার আমার চোখে চোখ পড়তেই সে একটু হাসল। জিজ্ঞাসা করলাম—কি ভাবছ?

শিবাজী মৃদু হেসে একটি নিঃশ্বাস ফেলে বললে—ভাবছি? না। বিশেষ কিছু ভাবছি না। কি ভাবব? আমি তো তোমাদের মত লেখাপড়া করিনি, আর ভাবনা-চিন্তা করার অভ্যাসও নেই আমার। তবু মধ্যে মধ্যে কেমন মনে হয় সময় সময়, জীবনটা কি ছিল কি হয়ে গিয়েছে।

জিজ্ঞাসা করলাম—কেন, খারাপ হয়ে গিয়েছে?

শিবাজী সঙ্গে সঙ্গে শশব্যস্ত হয়ে বললে—না, না, খারাপ-ভালর ব্যাপার নয়। ভাল-মন্দ কি সুখ-অসুখেরও ব্যাপার নয়।

—তবে?

—তবে কি জান? কত বদলে গিয়েছে। তখন জীবন এক রকম ছিল, এখন আর এক রকম হয়ে গিয়েছে। জান ভাগনা, সেই ফারাকটা সময় সময় বুঝবার, ধরবার চেষ্টা করি। কিন্তু ঠিক ধরতে পারি না।

বললাম—মামা, এটা শুধু তোমার কথা নয়, এটা সবারই কথা। সবাই নিজের নিজের মত করে নিজের জীবন সম্পর্কে এমনিই ভাবে।

শিবাজী ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে বললে—ঠিকই বলেছ। আজকের দিনের কাছে নিজেরই আগের জীবনটা স্বপ্নের মত মনে হয়। মধ্যে মধ্যে আগের জীবনের কথা ভাবলে মনে হয়, সে জীবনটা কি আমারই জীবন? কিন্তু সে জীবনটা কোথায় গেল? এক এক সময় মনে হয়, যেন সে জীবনটা ছিলই না কোনদিন। আমি শুধু স্বপ্ন দেখেছি।

একটু চুপ করে থেকে শিবাজী আবার বললে—বাবা ছেলেবেলা থেকে কানে মন্ত্র দিতেন, তুমি শিবাজী মহারাজের মত হবে। বাবার কথাগুলো প্রাণে বড়

বেশী করে বসে গিয়েছিল, বুঝলে ভাগনা! তাই লেখাপড়া শেখার দিকে মনটা যায়নি। ভাবতাম, লেখাপড়া শিখে কি হবে? শিবাজী মহারাজও তো লেখাপড়া শেখেননি। লেখাপড়া না শিখলেও কিছু যাবে-আসবে না। সেই মন ছিল বলেই সমাজের ওপরতলার লেখাপড়া জানা লোকদের ধার বড় একটা মাড়াতাম না। বেশী করে মেলামেশা করতাম নীচের তলার মানুষদের সঙ্গে। যারা লেখাপড়ার খুব একটা ধার ধারত না। তাদেরই সঙ্গে ছিল আমার চলা, বলা, খাওয়া, ওঠা, বসা সব। তারাই তো ছিল আমার কল্পনার মাউলী সৈন্যের দল। তাদের নিয়ে শিবাজী মহারাজের মত একটা কিছু করার স্বপ্ন আমার মাথায় ঘুরত।

চুপ করেই শুনছিলাম শিবাজীর কথা। এ শিবাজীকে আমি চিনি না। হাসি-খুশী, দিলদরিয়া, হৈচৈ-করা শিবাজীর আড়ালে এই যে বিষণ্ন, স্তিমিত স্বপ্নালু দৃষ্টি মানুষটি আপনার জীবনকে জানবার ও বুঝবার চেষ্টা করছে, একে আমি চেনা ত দূরের কথা, কখনও দেখিনি। অথচ তাকে আমার বেশ ভালই লাগছিল। এই ধু ধু করা জনবসতিহীন মাঠের মাঝখানে, খোলা আকাশের নীচে যে একান্ত নির্জনে আজ এই প্রভাতকালে নিজের জীবনের প্রাচীন পুঁথিখানি খুলে তার লিপির পাঠোদ্ধার করবার জন্যে মগ্ন ছিল, তাকে আমার এক ধ্যানমগ্ন সন্ধানীর মতই মনে হচ্ছিল।

শিবাজী আবার সেই আগের জের ধরেই বলছিল—কিন্তু জান ভাগনা, আজ বুঝেছি, চরিত্রের যে জোর, মাথায় যতখানি বুদ্ধি থাকলে শিবাজী মহারাজ হওয়া যায় তার কোনটার কিছুই আমার ছিল না। কিন্তু তখন ত আর তা বুঝিনি। তাই ভেবেছিলাম ওই সব দুসাদ, মুসহরদের একসঙ্গে জমিয়ে ত তুলি আগে। তাদের বেশ হিসেব করে আমার ওই মস্ত জঙ্গলের গাছের ছায়ায় লুকিয়ে রেখেছিলাম। ভাবতাম, ওদের দিয়ে একদিন একটা বড় কাজ করব। কি কাজ করব তারও কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না আমার। তবু ভাবতাম।

একটু থেমে শিবাজী আবার বললে—কিন্তু এতে একটা উপকার আমার হয়েছিল। মেয়েদের যে মায়ের মত সম্মান করতে হয়, মায়ের মত দেখতে হয়, এটা মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল সেই ছেলেবেলা থেকেই। এমনি করেই অনেকটা বয়স পর্যন্ত আমার হৈ হৈ করেই কেটে গিয়েছিল। কিন্তু গোল বাধল সেইদিন থেকে যেদিন চামারিয়া এসে পার্বতীয়ার জন্যে আশ্রয় চাইলে। আশ্রয় চাইতেই মনে হ'ল, স্ত্রীলোক বিপদে পড়েছে, তাকে আশ্রয় দেব না? না দিলে যে অধর্ম হবে। তাই চামারিয়া বলার সঙ্গে সঙ্গে পার্বতীয়াকে আশ্রয় দিলাম।

আশ্রয় দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু বুঝিনি, কি করলাম। বুঝলাম কিছুদিন পর। কিছুদিন পর থেকে একটু একটু করে বুঝতে লাগলাম, আমি কি করেছি। জীবনে অনাত্মীয় স্ত্রীলোক তার আগে দেখিনি বললেই চলে। একটি অল্পবয়সী তরুণী আমার সঙ্গে একই অরণ্যের আশ্রয়ে বাস করে, এইটাই যথেষ্ট ছিল আমার কাছে। আমার অরণ্যবাসকে ওই বোধটি যেন কেমন করে এক আশ্চর্য মূর্তিতে সুরভিত করে দিয়েছিল। পুরুষের কাছে স্ত্রীলোক যে কি আনন্দের খনি তা দিনে দিনে বুঝতে পারছিলাম। অথচ তোমাকে আগেই বলেছি, তুমি বিশ্বাস কর ভাগনা, আমার জঙ্গলে যাবার দেড় দু'বছর আগে পর্যন্ত তাকে আমি চোখেই দেখিনি। ও এই জঙ্গলে আছে এই বোধটাই আমার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

সেই থেকে আমার জীবনটা আমাব অগোচরেই আস্তে আস্তে বদলে যেতে শুরু করেছিল। ওই যে শিবাজী মহারাজের মত কিছু একটা করার স্বপ্ন, তাও ধীরে ধীরে অসার অর্থহীন হয়ে মন থেকে খসে পড়ছিল। সমস্ত মনোযোগটা তার বদলে ওই একদিকেই বয়ে চলেছিল। আর মজা কি জান ভাগনা, আমি তা বুঝতে পারিনি। এক ভাল-লাগা থেকে আর এক ভাল-লাগার টানে কখন যে ভেসে কতদূরে গিয়ে পড়েছি, তাও টের পাইনি।

এই সময় ঢাকের বাজনাটা থেমে গিয়েছে। হঠাৎ আমার নজরে পড়ল শিবাজীর ঝোপড়ির দরজায় এই ধু ধু মাঠের ধূসর পরিবেশে রাঙা শাড়ীপরা সুরমুতিয়া দাঁড়িয়ে আছে, ভুরুর ওপর একটা হাত দিয়ে, সকালের আলো আড়াল করবার জন্যে। সে আমাদেরই দিকে তাকিয়ে আছে। দেখে শিবাজীকে বললাম—ওই দেখ, তোমার শেষ ভাল-লাগা তোমার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে, বোধহয় তোমারই জন্যে।

শিবাজী আমার মুখের দিকে একবার, সুরমুতিয়ার দিকে একবার তাকিয়ে আবার চাইল আমার দিকে। দেখলাম চাপা হাসিতে ওর দুই চোখ চকচক করছে। শিবাজী আমার পিঠে একটা থাপ্পড় মেরে ছুটতে ছুটতে নেমে গেল। আবার ফিরে এল ছুটতে ছুটতে। আমার হাত ধরে টানতে টানতে বললে—চল, নাস্তা রেডি, খানে হোগা।

বললাম—কেন, নাস্তার জন্যে ওখানে যেতে হবে কেন? নাস্তাই এখানে আসুক না।

তাই এল। সুরমুতিয়াই নিয়ে এল। ওকে বললাম—তুই খেয়েছিস? খাসনি? তা হলে তুইও আমাদের সঙ্গে গাছতলায় বসে যা না।

স্বরস্বতিয়া একটু লাজুক হাসি হেসে ঘোমটা টানলে। শিবাজী বললে—ওর আজ উপবাস।

অবাক ব্যাপার। জিজ্ঞাসা করলাম—উপবাস কিসের রে তোর ?

জবাব দিলে শিবাজীই। বললে—ওই যে ঢাক বাজছিল। আজ ধর্মরাজ পুজোর উপোস।

খাওয়া হয়ে গেলে, স্বরস্বতিয়াই সব বাসনপত্রগুলো তুলে নিয়ে গেল।

চা খেতে খেতে শিবাজীকে বললাম—তারপর ? তোমার সেই জঙ্গলের গোছগাছ থেকে আরম্ভ কর। বিজ্ঞাপনের উত্তর এল কলকাতা থেকে ?

শিবাজী বললে—হাঁ। সবুর কর। মনটাকে এই মাঠ থেকে সেই জঙ্গলে ফিরে যেতে দাও। সেও তো বেশ কয়েক বছর পেছনে পড়ে আছে।

একটু হেসে বললে—বলছিলাম তো যখন মন ঠিক করে ফেলেছি যে সব বিক্রী-সিক্রী করে চলেই যাব তখনই মনটা আপনা-আপনি ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে। আমি কলকাতা থেকে পাওয়া চিঠির মধ্যে বেছে বেছে পাত্র ঠিক করছি। দুপুরবেলা। সত্য খাওয়া-দাওয়া করে বসেছি তখন। মনে মনে ভাবছি এইবার একটু শুলে হয় আরাম করে। এমন সময় বারান্দায় খুট খুট করে জুতোর আওয়াজ। অবাক হয়ে গেলাম। জুতো পরে কে হাঁটবে বারান্দায় ? বিশেষ করে এ তো মেয়েদের জুতোর আওয়াজ। কথাটা মাথায় চড়াক করে খেলতেই আমি ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। যা দেখলাম তাতে বুকটা ধ্বক করে উঠল। বারান্দায় স্বরস্বতিয়া দাঁড়িয়ে। যে পোশাকে স্বরস্বতিয়া কলেজ যেত সেই রকম পোশাক। ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে সাদা শাড়ী পরেছে। গোটা মুখখানা রাঙা হয়ে উঠেছে। মুখ চোখ যেন ঝাঁ ঝাঁ করছে। আমি ওর কাছে ছুটে এগিয়ে গিয়ে চাপা গলায় বললাম—তুই ? তুই আবার কোথা থেকে এলি ?

রুমাল দিয়ে মুখ চোখ মুছতে মুছতে স্বরস্বতিয়া বললে—কোথা থেকে আবার আসব ? গয়া থেকে এলাম।

—কিসে এলি ?

—বয়েল গাড়ীতে এলাম। লরা মেমসাব ঠিক করে দিয়েছিল।

আমার রাগ হতে লাগল ভয় কেটে গিয়ে। জিজ্ঞাসা করলাম—কেন এলি ?

আমার কথা শুনে স্বরস্বতিয়া আমার মুখের দিকে একবার মুখ তুলে চাইল। দেখলাম, তার চোখ দুটো বড়ো হয়ে উঠেছে, চকচক করছে। বুঝলাম, আমি যেমন রেগেছি ওর ওপর, ও নিজেও তেমনি আমার ওপর রেগে আগুন হয়ে উঠেছে।

নিজেকে সংযত করলাম। আর দু-একটা কথা কথান্তর হলেই আবার সেই আগের বারের মত আমি ওকে মেরে বসব মনে করে চুপ করে গেলাম। তা ছাড়া ও গয়া থেকে এতটা পথ এসেছে। খাওয়া-দাওয়া হয়নি। তার ওপর রোদ লেগেছে। তাই সব বুঝে ওর হাত ধরে ঘরের ভিতর টেনে এনে আমার বিছানায় বসিয়ে দিয়ে বললাম—এখনই রোদে এসেছিস। বস এখন।

ও কোন কথা বললে না। চুপ করে বিছানায় বসে রইল মুখ নীচু করে। মধ্যে মধ্যে হাতের রুমালে মুখ মুছতে লাগল। বুঝলাম, ওর খুব গরম লাগছে। আমি ও-পাশে র‍্যাকের ওপর থেকে হাত পাখাখানা নিয়ে ওকে বাতাস করতে লাগলাম।

ও আমার হাত থেকে পাখাখানা নিতে গেল। বললে—আমাকে দিন।

আমি আধা ভেঙিয়ে, অর্ধেক রাগে, খানিকটা কৌতুকে বললাম—ওঃ, আজ বলা হচ্ছে আমাকে দিন। সেই এতটুকু বিল্লীর বাচ্চার মত অবস্থা থেকে সেবা করে, যত্ন করে এতটা বড় করলাম, আজ ওঁর জ্ঞান-বুদ্ধি হয়েছে, বলছেন—আমাকে দিন!

ও আমার কথা শুনে আড়চোখে আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে আবার চোখ নামিয়ে চুপ করে বসে রইল।

আমি ওকে খানিকক্ষণ বাতাস করে ঠাণ্ডা করে পাখাটা ওর হাতে দিয়ে বললাম—তুই ততক্ষণ বাতাস খা, আমি আসছি।

তখন ওখানে আর কেউ ছিল না যে কাউকে হুকুম করব। রান্নাঘর থেকে খুঁজেপেতে খানিকটা চিনি যোগাড় করে সরবৎ করে লেবুর রস মিশিয়ে দুটো গেলাস ঢাল-উপুড় করতে করতে ওকে দিয়ে বললাম—খা!

ও বিনা বাক্যব্যয়ে আমার হাত থেকে সরবৎটা নিয়ে খেয়ে ফেললে।

আমি ওকে বললাম—এইবার স্নান কর। আমি তোর জন্যে ভাত চাপিয়ে দিয়ে এসেছি।

ও ঘাড় নেড়ে বললে—না!

—কি না? স্নান করবি না? ভাত খাবি না? যা, ওঠ, যা বলছি—শোন। ওই আমার কাপড় আছে, পরে স্নান করে নে।

বলে আমি রান্নাঘরে চলে গেলাম। আমি নিজে হাতে রান্নাও করতে পারতাম। করেওছি কখনও কখনও। যদিও অভ্যেস নেই। ভাত আর ক'টা সেদ্ধ-টেদ্ধ তৈরি করে ওকে ডাকতে গেলাম। সময় আমার নিশ্চয় একটু বেশীই লেগেছিল।

ঘরে এসে দেখলাম, স্বরস্বতিয়া স্নান করে এসে আমার বিছানাতে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। কিন্তু একটা জিনিস দেখে আমার মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। অতগুলো পয়সা খরচ করে আমি কলকাতার ইংরেজী কাগজে যে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম, যার উত্তরে বেশ কয়েকটা চিঠি এসেছিল সেগুলো সব কুঁচি কুঁচি করে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে স্বরস্বতিয়া। সেই কুঁচিগুলো মেঝের এখানে-ওখানে উড়ে বেড়াচ্ছে।

আমি আর রাগ সামলাতে পারলাম না। আমি ওর ঘাড়ের কাছে হাতটা ধরে রেগে জোরে ঝাঁকি দিয়ে রূঢ়ভাবে ডাকলাম—এই! এই স্বরস্বতিয়া! এই!

ঝাঁকি খেয়ে ধড়মড় করে উঠে বসল স্বরস্বতিয়া চোখে অবাক দৃষ্টি নিয়ে।

আমি আবার ওর হাতে ঝাঁকি দিয়ে বললাম—একি করেছিস তুই!

—কি করেছি? রাগতভাবেই বললে স্বরস্বতিয়া।

আমি দাঁত কিড়মিড় করে বললাম—আমি পয়সা খরচ করে কলকাতার কাগজে বিজ্ঞাপন দিলাম। তার উত্তরে যে সব চিঠি এসেছিল সেগুলো তুই কুঁচি কুঁচি করে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিস?

এইবার ও বিছানা থেকে সোজা উঠে দাঁড়াল। দু-চোখে আগুন ছড়িয়ে বললে—হ্যাঁ, দিয়েছি।

রাগে প্রায় ভেঙিয়েই বললাম—কেন দিয়েছ?

জ্বলে উঠল স্বরস্বতিয়া। গলায় যতটা জোর ছিল ততটা জোরে চেঁচিয়ে বললে—দিয়েছি, বেশ করেছি! আমার বিয়ে নিয়ে, আমাকে বিয়ে দেবার জন্যে তোমার এত মাথাব্যথা কেন? কেন? কেন?

বলতে বলতে, কি বলব তোমাকে ভাগনা, স্বরস্বতিয়া দু'হাতে আমার চুলের মুঠি চেপে ধরে দাঁতে দাঁত চেপে সজোরে ঝাঁকি দিতে দিতে কেবল বলতে লাগল—কেন? কেন? কেন?

আমি, কি বলব, আমি তো হতবাক! স্বরস্বতিয়া, আমার সেই ছোট্ট, নিজের হাতে মানুষ-করা স্বরস্বতিয়া আমাকে 'তুমি' বলে অপমান করে আমাকে ধরে মারছে? কি হ'ল কি ওর? ওর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল?

ও কিছুক্ষণ সজোরে প্রাণপণে আমার চুল ধরে টেনে আমাকে নির্যাতন করেও যেন ওর তৃপ্তি হ'ল না। ও আমার বুকের ওপর দু'হাত দিয়ে চড়-চাপড় মারতে লাগল। আমি ওকে শাসন করবার জন্যে ওর দু'হাত চেপে ধরবার চেষ্টা করতেই ও আমার হাত থেকে নিজের হাত দুটো সজোরে ছাড়িয়ে নিয়ে,

আমাকে আরও অবাক করে দিয়ে, দু'হাতে আমার গলা সজোরে জড়িয়ে ধরে আমার বুকে মাথা রেখে অঝোরঝরে কাঁদতে লাগল।

আমি এর কোন হিসেব খুঁজে পেলাম না। সেই সঙ্গে সে অবস্থায় কি করব, কি বলব তাও খুঁজে পাচ্ছিলাম না, বুঝতে পারছিলাম না। কেবল এইটুকু বুঝলাম যে, এখনই ওর কান্নাটা থামানো দরকার। আমি ওর কাঁধ দুটো ধরে ওকে আমার বুকের ওপর থেকে সরাবার চেষ্টা করে বিব্রতভাবে বললাম—এই, এই সুরসুতিয়া, এই অনসুইয়া, কি হ'ল কি তোর? অমন করে কাঁদছিস কেন?

কে জবাব দেবে? সুরসুতিয়া কেঁদেই চলেছে সমানে। অনেক কষ্টে ওকে ঠেলে আমার বুকের ওপর থেকে সরিয়ে ওকে ধরে বিছানার ওপর চেপে বসিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—কি হ'ল কি তোর, আমাকে বলবি তো?

সুরসুতিয়ার চোখের জলে আমার বুকটা ভিজে গিয়েছে। ওর দুই গাল বেয়ে তখনও জল গড়িয়ে পড়ছে। আমি হাত বাড়িয়ে ওর চোখের গালের জল মুছিয়ে দিতে গেলাম। ও রেগে ঝটকা দিয়ে মুখ সরিয়ে নিলে। তারপর আমার মুখের দিকে সোজাসুজি চেয়ে আমাকে বললে—হমে জহর দিজিয়ে, হম পি কর হমারা মাকে মাফিক মর যাউঙ্গি।

আমি হেসে বললাম—বেশ, বেশ বাপু, তোকে বিয়ে করতে হবে না। তুই চোখ মোছ।

সুরসুতিয়া আমার মুখের দিকে আবার চাইল।

আমি ওকে শান্ত করবার জন্যেই বললাম—বেশ, তোকে এখন বিয়ে করতে হবে না। কিন্তু আমি তো চলে যাব। তোকে কার কাছে কোথায় রেখে যাব?

সুরসুতিয়া হাঁপাতে হাঁপাতে বললে—হম্‌ভি আপকো সাথ যায়েঙ্গি।

আমি হেসে বললাম—তুই একটা পাগল রে! আমি একা পুরুষ মানুষ, কোথা থেকে কোথায় যাব! তুই একা মেয়েমানুষ, আমার সঙ্গে কোথায় যাবি?

সুরসুতিয়া একেবারে অবুঝের মত বললে—হম তুমহারা সাথ যাউঙ্গি।

তুম? এবার যেন মানেটা অল্প অল্প বুঝতে পারছি। তবু বললাম—তোর অল্প বয়েস, আজ না হোক একদিন তোকে সাদি করতে হবে। তোকে কি সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি?

সুরসুতিয়া আবার সোজা উঠে দাঁড়াল। আমার গালে ঠাস করে একটা চড় মেরে আমার মাথাটা দু'হাত দিয়ে বুকে চেপে ধরে বললে—তুমি যেখানে যাবে আমি সেখানেই যাব। আমি আর কাউকে সাদি করব না।

বোঝ একবার ব্যাপারটা! আমার মুণ্ডুটা দু'হাতে বুকের সঙ্গে চেপে রেখে আবার অঝোরঝরে কাঁদতে আরম্ভ করেছে। সেইভাবে ঠায় বসে থাকতে থাকতেই বুঝলাম আমার মাথার ওপর চাপ পড়ছে। তারপরই বুঝলাম, সুরসুতিয়া নিজের মুখখানা আমার মাথার ওপর চেপে ধরে কাঁদছে, আর তার চোখের জল ঝরে পড়ছে আমার চুলের ভেতর দিয়ে।

আমার ছাড়ান পাবার উপায় নেই। কি করি, বসেই রইলাম। তারপর এক সময় আস্তে আস্তে ওর হাত ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়ালাম। বললাম—যা, মুখটা ধুয়ে আয়। ভাত সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

সুরসুতিয়া চোখ মুছতে মুছতে ঘাড় নাড়লে—না।

—না কি? যা, মুখ ধুয়ে আয়। নইলে আমিই মুখ মুছিয়ে দেব।

বলতেই ও উঠে চলে গেল। আমি তার মধ্যে উঠে গিয়ে ওর জন্যে রান্নাঘর থেকে ভাত সেদ্ধগুলো আর একটা ডিম সেদ্ধ নিয়ে এলাম। সব নামিয়ে দিয়ে বললাম—খা!

খেতে বসে ওর সে কী ভীষণ লজ্জা! আমি ওর সামনেই বসে ছিলাম। ওর লজ্জা দেখে বললাম—এবার থেকে তো তুইই রান্না করে খাওয়াবি। আজ প্রথম দিন আমিই খাওয়ালাম তোকে।

খাওয়া হয়ে গেলে—জান ভাগনা, আজ বলতে শরম লাগছে, কিন্তু না বলেও পারছি না, বলতে ভালও লাগছে—ওর খাওয়া হয়ে গেলে আমিই সেদিন জল ঢেলে ওর এঁটো হাতখানা ধুইয়ে দিয়েছিলাম।

তারপর ওকে বললাম—তুই শুয়ে পড়। ঘুমো খানিকটা। অনেক কষ্ট করে এখানে এসেছিস, অনেক কাঁদলি। এখন ঘুমিয়ে খানিকটা আরাম কর।

বলে থামল শিবাজী। আমার চোখে চোখ পড়তেই খানিকটা বোকার মত হাসল সে। তারপর বললে—ব্যস, এই তো আমার কথা শেষ হয়ে গেল।

আমিও একটু হেসে চুপ করে রইলাম।

আশপাশে বৈশাখ মাসের রোদ এবার বেশ একটু চড়া হয়ে ফুটে উঠেছে। আমরা চেয়ার দু'খানা হাতে করে ঝোপড়ির পাশে ইঁটের চালায় উঠে এসে বসলাম।

শিবাজী চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—তারপর?

শিবাজী হেসে বললে—এর পরও তারপর বলছ?

জিজ্ঞাসা করলাম—বিয়ে করনি তুমি ?

শিবাজী বললে—আরে কী সর্বনাশ ! কী বলছ তুমি ! বিয়ে করিনি, তাই আবার হয় নাকি ? তারপর গয়া ফিরে এলাম। সেই দিনই, ওই মেয়েকে নিয়ে রাত কাটাবো কোথায় ?

স্বরস্বতিয়া ঘরের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল, আমি বাইরে এসে বসলাম। ভাবতে লাগলাম—কি হ'ল ব্যাপারটা ? এর মানেটা কি ?

ভাবতে ভাবতেই জঙ্গলের ভেতরের বস্তির দিকে রওনা হলাম। চেলাচামুণ্ডাদের বলে একখানা বয়েল গাড়ী যোগাড় করে এনে স্বরস্বতিয়াকে ডাকলাম—স্বরস্বতিয়া, ওঠ, শহরে যেতে হবে।

যেন কিছুই হয়নি এমনিভাবে উঠল স্বরস্বতিয়া। আমার সঙ্গে গাড়ীতে এসে উঠল।

শহরে ঢুকে প্রথমেই গেলাম লরা মেমসাহেবের বাড়ী। মেমসাহেবকে সোজাসুজি বললাম—মেমসাহেব, আমি স্বরস্বতিয়াকে সাদি করব। সিভিল ম্যারেজ আইনে। তুমি এই ক'দিনে সব ব্যবস্থা করে দাও তো।

তারপর ভাগনা, সাদি হ'ল। সাদি হ'ল অবশ্য গোপনেই। জঙ্গলও বিক্রী হয়ে গেল। ছোটে দাদোজী ওখানে বিষ্ণুপাদপদ্ম ধরে রয়ে গেলেন। আর আমি স্বরস্বতিয়া, আমার অনসুইয়ার হাত ধরে পথে নামলাম। কোথায় গয়া জেলার নিরিবিলি জঙ্গলের ছায়া, আর কোথায় মুর্শিদাবাদ জেলার ধুধু মাঠের ভেতর পথের ধারে বটগাছের গায়ে ইঁটের ঝোপড়ি ! কোথা থেকে কোথায় এসেছি ! কোথায় আবার ওর হাত ধরে কতদূর যাব তার ঠিক-ঠিকানা কি ?

মনের যত খোয়াব ছিল, খেয়াল ছিল, সে কবে সেই জঙ্গলের মধ্যে গাছের ছায়ায় ঘাসের ওপর খসে পড়ে গিয়েছে তা জানি না। আবার সেই খোয়াবকে, সেই স্বপ্নকেই এখানকার ধুলো থেকে, মাটি থেকে নতুন করে কুড়িয়ে পেয়েছি।

জান ভাগনা, আমি ছেলেবেলায় স্বপ্ন দেখেছিলাম দুষ্টকে শাসন করবার, মাউলী সৈন্য নিয়ে রাজ্য জয় করবার, রাজ্য স্থাপন করবার। কিন্তু সে সব কিছুই আমার হয়নি। তার জন্যে কোনো দুঃখ নেই আমার। এই যে তুমি, সেই ছেলেবেলার ছোট্ট বাচ্চাটা যে পাঁই পাঁই করে খুনি দৌড়ুত, যে ফুটবল খেলতে গিয়ে আমার সঙ্গে পারেনি, পড়ে গিয়ে মাথায় চোট লাগিয়েছিল, সেই তুমি, এখন একজন কত বড় খুনি, লিখনেবালা হয়েছ ! কিন্তু বিশ্বাস কর ভাগনা, তার জন্যে তোমাকে আমার এতটুকু হিংসে হচ্ছে না। আমার সব স্বপ্ন দিয়ে আমি

তার বদলে যা পেয়েছি, যেটুকু পেয়েছি, তাই আমার অনেক। আমি তাতেই বাদশা।

আমার থাকবার মধ্যে আছে কিছু পুরনো দোস্ত, যারা আমার হাত ধরে সেই জঙ্গল থেকে এখানে এই মাঠ পর্যন্ত এসেছে আমাকে বিশ্বাস করে। তাদের সঙ্গে সারাদিন খাটি, কাজ করি, তাদের গালমন্দ করি, আবার তাদেরই সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করি। যা কিছু রোজগার হয় ভাগ করে খাই ওদেরই সঙ্গে।

এত বড় দুনিয়ায় কে রাজা হ'ল, কে বাদশা বনল, কে কত টাকা রোজগার করল, তা নিয়ে খুনি, আমার বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। আমার ওসব ভাববার সময় কোথায়?

আর আছে খুনি, আমার সুরসুতিয়া। আমার তামাম দুনিয়ার সেরা স্বপ্ন হয়ে। সবসে আচ্ছা খোয়াব। আমি আমার মাউলীদের নিয়ে দিনভর খুনি, রাস্তায় কনট্রাকটারি করে বাদশাগী করি, দিনের শেষে ওই দীঘির হামামে ঠাণ্ডা হয়ে আমার অনসুইয়া বেগমের কাছে চলে আসি। আমার বেগম তখন ঠাণ্ডি পোলাও নিয়ে আমার জন্যে বসে থাকে। বসে থাকে মুখে হাসির খুশবু নিয়ে। আমি খাই আর দেখি। খাওয়া শেষ হলেই তিতির পাখী ধরার গুব্‌গুবে ডাকের মত ডাকি—সুরসুতিয়া, এ সুরসুতিয়া! তখন, বুঝলে ভাগনা, গয়ায় সেই ফেলে আসা জঙ্গল থেকে, বহু কালের ওপার থেকে পাখীর মত পাখা মেলে ঘুম উড়ে এসে বসে দুই চোখে।

*   *   *

সেইদিন দুপুরবেলা একটা সাঁইথিয়া যাবার বাস থামিয়ে শিবাজী আমাকে যত্ন করে ড্রাইভারের পাশে তুলে দিলে। ড্রাইভারকে বলে দিলে—দেখনা দোস্ত, হমারা মেহমান, বহুত ভারী আদমি। খেয়াল রাখনা।

বলে সেই হা হা হাসি।

আমার দিকে একবার চাইল সে। দেখলাম, ওর চোখে জল চিক চিক করছে। ওর পেছনে সুরসুতিয়া দাঁড়িয়ে।

সে আমাকে বললে—আপনি তো আপনাদের সিনেমা বানাবার সময় ফিন আসবেন? শীতের সময়? এখানে শীতের সময় খুব হাঁস আসে। তখন হাঁসের মাংস খাওয়াব। জরুর আসবেন যেন।

সে ছবিও হয়নি, আমারও আর যাওয়া হয়ে ওঠেনি।

তবু এখনও শিবাজীর কথা মনে হলে মনে হয়, শীতের হিমেল আকাশের নীচে দিয়ে, পূর্ণিমার চাঁদের হিম-হিম জ্যোৎস্না গায়ে মেখে এক জোড়া সাইবেরিয়ান হাঁসের মত শিবাজী আর স্বরস্বতিয়া এখানকার পাট তুলে আর এক নতুন জায়গায় রওনা হয়েছে। ওরা চলছে তো চলছেই। হাতে হাত রেখে, কখনও হেসে, কখনও কেঁদে, কখনও রাগে, কখনও অনুরাগে, দেশ-দেশান্তর পার হয়ে, জন্ম-জন্মান্তর পার হয়ে ওরা চলেইছে, চলেইছে। ওদের চেহারা বদল হয়, কিন্তু কখনও বয়স হয় না।

—